
রাজেশ্বরী
রাসমণি
গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ।। ১৯৬০

প্রকাশক : শ্যামলী ঘোষ ।। প্রযত্নে : যোগমায়া প্রকাশনী।
৬০, পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯।

প্রচ্ছদ : গৌতম রায় ।।

চিত্রগ্রাহক : রাজা ধর এবং অলোক দে ।।

মুদ্রাকর : সত্যরঞ্জন জানা। মাদার প্রিন্টার্স।
৩৮এইচ/১৮/১, মানিকতলা মেন রোড। কলকাতা ৭০০০৫৪।

রাজেশ্বরী রাসমণি

'সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ ।

নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।'





যোগমায়া প্রকাশনী
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০ ০৯

নিবেদন

রাসমণি। একটি নাম। এক মহিমময়ী চরিত্র।

বাংলার এক কিশোরী পল্লীবালার রূপবদল হয়েছিল কলকাতার জানবাজারে গৃহবধূ হয়ে এসে। তিনি হয়েছিলেন—রাণী, লোকমাতা। তিনি ছিলেন করুণাময়ী—সংসার-জীবনে এবং প্রজাবাৎসল্যে! তিনি হয়েছিলেন মহিমময়ী— তেজস্বিতায় এবং বৈরাগ্যে। ভোগ এবং ত্যাগ, দুটি রূপই তিনি দেখেছিলেন জীবনে, অনুভব করেছিলেন পরার্থে স্বার্থত্যাগেই আনন্দ।

'যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ
তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতশ্চ যা॥'

যাঁর আত্মা পাপ থেকে বিরত আর কল্যাণে নিবিষ্ট তিনি সকলই অনুভব করতে পারেন। তিনি জেনেছেন কোনটা স্বভাব বিরুদ্ধ আর কোনটা স্বভাব সিদ্ধ। 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।'—জ্ঞানবান ব্যক্তি কেবল অপরের সেবায় ধন এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

রাসমণির অন্তর-বাহির নিরন্তর সবার কল্যাণ কামনায়, সর্বজনের হিতসাধনায় প্রবৃত্ত থেকেছে। তাই তিনি অহংবোধকে ত্যাগ করে নিজেকে একটি বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রখর অনুভূতি, গভীর দূরদৃষ্টি তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

রাসমণির জন্মসাল ১২০০ বঙ্গাব্দ, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় কায়েম হয়ে বসেছে। কলকাতাও নিজেকে দ্রুত বদলাচ্ছে—যুগ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সওদাগরী ব্যবসার জালে আটকা পড়লেন অনেকেই। অচিরেই, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষরা ভিড় করল এই শহরকে ঘিরে—দালাল, সুদখোর মহাজন, মুৎসুদ্দি, মুন্সি, বেনিয়ান। এছাড়া বড় ছোট বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও সেই সঙ্গে বড়-ছোট জমিদার শ্রেণী। পরাধীনতার গ্লানি তখনও এঁদের অনেককেই স্পর্শ করেনি। বরং ধন্য করেছিল।

এই মিশ্র পরিস্থিতি সমাজের ভাল এবং মন্দ দুই-ই করেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার যে আলো এই প্রাচ্যদেশকে স্পর্শ করেছিল তারই প্রভাবে—এক নব চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।

এই নতুন সমাজ আন্দোলনে ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি ও বৃত্তিজীবি তথাকথিত 'ভদ্র' মানুষদের একজন হলেন রাজচন্দ্র দাস। রাসমণি এলেন তাঁর স্ত্রী রূপে শুধু নয়—নিজের শক্তিতে তিনি নারী সমাজে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। রামমোহন কলকাতায় এসে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। সেটা ১৮১৫ সাল। একদিকে বহুদিনের সঞ্চিত অশিক্ষার অন্ধকার, ধর্মান্ধতার উন্মত্ত উল্লাস, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের নিস্ফল আস্ফালন, অন্যদিকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা—যার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন-ভাবে, বিচিত্র ধারায় জনমানসকে প্রভাবিত করেছে—তার সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস।

জানবাজারের রাণীমার কাছেও কি তার আভাস কিছুমাত্র ছিল না? অবশ্যই ছিল। এ কথাও মনে রাখতে হবে জমিদারী পরিচালনা করতেন তিনি নিজে, প্রজাদের কাছে তিনি অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন না। তাই প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল তাঁকে। শাস্ত্রপাঠ করেছিলেন, জামাতাদের সঙ্গে বিষয়কর্ম নিয়ে যেমন কথা হত আবার ধর্মীয় আলোচনাও বাদ যেত না।

রাজচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। রাসমণি তাঁর সামনে চাতুর্যের সঙ্গে বিষয়-আলোচনা করতে কোনই দ্বিধাবোধ করেন নি।

একদিকে দেবেন্দ্রনাথের তন্নিষ্ঠ ব্রহ্মসাধনা, কেশব সেনের ধর্মপ্রচার অন্যদিকে রাধাকান্ত দেব প্রমুখের সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাপট। রাসমণি এ সবের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। রাসমণির পরিণত জীবনে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটে গেছে—এ কথাও ভুললে চলবে না।

যে নারী-শিক্ষার জন্য, নারী সমাজের মুক্তি ও প্রগতির জন্য বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের অন্ত ছিল না—রাসমণিকে সেই সমাজের অগ্রবর্তিনী বললে বোধকরি ভুল বলা হবে না।

রাসমণির শিক্ষা তাঁকে ক্রমশঃ নিয়ে গিয়েছিল সংযম ও ত্যাগের পথে।

ধর্মকে অবলম্বন করে তাঁর অধ্যাত্ম-চেতনা বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু ধর্মান্ধতার আনুগত্য মেনে নেয়নি। সহজভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতই ধর্মীয় আচরণ ছিল তাঁর সহজাত। জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, এ ছিল তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। যাকে আশৈশব তিনি লালন করেছিলেন এবং পরিণত জীবনে প্রকৃত পরিবেশে পল্লবিত হয়ে তা মহীরুহ হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৫ সালে রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর ঠিক দু'বছর পরেই ১৮৫৭ সালে ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহ শাসক সম্প্রদায়কে একটা নাড়া দিয়েছিল। ধর্ম নিয়ে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানদের মধ্যে এক ধরণের বিকৃত মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। যাঁরা বিদেশী তাঁদের চোখে আমাদের ধর্ম যেমন ছিল হীন, আবার স্বদেশবাসী যাঁরা তাঁরাও হচ্ছিলেন পথভ্রষ্ট। এই সুযোগে এক শ্রেণীর মানুষ, বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মের সমস্ত রকম গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে পক্ষান্তরে পরধর্মকেই আঁকড়ে ধরছিলেন।

এই সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সাধনার আলোকে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পলি খসে পড়ল। ফুটে উঠল এক অদ্ভুত জগত। যেখানে সহজ সত্যে তিনি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। হিন্দুধর্মের রুদ্ধ প্রবাহ চাকতে দিক পরিবর্তন করে অবলীলায়, প্রবল পরাক্রমে ছুটে চলল বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে।

বলতে কোন দ্বিধা নেই—এই উৎসমুখটির মূলকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর আর রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়। রাসমণি যে ধর্মবিশ্বাসে সিপাহী বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর তেজস্বিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, সেই ধর্ম বিশ্বাসেই তিনি তাঁর 'ছোট ঠাকুর' রামকৃষ্ণকে চিনতে পেরেছিলেন। তখনও ঠাকুর 'পরমহংস' হননি। তখনও দিকে দিকে ঠাকুরের নির্দেশিত পথে হিন্দুধর্মের জয়ভেরী বেজে ওঠেনি—কিন্তু রাসমণি তাঁর অনুভবে যেন ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সকলের সব মতামতকে উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে দ্বিধাবোধ করেননি।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্ত সমক্ষে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার লালসাহীন, কামগন্ধহীন রূপটি তুলে ধরেছিলেন। রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ করেছিলেন তিনি আপন আচরণে, অভিব্যক্তিতে।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাই লিখেছিলেন :

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য ? নাম্ন মহিম্নঃ
কো বেত্ত ? কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ ?
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্য সীমাম্ ?
একশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥"

তাঁরই অনুসরণে বাসু ঘোষ লিখেছিলেন—যদি 'গৌর নহিত'—তবে,

"রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানিত কে ॥
মধুরবৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার ।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥"

সেইমত আমরাও রাসমণির অক্ষয় কীর্তির মহিমা-কীর্তন করতে পারি । আজ তিনি বা তাঁর দক্ষিণেশ্বর না থাকলে আমরা রামকৃষ্ণকে পেতাম না ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-চেতনার পরিপূর্ণ রূপকল্প বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । কিন্তু তার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিলেন পুণ্যবতী রাসমণি ।

কিসের পুণ্য ? দেবালয় প্রতিষ্ঠার ? দানসত্র, যাগযজ্ঞ, সমারোহের ? অথবা ভোগ-রাগ-নিত্য পূজোর্চনার ? না, দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছিল প্রকৃত অর্থেই এক মহামিলন কেন্দ্র ! বলা যায়—বিশ্ব এসে ধরা দিয়েছিল এর ক্ষুদ্র অঙ্গনে । 'বহু' এসে মিলেছিল 'এক' ।

বিস্ময় জাগে, যখন দেখি, ভাবি এ কোন্ রূপক, রামকৃষ্ণ চড় মেরেছেন রাসমণিকে—'এখানেও বিষয়ের চিন্তা ?'—মন্দিরে আশ্রিত, বেতনভুক্ কর্মচারীর হাতের প্রহারে রাজসিক প্রাচী প্রাকারে ফাটল ধরল । অহংবোধের বেড়াটা ভেঙ্গে গেল । আর তখনই নতুন করে জেগে উঠলেন যেন আর এক রাসমণি—আর এক সত্তা নিয়ে । সৎ, চিদ্, আনন্দের উপাসিকা, সাত্ত্বিক, তাপসী এক রমণী । যিনি ত্যাগে-প্রেমে-বৈরাগ্যে চির ভাস্বর । এর জন্য তাঁকে অনেক দুঃখ বরণ করে নিতে হয়েছে । চলার পথও তাঁর কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি ।

এমনই একটি চরিত্রকে—বাস্তবের একটি চিত্রপটকে আমি আমার এই গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি । দুঃখবোধ করেছি, যখন দেখেছি আজও বিশ শতকের শেষভাগে পেঁছে রাসমণির মত বরণীয়া মহিলার যথার্থ কোন মূল্যায়ন হয়নি । আশাহত হয়েছি—বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সমাজবাদীদের আলাপ-আলোচনায় তিনি অনুপস্থিত থেকে গেছেন ।

আশ্চর্যের কথা তাঁর বৃহৎ কর্মজীবনের অনেক কিছুই আমাদের অজানা,—এ নিয়ে অনুসন্ধিৎসার বা আগ্রহের অভাবও মনকে পীড়িত করে।

রাসমণির জন্মের পর দু'শত বর্ষ অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সময় তার স্বাক্ষর রেখে গেছে ইতিহাসের বুকে। আজ আমরা পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছি। নারী আজ সমাজে পুরুষের সম মর্যাদার অধিকারিণী। কিন্তু আমরা চলব পিছন দিকে, ভাবব তখনকার কথা—সেই যুগে, সেই সময়ে রাসমণি শুধুমাত্র এক সাধারণ বঙ্গললনা ছিলেন না—নিজের গুণে ছিলেন রমণীরত্ন!

রাসমণি রাধিকার অন্য নাম। কৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যমণি ছিলেন শ্রীরাধা। পরম বৈষ্ণব হরেকৃষ্ণ-রামপ্রিয়া তাই কন্যার নামকরণ করেছিলেন রাসমণি। রামকৃষ্ণও তাঁকে 'কৃষ্ণসখী' বলে সম্বোধিত করেছেন। এ গ্রন্থে রাসমণিকে আমি 'রাজেশ্বরী' আখ্যায়িত করেছি। রাজেশ্বরী রাসমণি। রামপ্রসাদের গানে মেনকা গিরিরাজকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—'আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়···রাজরাজেশ্বরী হয়ে হাস্যবদনে কথা কয়।' আবার মহেশ্বরকে সতী তাঁর যে বিচিত্র দশ মহাবিদ্যা রূপ দেখিয়েছিলেন রাজ-রাজেশ্বরী তার অন্যতম! তাই রাজচন্দ্র-প্রিয়া অসামান্যা এই রমণীকে 'রাজেশ্বরী' আখ্যায়িত করে তাঁকে প্রণতি জানিয়েছি মাত্র।

প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থপ্রকাশে যাঁদের কথা না বললেই নয়, এবার তাঁদের কথায় আসি। প্রথমেই বলব—'প্রসেস সিন্ডিকেটের' কর্ণধার শ্রীবিমল দাশগুপ্ত-র কথা। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর প্রীতিসুখকর সাহায্য ও স্নেহের কথা আমি কোনদিনই বিস্মৃত হব না। নেপথ্যে তিনি আমায় নানাভাবে সাহায্য করে এগিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া 'সৎসঙ্গের' 'আলোচনা' পত্রিকায় সম্পাদক বীরেন্দ্রলাল মিত্র ও সহ সম্পাদক পরেশ ভোরা এই জীবনকথা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরিষদের অন্যান্য কর্মীবন্ধুদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অতীতের পত্র-পত্রিকা দেখার কাজে এঁরা অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন। কলকাতার মহামান্য হাইকোর্টের রমেন গুপ্ত তথা অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক চিত্রগুপ্তের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তিনি রাণী রাসমণির নথিপত্র দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

জানবাজারের পরিজনেরা বিশেষ করে প্রফুল্ল হাজরা মশাই, মথুরামোহন

বিশ্বাসের পুত্র ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের দৌহিত্ররা, এণ্টালীর আশুতোষ দাস মশাই, দক্ষিণেশ্বর ট্রাস্টি বোর্ডের অচিন্ত্যনাথ দাস এবং সত্যরঞ্জন চৌধুরী, মন্দিরের পুরোহিত হারাধন চক্রবর্তী, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবাইত, পালাকার ও মা জগদীশ্বরীর প্রধান পুরোহিত শশাংক চট্টোপাধ্যায়, দপ্তরের কর্মীবন্ধুরা একবার নয়, একাধিকবার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আমাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছেন।

অনেকেই অনেক তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে নিমতলা মহাশ্মশানে রাসমণি কৃত গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ঘাট নির্মাণের কথা বলেছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কেউ সঠিক কোন নিদর্শন হাজির করতে সক্ষম হননি। বর্তমান গ্রন্থে আমি সেই প্রাসাদতুল্য, অসামান্য স্থাপত্য-শৈলির নিদর্শন হাজির করতে সামর্থ হতাম না, যদি না বর্তমান মহাশ্মশানের কাষ্ঠ ব্যবসায়ী প্রভাত ভকত এবং তাঁর কর্মী ও বন্ধু প্রমোদকুমার রায় আমাকে আন্তরিক সাহায্য না করতেন। প্রভাতবাবু শুধু একজন কাষ্ঠ ব্যবসায়ী নন, কনট্রাক্টর। নিমতলা মহাশ্মশানের নতুন রূপ দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে প্রভাতবাবুদের ওপর। গঙ্গার ভিতর দিকে ২০০ ফুট যেমন বাড়বে, তেমনি শ্মশানের মডেলও সম্পূর্ণ বদলে যাবে অচিরেই। বসবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মর্মরমূর্তি, যে মহাকর্মযজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত প্রভাতবাবু। সেই প্রভাতবাবুর নির্দেশ মত তাঁর বন্ধু প্রমোদবাবু যখন রাণী রাসমণি এবং রাজচন্দ্র দাসের আর এক কীর্তি এই গঙ্গাযাত্রীর ঘাট আমাকে দেখালেন বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি! এখন সেই স্থাপত্য-শৈলির জীর্ণ দশা! ঘাটটি বর্তমানে এক মাড়োয়ারী মহাবীরপ্রসাদ বাগারিয়ার কাঠগোলা। বাগারিয়ার সন্ধান করতে গিয়ে পাওয়া গেল আর একজন মাড়োয়ারীর নাম, তিনি সিংহগড় বিল্ডিং-এর বিপরীতে মস্করা ভবনের কর্ণধার শঙ্কর মস্করা ওরফে হরিশঙ্কর মস্করা। যিনি কথাবার্তায় চাল-চলনে পুরোদস্তুর বাঙালী। বাঙালীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও কীর্তি প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাশীল! একদা নাকি এই শঙ্কর মস্করা, রাণী রাসমণির উত্তরসূরীদের কাছ থেকে এই প্রাসাদতুল্য ঘাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মহাবীরপ্রসাদ করেছেন কাঠগোলা! হরিশঙ্কর এখন অনেক কথাই সঠিকভাবে বলতে পারেন না, তবুও স্মৃতিচারণ করলেন! এক সময়ে নাকি এই ঘাটে তিনটি বিশাল তৈল-চিত্র দেওয়ালে শোভা পেত। রাণী রাসমণি, স্বামী রাজচন্দ্র দাস এবং

শ্বশুরে প্রীতিরাম দাসের তৈলচিত্র ! হরিশঙ্কর অনেক কষ্টে স্মৃতি খুঁড়ে বার করলেন একটি নাম, অজিতনাথ দাস। ইনি নাকি সেই তৈলচিত্র নিয়ে গেছেন। আমি এই পর্বটি ২য় সংস্করণে হাজির করবো। আরও একটি তথ্য জানালেন মস্করা, কিন্তু পূর্ণ বিবরণ দিতে পারলেন না। সেটি হলো, এই প্রাসাদতুল্য ঘাটেই রাণীমার একটি ফিটন ও একটি গাড়ি [অতি পুরাতন মডেলের] এবং কালো রঙের একটি বলিষ্ঠ ঘোড়া ছিল ! ফিটন ও গাড়ির জীর্ণদশা নাকি প্রভাতবাবুও দেখেছেন। হরিশঙ্কর সেই গাড়ি কোথায় আছে বলতে পারলেন না। যতদূর স্মৃতি খুঁড়ে বার করলেন তা থেকে মনে হলো সত্যনারায়ণ পার্কের সত্যনারায়ণ মন্দির যাঁদের, তাঁরা নাকি এ বিষয়ে বলতে পারেন।

আমি এই তথ্য সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে আপাততঃ পারিনি, ২য় সংস্করণে সংযোজন করার বাসনা রইল।

ছেলেদের ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে রাণীমায়ের যে ঐতিহাসিক মামলা হয়েছিল তার বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে ! রাণী রাসমণির নির্দেশ অনুসারে যে লোহার শিকল দিয়ে গঙ্গাকে বাঁধা হয়েছিল, তার একদিক ছিল মেটিয়াবুরুজ, অন্যদিকের শেষ সীমানা বর্তমান নিমতলা ঘাটে যাবার আদি ভূতনাথ মন্দিরের পাশ পর্যন্ত। যে বিশাল লৌহ দণ্ডের সঙ্গে সেই চেন বাঁধা হয়েছিল, তার দুটি চিহ্ন ফুটপাতের পাশে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একটি লৌহ দণ্ডের ওপর (বিন্দুমাত্র মরচে পড়েনি, মুছলে চক চক করে) ফুটপাতের চা-ওলা কয়লা ভাঙ্গে ! আমি সেই প্রাসাদ ও লৌহ দণ্ডের ছবি হাজির করলাম ! কিন্তু পরিতাপের বিষয়, রাসমণির এই সৌধ স্মৃতি, পুরাতন কলকাতার শেষ স্মৃতি অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এদিকে সকলের দৃষ্টি থাকলে ভাল হয়। ঐ ঘাট, সৌধ আর লৌহ দণ্ড প্রমাণ করছে, গঙ্গার অবস্থিতি ছিল কোথায়, আর শহর বাঁধতে বাঁধতে গঙ্গাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কতদূরে ! আহেরীটোলা ঘাটও রাণীমার কীর্তি। বর্তমান ঘাটটি নয়, অতীত ঘাটের চিহ্ন পাইনি খুঁজে !

রাণী রাসমণির জীবনবেদ রচনা এক দুরূহ ব্যাপার, এই ভাবনা থেকে যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছিলেন, যাঁর প্রতি মুহূর্তের ভাবনা, শ্রম এবং সরাসরি সর্বস্তরে সহযোগিতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তিনি আমার স্ত্রী শ্যামলী।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের সুচিন্তিত মতামত, আশীর্বাণী হয়ে আমাকে ধন্য করেছে। বেলুড়মঠের ভরত মহারাজ এবং গম্ভীরানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ আমাকে পূর্ণ করেছে।

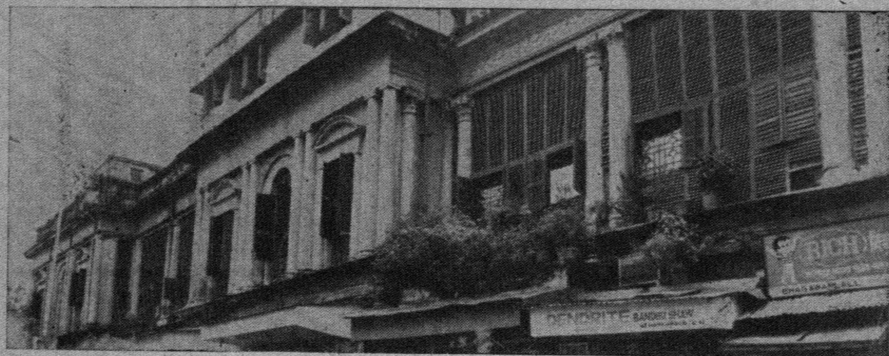
পরিশেষে বলি, বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সূর্যকে প্রকাশ করিতে মশালের প্রয়োজন হয় না। সূর্যকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে সূর্য উঠিয়াছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে এই উক্তি যেমন সত্য, রাসমণি প্রসঙ্গেও তেমনি। তাঁর চরিত্রের স্বতোৎসারিত উজ্জ্বল আলোকের দীপ্তিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার কোথায়! পাঠক-মন তৃপ্ত হলে আমার এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো! সকল শ্রেণীর পাঠকের কথা মনে রেখে এই গ্রন্থ আমি উপন্যাসাকারে রচনা করেছি, যাতে পাঠ কালে তথ্যকে অটুট রেখে, সমসাময়িক চরিত্র ও পটভূমির রূপরেখা যেন দৃষ্টির সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।



॥ রাণী রাসমণি ॥

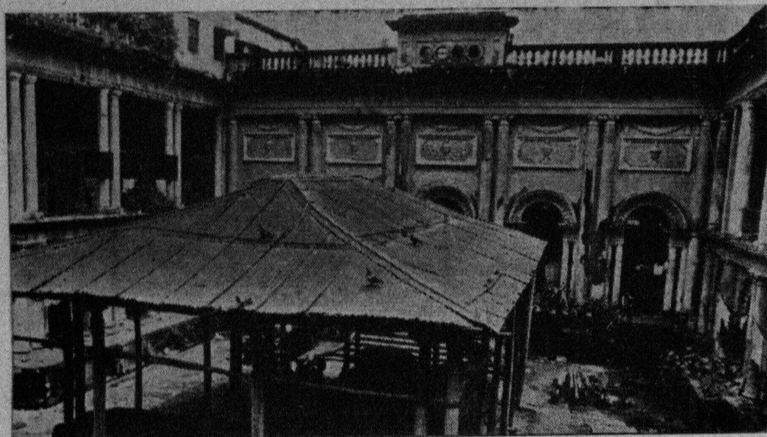


প্রীতরাম মাড় (দাস) তৈরী করলেন এই প্রাসাদ। একদিক এস. এন. ব্যানার্জী রোড, অন্যদিক ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে



উপরের তোরণ দিয়েই একদিন রাণী রাসমণি প্রবেশ করেছিলেন জানবাজারের বাড়ীতে। নীচের ঐ শ্বেত পাথরের টেবিলে জমিদারীর কাগজপত্র সই করতেন।



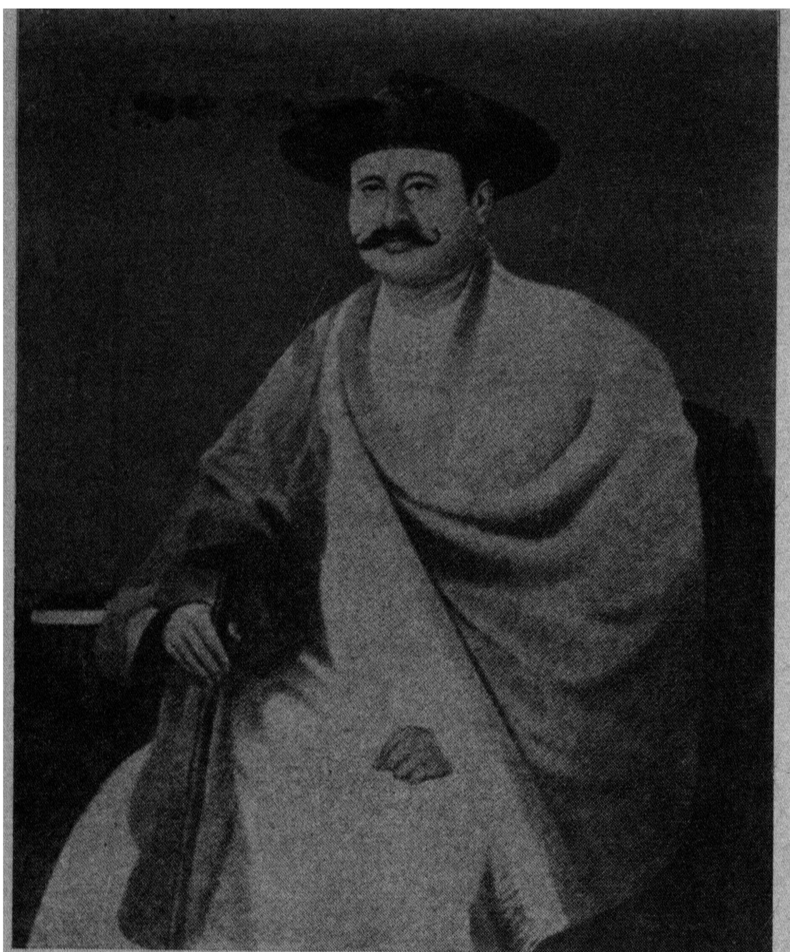


উপরে / জানবাজারের বাড়ির অঙ্গন। একদিন উৎসবে-আনন্দে ঝলমল করত।
নীচে / রাণীমার নাট মন্দির। রঘুনাথ থেকে দুর্গা সব পুজাই হতো এখানে।





॥ রাণী রাসমণির রঘুনাথ মূর্তি ॥



॥ মথুরামোহন বিশ্বাস ॥

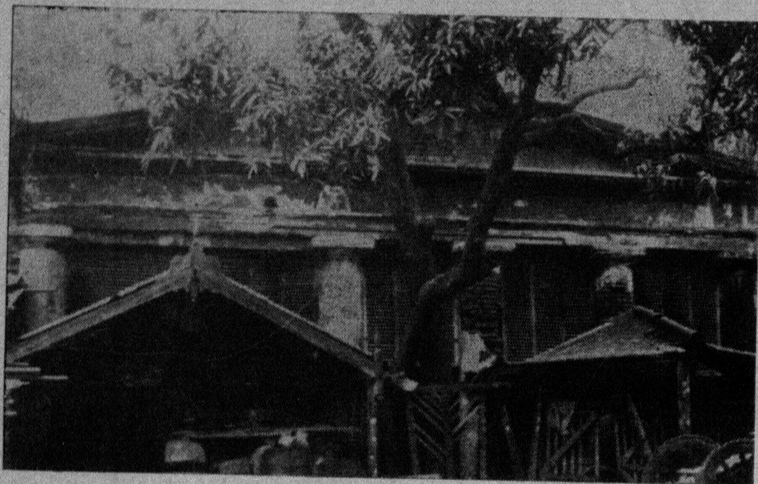
সাজ মুড়িবেকঝা ।



॥ রাণী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাসের কীর্তি, বাবুঘাট ॥

॥ নীচে আর এক কীর্তি নিমতলা মহাশ্মশানের গঙ্গাযাত্রীদের জন্য প্রাসাদতুল্য ঘাট। যে কীর্তি আজ জরা-জীর্ণ। স্মৃতি নিশ্চিহ্ন প্রায় ॥





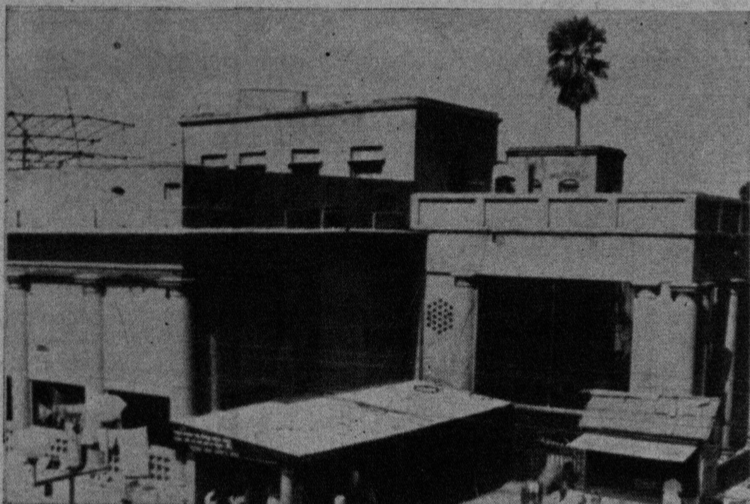
॥ নিমতলার প্রাসাদতুল্য ঘাটের সম্মুখ ভাগ ॥



॥ পুরাতন কলকাতার এই এক বিস্ময়কর স্মৃতি যা গঙ্গার পুরাতন সীমা রেখা প্রমাণ করে। এই লৌহ দণ্ডটি রাজচন্দ্রের তৈরী নিমতলা গঙ্গাযাত্রী ঘাটের গা-লাগোয়া ফুটপাতে আজও আছে। এখানে শিকল বেঁধে গঙ্গাকে বেঁধেছিলেন রাণীমা ॥



॥ রাণী রাসমণির কীর্তি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের
সাধন ও লীলাভূমি, সর্ব ধর্মের তীর্থ দক্ষিণেশ্বর ॥

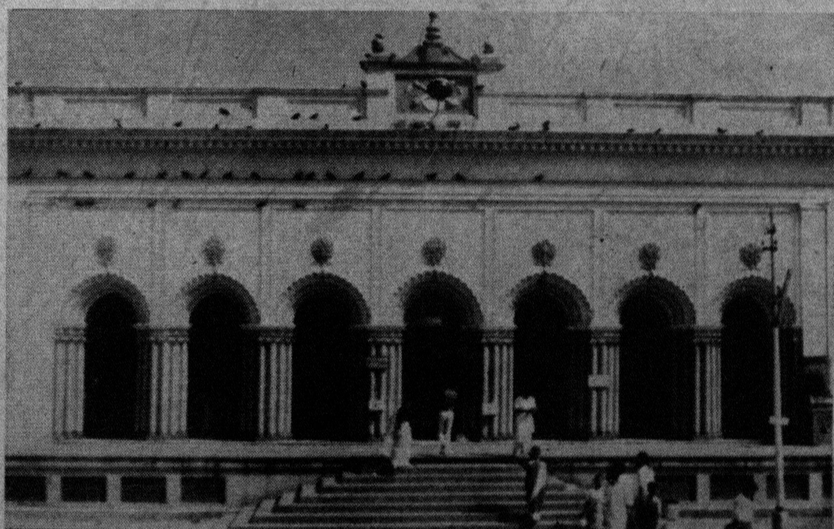


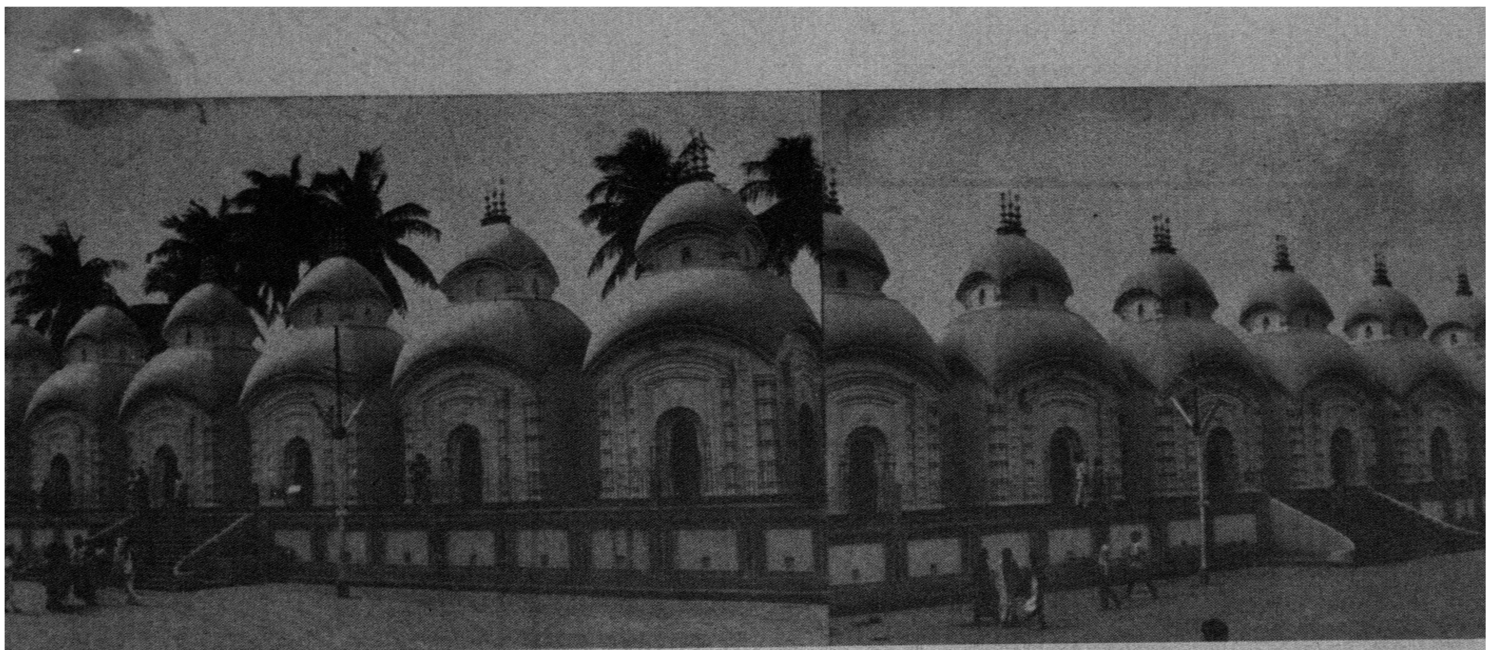
একদিকে এই ইংরেজ কুঠি বাড়ি অন্যদিকে গাজী পীরের থান এমন এক মাটিতে রাণী রাসমণির গড়ে তোলা দেবালয় দক্ষিণেশ্বর মন্দির।



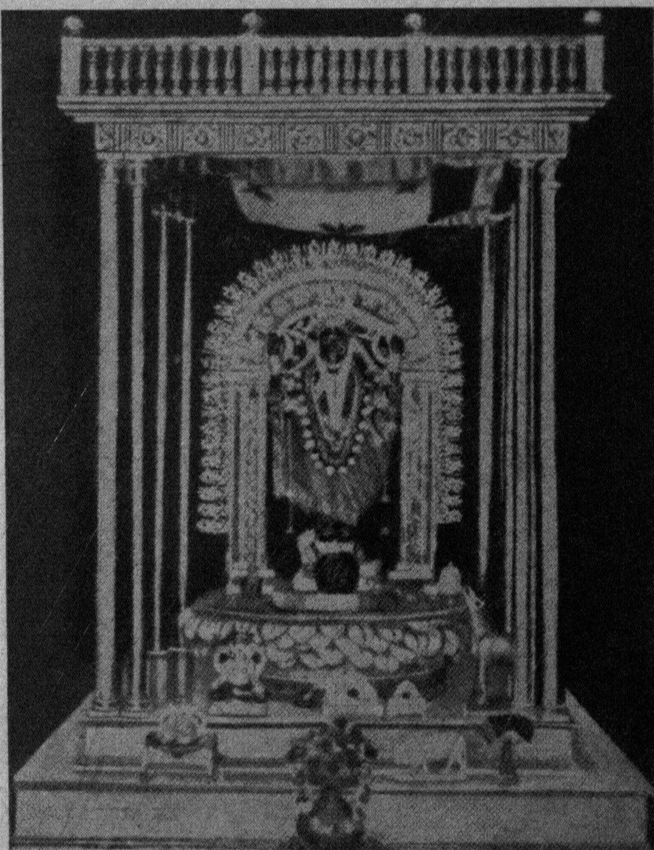
॥ দক্ষিণেশ্বর নাটমন্দির সংলগ্ন বলী বেদী ॥

॥ নীচে / মাতৃমন্দিরের অঙ্গ স্পর্শ করে রাধাকৃষ্ণের মন্দির ॥





ক্ষিণেশ্বরের মন্দির অঙ্গনের অন্যতম সেরা স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, রাণীমার ধর্মচেতনার অংশ এই দ্বাদশ শিবমন্দির ॥



॥ দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে অধিষ্ঠিতা মা জগদিশ্বরী ॥
অনেকে বলেন, মা ভবতারিণী।

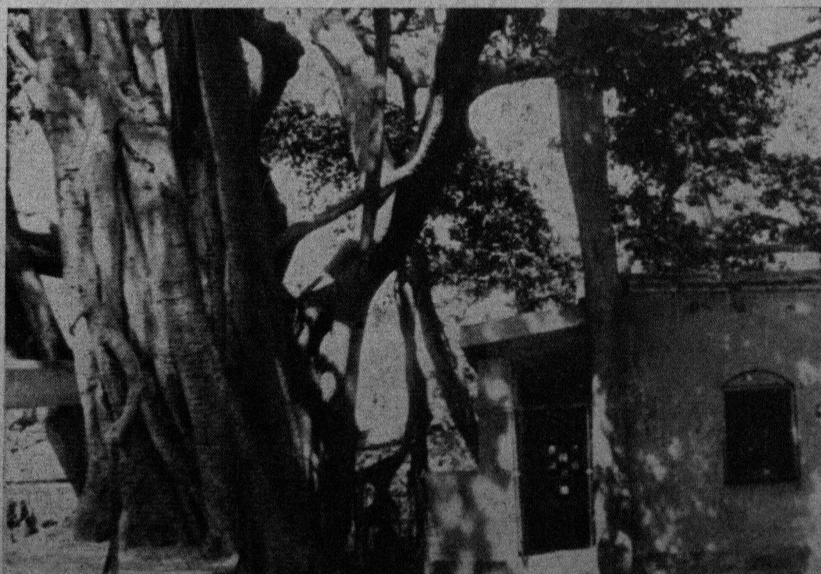


॥ স্নান ঘাট ॥



॥ নহবৎখানা। দক্ষিণেশ্বরের দ্যুটি নহবৎখানার একটি এখন বন্ধ। একদা এখানে অবস্থান করেছিলেন সারদা মা··· ॥

॥ পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ॥ নীচে ॥ ঠাকুরের সাধন ক্ষেত্র পঞ্চবটী ॥



॥ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আনন্দনিকেতন। এ এক পরমতীর্থ। ঠাকুরের শয়নকক্ষ। এই বারান্দা ঠাকুরের অনেক লীলার সাক্ষী ॥

॥ রাণীমার স্বাক্ষর যুক্ত, আদালতের দুষ্প্রাপ্য নথিপত্রের একটি পৃষ্ঠা ॥



সেদিন স্রোতস্বিনী গর্বিতা গঙ্গার ভরা যৌবনের প্রশস্ত বুকের ওপরে ছড়িয়েছিল একরাশ সোনা রঙের আলো। পশ্চিমের আকাশটা গাঢ় লাল। মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে কোন সে রসিক যেন আকাশের বুকটাকে রাঙিয়ে দিয়ে অলক্ষ্য থেকে প্রত্যক্ষ করে চলেছে আকাশের সেই অপরূপ রূপলাবণ্য।

সূর্য অস্তাচলগামী। রমণীর কপালে অাঁকা সিঁদুর বিন্দুর মত এই মুহূর্তের সূর্যটা।

প্রীতিরাম ভাববিমোহিত চিত্তে সেই রক্তিম সূর্যের রূপ দেখছিলেন। দুচোখ ভরে দেখছিলেন আর বোধকরি নিজের ভিতরকার—মনের গভীরতম অলিন্দে যে জমাট বাঁধা অন্ধকার, সেই অন্ধকারে খুঁজে ফিরছিলেন একরাশ অশান্তি আর অস্বস্তির প্রকৃত কারণ। একাকীত্বের একটা যন্ত্রণা দিবারাত্র তাঁকে কাতর করে রেখেছে। সেই যন্ত্রণা থেকে প্রকৃত মুক্তির স্বাদ নেবার আকাঙ্খায় অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রীতিরাম যেন আত্ম সমাধিস্থ! এই ভাবনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, যদি জানবাজারের প্রাসাদ অন্তঃপুরে ঐ সূর্যের রঙে রাঙানো একটি টিপ পরা কপালের সদা উপস্থিতি থাকে। যদি তার মল পরা দুটি চরণের নিত্য সঞ্চালনে জানবাজারের বাড়ি মুখরিত হয়।

কী নেই প্রীতিরামের? সব আছে। হাজার হাজার মানুষের যা নেই তার সব আছে জমিদার প্রীতিরামের। অর্থ ভাণ্ডারে অর্থ সীমাহীন। প্রাচুর্যের ভাণ্ডারে উপছে পড়ছে প্রাচুর্য। বিশাল জমিদারী যেমন আছে তেমনি আছে প্রজাদের মনের দেউলে এই মানুষটির জন্য আলাদা আসন বিছানো। শ্রদ্ধার আসন। ভক্তি আর বিশ্বাসের আসন। প্রজাদের প্রতি জমিদার প্রীতিরামের যে গভীরতম প্রীতি, সেই প্রীতিতে প্রণতি জানাতে প্রজাবৃন্দ সদাই আকুল। জমিদার আর প্রজাদের মধ্যে এমন মধুর মিলন বড় বিরল; যেন পিতা-পুত্র সম্পর্ক। এ যেন মাটির সঙ্গে শিকড়ের যোগ।

এ যেন ভক্তের সঙ্গে ভক্তি আর ভক্তির সঙ্গে দেবতার একাত্মতা। প্রভাত সূর্যের মত প্রশান্ত আর গঙ্গার মত পবিত্র পুরুষ প্রীতিরাম সবার অন্তরে ভাস্বর। অথচ কী আশ্চর্য, হাজার হাজার মানুষের যা আছে, অর্থে-সম্পদে-বৈভবে ভরা প্রীতিরামের তা নেই। স্বাচ্ছন্দ্য আছে কিন্তু সুখ নেই। প্রাচুর্য আছে অথচ মানসিক প্রশান্তি নেই জমিদার প্রীতিরামের।

রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রই এই প্রীতিরামের একাকীত্বের যন্ত্রণার উৎস। রাজচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালে প্রীতিরামের সেই যন্ত্রণা বাড়ে। চতুর্দিকে ছড়ানো বৈভবের দিকে যখনই চোখ রাখেন তিনি, সেই একই যন্ত্রণা ওঁর মনের গভীরে নতুন করে যেন দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি করে। আর তাই, বেগবতী গঙ্গার অপর প্রান্তের মাটি স্পর্শ করা আকাশের গায়ে অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিম ছটার মধ্যে আর এক অপরূপ ছবি কল্পনার তুলিতে আঁকতে থাকেন প্রীতিরাম। দৃষ্টি প্রসারিত করে গভীর আত্মনিমগ্নতায় অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেন তিনি—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং
ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎ পদং দর্শিতং যেন
তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।"

গুরু স্তোত্র সমাপ্ত করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। গঙ্গা বন্দনা নয়। গুরু বন্দনা। ঈশ্বরের পাদ পদ্মে আত্মনিবেদন।

স্রোতস্বিনী গঙ্গার উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করলেন জমিদার প্রীতিরাম। অত্যন্ত শান্ত নম্র স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ে বললেন, সূর্য অস্ত যাচ্ছে. ওদিকটায় একবার চেয়ে দেখুন দিকি নায়েব মশাই, কিছু বুঝতে পারেন কি না—

বৃদ্ধ নায়েব দ্বিধাহীন স্বরে জবাব দিলেন,—এই মুহূর্তে আপনি যে মনে, যে ভাব আর ভাবনা নিয়ে ঐ লাল টুকটুকে সূর্য দেখছেন, আমি কি আর সেই মন—সেই ভাব-ভাবনা নিয়ে কিছু উপলব্ধি করতে পারব? এ আমাকে বৃথাই বলা কর্তামশাই—

এই উক্তিতে বোধকরি প্রীত হলেন প্রীতিরাম। একরাশ খুশি যেন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখে মুখে। এত সহজ-সরল স্বাভাবিক ভাবে সত্যকে যাঁরা প্রকাশ করেন তাঁদের শ্রদ্ধা করেন প্রীতিরাম। তবুও মুহূর্তে ভারাক্রান্ত হলেন তিনি। অনেক চেষ্টায় সেই ভাবটাকে কাটিয়ে, নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়ে আবার বললেন, সামনের ঐ পড়ন্ত সূর্যটা যেন

একটা সিঁদুরের টিপ, তাই না নায়েব মশাই? এমন টিপ পরা একটি কন্যা যদি জানবাজারের বাড়িতে, আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াত, আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে বার বার বাবা বলে ডাকত, তাহলে পরম তৃপ্তি নিয়ে মরতে পারতুম। কিন্তু তা বোধহয় আমার কপালে নেই, যদি থাকত,—কথা শেষ করলেন না প্রীতিরাম। এক বুক নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। দীর্ঘ শুকনো সেই নিঃশ্বাস অবশ্যই একরাশ ভাবনার প্রতীক। এবার আপন মনে গঙ্গাকে উদ্দেশ করে অন্তরের সবটুকু আকুতি উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বললেন, মা, মা গঙ্গা—মাগো, আমি দীন, তোমার দাসানুদাস—তুমি আমার মনবাসনা পূর্ণ করে দাও মা—

প্রীতিরামের মানসিক অস্থিরতায় বৃদ্ধ নায়েব এবার বিচলিত হলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি বললেন, কর্তামশাই, একে আপনি সুস্থ নন, তার উপরে নৌকা যোগে এতদূরে এই হালিশহরে এসেছেন, একটু শান্ত হোন, সাধক রামপ্রসাদের এই পবিত্র সাধন-পীঠে একটু বিশ্রাম করে নিন—

প্রীতিরাম বৃদ্ধ নায়েবের কথা উপেক্ষা করতে পারলেন না। ক্লান্ত-অবসন্ন আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসে বসলেন সেই মহাতীর্থ-পীঠের এক পাশে। সামনে তরঙ্গায়িত গঙ্গা। শীতল স্নিগ্ধ বাতাস।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। দোল পূর্ণিমা। আবিরে-কুমকুমে রাঙানো ছিল মানুষের দেহ-মন। অলক্ষ্যে বাজছিল প্রেমের রাখাল,—পতিতের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী। হয়তো বা সেই মুহূর্তে ফুলের উৎসবে বৃন্দাবনের মাটিতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল শ্রীরাধিকার নূপুর নিক্কণ।

এখানে-ওখানে-সেখানে আর এই হালিশহরের মাটিতে পুরবাসীরা মেতে উঠেছিল সেই চিরন্তন প্রেমের অপরূপ খেয়ালে। গানে-কীর্তনে চতুর্দিক মুখরিত। প্রীতিরাম একটু সজাগ হলেন। কারা যেন কৃষ্ণ-রাধার প্রেম গাথা গাইতে গাইতে আসছে এদিকে। খোল-করতাল আর বাঁশির সুরে-সঙ্গতে, সুললিত কণ্ঠে ভক্তি-সঙ্গীতের অমৃত রসধারায়, এক অপরূপ ছন্দময় নৃত্যের ভঙ্গিমায় পুরবাসীদের স্নান করিয়ে দিতে দিতে, একদল যুবক চলেছে নগর পরিক্রমায়। প্রীতিরাম সেই গান শুনছিলেন। আকণ্ঠ পান করছিলেন সেই অমৃতধারা। এক ভাবাবেগে প্রীতিরাম হলেন আপ্লুত।

ওরা গাইছে। ওরা দুবাহু ঊর্ধ্বে তুলে নাচছে। সেই নৃত্যের তালে তালে মাতোয়ারা যুবকের দল মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিচ্ছে পথে-মাটিতে, বাতাসে, লতায়-পাতায়, শাখা-প্রশাখায়। কীর্তনীয়া যুবকের দল

বার কতক রামপ্রসাদের ভিটের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে গান শুনিয়ে চলে গেল। এই নির্জন-শান্ত পরিবেশটাকে আরও ভাবগম্ভীর, আরও স্নিগ্ধ করে দিয়ে চলে গেল। যে পথে ওরা যায় সেই পথ যেন এক অপরূপ ছন্দে মথিত হয়ে যায়।

অভিভূত হলেন প্রীতিরাম।

—কর্তামশাই আর বোধহয় এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না—, অর্ঘ্য নিবেদনের ভঙ্গিমায় কথাগুলি নিবেদন করলেন বৃদ্ধ নায়েব। প্রীতিরাম চঞ্চল হলেন। অনেকটা স্বাভাবিক হলেন! প্রকৃতির সর্বাঙ্গে নেমেছে নিয়মের বিবর্ণ আবরণ। সন্ধ্যা সমাগত। অন্ধকার নেমেছে অনেকটা। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন তিনি। পরক্ষণেই নিজেকে কিছুটা সহজ করে নিয়ে বললেন, কোথায় যাব আমরা?—আবার সেই যন্ত্রণা প্রীতিরামের সারা মনে। কণ্ঠস্বরে হতাশা মিশিয়ে বললেন, জানবাজারে ফিরে যেতে আর মন চায় না। এই বুকটার ভিতরে যে কী নিদারুণ অশান্তির ঝড় বইছে তা আর কেউ জানুক আর না জানুক আপনি তো জানেন নায়েব মশাই! রাজচন্দ্রের জন্য একটি মনের মত পাত্রী সংগ্রহ করতে না পারলে, ঐ বিশাল বৈভবের মধ্যে আমি যে পাগল হয়ে যাব। একে রাজচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাতে পারি না, যখনই ওর মুখের দিকে চোখ ফেরাই তখনই আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে! তা ছাড়া বংশ রক্ষার দায়িত্ব আমি কার ওপর ন্যস্ত করব, বংশধর না পেলে এই বিষয়-আশয় কে দেখবে বলতে পারেন নায়েব মশাই?—কথা বলতে বলতে কণ্ঠস্বর কাঁপে প্রীতিরামের। উত্তরে নায়েব বললেন, মনবাসনা আপনি তো রাধাগোবিন্দের পায়ে সমর্পণ করেছেন,—তিনি নিশ্চয়ই সব ঠিক করে দেবেন—

আর কথা নয়। ভারাক্রান্ত প্রীতিরাম এবার চলতে সুরু করলেন! একটি একটি পদক্ষেপে ভাবনার প্রতিফলন। বাঁশ-আম-কাঁঠাল আর আমলকীর পাতা বিছানো পথ ধরে চলেছেন জমিদার প্রীতিরাম। পিছনে বৃদ্ধ নায়েব। ঝরা পাতায় সেই পদ শব্দ অনেক বেশি স্পষ্ট। হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন তিনি। সারা মন জুড়ে একটা অস্বাভাবিক দোলা। পা দুখানা তাঁর সহসা থমকে থেমে গেল। ক্ষেপার পরশ পাথর খুঁজে ফেরার মত প্রীতিরাম যখন মনের চাহিদা খুঁজে খুঁজে ফিরছেন ঠিক সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ পরশ পাথর পেয়ে যাবার আনন্দে তাঁর চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল। যেন মৃদু তরঙ্গায়িত জলরাশির ওপরে পূর্ণিমার চাঁদের আলো! তিনি যেন স্পষ্টতই উপলব্ধি করলেন, হালিশহরের এই গঙ্গার তীর ঘেঁষা

এই বনের প্রাক্‌ সন্ধ্যার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেন আলোর নাচন। একটি বা দুটি নয়, এক মুঠো জোনাকির পিছন পিছন তাদের উড়ে চলা ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ছুটে ছুটে চলা এক কিশোরী। সেই কিশোরীর অপরূপ রূপলাবণ্যে যেন অন্ধকারে আলোর নাচন। জোনাকির দেহ-বিচ্ছুরিত বিন্দু বিন্দু আলো ধরার চেষ্টা সেই কিশোরীর। লাল পাড়ের ছোট্ট শাড়ির আঁচল বাঁধা কোমরে। আঁচল কিশোরীর অঙ্গ ঢাকতে পারে নি। নিরাবরণ অঙ্গের প্রতি কোন খেয়াল নেই তার। থাকবার মত মনও তার তৈরি হয়নি তখনও। প্রীতিরাম একরাশ আনন্দে বিহ্বল হয়ে এগিয়ে গেলেন সেই কিশোরীর কাছে। কিশোরীর চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ। সস্নেহে প্রীতিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে মা ?

মেয়েটির সারা মন জুড়ে তখন সেই আলো ধরার তাগিদ। তবুও বড় বড় অথচ গভীর উজ্জ্বল দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে ব্যস্ততা নিয়েই সে জবাব দিল আমি রাসমণি—কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে কিশোরী আবার সেই জোনাকির পেছনে একটা ছন্দ তুলে ছুটে বেড়াতে থাকল। সেতারের ঝালার মত প্রীতিরামের সারা মনের ওপর হিল্লোলিত হতে থাকল রাশি রাশি খুশি। চমৎকার নাম। বড় মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

আবার প্রশ্ন করেন প্রীতিরাম, তুমি কাদের মেয়ে গো ?

রাসমণি দ্বিধাহীন স্বরে উত্তর দেয়, আমি দাসেদের মেয়ে—

রাসমণি কথা বললে যেন তার কণ্ঠস্বরে অমৃত ঝরে পড়ে। স্বর যেন সুর হয়ে যায়। সেই মধুর স্বরে প্রীতিরামের হৃদয় উদ্বেলিত হলো। সেই বালিকা যেন থেমে থাকতে চায় না, জোনাকি ধরার তাগিদে সে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।

প্রীতিরাম নিজেকে যেন আর সামলে রাখতে পারলেন না. একরাশ কৌতূহল নিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—

তোমার বাবার নাম কি মা ?

কানামাছি খেলার মত জোনাকির দেহনিঃসৃত আলো-আঁধারের সঙ্গে খেলতে খেলতে উত্তর দেয় সে, আমার বাবার নাম হরেকৃষ্ণ দাস—

বালিকার সেই দুটি গভীর স্নিগ্ধ বড় চোখ, একরাশ ঘন কালো চুল, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, তেজোদীপ্ত অভিব্যক্তি প্রীতিরাম যতই দেখেন ততই মুগ্ধ হন। আরও বেশি চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনি। ভিতরকার আকাঙ্ক্ষা আরও বেশি তীব্র হতে থাকে। বৃদ্ধ নায়েব বুঝলেন, এই বালিকার ভিতরেই জমিদার প্রীতিরাম খুঁজে পেয়েছেন মানসিক প্রশান্তি লাভের কোন প্রতিচ্ছবি।

জোনাকিগুলো হয়তো এবার লুকিয়ে পড়ল পাতার আড়ালে।

বালিকার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ হতাশার ছায়া। সে থামল।

তখন প্রীতিরাম আত্মনিমগ্ন। বালিকা রাসমণিও বিস্ময়ে বাক্ হারা।

এই মুহূর্তে হালিশহরের গঙ্গাতীরবর্তী এই তীর্থে এক অপরূপ মিলন-সন্ধিক্ষণের জন্ম। মা আর ছেলের মিলন। উভয় উভয়কে জন্ম জন্মান্তরের অঙ্গীকারে যেন বুঝে নেবার এক স্বর্ণময় মুহূর্ত। ভাষাহীন ভাবে-ভঙ্গিমায় সেই কিশোরীকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি।

কৃষ্ণবর্ণের সন্ধ্যায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন। দূরে অতি দূরে, কাছে একান্ত কাছে, এখানে ওখানে সেখানে ঘরে ঘরে মঙ্গল বন্দনা। শঙ্খধ্বনিতে হালিশহরের মিষ্টি মাটির গ্রাম-জীবনের ধারায় অপরূপ ছন্দের প্রকাশ। মঙ্গল শঙ্খের অমৃত নিনাদে বালিকা সহসা যেন নিজের মধ্যে নিজে ফিরে এলো। প্রীতিরাম আর নায়েব মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল, সন্ধ্যে হ'লো—আমি ঘরে যাই—আমাকে যে পুজোয় বসতে হবে—

কৌতূহলী প্রীতিরাম শান্ত নম্র স্বরে জানতে চাইলেন, তুমি পুজো কর? কার পুজো কর মা?

বালিকার নির্মল উক্তি,—আমি তো নিজে পুজো করিনে—আমি সব গুছিয়ে দিই, আমার বাবা পুজো করেন, আমাদের ঘরে রঘুনাথের পুজো হয়, দিনে পুজো আর সন্ধ্যে হলে আরতি—

আনন্দ-খুশিতে প্রীতিরামের মুখখানা উজ্জ্বল হলো। বাঃ চমৎকার!

বালিকা বলে চলে,—আমি সব না গুছিয়ে দিলে রঘুনাথ যে রাগ করেন। আমার হাতে না খেলে রঘুনাথের পেট ভরে না। মুখ ঘুরিয়ে নেন। তারপর অনেক সাধাসাধি করে সেই রাগ আমাকেই তো ভাঙ্গাতে হয়—

প্রীতিরামের বুকের ভিতরটা কেমন যেন টন টন করে ওঠে। বালিকার মুখে ঈশ্বরের নাম-গানে প্রীতিরামের দু'চোখে কান্নার ঢল নামে। এই কান্না ভাবের কান্না। এই কান্না ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত অন্তরের একান্ত প্রেমের কান্না। শুকনো বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে দমকা বাতাস বয়ে গেলে যেমন করে মাতন জাগে, প্রীতিরামের শুকনো ব্যথিত হৃদয়ে বালিকার কথাগুলি যেন তেমনি মাতন লাগিয়ে দিল।

ঈশ্বরের করুণা কামনায় উন্মুখ তাঁর হৃদয় যেন বালিকা রাসমণির উক্তিতে বিগলিত। বালিকার দুখানি হাত অতি স্নেহভরে নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ভাবাবেগে প্রীতিরাম বললেন, আমাকে তোমাদের বাড়িতে

নিয়ে যাবে মা ? রাসমণি অবাক হয়। জানতে চায়, কে আপনি ?

প্রীতিরাম সহসা চমকে উঠলেন। তাঁর মুখে ভাষা ফোটার আগেই বৃদ্ধ নায়েবমশাই বললেন, ইনি কোলকাতার মস্ত বড় জমিদার—খুব নামী লোক—

নায়েব মশায়ের উক্তিতে সেই প্রাচুর্য আর বৈভবের অহঙ্কার। অহঙ্কারের চিরন্তন চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিফলন। কথাটা প্রীতিরামের কানের ভিতর বিঁধে গেল বিষাক্ত কাঁটা বেঁধার যে যন্ত্রণা ঐ "জমিদার" কথাটি প্রীতিরামের ভিতরে তেমনি যন্ত্রণার সৃষ্টি করল। বৃদ্ধ নায়েব মশায়ের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন তিনি। সেই অসন্তোষ নিয়ে প্রীতিরাম বললেন, আমি তোমাদের আপনজন—

এবারে একরাশ মেঘের ফাঁক দিয়ে একটুকরো চাঁদ যখন উঁকি দেয় তখন সেই চাঁদের হাসির মত কিশোরী হাসল প্রাণ খুলে। বলল, চলো—আমি আগে আগে যাই, তোমরা পেছন পেছন এসো—!

কথাটা প্রীতিরামের সারা মন জুড়ে অনুরণিত হতে থাকল। নিছক কথা নয়, যেন বাণী ! তিনি স্মিত হাসলেন। মনে মনে বললেন, হ্যাঁ তুমিই আগে আগে যাবে, আমরা সবাই তোমার পিছন পিছন যাব—।

নিতান্ত বালিকার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে এসেছিল একদিন, অনন্তকালের জন্য সেই উক্তির পিছন পিছন চলেছি আমরা। পুণ্য লোভাতুর মানবের সেই চলা বোধকরি থামবে না কোনদিন। মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ালে শুধু আজ নয়, অনন্তকালেও কান পাতলে শোনা যাবে সেই আনন্দ কল্লোলিত সংলাপ—"আমি আগে যাই··· তোমরা পিছনে এসো—"

তিনি আজও চলেছেন। অনন্তকালের জন্য চলেছেন সর্বকালের বাণী নিয়ে। তিনি ? কি তিনি ? কে তিনি ? মানবী না দেবী ! আলো না অন্ধকার ? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, "তুমি তো অষ্ট সখীর এক সখী।"

রাসমণি শুধু নন ! রাণী রাসমণি !

ঠাকুর তো বলেছেন, অবতার তো ঈশ্বরের কর্মচারী। জমিদারের নায়েবের মত। যেখানে যত গোলমাল জমিদার সেখানে পাঠান নায়েব। বরকন্দাজ। তেমনি জগতে যেখানে যখন কোন গণ্ডগোল বাধে, ধর্মহানি হয়, ধর্মসংস্থাপনের প্রয়োজন হয়—তখনই ঈশ্বর সেখানে অবতার পাঠান। এই

অবতার চেনা বড় শক্ত। বড় কষ্ট।

চেনা যায় না। চেনা কঠিন। অমন যে শ্রীরামচন্দ্র, তিনি কে? অবতার। অবতার বৈকি! শ্রীরামচন্দ্র নররূপে যখন অবতার হয়েছিলেন তখন কি সবাই তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন? পারেন নি। চিনেছিলেন সাতজন ঋষি। সপ্তর্ষী। তেমনি রাসমণি।

এই রাসমণিকে দিয়ে ঈশ্বর কিছু কাজ করিয়ে নিতে পাঠিয়েছিলেন মর্তের মাটিতে। যতটুকু কাজ ততটুকু জীবন। কাজ যেই শেষ, নশ্বর দেহটিরও শেষ। রাসমণিও তেমনি কাজ শেষ করে রক্ত মাংসের দেহটাকে রেখে চলে গেছেন অমৃতলোকে।

এই যে চলে যাওয়া, এই পার্থিব জীবন থেকে অবসর নেওয়া যে জীবন, তা মহান। এখানে সেই অসামান্য জীবনের স্মৃতিচারণা!

জন্মলগ্ন থেকে শুরু করি সেই জীবনের জয়গান।



আর চলতে পারছিলেন না হরেকৃষ্ণ। পা দুখানা তাঁর অবশ হয়ে আসছিল। দেহটা একরাশ ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। আকাশে সেই এক তারা থাকা ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-মুঠো অন্নের জন্য প্রায় রোজই ঘর ছাড়তে হয় হরেকৃষ্ণকে। এমনি করে ক্লান্তির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয় পথে পথে। কোনা গাঁ থেকে হালিশহর আবার হালিশহর থেকে অন্য কোনখানে রোজই হরেকৃষ্ণকে ঘুরে বেড়াতে হয় সংসার চালাবার, সংসারের কটা জীবনকে বাঁচাবার প্রয়োজনে।

সংসারটা নেহাত ছোট নয়। দু-বেলায় প্রায় দশটা পেট। আর সংসারের সব দায়-দায়িত্ব, শুভাশুভের ভার একমাত্র হরেকৃষ্ণর। সামান্য কিছু জমি আছে কিন্তু সেই জমিতে যা ফলে তার আয়ে এই দশটি পেট দুদিনও ঠিকমত চালান যায় না। কাজেই এমনি করেই হরেকৃষ্ণকে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে একটা যেমন তেমন কাজ খুঁজে বার করে নিতে হয়।

আজও তেমনি করেই ঘুরতে ঘুরতে যখন চলার শক্তি প্রায় হারিয়ে

ফেলেছিলেন হরেকৃষ্ণ, যখন তাঁর পা দু-খানা আর চলতে চাইছিল না, বারবার যখন সেই পা দুখানা হরেকৃষ্ণর মনোবলকে ভেঙে দিচ্ছিল তখন একান্ত বাধ্য হয়ে একটা গাছতলায় বসলেন তিনি। মাথার উপরে তপ্ত সূর্য। অনাবৃষ্টি আর খরতাপে মাটিতে ফাটল। খাল-বিল পর্যন্ত শুকিয়ে আছে। পাখিরা ডাকছে না। কুকুরটা পর্যন্ত প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে না পেরে মরা ডোবার ভিতরে একবিন্দু ভিজে মাটি আশ্রয় করেছে। এখুনি সেই ভিজে অংশটুকুও শুকিয়ে যাবে। নরম হবে, কঠিন-কঠোর। ফেটে চৌচির হয়ে যাবে সেই মাটিটুকুও। গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবার মত এমনি এক গরমের দুপুরে হরেকৃষ্ণ গাছতলায় বসে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহটাকে একটু জুড়িয়ে নিচ্ছিলেন।

আজও বেরুতে হয়েছিল সেই আকাশে এক তারা থাকা সকালে।

অন্যদিনের চাইতে আজ যেন একটু বেশী ভাবনা। একটু বেশী দুশ্চিন্তা তাঁর সারা মন জুড়ে। দিনের দুটি বেলায় দশটি পেটে অন্ন জোগাবার চাইতে আজ অনেক বেশী ভাবনা তাঁর রামপ্রিয়াকে নিয়ে। সংসারে আর পাঁচটা মেয়ে-বৌদের কত চাহিদা তো থাকে; বিষয় চাহিদা, প্রাচুর্যের চাহিদা, বিলাসের চাহিদা, নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার চাহিদা। তেমন কোন চাহিদা রামপ্রিয়ার নেই। আবার এমন অনেক সংসার আছে, এমন অনেক মেয়ে-বৌ আছে যাদের যা চাহিদা রামপ্রিয়ারও সেই একই চাহিদা। অন্যের জন্য ভাবনা, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, অন্যের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে মনের প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া - এই চাহিদা রামপ্রিয়ার। এ সংসারটা অচল, নিতান্ত জোড়া তালি দিয়ে কোনমতে টেনে নিয়ে যাওয়া এই সংসারের কথা এই গ্রামের সকলেই জানে অথচ কী আশ্চর্যের ব্যাপার প্রায় প্রতিদিন দু-তিনজন অতিথি আসেন এই বাড়িতে। এঁরা কেউ হরেকৃষ্ণ বা রামপ্রিয়ার নিমন্ত্রিত অতিথি নন, অযাচিত অতিথি। দীন-দরিদ্র-আতুর। রামপ্রিয়া খুশি। রামপ্রিয়ার যত খুশি বা সুখ, আত্মতৃপ্তি সবই ওই অতিথি সৎকারে। আর্ত সেবায় রামপ্রিয়ার যত আনন্দ। এ সব হরেকৃষ্ণ দাসের অপছন্দ নয় একেবারেই। মাঝে মাঝে ভাবনা হতো তাঁর, রামপ্রিয়ার এমন অতিথি সৎকার করার মত মনটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে তো?

হরেকৃষ্ণ মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলতেন, জানো বৌ, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কি জান? মনে হয় গ্রামে তো কত ঘর আছে, কত সংসার আছে, কত মানুষ আছে কিন্তু ওরা সেখানে না গিয়ে তোমার কাছে আসে কেন? নিজের

মুখের অন্ন তুমি হাসতে-হাসতে ওদের মুখে তুলে দাও দেখে আমার দুঃখ হয়, আবার ভালও লাগে—

রামপ্রিয়াও খুশি খুশি ভাবে বলেন, ওরা আসে বলেই তো আমাদের এত সুখ সংসারে।—অবাক হন হরেকৃষ্ণ। স্ত্রী রামপ্রিয়ার মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বলেন, যে সংসার অচল, যে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, যে সংসারে তোমাদের দু-মুঠো অন্ন দু-বেলা ঠিকমত জোগাতে পারি না, সেই সংসারে তুমি সুখ খুঁজে পাও কেমন করে আমি বুঝতে পারি না বৌ—

রামপ্রিয়া হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন,—আচ্ছা মনে কর তোমার যদি অঢেল থাকত, তোমার যদি কোন অভাব না থাকত, তা হলে তুমি কি বুঝতে পারতে প্রকৃত সুখ কাকে বলে? স্ত্রীর মুখে এ সব কথা শুনে হরেকৃষ্ণ দাসের মন ভরে যেত। এক অতি সাধারণ মেয়ের মুখে এমন অসাধারণ কথা শুনতে শুনতে হরেকৃষ্ণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, রামপ্রিয়া সাধারণ মেয়ে নয়। রামপ্রিয়া নারীরূপে সাক্ষাৎ নারায়ণী। অন্নপূর্ণা স্বয়ং এই কুঁড়ে ঘরে এসেছেন রামপ্রিয়া হয়ে। তাই স্ত্রীর এই খুশিটাকে, এই অতিথি সৎকারের চাহিদাটুকুকে চিরকালের মত বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এমনি করেই হরেকৃষ্ণকে দেহপাত করে যেতে হয়।

মনে মনে স্থির করেছিলেন হরেকৃষ্ণ, সংসারে সবাই যদি একবেলা অনাহারে থাকে তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু রামপ্রিয়ার কাছ থেকে একজনও শূন্য হাতে ফিরে গেলে ক্ষতি অনেক। তা কখনই হতে দেবেন না তিনি। ক্ষতি অন্য কিছুর নয়, একটা মনের—এক পরমাত্মার ক্ষতি। তাই কোন অতিথি যাতে এই বাড়ি থেকে কোনদিন শূন্য হাতে ফিরে যেতে না পারেন, তার জন্যে হরেকৃষ্ণ দাসের এই কঠোর পরিশ্রম।

গাছের তলায় বসে, গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হয়তো সেই সব কথাই ভাবছিলেন। হয়তো নিজেকে নিয়েও ভাবছিলেন তিনি। তাই আজ যেন হরেকৃষ্ণ একটু বেশী মাত্রায় ভারাক্রান্ত। একদিকে ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে পড়েছে, তার উপর আজ মনটাও ভাল নেই তাঁর। কিছুদিন যাবৎ রামপ্রিয়ার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। আজই বাড়ি থেকে বেরুবার সময় ক্ষেমংকরী বলেছিল,—দাদা, যদি পার একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস। কাল রাত থেকে বৌদির শরীর কিন্তু ভাল বুঝছি না। লক্ষণগুলো ভাল ঠেকছে না, তুমি বরং একটু তাড়াতাড়ি এস—

এ কথায় হরেকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি

মেলে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। ঘরে রামপ্রিয়ার শরীরটা খারাপ অথচ বাইরে না বেরুলে উপায় নেই। অনেক টাকার দরকার! সে কথা মনে করে অনেক চিন্তার ভারে নুইয়ে পড়া মনটাকে সহজ করার চেষ্টা করে ভারী স্বরে বললেন,—তুই নজর রাখিস ক্ষেমা, না বেরুলে তো চলবে না, তবে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরবো। ঈশ্বর মঙ্গলময়—তিনি রক্ষাকর্তা—! রামপ্রিয়াকে সেই ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে দিলাম। তিনি এখন যা করবেন তাই হবে—! কথাটা শেষ করে দরজার ওপরে, দেওয়ালে ঝোলানো সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবির দিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বাইরে পা রেখেছিলেন হরেকৃষ্ণ। তারপর এই ভরা দুপুর।

হঠাৎ ক্ষেমংকরীর মুখটা মনে পড়ে গেল হরেকৃষ্ণর। অনেকক্ষণ থেকেই মনটা একটু বেশি চঞ্চল হয়েছিল। কোন কাজে মন বসছিল না, শুধু বাড়ি যাই-যাই করছিল মনটা তাঁর। অথচ শরীরটা বইছিল না, তাই একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াবেন এই ছিল ইচ্ছে। তিনি যতবার মনকে হালকা করতে চাইছিলেন, ভারমুক্ত করতে চাইছিলেন, পোড়া মনটা ততই ভারী হয়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বর যখন ভার চাপান মানুষের সাধ্য কি সেই ভার মুক্ত হয়! মাথা নীচু করে হয়তো সেই কথা ভাবছিলেন হরেকৃষ্ণ।

চোখ গিয়ে পড়ল একটা মিছিলের ওপর। খুব ছোট ছোট অগণিত লাল পিঁপড়ের মিছিল। গাছের গুঁড়ির ভিতরে ওদের বাসা। এক জায়গা থেকে এসে সেই মিছিল চলেছে ঘরের দিকে। সবার মুখে সাদা সাদা ডিম। ওরা কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে চলেছে মিছিল করে। হয়তো কোন আনন্দবার্তা ছড়িয়ে চলেছে এক কান থেকে আর এক কানে!

হরেকৃষ্ণ সেই মিছিল দেখছিলেন নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে। দেখতে দেখতে নিজের ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলেন।

ক্ষেমংকরীকে নিয়েও তাঁর কম ভাবনা নয়। ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! একমাত্র বোন ক্ষেমংকরীকে কত কষ্ট করে বিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন বোনটা তাঁর সুখে থাকবে। সুখী হবে। মনের মত করে সাজিয়ে নেবে তার সংসার। কিন্তু হঠাৎ সব কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল। কপালের লিখন খণ্ডন করবে কে! কপালে সুখ না থাকলে সুখ দেবে কার সাধ্য!

স্বামীর ঘর করার কপাল না থাকলে শত চেষ্টাতেও ঘর করা যায় না।

ক্ষেমংকরী বেশিদিন হাসি মুখে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে পারে নি। হঠাৎ মারা গেল ক্ষেমংকরীর স্বামী, স্বামী মারা যাবার পর শ্বশুর বাড়িতে জায়গা হয়নি তার। বিধবা হয়ে, কোরা থান পরে কাঁদতে কাঁদতে আবার দাদার আশ্রয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল ক্ষেমংকরী।

দাদার আশ্রয়ে এসে মায়ের মত বৌদির বুকের ভিতরে মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষেমংকরী বলেছিল, আবার তোমার সংসারে ফিরে আসতে হলো— ওরা আমাকে ঠাঁই দিলে না—তুমি আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই না দিলে আমি কোথায় যাব বৌঠান ?

রামপ্রিয়া হাসতে হাসতে সস্নেহে ক্ষেমংকরীর কান্নায় ভেজা চোখ দুটোকে মুছে দিতে দিতে বলেছিলেন,—এমন করে বলছো কেন গো ? এমন করে বললে ঈশ্বর যে অসন্তুষ্ট হবেন, তুমি কি এই আশ্রয়ে নিজে ফিরে এসেছ ভাই, ঈশ্বর তোমার জন্য যে আশ্রয় ঠিক করে দিয়েছেন সেখানে আসবে না তো কি ?

সেই থেকে এই বালবিধবা, দাদা হরেকৃষ্ণ দাসের আশ্রয়ে আছে। সংসারের যাবতীয় কাজ রামপ্রিয়ার সঙ্গে ক্ষেমংকরী মিলে মিশে করে নেয়। পিসিমাকে পেয়ে রামচন্দ্র আর গোবিন্দর আনন্দ আর ধরে না। পিসি অন্তপ্রাণ ওদের। পিসিই ওদের সব।

হরেকৃষ্ণ আর রামপ্রিয়ার দুই ছেলে রামচন্দ্র আর গোবিন্দকে নিয়ে সব ব্যথা ভুলে থাকে ক্ষেমংকরী। সারাদিন পর হরেকৃষ্ণ যখন বাড়ি ফেরেন, ক্ষেমংকরী দাদার সেবার কোন ত্রুটি রাখে না। নিজের হাতে দাদার পা ধুইয়ে দেয় গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে দেয়, গোবর জলে মাটির দাওয়া নিকিয়ে দিয়ে কুশের আসন বিছিয়ে পাশে রামায়ণটা রেখে যায় ক্ষেমংকরী !

হরেকৃষ্ণ রামায়ণ পাঠ করেন। রামপ্রিয়া সেই সব দেখেন আর ভাবেন, ভগবানের করুণায় রঘুনাথের দয়ায়, যেমন দুটি পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে, তেমনি যদি ক্ষেমংকরীর মত একটা মেয়ে থাকত তা হলে সে হয়তো এমনি করেই তার বাবার সেবা করত। হাতের কাছে এগিয়ে দিতে পারত রামায়ণ-মহাভারত।

অনেকদিন স্বামীর কাছে বলেও ফেলেছিলেন রামপ্রিয়া। বলেছিলেন, হ্যাঁ গো, ক্ষেমা ঠাকুরঝিকে যত দেখছি তত মনে হচ্ছে ও আমাদের মেয়ে ! ভগবান যদি আমাদের একটা মেয়ে দিতেন তা হলে খুব ভাল হতো, তাইনা

গো ? কোমরে আঁচল জড়িয়ে নরম-নরম ছোট ছোট পা ফেলে সে আমাদের পাশে পাশে ঘুরত—

হরেকৃষ্ণ বুঝতে পারতেন স্ত্রীর মনের কথা। সান্ত্বনা দিতেন। নিজেও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেতেন না তা নয়। দুই ছেলের পর এক মেয়ের আকাঙ্ক্ষা। একটি কন্যা সন্তান পেলে রামপ্রিয়ার সব ব্যথা ঘুচে যেতে পারে, অথচ হরেকৃষ্ণ বোঝেন সংসারের যা হাল তাতে আর একজন বাড়লে দুঃখ কষ্টের মাত্রা বাড়বে বই কমবে না ! তাই নিজেকে চরম সংযত করে রাখেন হরেকৃষ্ণ। কিন্তু রামপ্রিয়ার সেই কন্যাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতে থাকল। এই বুক জুড়ে একটি কন্যা থাকবে সেই কামনা তাঁর।

মনকে প্রস্তুত করেন হরেকৃষ্ণ। যদি সংসারে আর একজন কেউ আসে বুঝে নিতে হবে সেটা ঈশ্বরের খেয়াল, বিধির বিধান। যিনি পাঠাবেন, তিনিই চালাবেন। এই ভাবেই তো চলছে বিশ্বসংসার। চমকে উঠলেন হরেকৃষ্ণ। মাথার উপরে গাছের ডালপালা, লতাপাতার ভিতরে একটা ঝটপট শব্দ। খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে যেন গাছের ডালে। হরেকৃষ্ণ দেখলেন পাখিতে পাখিতে মারামারি। মুহূর্তের মধ্যে একটা ভয়ার্ত পাখির বাচ্চা এসে পড়ল ঠিক তাঁর পায়ের কাছে। আর একদল পাখী ডানা মেলে উড়ে গেল অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। হরেকৃষ্ণ বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। নীড় থেকে খসে পড়া সেই পাখির বাচ্চাটির কাছে হাঁটু মুড়ে বসে অতি সন্তর্পণে তার ছোট্ট দেহটাকে তুলে নিলেন হাতে। এখনও প্রাণ আছে। একবিন্দু হৃদপিণ্ডে তখনও স্পন্দন আছে ! একটু জলের প্রত্যাশা। ওর মুখে একফোঁটা জল দিতে পারলে হয়তো সতেজ হবে সে, ডানা মেলে উড়ে যেতে পারবে আকাশে।

হরেকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মৃতপ্রায় পাখির বাচ্চাটাকে নিয়ে তিনি দ্রুত নেমে গেলেন সেই শুকনো ডোবার ভিতরে। কয়েক বিন্দু জল আছে। সেই জল পাখির পক্ষে যথেষ্ট। আঙুলের ডগা করে বিন্দু বিন্দু জল সেই পাখির মুখে দিলেন হরেকৃষ্ণ। সেই সঙ্গে পাখিকে শোনালেন কৃষ্ণ নাম। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

আবার হরেকৃষ্ণ দাস ফিরে এলেন গাছতলায়। ভাবলেন, কেন এই পাখির বাচ্চাটি আজ এমন করে আমার কাছে এসে ধরা দিল ! সব জীবে ঈশ্বর। তা হলে এই পাখির ভিতর থেকে ঈশ্বরের করুণা লাভ ! কোন ভাবনার প্রকৃত উত্তর খুঁজে পেলেন না হরেকৃষ্ণ ! শুধু রামপ্রিয়ার

মুখখানা বার বার তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকল।

রামপ্রিয়ার শরীরটা ভাল নেই। ক্ষেমংকরী বলেছিল যত কাজই থাক আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে।

হরেকৃষ্ণর সারা মন জুড়ে একটা অজানা আশংকা; একটা ভয় ভয় ভাব সারা মন জুড়ে। তিনি জানেন না আজ কী সংবাদ অপেক্ষা করছে বাড়িতে তাঁর জন্য। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কী সংবাদ প্রস্তুত আছে ঘরে তাঁরই বিধানে। তবুও একরাশ ভাবনা নিয়ে দুরু দুরু বুকে সেই পাখির বাচ্চাকে বুকের ভিতরে আঁকড়ে ধরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন হরেকৃষ্ণ দাস!

বিধির নির্দিষ্ট বিধান খণ্ডন করবে কে? সাধ্য কার?

চোখের সামনে কোন প্রিয়জনের মৃত্যু-মুহূর্ত দেখলে আমরা সবাই ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করি, যথাসর্বস্ব ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন করে বসি, বারবার আকুতি জানাই 'ঈশ্বর ওকে সুস্থ করে দাও—'দয়াময়, দয়া করো। ওর প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে করুণা কর করুণাময়ী—ও সুস্থ হয়ে উঠলে আমি তোমায় ষোড়শ উপচারে পুজো দেব—।' মানত করে বসি, 'জোড়া পাঁঠা বলি দেব মা,'—এই মানসিকতায় আমরা আমাদের নির্বাচিত, আমাদের আরাধ্য দেবদেবীর উদ্দেশে মাথা কুটে কুটে যখন আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারি না, যখন আসন্ন সর্বনাশ এত মানত সত্ত্বেও রোধ হয় না, তখন আমরা বিশ্বাস হারাই। দুর্বল চিত্ত নিয়ে আমরা এক নয়, একাধিক দেবদেবীর, পীর-পয়গম্বর সকলের উদ্দেশে আকুল আকুতি নিবেদন করি।

অথৈ জলে যখন কেউ ডুবতে থাকে তখন সে একটা খড়কুটো পেলে সেটি ধরেও বাঁচতে চায়, ঠিক তেমনি মহাবিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়ালে নির্দিষ্ট কোন দেব-দেবী এমন কি নিজের মনের ওপরেও আস্থা স্থাপন করতে পারে না অনেকেই। এই তো আমরা। এই তো মানুষ! আস্থা হারালে বিশ্বাসে ফিরে যাওয়া। তাই বোধ করি আমরাই বলে থাকি, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে! বলি, নিয়তির বিধান।

এই বিধান বড় আশ্চর্য। বড় বিস্ময়েরও বটে।

জন্ম আর মৃত্যু তাই একমাত্র বিধির নির্দিষ্ট বিধান। জীব মানেই ঈশ্বরের জীব। ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাই সর্বজীবের ভিতরে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। তাইতো বীরেশ্বর বিবেকানন্দর হৃদয় উৎসারিত অমৃতবাণী··· "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর···" সৃষ্টি যাঁর খেয়ালে—লয়ও তাঁরই খেয়াল। তাই বোধহয় মৃতপ্রায় পক্ষীশাবকের

ডানা ঝটফট করে উঠল। যখন ক্লান্ত পদক্ষেপে হরেকৃষ্ণ বাড়ি ফিরছিলেন তখন বোধকরি বিধিরই বিধানে সে জীবন ফিরে পেল! সতেজ হল সে। স্বস্তি ফিরে পেল। নিজেকে ফিরে পেল। মানবের প্রীতির রসে জীবের জীবন হলো রসসিক্ত। হরেকৃষ্ণ যেন কিছুতেই সেই পাখির বাচ্চাটাকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। আনন্দ খুশিতে চনমন করে উঠল তাঁর মন। মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে উড়ে উড়ে স্বাধীনতার আনন্দ পেতে চাইছে যে পাখি, তাকে ধরে রাখা অন্যায়। পাপ! হরেকৃষ্ণ পাখীর ঠোঁটে বার কতক স্নেহচুম্বন এঁকে দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। সেই পাখিটা এক বুক খুশি নিয়ে উড়ে গেল আকাশে।

মাঠের আলের ওপর দাঁড়িয়ে হরেকৃষ্ণ দুচোখ ভরে দেখলেন তার উড়ে চলার ছন্দ। নিজের মনে নিজেই বললেন, যা, মায়ের কোলে ফিরে মায়ের কোল আলো করে তোল গিয়ে।

মনের কথা মনের ভিতরেই শেষ করে হরেকৃষ্ণ আবার দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকলেন! রামপ্রিয়া এতক্ষণ বোধহয় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাড়ির কাছ বরাবর আসতে না আসতেই হরেকৃষ্ণ দেখলেন ক্ষেমংকরী প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে। হরেকৃষ্ণর মনটা আরও ভাবনায় জড়িয়ে পড়ল; বুকের ভিতরে অস্থিরতা।

ক্ষেমংকরী কাছে আসতেই হরেকৃষ্ণ বললেন, ব্যাপার কী! তোর চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার ভাংগা ঘরে একটা বড় ঘটনা ঘটেছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষেমংকরী বলল, ঘরের দাওয়া থেকে তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি ছুটতে ছুটতে এলাম দাদা, আর কথা বলবার সময় নেই, উঃ সেই সকাল থেকে যা গেল।—

কৌতূহল দমন করতে না পেরে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, তোর বৌঠান কেমন আছে তাই বল আগে—

ক্ষেমংকরীর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, তবুও অভিমানের সুরে বলল সে, তুমি কেমন ধারা মানুষ বল দিকিনি দাদা, লোকের মুখ দেখেও মনের কথা ধরে নিতে পার না? ভাল আছে—শুধু বৌঠান না আরও একজন, সবাই ভাল আছে—একটু পা চালিয়ে এসো দাদা—দেখবা এস তোমার ভাংগা ঘরে চাঁদ উঠেছে

হরেকৃষ্ণ এতক্ষণে আশ্বস্ত হলেন। হরেকৃষ্ণর মনের গভীরে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়ার যমুনা সেই যমুনায় খুশির হিল্লোল। তিনি অনেকখানি হাল্কা বোধ করলেন বটে তবুও একটা জিজ্ঞাসা যেন তাঁর

মনটাকে তোলপাড় করে দিতে থাকল, একটা সঙ্কোচে বোনের কাছে সেই জিজ্ঞাসা পেশ করতে বার বার বেধে যাচ্ছিল, তবুও কৌতূহল দমন করতে না পেরে, নিজেকে সংযত করে রাখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, খবর সব শুভ তো ক্ষেমা ? মানে বলছিলাম—

কথাটা শেষ করতে পারলেন না হরেকৃষ্ণ। তাঁর মুখে ভাষা ফোটার আগে ক্ষেমংকরী বলল, ভগবান এবার মুখে তুলে চেয়েছেন দাদা, বৌঠানের মেয়ে হয়েছে—মেয়ে তো নয় দাদা, যেন সাক্ষাৎ কোন দেবী স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন তোমার ঘরে—

ক্ষেমংকরীর কথা শেষ হতে না হতে পাখীরা যেন গান গেয়ে উঠল। হরেকৃষ্ণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যেন বেজে উঠল সেতারের সুর। আকাশটা যেন আরও প্রশস্ত হল। ঘরের সামনে যে উঠান তার মাঝখানে মাটির বেদিতে বড় তুলসী গাছটা মৃদু বাতাসে দুলে উঠল, যেন খুশির ভাব প্রকাশ! খুশির বন্যায় ভেসে যাওয়া মনটাকে শক্ত করে হরেকৃষ্ণ বললেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আনতে নেই ক্ষেমা, আমরা হলাম গিয়ে রক্ত মাংসের মানুষ—তার উপরে জাতেতে কৈবর্ত। শ্রীহট্ট,-হালিশহরের সব চাইতে নীচু জাত, আমাদের ঘরে স্বর্গের দেবী জন্মেছে বলা পাপ, অমন পাপ করিসনে রে ক্ষেমা. চল, চল—। একজন অন্ধ যখন তার দৃষ্টি ফিরে পায়, যখন সেই চোখের আলোয় আর পাঁচজন মানুষের মত স্বাভাবিক ভাবে চলতে ফিরতে পারে তখন তার মনের অবস্থা যেমন হয়, প্রথম কন্যা-সন্তান লাভে তেমনি হরেকৃষ্ণর মনটা আনন্দে বিহ্বল, খুশিতে দিশাহারা। হরেকৃষ্ণ যেন শিশু।

সেদিন ছিল ১২০০ সনের আশ্বিন মাসের ১১ তারিখ। বুধবার।

হরেকৃষ্ণ যেন নিতান্ত ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। আনন্দে আত্মহারা হরেকৃষ্ণ সোজা গিয়ে প্রবেশ করলেন আঁতুর ঘরে। কিন্তু মুহূর্ত সেখানে তাঁর থাকা হলো না. নবজাতিকাকে দুচোখ ভরে দেখা হলো না, ক্ষেমংকরী এসে একরকম জোর করে ঘর থেকে দাদাকে বার করে দিতে দিতে বলল, তুমি কী বল তো দাদা—এখন এ ঘরে থাকতে নেই, যখন এ ঘরে তোমার দরকার পড়বে তখন ডাকবো, মেয়ের মুখ তখন যত পার দেখ। এখন খাবে চল—আজ তোমার জন্যে ভাত রেখেছি—

ছোট্ট চালা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে যখন একমাত্র বোনের সঙ্গে কথা বলছিলেন হরেকৃষ্ণ তখন আঁতুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল দাই। এ গ্রামের সবাই বলে দাই মা। পাশের গ্রামের বাসিন্দা। বড় মিষ্টি, বড় দয়ার

মন তার। করুণাময়ী। আর এই করুণাময়ী যদি এসে না পড়তেন তা হলে রামপ্রিয়ার দৈহিক কষ্টের আর সীমা থাকত না। রামপ্রিয়ার ব্যথা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই মহিলা এসে হাজির না হলে হয়তো অনেক হিতে বিপরীত হতে পারত। রামপ্রিয়ার গর্ভের প্রথম কন্যা-সন্তানকে তিনিই এনেছিলেন পৃথিবীর আলোয়।

এসব ব্যাপারে ক্ষেমংকরী খুব একটা পটু নয়। মনের জোরও তার কম। আঁতুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাই মা বললেন, যাও বাবা, এবার মেয়ে দেখে এস—

মহিলার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসতে না আসতেই হরেকৃষ্ণ খুশিতে টলমল করে উঠলেন। একরকম ছুটে সেই ঘরে ঢুকলেন হরেকৃষ্ণ। ঘরে পা দিয়ে বিস্ময়ে হতবাক তিনি। বিচালির শয্যায় শায়িতা রামপ্রিয়া আর তাঁর বুকের ভিতর যেন একখণ্ড পূর্ণিমার চাঁদ। দু'চোখের পাতা মেলে এবার রামপ্রিয়া তাকালেন স্বামীর দিকে। ওঁর দু'চোখেরা তারায় একরাশ প্রশান্তি, দু'চোখের পাতায় এক মুঠো লজ্জা।

অবাক বিস্ময়ে সদ্যজাত কন্যাকে দেখছিলেন হরেকৃষ্ণ।

হয়তো মনে মনে একটা ছবি আঁকছিলেন অথবা অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন তিনি।

এ গ্রামের আর পাঁচটা সদ্যজাত সন্তানের সঙ্গে এই সন্তানের যেন বিস্তর ব্যবধান! এমন গোলগাল ভারী ওজনের মেয়ে কারও হয়নি এ গ্রামে! মেয়ে তো নয় যেন এক খণ্ড হীরে। হরেকৃষ্ণ এবার আস্তে আস্তে সদ্যজাত সেই কন্যার পাশে নতজানু হয়ে বসলেন। পাশে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। একটি মাটির পাত্রে শুকনো গোময়ের আগুন। সেই অগ্নিকুণ্ডে হাত রেখে তপ্ত হাতটি সদ্যজাতিকার নরম তুলতুলে মস্তকে-মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দিতে দিতে কন্যার মঙ্গলকামনায় হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ করলেন তিনবার—উচ্চারণ করলেন নিতান্ত অস্ফুট স্বরে—

"মধুসূদন-কৃষ্ণেতি-বাসুদেব-জনার্দ্দন ঃ
চত্বারি তব নামানি
মহাবিপত্তি নাশনঃ—"

কন্যার মঙ্গলকামনা করে হরেকৃষ্ণ যেন আরও ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। আঁতুর ঘর থেকে বেরিয়ে ক্ষেমংকরীকে ডেকে বললেন, ক্ষেমা আমি একটু বেরুচ্ছি—সবাইকে জানিয়ে আসি খবরটা।

ক্ষেমংকরী হলো অবাক,—সে কী—বেলা পড়ে এল, অবেলায় চান-

খাওয়া করলে তোমার শরীরটা যে নষ্ট হবে। পরে যেও—এই নাও গামছা—আগে গাং থেকে চান করে এস—খাও দাও। তারপর যেও। নাও, হাতটা পাতো দিকিনি, তেল দেব—মাথায় ঘসে নাও—

হরেকৃষ্ণ বললেন, তা হয় না, এতবড় আনন্দের খবর সবাইকে না দিতে পারলে আমার মুখে যে ভাত উঠবে না। তুমি বরং খেয়ে নাও—আমার জন্যে বসে থেকে পেটে পিত্তি ফেল না—

ক্ষেমংকরী অসন্তুষ্ট হল। অসন্তোষের রেখাগুলো মুখের ওপরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু অভিমানের সুরে বলল, তুমি কি আমার কোন কথাই শুনবে না?—তারপর আপন মনে রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে বলল, দাদার সবকিছুতেই আদিখ্যেতা। ছেলে-মেয়ে যেন আর কারও হয়নি কখনো, তাও যদি একটা ছেলে হতো।

কথাগুলো হরেকৃষ্ণর কানে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ক্ষেমা তুইও তো মেয়ে, অথচ কী আশ্চর্য দেখ—একটা মেয়ে জন্মেছে বলে তোরা খুব বেশী খুশী হতে পারিসনি—উলু আর শাঁখের ফুঁতে এ বাড়িটাকে মাতিয়ে তুলিস নি। আমি হলফ করে বলতে পারি একটা ছেলে জন্মালে তোরা আরও বেশী আনন্দ পেতিস—উলু আর শাঁখের ফুঁ দিয়ে গ্রামটাকে পর্যন্ত মাতিয়ে দিতিস, ভাবখানা এমন দেখাতিস যেন আর কারও বাড়িতে এর আগে ছেলে জন্মায়নি—এটা সংস্কার—বুঝলি? মেয়ে হয়ে আজ তোরা এই কুসংস্কারকে ইন্ধন দিচ্ছিস—একদিন এমন আসবে যখন এই মেয়ে জন্মালে বাবা-মা উলু দেবে—শাঁখ বাজাবে—স্বস্তি পাবে। এখন একটা মেয়ে জন্মালে সবাই মনে করে বোঝা, অথচ তারা কিছুতে ভাবতে পারে না একটা মেয়ের জন্ম মানে আর এক মায়ের আবির্ভাব ঘটল। একদিন এই সংস্কার থাকবে না, একদিন ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে, কোন ব্যবধান থাকবে না। একদিন এই মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেবে, পায়ে পা মিলিয়ে চলবে। হাতে হাত মিলিয়ে চলবে। যে এসেছে ও আমার মেয়ে নয় রে—আমার মা এসেছেন—আমি আগে সেই বন্দনা করবো তারপর অন্য কাজ—।

কথাটা শেষ করে ক্ষেমংকরীর হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে মাথার তালুতে তেল ঘসতে ঘসতে হরেকৃষ্ণ বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

পথে পা দিয়ে স্নানের কথা বিস্মরণ হলো তাঁর।

কৈবর্তদের ঘরে ঘরে গিয়ে হরেকৃষ্ণ নিতান্ত বালকের মত সবাইকে ডাকেন। কেউ কেউ অসময়ে হরেকৃষ্ণকে দেখে বিস্মিত হয়। বলে, ব্যাপার কী হরেকৃষ্ণ?

হরেকৃষ্ণ হাত কচলে বিনয়ের সুরে বলেন, একটি শুভ খবর আছে, আজ আমার কুঁড়ে ঘরে চাঁদ উঠেছে, ঘর আলো করে সে এসেছে।

সকলেরই চোখে মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন; একরাশ কৌতূহল নিয়ে সবাই জানতে চায়, কে সে।

হরেকৃষ্ণ বলেন, আমার মা এসেছেন আমার মেয়ে হয়ে—।

কারও বুঝতে বাকী থাকে না হরেকৃষ্ণ দাসের মেয়ে হয়েছে। হরেকৃষ্ণের এই আনন্দের সঙ্গে কেউ আনন্দও মিলিয়ে দেয়, কেউ দেয় না। কেউ খুশি হয়, কেউ হয় না। কেউ কেউ আড়ালে-আবডালে বলে, হরেকৃষ্ণর মেয়ে হয়েছে বলে দেখছি মাথাটা খারাপ হয়েছে। এতে এত মাতামাতি করার কী আছে। আবার কেউ কেউ বলে, যাব আমি নিজে গিয়ে তোমার মেয়েকে আশীর্বাদ করে আসব। ভগবান ওকে ওর মায়ের কোল জুড়ে রাখুন — হরেকৃষ্ণ তাতেও যেন তৃপ্ত হতে পারেন না। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে জড়ো করে বলেন, আজ সন্ধ্যে বেলায় তোরা আমাদের বাড়িতে যাস। উঠোনে হরির লুঠ দেওয়া হবে—

ছোটরা আনন্দে নেচে ওঠে। হাতে তালি দিয়ে নাচতে নাচতে মনের আনন্দ প্রকাশ করে।

হরেকৃষ্ণের বাড়িতে মাঝে মাঝেই হরির লুঠ হয়।

দাওয়ায় বসে রামায়ণ পাঠ শেষ করে উঠে একটা বেতের বোনা ধামায় করে বাতাসা নিয়ে বড় উঠানের মাঝখানে যে তুলসী-বেদী সেখানে বাতাসা ছড়িয়ে মাঝে মাঝেই হরির লুঠ দেন হরেকৃষ্ণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাটি থেকে সেই বাতাসা কুড়িয়ে নেবার জন্যে মাতামাতি করে। দু' চোখ ভরে দেখেন হরেকৃষ্ণ। দেখতে ভাল লাগে তাঁর। মাঝে মাঝেই হরেকৃষ্ণ ভাবতেন ঐ শিশুদের মধ্যে নিজের শিশু যদি অমন করে মাতামাতি করত, খুশিতে ভরে থাকত এই বুকটা !

আজ সেদিন এসেছে। স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে হরেকৃষ্ণ দাসের !

আর মাত্র কটা বছর। তারপর মেয়েটা ওদের মত বড় হবে। সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটি থেকে সেও বাতাসা কুড়িয়ে নেবে একদিন !

চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি। সন্ধ্যার আহ্বান !

হরেকৃষ্ণ শুদ্ধচিত্তে-পবিত্র বসনে একটা আসন নিজেই পেতে নিলেন দাওয়ায় ! প্রদীপের আলোটা রাখলেন সামনে। তারপর প্রতিদিনের মত বসলেন রামায়ণ পাঠে। আজ আর হরেকৃষ্ণ একলা নন। তাঁর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বসে আছেন গ্রামের অনেক বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ। রামায়ণ পাঠের

চিরন্তনী সুরকে ছাপিয়ে গেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দের সুর। হরেকৃষ্ণ পাঠ শেষ করে রামায়ণ মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এমন ভক্তি নিষ্ঠা যাঁর মূলধন সে তো মানুষ থাকে না, মহামানুষে রূপান্তরিত হয়।

জাতের বিচার নেই, গরীব হলেও ঐশ্বর্যের অভাব নেই। মনটা যাঁর ঈশ্বর পদে সমর্পিত, সে তো ঐশ্বর্যবানই বটে! হরেকৃষ্ণ তেমনি ঐশ্বর্যবান বলেই গোটা কোনাগাঁর বাসিন্দাদের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়।

তবুও হরেকৃষ্ণকে মাঝে মাঝে একটা যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো। তা হলো, গ্রামের বৃদ্ধজনেরা তাঁকে ডাকত হারু ঘরামী বলে। হরেকৃষ্ণ দাসের বাবা জগমোহন ছিলেন আরও গরীব। আপন সম্পত্তি বলতে সামান্য জমি, তা নিজেই চাষ করতেন। হরেকৃষ্ণও তাই করতেন বটে, সেই সঙ্গে অন্যের ঘর বেঁধে যৎসামান্য আয় করতেন বলে এই 'ঘরামী' পরিচয়।

আপাততঃ হরেকৃষ্ণর কথা থাক! প্রীতিরামের কথা আসুক।

হরেকৃষ্ণ না এলে যেমন প্রীতিরাম সম্পূর্ণ নন, তেমনি প্রীতিরাম না এলে হরেকৃষ্ণ অসম্পূর্ণ।

একজন আর একজনের জন্যেই সম্পূর্ণ।

হরেকৃষ্ণ যদি শ্বেতপত্র, প্রীতিরাম তা হলে মসী। এবার তাই প্রীতিরামের কথায় আসা দরকার।



কথা উঠেছে মানুষটির নাম নিয়ে।

কেউ বলেন প্রীতিরাম আবার কেউ বলেন প্রীতুরাম। আসল কোনটি, আবার নকলই বা কোনটি। আসলে দুটিই আসল। গোবিন্দপুরের একফালি গ্রামের শান্ত-মিষ্টি পরিবেশে ছেলেটি যখন ঘুরতো-ফিরত-পাঠশালায় যেত, তখন যার যে ভাবে প্রয়োজন হতো ডাকতো। এই উচ্চারণের ব্যাপারে কারও কোনও বিধি নিষেধ ছিল না। উচ্চারণ শুদ্ধ

করে ডাকার প্রয়োজন হতো না। যুগল ডাকতেন—প্রীতি বলে। অক্রুর ডাকতেন প্রীত্ বলে, আর পিসিমা ডাকতেন—প্রীতিরাম। তাই যে প্রীত্ সেই প্রীতি।

ঈশ্বর যেমন জীবের স্রষ্টা, প্রকৃতির স্রষ্টা, মানুষের স্রষ্টা —তেমনি মানুষ ভাগ্যের স্রষ্টা। মানুষ আপন ভাগ্য আপনি রচনা করে। প্রীতিরামও তাই করেছিলেন!

লোকে বলে ভাগ্যের লিখনে এক একজন মানুষ এক এক আসনে অধিষ্ঠিত। যিনি বিলাস-ঐশ্বর্যের স্বর্ণখচিত সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন তিনি ভাগ্যের লিখনে নিয়ন্ত্রিত। একথা সকলেই বিশ্বাস করলেও প্রীতিরাম কিন্তু বিশ্বাস করতেন না। প্রীতিরাম বলতেন, কর্মই জীবন আবার জীবনই কর্ম। পুরুষকার না থাকলে জীবন কখনই কর্মময় হয়ে ওঠে না। ভাগ্যে লেখা আছে ঐশ্বর্যবান হবো আর সেই লেখাকে সম্বল করে ঘরের কোণে চুপটি করে বসে থাকলে তো হবে না।

প্রীতিরাম তাই, সেই প্রায় কিশোর বয়স থেকে বড় বেশী করে কাজকে ভালবেসে ছিলেন।

কিশোর বয়সে যে প্রীতিরাম ছিলেন একান্তভাবেই সর্বহারা-সম্বলহীন, খাঁটি দীন-দরিদ্র, যে বয়সে প্রীতিরাম দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ভাল করে পেতেন না, যৌবনের মধ্যাহ্নে পেঁছে সেই প্রীতিরামই হয়েছিলেন আশ্চর্যরকম ঐশ্বর্যবান। পরবর্তী সময়ে সবাই বলত তাঁকে -- রাজাবাবু।

সত্যিই রাজা হয়েছিলেন প্রীতিরাম।

একটার পর একটা ইঁট সাজিয়ে রাজমিস্ত্রি যেমন করে গড়ে তোলে প্রাসাদ, প্রীতিরাম ঠিক তেমনি করে সেই একান্ত বালক বয়স থেকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা-ধৈর্য-স্থৈর্য দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন বিশাল ক'রে। অঙ্কুর থেকে নিজেকে মহীরুহ করেছিলেন তিনি।

কেমন ছিল সেই বাল্যকাল?

এই গোবিন্দপুর প্রসঙ্গে একটা ছবি আঁকা দরকার। এই গোবিন্দপুর, সুতানুটী আর কলকাতার কথা পুরাতন কলকাতার অনেক ইতিহাসে আছে। তাই বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম, এক সময়ে সেই জায়গার নাম ছিল গোবিন্দপুর। গড় গোবিন্দপুর।

গোবিন্দপুর গ্রামে কেমন করে প্রীতিরামের বাল্যের দিনগুলি কেটেছিল তা জানা দরকার বৈকি! দুই ভাই। যুগল আর অক্রুর। এই দুই ভাই

মিলেমিশে—একজন আর একজনের আত্মার আত্মীয় হয়ে জমিদারী তদারক করতেন। হাসিতে-খুশিতে-ঐশ্বর্য-প্রতাপে দু ভায়ের সংসার আর বাইরের জগৎটা ভরে ছিল। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ছিলেন বিধবা পিসিমা।

পিসিমা বিন্দুবালা যদিও এ সংসারে নিতান্তই ভাগ্য বিড়ম্বনায় আশ্রিতা, তবুও দুই ভাই সেই পিসিমাকে কোনদিন আশ্রিতা ভাবতে পারেন নি। সংসারে মা নেই। এই বিন্দুবালার ভূমিকা ছিল মায়ের মত। যুগল-অক্রূর বিষয়-আশয় নিয়ে এই পিসিমার সংগে আলাপ-আলোচনা করতেন। সংসারের কোন কাজই এই পিসিমার অনুমতি ছাড়া হয়নি কখনও। দুই ভাইয়ের পরিশ্রম মাঝে মাঝে পিসিমার মাতৃ-হৃদয়কে দোলা দিত। বড় বেশী কাতর করে তুলত। একদিন বিন্দুবালা দুই ভাইকে কাছে ডেকে বললেন, প্রীতিরামকে জানিস তোরা ?

যুগল-অক্রূর দুজনেই পিসিমার এই আকস্মিক প্রশ্নে অবাক হলেন। মনে মনে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকলেন, কে প্রীতিরাম! ওঁদের দুজনের মন যেন মুহূর্তে গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে পেঁছে গেল। পাশের ঘরের দিকে না তাকিয়ে যেন পাশের রাজ্যে।

পিসিমা বললেন, ঐ দাসেদের ছেলের কথা বলছি, বেচারার কচি মুখখানার দিকে তাকালে আমার বড় মায়া হয় রে, সেই খোশালপুর থেকে প্রায়ই ছেলেটা আসে, শুকনো মুখে আসে, কেমন কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে, পিসি, আমার তো কেউ নেই ; তোমাদের কাছে আমাকে একটু থাকতে দেবে ? আমি তোমাদের সব কাজ করে দেব, যেমন ধরো, তোমাদের গরু-বাছুরের জাবনা কেটে দেব, মাঠ থেকে গরুকে ঘাস খাইয়ে এনে দেব, খামার পরিষ্কার করে দেব, গোলায় ধান তুলে দেব—যা করতে বলবে, তাই করে দেব—তোমরা আমাকে দু মুঠো খেতে দিও আর কিছু চাইনে আমার—

কথা বলতে বলতে পিসির দুটো চোখ কেমন যেন ভিজে ভিজে ওঠে। ভেজা চোখ দুটো থানের আঁচল দিয়ে একটু মুছে নেন। বালক প্রীতিরামের জন্য পিসিমার মনটার কোথায় যেন ব্যথায় টন টন করে ওঠে!

সব শুনে দুই ভাই-ই রাজী, বেশ তো! তোমার যদি মন চায় রাখ ছেলেটিকে, দাসেদের ছেলে তার উপরে গরীব—সবচেয়ে বড় কথা তুমি চাও ছেলেটি থাক আমাদের বাড়িতে—

সেই থেকে প্রীতিরামের ভাংগা রথের চাকা অন্য পথে বাঁক নিল।

মান্না পরিবারের একজন হয়ে গেল প্রীতিরাম।

সারাদিন বাড়ির সব কাজকর্ম সেরে প্রীতিরাম যখন 'ছুটি' পায় তখন সময়ের অপচয় করে না। প্রীতিরাম সেই বয়সেই বোধ করি একটি সত্য উপলব্ধি করেছিল, তা হলো জীবনটা বড় ছোট—, সেখানে হেলায় সময় গুলো নষ্ট করে দিতে নেই। এই বিশাল বাড়িটার যে দিকে একটু নিরিবিলি—কোন কোলাহল নেই, সেই দিকে বসে বই পড়ে সে। বই পড়তে ওর ভাল লাগে। পড়াশোনার ওপরে খুব ঝোঁক।

সেদিনও প্রীতিরাম একান্ত নিভৃতে বসে বই পড়ছিল। পিসিমা বিন্দুবালা এসে দাঁড়ালেন পাশে। অত্যন্ত চুপি চুপি এসে দাঁড়ালেন। এতটুকুও শব্দ উঠল না পায়ে। প্রীতিরামের নজর পড়ল না। বইতে চোখ রেখে পড়ার বইয়ের মধ্যে যেন তলিয়ে গিয়েছিল। পিসিমা সস্নেহে ডাকলেন, প্রীতিরাম—

প্রীতিরাম ডাক শুনে মুখটা তুলে দু' চোখের পাতা মেলে তাকাল—। ভয়ে যেন জড়োসড়ো। মুখখানা মুহূর্তে যেন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল। ওর ধারণা পিসিমা বকাবকি করবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য। ব্যাপারটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। পিসিমা আস্তে করে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, তুই পড়ছিস ?

তখনও মন থেকে ভয় তাড়াতে পারেনি প্রীতিরাম। পিসিমা বুঝলেন, প্রীতিরাম কোথায় যেন নিজেকে আলাদা করে রাখবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে পারছে না সে। অথচ, বিন্দুবালা মনে প্রাণে চান প্রীতিরাম মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠুক।

যতই সাধারণ স্ত্রীলোক হোন, আসলে তাঁরা সবাই তো মায়ের জাত। একজন সন্ন্যাসিনীর মাতৃভাব যতখানি, একজন বারবনিতার মাতৃভাব তার চাইতে কি কম থাকে ? যে মহিলা একাধিক সন্তানের জননী তাঁর মা-ভাব যতখানি—, যে মহিলা নিঃসন্তান তাঁরও মাতৃহৃদয় ততখানি। বিন্দুবালা তেমনি একজন মহিলা যিনি তাঁর বিরাট হৃদয়টিতে আশ্রিত প্রীতিরামকে বসিয়েছিলেন নিজের গর্ভজাত ছেলের মতই। বলা যেতে পারে, এর জন্যে অনেকাংশে প্রীতিরাম নিজেই নিজেকে তৈরী করেছিল।

যেমন ব্যবহার প্রীতিরামের, তেমনি সে পটু সব কাজে। সর্ব ব্যাপারে উৎসাহী।

বাড়িতে কোথাও কিছু হলে সবার আগেই তো ছুটে যায় প্রীতিরাম।

অক্রুর যখন জমিদারী তদারকে বেরুতেন, বালক প্রীতিরাম উপযাচক

হয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলত—দাদা, আমাকে যদি কোন কাজে লাগে সঙ্গে নিতে পারেন—

অক্রূর বলতেন, নেব-নেব, সঙ্গে নেব—সময় হলেই ডেকে নেব তোমাকে—

সেই হেন হীরের টুকরোর মত ছেলেকে ভালবাসবে না কে? পিসিমা তাই বোধ হয় একটু বেশী ভালবাসতেন, স্নেহ দিতেন তাকে। ওর লেখা-পড়ায় উৎসাহ দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন তিনি। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন—বাংলা-ইংরিজীটা শিখে রাখা ভাল! আমাদের চারদিকে শুধু লালমুখো ইংরেজ, তাদের মধ্যে থেকে যদি না একটু ওসব শিখে রাখা যায় তা হলে ওরা আমাদের মুখ্যু বলবে, ঠকাবে—ভয় দেখিয়ে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে—

পিসিমার কথা শেষ করতে না দিয়ে আনন্দে আটখানা প্রীতিরাম বলল, তাই তো আমি এ, বি, সি মুখস্ত করে ফেলেছি পিসিমা, একদিন দেখবেন আমি ইংরাজীতে নাম সই করতে পারবো, তারপর একদিন ইংরাজীতে পত্র লিখতে পারবো—ইংরেজরা আমাকে ঠকাতে পারবে না!

বালকের মুখে এসব কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিন্দুবালা। বলেছিলেন, তোর যখন লেখাপড়ায় এত মতিগতি, তখন যাতে বেশ ভাল করে পড়াশুনো করতে পারিস আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেবখন—

প্রীতিরাম সেকথা শুনে আনন্দে টলটল করে ওঠা মনটাকে নিয়ে পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসল। বিন্দুবালা অবাক হলেন।

করিস কি—করিস কি। পাগল ছেলে কোথাকার—বলে প্রীতিরামের মুখটাকে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন বললেন, এখন পেন্নামের ঘটা কেন রে প্রীতি?

প্রীতিরাম বলেছিল, আমার তো কেউ নেই পিসিমা, আমার যদি মা থাকতেন, বাবা থাকতেন, তা হলে আমি তো তাঁদের পেন্নাম করতাম পিসিমা, তুমি তো আমার মা, তাই তোমাকেই না হয় পেন্নাম করলাম—; কথা বলতে বলতে প্রীতিরামের চোখ জোড়া ছলছল করে উঠেছিল। দু' ফোঁটা কান্না নীরবে ঝরে পড়েছিল তার গালের ওপর দিয়ে। সেদিন সেই নিঃসন্তান, বালবিধবা নারীর মনের ওপরে বালক প্রীতিরাম আর একবার মুঠো মুঠো অধিকারের আবির ছড়িয়ে দিল।

পিসিমা একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাড়ির কাছের পাঠশালার

গুরু মশাইকে ডেকে প্রীতিরামকে যাতে ভাল করে পড়ানো হয় সে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানেই প্রীতিরামের পড়াশোনা!

অনেকগুলো দিন কাটল।

অনেকগুলো বছর কাটল বলা যায়। এখন প্রীতিরাম পূর্ণ যুবক। মান্নাবাড়ির পরিবেশে—স্নেহ আর প্রীতিতে গড়ে উঠেছিলেন তিনি। লেখাপড়াও শিখেছিলেন অনেকটা। যৌবনের ধর্ম ফুলের গন্ধের মত; ফুলের গন্ধ যেমন বাতাসে বিলীন হয়, তেমনি যৌবনের ধর্ম পালিত হয় আপন মহিমায়! যৌবনের ধর্মে প্রীতিরামও তাই স্বাভাবিকভাবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্য উতলা হয়ে পড়লেন।

এবার প্রকৃতই একটা কাজ চাই। বাইরের বিশাল জগতে কতই না কাজ, তার একটি কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে পুরুষের ধর্ম পালন করার তাগিদে প্রীতিরাম যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন।

যে পুরুষ কাজ করে না, কাজকে ভালবাসে না, ভালবাসতে জানে না সে আবার পুরুষ কীসের!

তাই প্রীতিরাম মনে মনে একটা কাজের তাগিদে ছটফট করে উঠলেন। ভাবনার কূল-কিনারা নেই। পথ খোঁজার তাগিদে সদাই কেমন যেন বিমর্ষ। প্রীতিরামের এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন বিন্দুবালার নজরকে এড়িয়ে যেতে পারল না।

একদিন ভারাক্রান্ত প্রীতিরামকে ডেকে বললেন, প্রীতিরাম, কিছুদিন হলো লক্ষ্য করছি তুই সব সময় কেমন যেন মন মরা হয়ে থাকিস—কি হয়েছে বলত তোর?

প্রীতিরাম বললেন, আমার ভাল লাগছে না পিসিমা কিছু ভাল লাগছে না। একটা কাজ চাই—আমার কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে পিসিমা—দাদাদের বলে আমায় একটা কাজ জোগাড় করে দেবে তুমি?

পিসিমা বললেন, এখন তুই বড় হয়েছিস, এ বাড়ির সব কাজই তো তুই করিস। এত কাজের পর আবার কাজ চাস, এত কাজ করে কি হবে শুনি? শরীরটা যে মাটি হয়ে যাবে বাবা—

প্রীতিরাম একটু হেসেছিলেন। আপন মনেই বলেছিলেন, শরীর! মাটির শরীর মাটি হয়ে যাবে তাতে ক্ষতি কি পিসিমা? দাদারা কত পরিশ্রম করেন, পরিশ্রম না করলে সংসারে সুখ থাকবে কেন পিসিমা। আমি যদি দাদাদের একটু সাহায্য করতে পারি, তাহলে দাদারাও তো একটু বিশ্রাম পেতে পারেন -

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিন্দুবালা। একরাশ বিস্ময় নিয়ে শুধু দু'চোখ ভরে দেখেছিলেন তাঁর স্নেহাশ্রিত সেই দুরন্ত নব যুবককে।

অবাক লাগে ভাবতে—এমন ছেলেও সর্বহারা হয়! ভাবছিলেন বিন্দুবালা, আজ যদি এই প্রীতিরামের বাবা-মা থাকতেন তা হলে এমন সুন্দর ছেলের জন্যে গর্ব অনুভব করতেন। দুর্ভাগ্য তাঁদের। দুর্ভাগ্য প্রীতিরামের। মনে প্রশ্ন জাগে বার বার, কেন নেই ওঁরা আজ? কেন ঈশ্বর এমন একটি ছেলেকে সেই জন্মলগ্ন থেকেই সর্বহারা করে পাঠিয়েছেন!

দু'দণ্ড কি যেন ভাবলেন বিন্দুবালা। তারপর নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন, বেশ, তোর দাদারা ঘরে এলে তাদের বলবো সব।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রোজ ঠিক এই সময়ে, সূর্যাস্তের পরই কনে দেখা আলোয় যুগল আর অক্রুর ঘরে ফিরে আসেন। আজও তাই এলেন তাঁরা। একটু পরেই পিসিমা গিয়ে দাঁড়ালেন যুগলের কাছে অবাক হলেন যুগল। এমন সময় কোনদিনই তো এ ঘরে পিসিমা আসেন না। তিনি তো চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা জপেন। যুগল নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়ে বললেন, আমাকে কিছু বলবে পিসি? বিন্দুবালা যুগলের সামনে বসলেন। বসলেন চেয়ারে। জাফরী কাটা—বাঘের থাবাওলা চারপায়া বিশাল চেয়ারটিতে বসে বললেন, তোরা সারাদিন এত খাটিস, শরীরের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাস না, বলি শরীর গেলে কি আর ফিরে আসে? তাই বলছিলুম সেরেস্তার কাজকম্ম একটু আধটু প্রীতিরামকে বুঝিয়ে দিতেও তো পারিস তোরা তার কাজ করার কত সাধ—

যুগল বললেন, প্রীতু কিছু বলছিল বুঝি?

পিসিমা বললেন, বলছিল—তোদের সঙ্গে মহালে বেরিয়ে কিম্বা কাছারি বাড়িতে বসে কাজ করবে। আরও বলছিল, দাদারা এত পরিশ্রম করেন, একটু শরীরের দিকে তাকাবার সময় পান না; ছেলেটা কি সুন্দর কথা বলে, তাই বলছিলুম ওকে যদি তোরা তোদের কাছে নিয়ে খানিকটা কাজ দিস তা হলে তোদের খানিকটা পরিশ্রম লাঘব হবে—

যুগল বললেন, প্রীতিরাম বড় ভাল ছেলে। এমন কথা কজন বলতে জানে? বেশ, কাল থেকে যখন মহালে বেরুবো ও যেন যায় আমাদের সঙ্গে।

খুশি হলেন বিন্দুবালা। যেন একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন তিনি। তারপর নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন প্রীতিরামকে। যোগমায়া নিজের হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো প্রীতিরামকে। প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল।

প্রকৃতি যেমন খেয়ালী, যেমন আপন মহিমায় মহিমান্বিতা—এ বাড়ির কিশোরী যোগমায়াও তেমনি। প্রীতিরাম যেন ওর খেলার সাথী, সদা সহচর! সবটুকু অধিকার যেন যোগমায়ার একার।

প্রীতিরামকে এ ঘরে পেঁছে দিয়ে আবার চলে গেল যোগমায়া। প্রায় নাচতে নাচতে চলে গেল।

পিসিমা বললেন, প্রীতি, কাল থেকে তুই দাদাদের সঙ্গে সেরেস্তার কাজকম্ম দেখতে যাস, কেমন?

প্রীতিরাম আনন্দে আটখানা! কাজ পাবার আনন্দে দিশেহারা।

পরের দিন থেকে কাজে বেরুলেন প্রীতিরাম।

বাড়ি থেকে অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে প্রতিদিন যেতে হয় সেরেস্তার কাজে।

এমনি করে কিছুদিন কেটে গেল!

একদিন সেরেস্তার কাজ করার ফাঁকে প্রীতিরামের কানে এল একটি নাম। ডানকিন্। ডানকিন্ সাহেব। দাদা অক্রূর মান্না কথায় কথায় বললেন, জানো প্রীত্, কাজকে কোনদিন ভয় পেতে নেই। পুরুষ মানুষের অলঙ্কার হলো কর্ম, যদি সেই কর্ম সঠিক ভাবে করে যেতে পার, তাহলে জীবনে দুঃখ কাকে বলে বুঝতেই পারবে না। যারা কাজ করতে ভয় পায়—আলস্যে দিনগুলো পার করে দেয়, সবাই তাদের ঘৃণা করে। এই আমাদের তো দেখছ—বিশেষ করে আমাকে, যদিও নিজের কথা নিজে জাহির করা পাপ, তবুও বলছি, সেই কোন ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেরেস্তার কাজ-কম্ম দেখি, চাষবাসের দিকটাও দেখি. সেখান থেকেই সোজা চলে যাই ডানকিন সাহেবের ওখানে—

প্রীতিরাম কৌতূহলী হয়ে ওঠেন; বলেন ডানকিন সাহেব কে দাদা?

অক্রূর বললেন, সে কী রে! অত বড় ব্যবসাদার লোকটার নাম জানিসনে? বিরাট ব্যবসাদার! লবণের ব্যবসা করে। জাহাজকে জাহাজ লবণ আসে, সেই লবণ গুদামে তোলে তারপর আমাদের দেশে বিক্রি করে আমি সেই ডানকিন সাহেবের ওখানে চাকরিও করি। আসলে দেওয়ান ছিলেন এই মান্নাবাবু।

প্রীতিরামের মুখ থেকে কে যেন বার করে নিয়ে এল একটি কথা, বিন্দুমাত্র দেরী না করে প্রীতি বললেন, দাদা আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে ডানকিন সাহেবের ওখানে কাজ করবো। ওখানে আপনার মত আমাকেও একটা কাজ পাইয়ে দিন—

কথাটা শুনে অক্রুর মান্না খুশি হলেন। এই কথাটি শোনার জন্যেই যেন তিনি অপেক্ষা করছিলেন। বোধহয় মনে পড়ল, সাহেব বলেছিল, তার ব্যবসার ব্যাপারে বিশ্বাসী-সৎ একটা ছেলের দরকার। তেমন ছেলে যে এনে দিতে পারবে তার পদোন্নতি! এই সব চলত তখন! সাহেবদের মন জুগিয়ে কাজ করতে পারলে, সাহেবদের মোসাহেবী করতে পারলে রাতারাতি ভাগ্য প্রসন্ন হতো। কেউ কেউ একটা করে খেতাবও পেয়ে যেত তখন! অর্থলোভে—খেতাবের মোহে তখন কলকাতার অনেক বাঙালী চাইকি হিন্দু সন্তান সাহেবদের গোলাম হয়ে যেত! কেনা গোলাম!

অক্রুর মান্না একবারও ভেবে দেখলেন না, প্রীতিরামকে যদি ডানকিন সাহেবের কাছে কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে নিজেদের সেরেস্তার কাজে ঘাটতি পড়তে পারে। আগুপিছু বিবেচনা না করে অক্রুর বললেন. করবি? তুই ডানকিন সাহেবের লবণের আড়তে কাজ করবি?

প্রীতিরাম বলল, হ্যাঁ, করবো দাদা

তারপরের দিনই প্রীতিরামকে সঙ্গে করে নিয়ে সোজা হাজির হলেন অক্রুর মান্না ডানকিন সাহেবের কাছে।

আলাদা ভাবে সাহেবের সঙ্গে কথা বলে এসে প্রীতিরামকে ডেকে বললেন, বড় সুখবর প্রীতু! সাহেব এক কথায় তোকে কাজে নিতে রাজী হয়ে গেলেন; সাহেব খুব ভালো মানুষ। তবে বেতন সামান্য, মনে কর হাত খরচা. কিরে কাজ করবি?—

প্রীতিরাম বললেন, বেতন যাই দিক. কাজটা তো শিখতে পারবো —

ব্যস! সেই দিনই প্রীতিরামের চাকরি হ'য়ে গেল।

ডানকিন সাহেবের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে প্রীতিরাম বললেন, নমস্কার—আপনাকে ধন্যবাদ সাহেব—

ডানকিন সাহেবের ঘোলাটে দু'চোখে বিস্ময়। বিস্ময় এই যুবকের আশ্চর্যরকম ব্যক্তিত্ব দেখে! এমন দৃঢ়চেতা নির্ভীক ছেলে ডানকিন সাহেবের নজরে পড়েনি এতদিনের মধ্যে।

ডানকিন বললেন, থ্যাঙ্কস্ বোলো—

প্রীতিরাম নির্ভীক ভাবে জবাব দিলেন. আমি ইংরাজীতে আপনাদের মত কথা বলতে জানিনে, তা ছাড়া যে বাংলা দেশের মাটিতে আপনারা লবণের ব্যবসা করছেন, আমি সেই বাংলা দেশের মাটিতে জন্মেছি। বাংলায় কথা বলি বাংলা আমার মাতৃভাষা এটা আমার গর্ব—

যুবক প্রীতিরামের কথা শুনে ডানকিন সাহেব অবাক হলেন। বুকের

মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন প্রীতিরামকে আবেগে। পিঠ চাপড়ে বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি প্রীতিরাম, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম যে তোমার মাদারল্যাণ্ডকে তুমি কতটা ভালবাস। আমি জানি, যে মাতৃভূমিকে ভালবাসতে জানে সে কাজকেও ভালবাসতে পারবে!

ডার্নাকিন সাহেবের প্রাণখোলা ব্যবহারে প্রীতিরাম খুশি হলেন। ওঁর মনটা তৃপ্তিতে ভরে উঠল। সেই থেকেই এই নব্য যুবকের জীবন গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রীতিরামের কাজ দেখে ডার্নাকিন সাহেব খুশি। কিছুদিন কাটল। একদিন ডার্নাকিন সাহেব এসে দাঁড়ালেন প্রীতিরামের কাছে! কিছু বলতে চান তিনি। ওঁর মুখে ভাষা ফোটার আগেই প্রীতিরাম বললেন, আমাকে কিছু বলবেন সাহেব?

সাহেব বললেন, তোমার কাজকর্মে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি; সল্ট বিজনেসটা যে কি আশা করি তা তুমি বুঝে নিতে পেরেছ. এবার আমি তোমাকে একটা অফার দিতে চাই

প্রীতিরাম বললেন, কি অফার বলুন—

ডার্নাকিন সাহেব বললেন, বাজারে নতুন নতুন সল্ট সেলার তৈরী কর, যত বেশী মাল বিক্রী করতে পারবে তার উপরে তত বেশী পারসেনটেজ কমিশন থাকবে তোমার—

প্রীতিরাম ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলেন। হাসিমুখেই কাজটা গ্রহণ করলেন তিনি।

সেই থেকে নতুন করে নতুন পথে অভিযান শুরু করে দিলেন প্রীতিরাম। আশ্চর্যরকম ফল লাভ হতে থাকল প্রথম থেকেই। উর্বর জমিতে ঠিক মত যত্ন নিতে পারলে—ঠিক মত চাষ করতে পারলে সোনার ফসল ফলে বৈ কি! এক্ষেত্রেও তাই ঘটে গেল। প্রীতিরাম দিন রাত পরিশ্রম করে বাড়াতে থাকেন ব্যবসা। সল্ট সেল।

যা আয় হয়, প্রীতিরাম তার সবটুকুই হাসি মুখে তুলে দেন দাদাদের হাতে। পিসিমা বললেন. যা আয় করিস তার সবটাই দাদাদের হাতে তুলে দিস কেন প্রীতি—

প্রীতিরাম বললেন. আমার টাকা-পয়সা. ধন-দৌলতে লাভ কি, আমি তো খাচ্ছি-দাচ্ছি. ভালই আছি—অভাব নেই কিছু—তাই টাকা দিয়ে আমার কি হবে, বরং দাদাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারলে ভাল হবে পিসিমা—

একদিন সত্যি সত্যি এই গচ্ছিত টাকা কাজে লেগে গেল। এ সব কথা অবশ্য ডার্নাকিন সাহেবের মৃত্যুর অনেক পরের ঘটনা!

ডানকিন সাহেব অকস্মাৎ চলে গেলেন। দমকা বাতাসে প্রদীপ শিখা যেমন কাঁপতে কাঁপতে, দাপাদাপি করতে করতে দপ করে নিভে যায় ঠিক তেমনি করেই যেন ডানকিন সাহেবের জীবন প্রদীপ নিভে গেল। দেহ থেকে জীবন গেলে, আত্মা বেরিয়ে গেলে দেহ যেমন মূল্যহীন হয়ে যায়— তেমনি ডানকিন সাহেবের মৃত্যুতে তাঁর লবণের ব্যবসায় ভাঁটা পড়তে পড়তে একদিন ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল!

ব্যবসাটাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন প্রীতিরাম। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল! মনটা তখনকার মত ভেঙে গেল প্রীতিরামের। নিজেকে ভীষণ বিপন্ন মনে হোল। আয় বন্ধ হয়ে গেলে বিপাকে পড়তে হবে বৈ কি!

উপরি আয় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে প্রীতিরামকে খানিকটা ভাবিয়ে তুলেছিল বটে কিন্তু হতাশা নিয়ে ঘরে বসে রইলেন না তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে সহজ করে নিলেন! আবার দাদাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রীতিরাম। ভারাক্রান্ত প্রীতিরামকে যুগল বললেন, এবার কি করবে ভাবছ?

প্রীতিরাম বললেন, একটা নতুন ব্যবসা করবো ভাবছি—

যুগল বললেন, ব্যবসা? লবণের ব্যবসায় থাকতে থাকতে ব্যবসাটা ভাল বুঝেছ বুঝি?

প্রীতিরাম বললেন, ভাল আর কি বুঝি?

অক্রুর মান্না এই আলোচনায় এসে যোগ দিলেন। ব্যবসা নিয়ে কথা হচ্ছে কানে যেতে তিনি বললেন, কি ব্যবসার কথা হচ্ছে শুনি—

প্রীতিরাম বললেন আমি ভাবছি বাঁশের ব্যবসা করব—বেলেঘাটায় যেখানে ডানকিন সাহেবের বাঁশের আড়ৎ, তার পাশে আমার জানাশোনা একজনের পেল্লায় একটা ঘর আছে, বাঁশের আড়ৎ করার মত ঘর, ভাবছি ঘরটা নিয়ে বাঁশের আড়ৎ করবো—বাঁশের এখন প্রচন্ড চাহিদা

প্রীতিরামের ভাবনায় কেউ আঘাত করলেন না।

যত টাকা দাদাদের কাছে গচ্ছিত ছিল সেই টাকা দিয়ে প্রীতিরাম নতুন ব্যবসায় জড়িয়ে ফেললেন নিজেকে! বেলেঘাটায় শুরু হয়ে গেল তাঁর স্বাধীন ব্যবসা। বাঁশের ব্যবসা।

মাত্র কিছুদিনের মধ্যে ব্যবসা বেশ জমে উঠল তাঁর। লাভ হতে থাকল বেশ। ঈশ্বরের নির্দিষ্ট বিধানে এবং কর্মকুশলতায় প্রীতিরামের বাঁশের ব্যবসা যেমন ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকল তেমনি চারিদিকে তাঁর

খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়তে থাকল। পাকা ব্যবসাদার হিসাবে। সবাই ডাকে দাস মশায়ের পরিবর্তে মাড় মশাই। কালে কালে এই বাঁশের ব্যবসার জন্যেই প্রীতিরাম দাস 'মাড়' উপাধিতে ভূষিত হয়ে গেলেন।

প্রীতিরাম দাস হলেন প্রীতিরাম মাড়।

এই বাঁশের ব্যবসা যখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে তখন পাশাপাশি আর এক ব্যবসায় মন দিলেন প্রীতিরাম!

নিলামে জিনিস কিনে আবার বিক্রি করা আর সেই সঙ্গে অর্ডার সাপ্লাই! এমনি করে প্রীতিরাম এগিয়ে চলতে থাকলেন তরতর করে।

নদীতে জোয়ারের পর যেমন ভাঁটা, রাতের পর যেমন দিন—তেমনি করে কর্মময় জীবনে উত্থানের পর পতন। যে জীবনে উত্থান নেই, পতন নেই, সে জীবনে মাধুর্য নেই! প্রীতিরাম তাই উত্থানেও যেমন আনন্দিত তেমনি পতনেও খুশি। হঠাৎই বাঁশের ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত ভাবে মন্দা ভাব দেখা দিল।

প্রীতিরাম কিন্তু হাল ছাড়লেন না!

ব্যবসার তরীটিকে শেষ পর্যন্ত ভাসিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তিনি। হলো না। তরী ডুবল বাঁশের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন প্রীতিরাম। এক সদা কর্মী মানুষ হঠাৎ কর্মহীন হলে তাকে যে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হতে হয়, ঠিক তেমনি ব্যর্থতার যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হলেন প্রীতিরাম। শেষ পর্যন্ত আবার গিয়ে দাঁড়ালেন দাদাদের সামনে।

অক্রুর জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি প্রীতু?

প্রীতিরাম বললেন, ব্যবসায় শেষ পর্যন্ত যে এমন করে মন্দাভাব আসবে তা বুঝতে পারিনি, আমার ভাগ্য দেবতা শেষ পর্যন্ত আমাকে যে কোথায় নিয়ে যাবেন ঠিক বুঝতে পারছি না; তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমিও দেখতে চাই আমার জীবন-তরী ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে কোন ঘাটে গিয়ে ভেড়ে—

অক্রুর বললেন এখন কি করবে ভাবছ?

প্রীতিরাম বললেন, আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন—

অক্রুর বললেন, একটু ভেবে দেখি—

প্রীতিরামকে নিয়ে এখন সবার ভাবনা।

এমনকি মাড়া পরিবারে ঐ কিশোরীর চোখে মুখে আর বোধহয় সারা মনেও সেই ভাবনা খেলা ছড়িয়ে! তাই এখন থাকনা প্রীতিরামের কথা—

সেই কিশোরীর কথা হোক !

সূর্য যেমন উদিত হয় চন্দ্রও তেমনি।

দিন হয় বলেই তো রাত। রাতের পর আবার সেই দিন, অন্ধকারের পর আলোক। আজকের পর কাল। কালের পরই তো কালাতিক্রম। জন্মের পর মৃত্যু।

এ সবই পরম সত্য।

একেবারে মৃত্যুর মত সত্য। শ্যাম-সুন্দরের মত সত্য ! সেই সুন্দরের আর এক রূপ, বিয়ের ফুল ফুটলেই বিবাহ বন্ধন। একের জন্যে অন্যের সৃষ্টি। এক নরের জন্য বিশ্বলোকের মাটিতে নারীর আত্মপ্রকাশ।

ঠিক যেমন প্রীতিরামের জন্যে এই মান্না পরিবারে তিল তিল করে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছিল যোগমায়া। যিনি প্রীতিরামকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সেই তিনি, অলক্ষের সেই স্রষ্টা পাঠিয়েছিলেন এই বালিকাকেও।

সবই ঈশ্বর নির্দিষ্ট। যুগলকিশোর মান্নার মেয়েটিও প্রীতিরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই স্রষ্টারই অমোঘ বিধানে। যে পুষ্প-বাগিচায় প্রীতিরামের আসন ছিল পাতা, সেই পুষ্প-বাগিচায় বিধির বিধানে পুষ্পলতায় প্রীতিরামের বন্ধন। এ সবই পূর্ব নির্দিষ্ট। খন্ডন করবে কে ?

অনুরাগ থেকে প্রেমের জন্ম।

শ্রী রাধিকার মনের অনন্ত গভীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে শাশ্বত প্রেমের জন্ম সে তো ঐ অনুরাগেই রঞ্জিত। মানব-লোকের প্রেমের রূপটিও তেমনি। ব্যতিক্রম হয়তো থাকে কোথাও কোথাও। মানবলোকে এই পার্থিব প্রেম কোথাও মৌন আবার কোথাও মুখর। কেউ প্রেমের ভাষাটি ব্যক্ত করে দেয় দ্রুত আবার কেউ প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে করে প্রতীক্ষা।

শ্রীরাধা তেমনি। প্রেমের রাখালের মুরলী ধ্বনি তাঁর মরমে পশেছিল। হৃদয়ের গভীরে প্রেমের পদ্মটি সেই লীলাময়ের লীলায় ফুটেছিল। প্রস্ফুটিত সেই পদ্ম শ্রীমাধবের পাদপদ্মে অঞ্জলি দেবার ঐকান্তিক বাসনায় শ্রীরাধিকার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু চতুর্দিকে যে বাধা, যে সংস্কারের প্রাচীর তা উপেক্ষা করে, বাধা অতিক্রম করে তাঁকেও আপনার মনের মাধুরী মিশায়ে আপনারে প্রস্তুত করে নিতে হয়েছিল। কঠিন, কঠোর সে কৃচ্ছসাধন। পরম প্রিয়কে লাভ করার চরম সাধনা। সব কিছু উপেক্ষা করে আত্মনিবেদনেই তো তাঁকে পাওয়া যায়। যে বাঁশি ডেকেছিল সেই বাঁশিই সৃষ্টি করেছিল কন্টক। সেই কন্টকিত পথ মাড়িয়ে হৃদয়-পুষ্প নিবেদনে

শ্রীরাধিকাকে যেতে হয়েছিল প্রেমের দুয়ারে। হয়েছিল নিষ্কাম প্রেমের বোধন!

কেমন করে আয়ান জায়া শ্রীরাধিকা প্রস্তুত করেছিলেন নিজেকে? গোবিন্দদাসের ভাষায়ঃ

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলী চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

মাধবের কাছে অভিসারের জন্য রাধার এই প্রস্তুতি। পদ্মের মত কোমল পদযুগল তাই রাধা বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করেছেন। পাছে নূপুরের ধ্বনি কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। পথের বিঘ্নকে সহজ করে নিতে আঙিনায় জল ঢেলে, কণ্টক বিছিয়ে তার ওপর দিয়ে চলা অভ্যাস করছেন—পথ দুর্গম! ভক্ত যাবে ভগবানের কাছে। এ যে তারি চরম সাধনা।

যুগলকিশোরের বালিকা কন্যার হৃদয় স্পর্শ করেছিল শ্রীমাধবের সেই মুরলীধ্বনি। আপন স্বভাবধর্মে তার প্রকাশ ছিল না সেই বালিকার চোখে-মুখে-মনের কোথাও। ভাগ্যনিয়ন্তা কিন্তু প্রীতিরামের জন্যই তিল তিল করে তাকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলেছিলেন!

যুগলকিশোর এবং তাঁর পরিবারের অনেকেই প্রীতিরামকে জামাই করার সিদ্ধান্তে ছিলেন অটুট। প্রীতিরাম জানতেন না এসব কথা। কল্পনাও করেন নি কখনও। যে ছোট্ট মেয়েটি তাঁর খেলার সাথী, মান্না বাড়ির আঙিনায় যে মেয়েটি তাঁর কিশোরকাল থেকে একমাত্র সঙ্গিনী, যার সঙ্গে কথা বলে—গল্প করে, কখনও কখনও ঝগড়া করে, মান-অভিমানের পালা করে এতগুলো বছর কেটেছে, সেই মেয়েটিকেই যে জায়ারূপে বরণ করে নিতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি প্রীতিরাম। যোগমায়াও তাই।

সেদিন যখন নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে ঠাকুরদালানের এক নির্জন পরিবেশে বসেছিলেন প্রীতিরাম, বসে বসে ভাবছিলেন ডানকিন সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে চাকরি চলে যাওয়া, বন্ধুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যশোরের সাকিমপুর থেকে বাঁশের মাড় আনিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যবসার হঠাৎ ক্ষতি হয়ে যাবার কথা, ঠিক তখনই সেই বালিকা গিয়ে দাঁড়াল

প্রীতিরামের পাশে। মধু ঝরানো সুরে বলল, দিনরাত কি এত ভাবছ বলো তো ?—তোমার অতশত ভাবনা কিসের আমি বুঝি না বাবা !

প্রীতিরাম সে কথার জবাব দেননি। জবাব দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন।

বালিকা যোগমায়াও নাছোড়বান্দা।

এবার সে প্রীতিরামের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে স্নেহময়ী, মমতাময়ীর শাশ্বত রূপটি নিয়ে আবার বলল, বল না—কি ভাবছ, বল না কি হয়েছে তোমার ?

প্রীতিরাম মাথার ওপর থেকে সেই ছোট্ট হাতটি নামিয়ে দিয়ে বললেন, হবে কি আবার ! আমি তো আর এখন তোমার মত ছোট্ট নই—রীতিমত বড়, যে লোক বড় হয় সে কি কখনও কাজটাজ না করে ঘরে বসে থাকতে পারে ? এই দেখ না, ডার্নকিন সাহেব মরে গেল আর আমার কাজ চলে গেল, গেলুম ব্যবসা করতে সে ব্যবসাও চলল না - কত কি কাজ করলাম কিছুই হলো না, যতক্ষণ একটা ভাল কিছু কাজ না করতে পারি ততক্ষণ আমার মন ভাল হবে না—

যোগমায়া হাসল। খিল খিল করে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, তুমি তো বাবাকে বলেছ সব. দেখবে বাবা তোমার জন্যে খুব ভাল কাজ এনে দেবেন—অনেক বড় কাজ

মুখের কথা তো নয় যেন শরতের শিউলি ঝরে পড়া।

বাক্য তো নয় যেন বেদবাক্য

কটা দিনও কাটল না। প্রীতিরামের ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হলেন। একরাশ গাঢ় অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল।

সেদিন কাছারীতে বসে কাজ করছিলেন যুগলকিশোর।

এমন সময় কে যেন একজন কাছে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—

জমিদারীর কাগজপত্রে চোখ রেখেই যুগলকিশোর বললেন, পাঠিয়ে দাও এখানে—

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। ভদ্রলোক এলেন। যুগলকিশোর যথাযোগ্য সম্মানে বসতে বললেন অতিথিকে। বললেন, বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি—

আগন্তুক বললেন, শুনলাম ভাড়া দেবার মত একটি বাড়ি আছে

আপনার—যদি অনুগ্রহ করে বাড়িটি ভাড়া দেন, যশোরের ডি. এম সাহেব খুব উপকৃত হবেন—

যুগলকিশোর একটু অবাক হলেন। বললেন, যশোরের জেলাশাসক হঠাৎ কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন ?

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে না—কিছু কাজ নিয়ে সাহেব কলকাতায় এসেছেন—কাজগুলি সমাধা করতে কিছু সময় লাগবে—

যুগলকিশোর কি যেন ভাবলেন। তারপর নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন, বাড়ি ভাড়া দেবার ব্যাপারটা আমার ছোট ভাই অক্রূর জানেন—আপনি সামান্য অপেক্ষা করুন। আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি—: ডাকতে হলো না। স্বয়ং অক্রূরচন্দ্র এলেন সেখানে। ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে যখন যুগলকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন সেই একই আবেদন পুনরাবৃত্তি করলেন ভদ্রলোক। রাজী হলেন অক্রূর মান্না। বললেন, আপনাদের সাহেবকে বাড়ি তো ভাড়া দিতেই হবে, তা না হলে আমি অপরাধী হয়ে যাব, আপনাদের সাহেবের সঙ্গে আমার শুধু পরিচয় নয় রীতিমত ঘনিষ্ঠতা আছে— ;

যথা সময়ে যশোরের জেলাশাসক, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসে উঠলেন সেই বাড়িতে।

খবরটি প্রীতিরামের কানে পেঁছে গেল।

প্রীতি কিছুতেই নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলেন না। একটা কাজের প্রত্যাশায় তখন তিনি অস্থির। একদিন মনের কথাটি সরাসরি পাড়লেন অক্রূরবাবুর কাছে। বললেন, যশোর জেলার শাসক শুনেছি খুব ভাল লোক, ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার খুব ভাল পরিচয় আছে আমি জানি, আপনি যদি তাঁর কাছে আমার কথা বলেন তা হলে ভাল হয়—

অক্রূরবাবু একদিন জেলাশাসকের কাছে প্রীতিরামের কথা বললেন। শুধু বলা তো নয়, একদিন প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন ডি. এম.-এর কাছে। সাহেব প্রীতিরামের সঙ্গে একটু কথা বলেই বুঝতে পারলেন ছেলেটি সামান্য নয়। বুঝলেন, ছেলেটির ভিতরে এমন কিছু আছে যা বুঝতে পারলে এবং বুঝে কাজে লাগাতে পারলে ভালই হবে। রাজী হলেন সাহেব। বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যশোর চলো. আমার অফিসে তোমাকে চাকরি দেব—

প্রীতিরাম আনন্দে অধীর। কাজ পাবার আনন্দ। আনন্দে-আহ্লাদে দিশাহারা তিনি ছুটে গেলেন বাড়িতে। পিসিমার পায়ের ধুলো

মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, আমি যশোর যাচ্ছি, ভাল চাকরি পেয়েছি ওখানে। কথাটা শুনে পিসিমাও খুশি। খুশি হলেন যুগলকিশোরও। সবাই খুশি। এমনকি যোগমায়াও খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

যথাদিনে প্রীতিরাম ছোট একটা টিনের বাক্সে জামা-কাপড় আর চাদর গুছিয়ে নিয়ে যখন সবাইকে প্রণাম করে বাড়ির বাইরে পা দিলেন তখন বাইশ বছরের প্রীতিরাম জানতেন না এই বাড়ির কোন এক নিভৃতে একজনের হৃদয়পদ্মে প্রীতিরামের অব্যক্ত বেদনার ছোঁয়া! প্রীতিরামের মনটি কিন্তু তাকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হলো। বাড়ির বাইরে পা রেখে যখন শেষবারের মত সবাইকে দেখার আগ্রহে প্রীতিরাম ঘুরে তাকালেন, দেখলেন যোগমায়া দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। দু'চোখে যেন বহু কথা জমা হয়ে আছে তার। কত স্বপ্ন যেন ভরে আছে সে দুটি নয়নে।

প্রীতিরাম চলে গেলেন যশোরে।

তারপর কটা বছর কাটল। যশোর থেকে খবর এল জেলাশাসক বদলি হয়ে গেছেন ঢাকায়। সাহেবের সঙ্গে প্রীতিরামও চলে গেছেন সেখানে। এ সংবাদে মান্না পরিবারের কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, বরং সবাই খুশি। খুশি প্রীতিরামের চাকরির জীবনে উন্নতির লক্ষণ দেখে।

ঢাকা যাবার পরই প্রীতিরামের ভাগ্যরথের চাকা যেন আরও গতিময় হয়ে গেল। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয় বোধ করি এমনি হয়। সাহেব তাঁর সহোদর ভাইয়ের মতই ভালবেসেছিলেন প্রীতিরামকে।

ঢাকায় বেশ ভাল ভাবেই হাসিতে খুশিতে কেটে যাচ্ছিল প্রীতিরামের। এমন সময় একদিন রামকান্তবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল প্রীতিরামের। রাজা রামকান্ত রায়। নাটোরের রাজা। সেরেস্তার কাজ নিয়ে যখন প্রীতিরামকে যেতে হয়েছিল নাটোরে—তখনই এই পরিচয়। তাঁর ব্যবহার, কর্মকুশলতা, ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন রাজা রামকান্ত! শুধু মুগ্ধই হলেন না, স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে প্রীতিরামকে তিনি তাঁর জমিদারীর দেওয়ান পদে নিয়োগ করবেন। যে ভাবনা সেই কাজ! এক সময়ে ডেকে পাঠালেন প্রীতিরামকে। রাজপ্রাসাদ অভ্যন্তরে এক বিলাসবহুল আলোকোজ্জ্বল কক্ষে রাজা প্রীতিরামকে অন্তরের গভীরতম প্রীতি উজাড় করে অভ্যর্থনা জানালেন।

বললেন, আমি তোমাকে একটা বড় দায়িত্ব দিতে চাই—দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করবে প্রীতি?

প্রীতিরাম বিস্ময় জড়ানো দুচোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, আজ্ঞা করুন, কি দায়িত্ব দিতে চান আমাকে—

রাজা রামকান্ত রায় বললেন, ঢাকা থেকে চলে আসতে হবে তোমায়, আমি তোমাকে আমার নাটোরের দেওয়ান করতে চাই—

প্রীতিরাম কোথায় যেন একটা ধাক্কা খেলেন। নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়ে বললেন, এখন তা কি করে সম্ভব হবে তাই ভাবছি ; আপনি তো জানেন রাজা, ঢাকার জেলাশাসক আমাকে স্নেহ করেন—বিশ্বাস করেন—এখনই সেই চাকরি ছেড়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না—। যদি কোনদিন সাহেব আমায় পরিত্যাগ করেন. আমি সেইদিনই আপনার এই দায়িত্বভার আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবো—

এ কথা শুনে রাজা রামকান্ত রায় শুধু অবাকই হয়েছিলেন তা নয়. মনে মনে যুবক প্রীতিরামের এই দৃঢ়তাকে হয়তো শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেলেছিলেন। একটা বিশেষ আকর্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত রাজা নিজেই ঢাকার জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছিলেন সরাসরি—প্রীতিরামকে আমি চাই– ওকে আমার কাছে আসতে দিন সাহেব, ওকে আমার বড় প্রয়োজন।—

রাজা রামকান্ত রায়ের এই আবেদন পেয়ে সাহেব স্মিত হাস্যে বলেছিলেন—রাজা, আমি প্রীতিরামকে সেইদিনই আপনার হাতে তুলে দেব আনন্দের সঙ্গে, যেদিন আমি চিরদিনের মত অবসর নেব—

একেই বলে ভালবাসা ! একেই বলে মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি।

কথা রেখেছিলেন সাহেব।

কিছুদিনের মধ্যেই অবসর নিলেন তিনি। ঢাকার জেলা শাসকের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য প্রীতিরামেরও অবসর নেওয়ার লগ্ন এসে গেল। সব কাজ শেষ হল সেখানকার। ভারাক্রান্ত প্রীতিরাম সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন নাটোরে। রাজা রামকান্ত রায় প্রাসাদের ঝাড়-লণ্ঠনের মত খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন। যথা সময়ে নাটোরের দেওয়ান পদে প্রীতিরামকে করলেন অভিষিক্ত।

অল্পদিনের মধ্যে এখানেও প্রীতিরাম সকলের মন জয় করে নিলেন। প্রজাদের মুখে মুখে, ঘরে ঘরে দেওয়ান প্রীতিরামের খ্যাতি পড়ল ছড়িয়ে। এই অপার খ্যাতির খবর পেঁৗছে গেল মান্না পরিবারে। আর সেদিন সেই কিশোরী যোগমায়ার চেতনাবোধের কাছে এসবের বিশেষ কোন মূল্য না থাকলেও সবার খুশির মেলায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে সেও ভোলেনি।

মাত্র কিছুদিন কাটল। হঠাৎ নাটোরের রাজপ্রাসাদে নেমে এল শোকের ছায়া।

রাজা রামকান্ত রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভেঙে পড়লেন না প্রীতিরাম। সংসারে জরা-ব্যাধি-ব্যথা-বেদনা-সুখ-জন্ম-মৃত্যু—এই তো নিয়ম। সুতরাং ভেঙে পড়লে চলবে কেন? সহ্য করতে হয় সব, হাসি মুখে বরণ করে নিতে হয় দুঃখের ভাগ। প্রীতিরামও তাই নিলেন। সব ব্যথা বুকের ভিতরে জমা করে রেখে প্রীতিরাম সব কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করে যেতে লাগলেন। এবার নাটোরের অধ্যায় শেষ হবার মুখে। বাজলো ছুটির ঘণ্টা।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাজা রামকান্ত রায়।

রাজার মৃত্যুর পর আর প্রীতিরাম কিছুতেই নিজেকে নাটোরের কোন কাজেই জড়িয়ে রাখতে পারলেন না। একদিন হাসিমুখে নাটোর থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন প্রীতিরাম।

এবার বন্ধন।

এবার সেই মহামিলনের সন্ধিক্ষণ।

এবার জন্ম জন্মান্তরের জন্য শ্রীমাধবের পাদপদ্মে হৃদয়-পদ্মটির আত্ম নিবেদনের শুভলগ্ন!

সেতারের তারে সুনিপুণ অঙ্গুলীস্পর্শে যে সুর লহরীর জন্ম, ঝর ঝর ঝরণা ধারায় যে হিল্লোলিত ঝঙ্কারের অপরূপ সৃষ্টি, আজ ঠিক তেমনি হাসির কলতান মান্না পরিবারের প্রাসাদ অলিন্দে। আনন্দের অমৃত জোয়ারে উদ্বেলিত এক কিশোরী হৃদয়।

যোগমায়াকে ঘিরে কিশোরী সখীর দল। বিচিত্র, বর্ণময়, উজ্জ্বল অনেক ফুলের মাঝে যেন একটি রক্ত গোলাপের মত বসে আছে যোগমায়া। রাশি রাশি খুশিতে ওরা সবাই আজ বড় বেশী ঝলমলে। সবাই এসেছে ছুটে। সবাই জেনেছে আজ যোগমায়ার বিয়ে।

বিয়ে কী?

বিয়ের চিরন্তন রূপটিই বা কী?

জীবনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধই বা কতটুকু?

এসব ওরা জানে না। শুধু জানে টোপর মাথায় দিয়ে পালকী চড়ে বর আসে গলায় ফুলের মালা দুলিয়ে। শঙ্খ বাজে। উলু দেয় মা-মাসিরা। কত লোক, কত বাহার, আনন্দ আর আনন্দ। এমন আনন্দের অংশীদার সকলেই হয়েছে। জন্ম জন্মান্তরের জন্য এই সামাজিক প্রথা জগদ্দল পাথরের

মত নিত্য জাগ্রত। ওরা দেখে বর আসে আবার চলে যায় টুকটুকে বৌ নিয়ে পালকী চড়ে।

ব্যাস—বিয়ের অর্থ, বিয়ের রূপ ওদের কাছে এই।

সই যোগমায়ার সেই বিয়ে।

কেয়ূরে-কুমকুমে-আতরে-চন্দনে যখন সইরা সাজাচ্ছিল. বর আসবে এক্ষুণি পালকী চড়ে—নিয়ে যাবে বিয়ে করে—এমন একটা ঠাট্টায় ওরা যখন মাতিয়ে রেখেছিল, তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে যোগমায়া শুধু উচ্চারণ করেছিল একটি মাত্র শব্দ—ধ্যাৎ—

দেখতে দেখতে লগ্ন এল। শঙ্খধ্বনি আর উলুতে মুখরিত মান্না বাড়ি। যুগলকিশোরের কাছে এসে অতিথি অভ্যাগতেরা একবাক্যে বললেন, তোমার কন্যার জন্যে উপযুক্ত পাত্রই পেয়েছ যুগল—মেয়ে-জামাই সুখী হোক, তোমায় এই আশীর্বাদ করি—

যুগলকিশোর আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। আশীর্বাদ। এ যেন শরতের মেঘমুক্ত আকাশে প্রতিপদের চাঁদ ওঠার অনিবার্য ধর্ম পালন।

যুগল বললেন, প্রীতি তো আমার জামাই নয়, আমার ছেলে—

বিবাহপর্ব চুকে গেলে পিসিমা বিন্দুবালা এলেন প্রীতির কাছে। অত্যন্ত শান্ত মিষ্টি স্বরে ডাকলেন, প্রীতু; ডাক শুনে প্রীতিরাম ছুটে যান পিসিমার কাছে। মায়ের ডাকে ছেলে যেমন ছুটে যায় তেমনি করেই ছুটে গেলেন। প্রীতিরাম জানেন, তাঁকে পূর্ণ করে তোলার পিছনে এই পিসিমার দান অপরিসীম। কাছে দাঁড়িয়ে যখন চোখ তুলে তাকালেন প্রীতিরাম দু'চোখের তারা সহসা বিস্ময়ে যেন স্পন্দনহীন। পিসিমার চোখে জল। প্রীতিরাম নিজেকে সহজ করে নিয়ে পিসিমার পা স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। পদধূলি মাথায় নিয়ে যেন পবিত্র হলেন তিনি।

পিসিমা বললেন, আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও—

এরপর যুগলকিশোরও একসময় সস্নেহে প্রীতিরামকে কাছে ডেকে নিলেন। প্রীতিরাম যখন পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, যুগল বললেন, বসো বাবা—আমার এই কাছটিতে বসো—

প্রীতিরাম বসলেন। একখানা কাগজ প্রীতিরামের হাতে তুলে দিয়ে যুগলকিশোর বললেন, এখানা যত্ন করে রেখে দিও—

দানপত্র। প্রীতিরাম দেখলেন দানপত্র। যুগল বললেন, ওটা কি তা বুঝলে তো? দানপত্র—, ষোল বিঘে এক ছটাক জমি আমি তোমাকে দিলাম—

প্রীতিরাম দানপত্রটি মাথায় ঠেকিয়ে ভক্তি জানালেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমি এই জমির সদ্ব্যবহার করতে চাই—

যুগল বললেন, জমি তোমার—তোমার যা ইচ্ছে তাই করবে—যা করবে জানবে তাতেই আমার সম্মতি আছে—

প্রীতিরাম বললেন, আপনার দেওয়া এই জমির ওপর আমি বাড়ি তৈরী করতে চাই—

যুগল বললেন, তাই করো –

যে কথা সেই কাজ।

কোলকাতার সেরা রাজমিস্ত্রীদের ডেকে পাঠালেন প্রীতিরাম। রাজমিস্ত্রী এল।

নক্সা তৈরী হলো বাড়ির। যথাদিনে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট, যুগলকিশোর মান্নার দেওয়া জমির ওপরে শুরু হয়ে গেল বাড়ি তৈরীর বিশাল কর্মকাণ্ড। বাড়ি তো নয় প্রাসাদ। অবশেষে একদিন সেই প্রাসাদ তৈরীর কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার গৃহপ্রবেশ। গৃহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাড়িতে গৃহলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হলেন প্রীতিরাম।

একদিন তিনি সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন শ্বশুর মশায়ের সামনে। বিয়ের পর তখন অনেকগুলো দিনই কেটে গেছে।

প্রথম কুঁড়ির মত প্রথম ঋতুর প্রকাশে যোগমায়া যখন আনন্দস্নাতা তখন প্রীতিরাম গিয়ে দাঁড়ালেন শ্বশুর যুগলকিশোরের সামনে। বললেন, আপনি যদি অনুমতি দেন আমি আপনার মেয়েকে জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি, ভাবছি গৃহপ্রবেশের পূজা ক্রিয়াদির সঙ্গে আপনার মেয়েও ও বাড়ির গৃহলক্ষ্মী হিসেবে প্রবেশ করবে।

যুগলকিশোর সানন্দে অনুমতি দিলেন।

যথাদিনে, শুভক্ষণে, দুই ভাই আর জায়া যোগমায়াকে নিয়ে প্রীতিরাম প্রবেশ করলেন আপন প্রাসাদে।

নিতান্ত শৈশবকাল থেকে হাওড়া খোশালপুরের মান্না পরিবারের সঙ্গে যে আত্মার আত্মীয়তা তার প্রতি অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধাটুকু জানিয়ে প্রীতিরাম এলেন নবগৃহে।

পণ্ডিতদের বিধান অনুসারে যথাদিনে সেই গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে গৃহলক্ষ্মীর প্রবেশ ঘটে গেল একই সঙ্গে।

দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রীতিরাম।

এই দুই ভাইয়ের কথা এখানে বলা দরকার। সহোদর ভাই। একই

রক্ত তিনের শরীরে। অথচ দুইয়ের কথা রেখে তিন থেকে শুরু। কিন্তু দু'য়ের কথা না বললে তিনের পূর্ণতা আসে না। সেই গৃহ হারাবার সময় থেকে এই গৃহপ্রবেশ পর্যন্ত প্রীতিরাম যে দুই ভাইকে চোখে চোখে, কাছে কাছে রেখেছিলেন, সেই দুই ভাই ছাড়া প্রীতিরামের আপনজন বলতে আর কেউ তো ছিল না। তাই এখানে প্রীতিরামের বাল্যস্মৃতি কিছুটা বলে নেওয়া দরকার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।

সারাদেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে রাষ্ট্রবিপ্লব। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা মূলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বলা যেতে পারে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই বিপ্লবের চেহারা হয়েছিল জটিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ভারী।

ভারী হবারই কথা। ক্ষমতার লড়াই। স্বার্থের লড়াই।—স্বৈরতন্ত্রের লড়াই চলে এসেছে চিরকাল।

১৭৪২ সাল।

তখন নবাব আলিবর্দী খাঁর আমল। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভাব ঘটল ভাস্কর পণ্ডিতের। আবির্ভাব তো নয়, বলা যেতে পারে উল্কার মত আত্মপ্রকাশ ঘটল। আত্মপ্রকাশ ঘটল আক্রমণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিত আর তাঁর কয়েকশত কর্মীরা সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার বুকে। নবাব আলিবর্দী খাঁর দরবারে বীরদম্ভে হাজির হয়ে ভাস্কর পণ্ডিত দাবী পেশ করলেন, নবাবের হাতীশালায় যত হাতী আছে সব তাঁর চাই। শুধু হাতী হলেই চলবে না সেই সঙ্গে দিতে হবে বেশ কিছু টাকা। ভাস্কর পণ্ডিতের এই দুঃসাহস দেখে নবাব স্তম্ভিত হলেন কিন্তু দুর্বল হলেন না। আলিবর্দী খাঁ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন সেই দাবী। স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন এই দাবী মেনে নিতে তিনি বিন্দুমাত্র রাজী নন।

অথচ ভাস্কর পণ্ডিতের দাবী মেনে না নেওয়ার অর্থ বর্গীর অত্যাচারকে আমন্ত্রণ জানানো।

ঘটনা তাই ঘটতে থাকল।

ভাস্কর পণ্ডিতের অনুগত বর্গীদের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

অত্যাচার শুরু করল তারা। সারা বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল

বর্গী অত্যাচার। সে অত্যাচার যেমন পৈশাচিক তেমনি নির্বিবাদে তারা চালিয়ে যেতে থাকল লুঠতরাজ।

নবাব আলিবর্দী খাঁ এবার আর চুপ করে থাকলেন না। ভাস্কর পণ্ডিতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন নবাব।

শেষ পর্যন্ত নবাবের রণকৌশলের কাছে শুধু পরাজিত নয় মৃত্যুবরণ করে নিতে হলো ভাস্কর পণ্ডিতকে। এই মৃত্যুর পরেও কিন্তু বর্গীর অত্যাচার চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল না। তাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অত্যাচার সংঘটিত হতে থাকল ঘরে ঘরে। সাধারণ মানুষ গৃহহারা-সর্বহারা হতে থাকল। ক্রমে এই গৃহহারার বন্যা দেখা দিল সারা বাংলাদেশ জুড়ে। বিশেষ করে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, রাজশাহী অঞ্চলের মানুষেরা বর্গীর অত্যাচার থেকে বাঁচবার তাগিদে আশ্রয় নিতে থাকল কোলকাতায়-হাওড়ায়।

অবশেষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশের মাটি থেকে বর্গীর অত্যাচার চিরতরে নির্মূল করে দিল।

আর সেই অত্যাচারের কথা কালে কালে স্থান পেল ঠাকুমা-দিদিমার ঝুলিতে।

মা-ঠাকুরমারা বর্গীর অত্যাচার নিয়ে ছড়া বাঁধলেন। তাঁরা কোলের শিশুদের ঘুম পাড়াতেন সেই ছড়া গেয়ে গেয়ে—

"...বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?"

এই সময়ে হাওড়া-খোশালপুরে প্রীতিরাম হারালেন বাবা-মাকে। সহায় সম্বলহীন নিতান্ত অনাথ প্রীতিরাম ছোটভাই রামতনু আর তার বছর দেড়েকের বড় কালিপ্রসাদকে নিয়ে চলে এলেন মান্না পরিবারের আশ্রয়ে। তার পরের ঘটনা বলা হয়েছে আগেই!

যোগমায়া যেন সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী। সংসারের সবদিকেই তাঁর সমান দৃষ্টি।

বড়লোক আর বড় বাড়িতে মানুষের তো অভাব থাকে না, এবাড়িতেও তেমনি লোকের অভাব ছিল না। স্বামী প্রীতিরামের সঙ্গে যারা কাজ করে শুধু তারাই নয়, প্রতিদিনই প্রায় অতিথি অভ্যাগতের আনাগোনার বিরাম থাকত না। হেঁসেলের বড় উনুনের আগুন ধরতে গেলে চব্বিশঘণ্টা জ্বলেই থাকত। নিভবার অবকাশ পেত না।

কোন কাজের বাড়িতে যেমন পাত পড়ে এ বাড়িতেও তেমনি প্রতিদিনই দু'বেলা অনেক মানুষের পাত পড়তে লাগল।

কেউ বেড়াতে এলে এ বাড়ির অন্নগ্রহণ না করলে যোগমায়া ব্যথা পেতেন। নিজে ঘুরে ঘুরে সবার খাওয়া দাওয়ার তদারকি করতেন।

সন্ধ্যে হলে ঠাকুর ঘরে গিয়ে নিজ হাতে ঠাকুরের ভোগ সাজাতেন, নিবেদন করতেন। আরতি করতেন ভক্তি অর্ঘ্যে।

গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতেন। রাত্রে সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে বিশেষ করে দুই দেওরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে নিজে দুটি অন্ন মুখে দিতেন।

সংসারের সব কাজ সেরে যখন যোগমায়া নিজের ঘরে যেতেন—একরাশ ক্লান্তি নিয়ে তখন ঘুমিয়ে পড়ত এবাড়ির সবাই। নিস্তব্ধ নিথর হয়ে যেত গোটা শহর।

প্রীতিরাম শুধু ঘুমতে পারতেন না। যোগমায়ার জন্য দু'চোখ মেলে হয় কোনোদিন বসে থাকতেন নতুবা ডুবে থাকতেন ব্যবসার হিসাব নিকাশের রাশি রাশি কাগজপত্রের মধ্যে।

যোগমায়া কাছে এসে দাঁড়ালে প্রীতিরাম মুহূর্তের জন্যও বিলম্ব করতেন না। সব কাজ সরিয়ে রেখে, সব ভাবনা থেকে নিজের মনটাকে আলাদা করে নিয়ে হয়ে যেতেন সম্পূর্ণ আলাদা একটা মানুষ। প্রেমিক। নিতান্ত বালক।

এই তো সময়। ঈশ্বর যেন এই সময়টুকু বেঁধে দিয়েছিলেন পার্থিব প্রেম আর ভালবাসার স্বর্গ রচনার জন্য।

আবার পাখী ডাকত, আবার সূর্য উঠত, আবার শিউলি ঝরে পড়ত. অন্ধকার মুছে যেত দিনের আত্মপ্রকাশে। যোগমায়া অতি ভোরে বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়াতেন ঘরের জানালার কাছে। করজোড়ে বন্দনা করতেন সূর্য দেবতার।

তারপর গোটা বাড়িটা তদারক করে স্নান সেরে এসে ঠাকুর ঘরে যেতেন পুজো করতে। পুজো যখন শেষ হতো, প্রীতিরামের তখন কাজে বেরুবার সময়।

অনেক কাজ।

টালায় তখন ছিল নিলাম ঘর। প্রীতিরাম সেখানে গিয়ে নিলাম-এ কিনতেন সোখীন জিনিসপত্তর। আর সেই সোখীন জিনিসগুলো নিয়ে এসে বেশীদামে বিক্রী করে দিতেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীদের কাছে। বেশীরভাগ বিক্রি করতেন শহরের বড় বড় সাহেব অধিবাসীদের কাছে। তাছাড়া এই নতুন বাড়ি তৈরী করার পর আবার বাঁশের ব্যবসা নতুন করে

আরম্ভ করেছিলেন তিনি। এর ওপরে ছিল ইণ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক বিভাগে রসদ যোগানো। দু'পয়সা বেশী লাভ থাকত তাতে। দালালী বললে হয়তো শ্রুতিকটু হবে তাই বলা দরকার এই রসদ যোগান দিয়ে বেশ মোটা কমিশন পেতেন প্রীতিরাম।

আসলে সর্বদিক থেকেই প্রীতিরামের আয়।

যেমন আয় তেমনি পরিশ্রম। বুকের রক্ত জল করা। কর্মী তো নন—প্রীতিরাম কর্মবীর। মাঝে মাঝে সেই রাত্রে নিস্তব্ধ প্রহরে যোগমায়ার কণ্ঠে বাজতো অনুযোগের সুর—এত কাজ করলে তোমার শরীরটা যে মাটি হয়ে যাবে তা ভেবেছ কখনো?

প্রীতিরাম বলতেন, মাটির শরীর তা আবার মাটি হয় নাকি?

যোগমায়ার দু'টো চোখ ছল ছল করে উঠত। একরাশ অভিমান। প্রীতিরাম যত বেশী যোগমায়াকে এড়িয়ে কাজের কথায় আসেন, যোগমায়ার অভিমান তত বেশী বেড়ে যায়।

যতক্ষণ না প্রীতিরাম সেই মানভঞ্জন করবেন, ততক্ষণ এই বড় ঘরটার ভিতরে অমাবস্যা।

সোহাগে পূর্ণিমা।

প্রীতিরাম প্রতিবারেই বলেছেন, ঠিক আছে এখন থেকে আর পরিশ্রমের মাত্রা সত্যি বলছি যোগমায়া, কমিয়ে দেবার চেণ্টা করবো—; ঠিক ততবারই পরিশ্রমের মাত্রা বেড়েছে তাঁর।

এবার নতুন অধ্যায়।

রোজকার মত প্রীতিরাম সকালে কাজে বেরুবার জন্য যখন নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন, যোগমায়া যখন বেনিয়ানের ফিতে বেঁধে দিচ্ছিলেন, ঠিক তখন কালিপ্রসাদ এসে খবর দিল এক ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে। ভদ্রলোকের নাম শিবরাম সান্যাল।

প্রীতিরামের কপালের চামড়ায় একটা ঢেউ খেলে গেল। হয়তো মনে করবার চেষ্টা করলেন মানুষটিকে। তারপর যোগমায়াকে বললেন, তুমি জলখাবারের আয়োজন কর—আমি দেখে আসি কে শিবরাম সান্যাল—কথাটা শেষ করে প্রীতিরাম ফরাসডাঙ্গার ধুতির কোচা মুষ্ঠিবন্ধ করে সোজা এসে দাঁড়ালেন নীচের বৈঠকখানায়। উঠে দাঁড়ালেন শিবরাম সান্যাল। সাতোর পরগণার নায়েব।

প্রীতিরামের অবশ্যই জানাশোনা। প্রীতিরাম বললেন, বসুন, বসুন, সান্যাল মশাই—খবর কি বলুন? শিবরাম বললেন, সাতোর পরগণা আর

মাকিমপুর নীলামে চড়ছে। লাটে উঠল আর কি। আমি বলি, আপনি যদি নীলামে কিনে নেন ভাল হয়—

প্রীতিরাম ভাবলেন প্রস্তাবটি মন্দ নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রীতিরামের পক্ষে কেনা সম্ভব নয় জানিয়ে দিলেন। শিবরাম বললেন, আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা—তা ছাড়া এও বুঝতে পারছি সাতোর পরগণা আর মাকিমপুর যদি কিনে নেওয়া যায় তা হলে এমন একদিন আসবে, যখন এখান থেকে আয় হবে অনেক। মাটি হলো মা, মায়ের মত মাটি কখনো ফাঁকি দেয় না—, তাই আমি যদি আপনার অনুমতি পাই তা হলে আরও একটি কাজ করতে পারি

প্রীতিরাম বললেন. বলুন কি অনুমতি চান ?

শিবরাম সান্যাল বললেন, আজ্ঞে আমি হলাম সাতোর পরগণার নায়েব। সাতোর পরগণার অন্ন জল আমার পেটে, এতদিন পর সেই সাতোর পরগণা লাটে উঠে যাবে আর চোখের সামনে তাই দেখব ভাবতে পারছি না, অথচ আমার পক্ষে নীলামে কেনাটা পাঁচজনের চোখে অন্য দেখাবে—তাদের চোখ টাটাবে। তাই বলি কি আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার নামে আমিই দুটি পরগণা কিনতে পারি—

প্রীতিরাম বললেন. বেশ আপনি কিনুন, আমার নামেই কিনুন—এতে আমার আপত্তি নেই—;

প্রীতিরাম আরও বললেন, আপনি তো জানেন আমার দুই পুত্র, হরচন্দ্র আর রাজচন্দ্র; এখন জমিজমা বাড়িয়ে সর্বক্ষণ সেই জমিজমা নিয়েই যদি থাকি তা হ'লে ওদের দিকে নজর দিতে পারব না। সান্যাল মশাই, ওরা আরও বড় হোক, তখন ওদের ছেড়ে জমিজমায় মন দেব।

শিবরাম বললেন, যথার্থই বলেছেন আপনি। আপনার পুত্র দুটির নামকরণ কিন্তু চমৎকার হয়েছে। এবার ঈশ্বর করুন ওরা বড় হয়ে নামের মর্যাদা রাখুক আর আপনার মুখোজ্জ্বল করুক—আজ আসি তা হলে ? পরে আমি আপনার সঙ্গে আবার দেখা করবো; কথাটি শেষ করে শিবরাম সান্যাল করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

প্রীতিরাম আবার ফিরে গেলেন অন্দরমহলে।

শিবরামবাবুর সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে কথা হলো সেই কথাগুলো যোগমায়াকে বললেন প্রীতিরাম। সব শুনে যোগমায়া বললেন, ঠিকই বলেছ তুমি। আমাদের হরচন্দ্র আর রাজচন্দ্র বড় হলে তুমি ঐ জমিজমা নিয়ে থেকো, এটা আমারও মত।

প্রীতিরাম আর যোগমায়ার প্রথম পুত্র হরচন্দ্র।

নতুন বাড়িতে আসবার পর যেদিন যোগমায়া নতুন বার্তা শুনিয়েছিলেন চুপি চুপি, একান্ত সংগোপনে, সেদিন প্রীতিরাম আনন্দে হয়েছিলেন দিশেহারা। মহাসাগরের উদ্বেলিত জলরাশির মত প্রীতিরাম আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে সেই বার্তা নিজেই পেঁছে দিয়েছিলেন ঘরে ঘরে। কাজ ছাড়া যে মানুষ দু'দণ্ড বসে থাকতে পারেন নি কখনো, একটি মুহূর্ত যে মানুষ অপব্যবহার করেন নি, সেই মানুষটি সব কাজ ভুলে গেলেন। ছেলে-মানুষের মত ছুটে গেলেন পিসিমার কাছে। এই শুভসংবাদ প্রথম পিসিমাকেই তো দেওয়া দরকার, তারপর বাকী সবাইকে। ওঁদের পদরেণু এনে যোগমায়ার মাথায় ঢেলে দিতে হবে।

তাই করেছিলেন প্রীতিরাম, আর সেই আশীর্বাদ মাথায় দিয়ে যোগমায়া যথাদিনে এক শুভক্ষণে প্রসব করেছিলেন প্রথম সন্তান। হরচন্দ্রের নামকরণ আর অন্নপ্রাশন দিয়েছিলেন মহাউৎসবের অনুকরণে।

এর বছর দেড়েক পর আবার সেই একই মহোৎসব হয়েছিল জানবাজারে। রাজচন্দ্রের অন্নপ্রাশন।

দুই ছেলের অন্নপ্রাশনে যাঁরা অন্নগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নবজাতকদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—ওরা সুখী হবে, দীর্ঘজীবী হবে—

কেউ কেউ প্রীতিরামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, মাড় মশাই দেখালেন বটে একটা কাণ্ড! অন্নপ্রাশন তো নয়—যেন মহোৎসব!

থাক সে সব কথা।

আবার এলেন শিবরাম সান্যাল!

কথা দিয়েছিলেন আবার দেখা করবেন, সেই কথা রেখেছিলেন তিনি। হরচন্দ্র তখন প্রথম যৌবনের দূত, রাজচন্দ্র যখন প্রথম যৌবনের আলোয় ঠিক তখন বৃদ্ধ শিবরাম সান্যাল এসেছিলেন। প্রীতিরাম যথারীতি সান্যাল মশায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যাপার কি সান্যাল মশাই, খবর সব কুশল তো?

শিবরাম কুশল বিনিময় করে বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা এবার সাতোর পরগণা আর মাকিমপুর তালুকের ব্যাপারে একটা পাকা বন্দোবস্ত হোক। আপনার নামে আমি ঐ দুটি তালুক নীলামে কিনে নিয়েছিলাম, এবার আপনি

যদি হাজার উনিশ টাকা দেন তাহলে ঐ মাকিমপুর তালুক আপনাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি—

প্রীতিরাম রাজী হয়ে গেলেন।

সাতোর পরগণা নিজে রেখে মাকিমপুর সেই উনিশ হাজার টাকায় ছেড়ে দিলেন শিবরাম সান্যাল।

এক সময়ে জানা গেল মাকিমপুরের মাটি বন্ধ্যা-নারীর মত।

প্রীতিরাম অনেক চেষ্টা করেও সেই মাটিতে ফসল ফলাতে পারলেন না, তাই বলে মাকিমপুর পরগণাকে পরিত্যাগও করলেন না তিনি। এ ব্যাপারে শিবরাম সান্যালের প্রতি কোন অভিযোগ করেননি তিনি কখনই।

বিবাহের পর যদি জানা যায় কন্যা বন্ধ্যা—তাহলে যেমন কন্যার মা-বাবাকে দোষী করা অনুচিত কিংবা স্ত্রী পরিত্যাগ করা সুস্থ মানসিকতার প্রকাশ নয়, তেমনি মাকিমপুরের জমি অনুর্বর জেনেও শিবরামের প্রতি কোন অভিযোগ করেন নি, সেই জমি পরিত্যাগও করেননি প্রীতিরাম।

বরং মাঝে মাঝে তদারক করতেন। আগাছা-পরগাছা পরিষ্কার করিয়ে মাকিমপুরকে সযত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতেন তিনি।

এমনি করে কয়েকটা বছর পার হয়ে গেল।

হরচন্দ্রের বিয়ে দিলেন প্রীতিরাম। প্রভূত অর্থ খরচ করে প্রথম ছেলের জন্য একটি কন্যাকে বধূরূপে বরণ করে নিয়ে এলেন।

কোলকাতায় এই বিয়ে নিয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বিয়ে তো নয়—সেই অন্নপ্রাশনের মত মহোৎসব। হরচন্দ্রের বিয়ের পরই প্রীতিরামের ভাগ্যলক্ষ্মী যেন অলক্ষ্য থেকে তাঁর উপরে আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিলেন। প্রীতিরাম খবর পেলেন বন্যায় মাকিমপুর পরগণা ভেসে গেছে। খবরে বিষণ্ণ হয়েছিলেন প্রীতিরাম। কিন্তু হাহাকার করেন নি তিনি। যা যাবার তা যায়, তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা যদিও মানব কর্তব্য, তবুও ধরে রাখা যায় না। গেলে ব্যথা পেতে নেই, মেনে নিতে হয়—যা গেল তা ঈশ্বর নির্দিষ্ট। প্রীতিরামও তাই ধরে নিয়েছিলেন।

ঈশ্বর যাঁর সহায় তাঁর ভাবনা বোধকরি ঈশ্বরই ভাবেন।

প্রীতিরাম একদিন খবর পেলেন, বন্যার জল সরে যাবার পর মাকিমপুরের মাটিতে পলি জমে সেই মাটি উর্বর হয়েছে।

কোন বন্ধ্যা কন্যা আকস্মিক ভাবে যদি অভিশাপ মুক্ত হয়, নারীত্বের সবটুকু ঐশ্বর্য যদি ফিরে পায়—তাহলে অন্ততঃ পিতার হৃদয় যেমন আনন্দে দিশাহারা হয় তেমনি হলেন প্রীতিরাম। তাঁরই চেষ্টায় ফলে-ফুলে-পল্লবে

অল্পদিনের মধ্যেই মাকিমপুর ঝলমল করে উঠল। সেই মাটির সোনার ফসলে প্রীতিরামের ঐশ্বর্য বাড়তে থাকল ক্রমশঃ। একসময়ে এই তালুকের আয় থেকে প্রীতিরাম হলেন রীতিমত অর্থশালী। একদিকে ঐশ্বর্য বাড়তে থাকে, অন্যদিকে হরচন্দ্রকে নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না।

যোগমায়ার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাবার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেন প্রীতিরাম। মায়ের মন অনেক খবরই নিতে পারে অতি সহজে। হরচন্দ্র বাঁচবে না, তাজা যুবক হরচন্দ্র সবাইকে রেখে হাসিমুখে অকালে চলে যাবে – যোগমায়ার মন বোধকরি তা বলে দিয়েছিল অনেক আগে।

হলো তাই! মাঝে মাঝে হরচন্দ্র অসুস্থ হতেন—আর সেই অসুস্থতা শেষপর্যন্ত একান্ত অসময়ে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যোগমায়ার কোল থেকে।

প্রথম সন্তানের মৃত্যুতে প্রীতিরামের মত বিশাল পুরুষটিও ভেঙে পড়লেন। চোখের জলে বুক ভাসালেন যোগমায়া।

যিনি ব্যথা দেন আবার তিনিই সেই ব্যথা সহ্য করার মত শক্তিও দেন। যিনি উজাড় করে দেন আবার তিনিই নিঃস্ব করে নেন। যিনি পূর্ণতা আনেন তিনিই সৃষ্টি করেন মহা শূন্যতা।

যিনি ভাবনা ছড়ান আবার তিনি ভুলিয়ে রাখেন। এই সেই বিধির নিয়ন্ত্রণে সবাই চলেছে প্রতিমুহূর্তে।

কিছুদিনের মধ্যে যোগমায়ার শোকও স্তিমিত হয়ে এল।

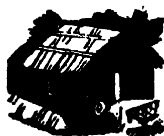
অপুত্রক হরচন্দ্র চলে যাবার পর, বালবিধবা পুত্রবধূ চোখের সামনে ঘুরে বেড়ালে কার না বুকে বাজে? যোগমায়া আব প্রীতিরামের বুকে বাজতো। তবুও এই শোকাচ্ছন্ন বাড়িতে একমাত্র রাজচন্দ্রই শোকবিহ্বল প্রীতিরাম আর যোগমায়ার সান্ত্বনা। রাজচন্দ্রই চোখের মণি। এবার প্রীতিরাম ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে তৎপর হলেন।

প্রীতিরামের ইচ্ছে হরচন্দ্রের যে দিকগুলো পূর্ণ হতে পারেনি, সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ হবার আগেই হরচন্দ্র যে অতৃপ্তি নিয়ে হারিয়ে গেলেন, রাজচন্দ্রের জীবনে যেন সেই অতৃপ্তি না থাকে।

যোগমায়া বললেন, বেশ তাই হোক, তুমি যখন ভেবেছ বাড়িতে পণ্ডিত রেখে রাজচন্দ্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবে তখন তাই কর—

প্রীতিরাম তাই করলেন। অনেক চেষ্টা করে রাজচন্দ্রের জন্য বাড়িতে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এলেন গৃহশিক্ষক। শুরু হলো রাজচন্দ্রের লেখাপড়া।

এক বুক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন প্রীতিরাম। গভীর আত্মতৃপ্তিতে ভরে গেলেন যোগমায়া।



হালিশহরের কোনাগ্রামের কুঁড়ে ঘরের ভিতরে তখন চাঁদের হাসি।

আকাশের পূর্ণিমার চাঁদটার দেহ থেকে যেন একটা টুকরো খসে পড়েছে কোনা গ্রামের হরেকৃষ্ণ দাসের আঙ্গিনায়। দাওয়ায় বসে রামায়ণ পড়তে পড়তে হরেকৃষ্ণ দেখলেন, ছোট্ট একফালি উঠানে তুলসী মঞ্চের কাছে রামপ্রিয়ার কোলের ভিতরে সেই খসে পড়া চাঁদের টুকরো।

সদ্যজাত কন্যাকে বুকের ভিতরে আঁকড়ে নিয়ে রামপ্রিয়া তুলসীতলায় প্রণাম জানাচ্ছেন। তুলসীতলার মাটি নিয়ে সদ্যজাত সন্তানের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে মঙ্গল কামনা করছেন রামপ্রিয়া।

রামায়ণের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে এনে এই অপরূপ ছবিটি দেখতে দেখতে হরেকৃষ্ণ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। এই মুহূর্তে হরেকৃষ্ণ দাস আত্ম সমাহিত।

যাঁরা রোজ রামায়ণ শুনতে আসেন হরেকৃষ্ণের কাছে তাঁরাও দেখলেন সেই ছবি। রামপ্রিয়া ধীরে ধীরে যখন নিজের ঘরে চলে গেলেন, হরেকৃষ্ণ দাসের সম্বিত ফিরল।

দু'চোখে জল। আনন্দ অশ্রু। হরেকৃষ্ণ ধুতির খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে বন্ধ করলেন রামায়ণ। মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললেন,—আজ এই পর্যন্ত! এবার তোমরা যাও—

সবাই চলে গেলেন। হরেকৃষ্ণ এলেন ঘরে।

রামপ্রিয়া চাপাস্বরে বললেন,— আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কত করুণা, তাই নয় গো? হরেকৃষ্ণ বললেন, সত্যিই করুণা! তুমি চেয়েছিলে একটি মেয়ে —মেয়ে না এসে আমাদের রামচন্দ্র আর গোবিন্দের মত আরও একটা ছেলে আসতে পারত, কিন্তু তা হয়নি—ঈশ্বর তোমার আশা মিটিয়েছেন—

রামপ্রিয়া বললেন, মেয়ের জন্ম সন-তারিখ মনে রেখেছ, না ছেলেমানুষের মত আনন্দে সব ভুলে গেছ?

হরেকৃষ্ণ বললেন,—ও কি ভোলা যায় ? বলবো ? শুনবে ?

রামপ্রিয়ার অধরে হাসির রেখা। বললেন.—বলতো শুনি—

হরেকৃষ্ণ বললেন. ১১ই আশ্বিন, ১২০০ সন—

ইংরাজীর সেটা ছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ।

রামপ্রিয়া দু'চোখ মেলে তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে। রামপ্রিয়ার সেই দৃষ্টিতে ছড়িয়ে ছিল প্রশান্তি।

একশ পঁচানব্বই বছর আগেকার কথা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ। বাংলাদেশ একটি সংকটময় অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এক অজানা জগতের দুয়ার খুলে যাচ্ছে। আর রক্ষণশীল সমাজ তাই দেখে বলে উঠছে, গেল গেল, সব গেল। আচার গেল, বিচার গেল, ধর্ম গেল। ম্লেচ্ছ এসে সব নষ্ট করে দিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মানুষের ধর্ম বলতে যা বোঝাত তা হলো কিছু প্রথা বা অন্ধ সংস্কারের আনুগত্য। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঈশ্বর প্রেম, মানব প্রেমের জোয়ার বাংলাদেশকে করেছিল প্লাবিত। তাঁর আদর্শে, তাঁর জীবনবেদে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনের সব স্তরেই তখন নব জীবনের সঞ্চার হয়।

যিনি মানব তিনিই ঈশ্বর, ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, সেই ঈশ্বর যদি সকলের 'প্রিয়-ঈশ্বর', করুণা লাভের আকাঙ্ক্ষা যদি মানবের ধর্ম—তা হলে মানব ধর্মই ঈশ্বর ধর্ম। মানবের প্রেমে ঈশ্বর তুষ্ট! মানবের কল্যাণে ঈশ্বরের কল্যাণ। মানব যদি মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, ঈশ্বর পূজার কাজই সম্পাদন করা হয়। এই আদর্শ নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানব-রূপে অবহেলিত জাতির হৃদয়ের পুষ্পটিকে ফোটাতে চাইলেন বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য, সার্বভৌম উদারতার মাধুর্য বর্ষণে।

তাই তাঁর অন্য পরিচয় "মানব-ভগবান"।

শ্রীচৈতন্যের এই ভূমিকা কিন্তু এদেশের সব মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেনি তখন! এক শ্রেণীর মানুষ, এক শ্রেণীর সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ের অত্যাচারে, অবমাননায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গ হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। এমনি করেই যুগে যুগে মানবের কল্যাণ সাধনে মানবরূপে এসেছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর এসেছেন অবতাররূপে। মহাসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত দেখেছিলেন ঈশ্বরকে আর এক ভাবে। সে হলো মাতৃভাব। এই মাতৃভাবের যে অমৃতধারা, সেই ধারায় তাঁরা মানবজাতির অন্তর সঞ্জীবিত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ

করেছিলেন। তাঁদের অবলম্বন ছিল বেদবিহিত মার্গ। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে 'সর্বত্রই মা' এই বিশ্বাসে চেয়েছিলেন মানবকল্যাণ। সেদিন ক'জনই বা রামপ্রসাদের বাণী-প্রসাদে এই ভাবে নিজেদের পবিত্র করেছিলেন? করেনি অনেকেই। বলা যায় কেউ না।

রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের সেই মাতৃভাব বিকশিত হয়েছিল ধীরে ধীরে। বিশেষ কয়েকজন এর তাৎপর্য বুঝেছিলেন। কিন্তু বাকিরা বাহ্য রূপটাকে গ্রহণ করে তন্ত্র সাধনার কদর্থ করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। আর মিশনারীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের নীতি অপেক্ষা খৃস্টান ধর্মনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ল।

তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যখন মানুষ প্রতিবাদী মন তৈরী করেছিল, যখন তান্ত্রিকতার অভিচারাদির ওপরে একটা উৎকট ধারণা তৈরী হয়েছিল, তখন সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সেই সংস্কার প্রয়াসীরাই সাধন-তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করতেন। তেমনি যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠায় আচার্যরা উপনিষদ ব্যাখ্যা করতেন এবং নিজেদের মতবাদে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন তখন সবাই যে সেই উপদেশে নিজেদের তৈরী করতেন তা নয়। সেদিনের ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার প্রয়াসীরা অবশ্য বিগ্রহের বিরুদ্ধে ছিলেন, বিগ্রহ পূজার ওপরে ছিল তাঁদের প্রচণ্ড আক্রোশ। তাঁরা বললেন ঈশ্বরের রূপ আছে কিন্তু আকার নেই। ঈশ্বর নিরাকার। রূপ হলো গুণের নামান্তর। সেই গুণকে যদি স্বীকার করা হয়, তা হলে রূপকে স্বীকার করতে হয় বৈকি! গুণের মাধুর্যে চিত্তের মাধুর্য। গুণের বিকাশে চিত্তের বিকাশ-স্ফূর্তি। এ সত্য, আর এই সত্যকে স্বীকার করলেন ব্রাহ্মণরা।

বঙ্কিমচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মোটামুটি এইভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মের গুণগুলির চিন্তা শুধু আমাদিগকে মনে মনে করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, চক্ষু বুজিয়া আমরা যদি পরব্রহ্মের গুণসমূহ মনে মনে চিন্তা করি, তবে সেই চিন্তা আমাদের চিত্তবৃত্তকে উদ্দীপ্ত করিয়া মূর্তির ভাবনাতেই পরিপূর্তি লাভ করিতে চাহিবে। চিন্তার ক্ষেত্রে আকারকে স্বীকার না করিয়া আমাদের মনে কোন রূপের অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রতিমাপূজার বিরোধী যাঁহারা তাঁহারা মনস্তাত্ত্বিক এই সত্যকে স্বীকার করেন না। মনকে বাদ দিয়া উপাসনার প্রয়োজন ইহাই

তাঁহাদের যুক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে মনোময়ী ভাবনাকেই শ্রীভগবান প্রতিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন!

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ,

তিনে ভেদ নাহি তিনে চিদানন্দরূপ।'

আচার্য শ্রীমৎ রামানুজের মনে বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি অর্চাবতার। চরিতামৃতের উক্তি অনুসারে 'ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার।' অর্চাবতারও এইরূপ অবতার। ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান শ্রীবিগ্রহে প্রকট হইয়া থাকেন। তাঁহাকে এইভাবে নিকটে না পাইলে ভক্তের প্রাণের পিপাসা মিটে না। যিনি আমার প্রিয়, তাঁহাকে আমার আয়ত্তের মধ্যে না পাইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না···শ্রীবিগ্রহ সেবায় এইভাবে ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সৌলভ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যে নিবিড় হইয়া উঠে বা ঘনিষ্ঠতা লাভ করে।

দেবীসূক্তে মা বলিয়াছেন—

'অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি'

যাহারা আমার কথা ভাবে না, আমার স্নেহ যাহারা বিস্মৃত হয় তাহারা এ জগতে দুর্বল হইয়া পড়ে।······

"যং যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি,

তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।"

আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে উন্নতপদ প্রদান করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকে ঋষি করি। তাহাকে আত্মজ্ঞানধারণোপযোগী সেবা দিই—'

এই হলেন মা। বিশ্বজননীর এই হলো অমৃতরূপ। আর সেই একক শক্তিময়ী চিন্ময়ীকে জানার জন্য মনের আকুলতার প্রয়োজন, প্রয়োজন ভালবাসার। তাই রামপ্রসাদ 'মা'কে ঘরের মধ্যে কাছটিতে বসিয়েছেন, বেড়া বেঁধেছেন, অভিমান করেছেন, আর তাঁর উত্তরসূরী রামকৃষ্ণ তাঁর মাকে নিয়ে এসেছেন আর্ত-দীনজনদের কাছে, হাত ধরে মায়ের কাছে এই মরে থাকা মানুষগুলোর আত্মিক মুক্তির আকুতি জানিয়েছেন।

মহাশক্তি সেই অনন্ত করুণার আধার, 'মায়ের' আশীর্বাদ পাথেয় করে— যিনি ভারতের তৎকালীন রাজধানী এই শহর কলকাতার উপকণ্ঠে মায়ের কোল আলো করে জন্ম নিলেন তিনি রাণী রাসমণি।

যে সময় পরধর্মের প্রতি প্রায় অধিকাংশেরই আকর্ষণ, যে সময় বিগ্রহ পূজায় প্রায় সকলেরই অবজ্ঞা প্রকট, যে সময়ে চতুর্দিকে অজ্ঞতার অন্ধকারে,

সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব অবহেলিত, ঠিক তখনই বাংলার মাটিতে এক মায়ের আবির্ভাব। যে মায়ের করুণাধারায় শত সহস্র মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল মাধুর্যমণ্ডিত। পরবর্তী সময়ে তিনিই লোকমান্যা রাণী রাসমণি। যে সময়ে এদেশের সাধারণ মানুষ ছিল ক্রীতদাসতুল্য, বহু বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যে মানুষ ছিল নিতান্তভাবেই বীর্যহীন-সাহসহীন-মনুষ্যত্বের মর্যাদাহীন—সেই সময়ে যে নারীর জন্ম তিনি রাসমণি। রাণী রাসমণি। অষ্ট সখীর এক সখী—! শ্রীমতীরাধা, ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গ! জন্মান্তরে এঁদেরই একজন রাসমণি! ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন একথা।



রাসমণির জন্ম হয়েছিল হালিশহরের কোনা গ্রামের মাটিতে। যে মাটি পবিত্র তীর্থে রূপান্তরিত। এবার সেই মাটির কথা হোক। কেমন ছিল হালিশহর, কেমন ছিল কোনাগ্রাম। তাই এখন রাসমণির কথা রেখে হালিশহরের কথা বলি।

হালিশহর পরগণা হিন্দুরাজত্বে সম্ভবত 'সুহ্মদেশ'-এর অন্তর্গত ছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁর 'পবনদূত' কাব্যে মলয়পবনকে "গঙ্গাবীচিতপ্লুত পরিসর" সুহ্মদেশে যেতে বলেন। সেখানে এক বিষ্ণু মন্দির ছিল তার উত্তর অধুনালুপ্ত এক শিবের ক্ষেত্র। তারমধ্যে গঙ্গাতীরে রামমন্দির, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। বল্লাল সেন নির্মিত সেতু এবং পবিত্র যমুনা সঙ্গম অতিক্রম করে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী 'বিজয়পুরে' আসতে হয়।

এই বিজয়পুর কোথায় তা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তর্ক চলছে। আজও হালিশহরের সংলগ্ন 'বীজপুর' নাম তার সাক্ষী দিচ্ছে। লক্ষণীয় হচ্ছে 'পবনদূত' কাব্যে গঙ্গা থেকে নির্গত যমুনা নদীর বর্ণনা আছে, কিন্তু সরস্বতী নদীর কোন উল্লেখ নেই। তারপরই আছে রাজধানী বিজয়পুরের নাম। শ্রীচৈতন্যের সময়েও বিজয়পুর নাম প্রচলিত ছিল মনে হয়, কারণ তাঁর সমকালীন 'মুখ' বংশীয় একটি বিখ্যাত বিদ্বৎ গোষ্ঠীতে ভগবান ন্যায়াচার্য, গোপাল সার্বভৌম প্রভৃতি সাত ভাই ছিলেন এবং সার্বভৌমের

নিবাসসূচক 'বিজয়পুরিয়া' পদ কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। 'হালিশহর' নাম মনে হয় মুসলমান যুগের। হাবেলীশহর কথার অপভ্রংশ হালিশহর।

'হাবেলী' কথার অর্থ অট্টালিকা বা প্রাসাদ। অট্টালিকাবহুল নগরী ছিল বলে হালিশহর নাম। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সাতগাঁ সরকারের অধীনে হাবেলীশহর গড়ে উঠেছে। হালিশহর একসময়ে কুম্ভকারদের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজও হালিশহরের হাঁড়িকলসীর একটা নাম স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এই কুম্ভকারদের একটা বিরাট হাট বসত হালিশহরে। এই হাবেলীশহরের স্থানীয় নাম হতে পারে কুমারহট্ট। কুমারদের হাট বসত—তাই কুমারহাট থেকে কুমারহট্ট নাম।

কেউ কেউ বলেন, রাজকুমার এখানে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে আসতেন, তার জন্য হাট বসত তাই কুমারহট্ট।

মাধবেন্দ্র পুরীর যে দ্বাদশ শিষ্যের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী প্রভৃতি অন্যতম। এঁরাই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষাগুরু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গয়াতে ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। কাটোয়াতে কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরপুরী ছিলেন বাঙালী। কুমারহট্ট হালিশহরের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরপুরীর জন্ম। পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য। ঈশ্বরপুরী হালিশহর থেকে নবদ্বীপে প্রায়ই আসতেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর ধর্মমতে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। অনেক সাধ্য সাধনা করে ঈশ্বরপুরী শেষে শ্রীচৈতন্যকে দীক্ষা দিতে পেরেছিলেন। দশাক্ষরের কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যকে।

হালিশহরে ঈশ্বরপুরীর বাস্তুভিটা এখন 'চৈতন্য ডোবা' নামে কথিত আছে। সেই 'চৈতন্য ডোবা'র সামনে একটি সুন্দর মঠ। মঠে প্রতিষ্ঠিত আছে গৌর-নিতাই মূর্তি।

ঈশ্বরপুরীর বাসস্থানের কাছে শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতও বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। শ্রীবাস থাকতেন নবদ্বীপে—মাঝে মাঝে এই বাসস্থানেও আসতেন, সৎসংগ করতেন এখানে। পদাবলী রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ, কীর্তনিয়া মাধব আর গোবিন্দানন্দও থাকতেন এই হালিশহরে।

সেই চৈতন্যযুগ থেকে এই হালিশহরে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার লাভ। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে নানা স্মৃতিচিহ্ন। ঈশ্বরপুরীর স্মৃতিমন্দির, চৈতন্য ডোবা, শ্রীবাসের বাসস্থান ছাড়াও চৌধুরী পাড়ার বিখ্যাত শ্যাম

রায় আছেন। শিকদার পাড়ায় এখন যাকে বলা হয় ঠাকুরপাড়া, সেখানে আছেন রাধাগোবিন্দ। বারেন্দ্র গলিতে মল্লিক বাড়িতে মদনমোহন আছেন। যাঁরা ছিলেন শাক্ত তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাধক রামপ্রসাদ জন্মেছিলেন হালিশহরে। শুধু সাধনায় নয়, মাতৃ আরাধনায় মগ্ন, কাব্যে-সঙ্গীতে একটা বিচিত্র ধারার প্রবর্তনা তিনি করেছিলেন এই বাংলাদেশে।

আজও এই হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতিবিজড়িত ভিটে মহাতীর্থরূপে দর্শনার্থীদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র হয়ে আছে। আর এই হালিশহরের অতি কাছে কোনা গাঁয়ে জন্মেছিলেন রাসমণি। জন্মেছিলেন পরম বৈষ্ণব এক কৈবর্ত পরিবারে। নিতান্ত দীন হরেকৃষ্ণ দাসের কুঁড়ে ঘরে। এমনি আর এক কুঁড়ে ঘরে এসেছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

এইরকমই বোধকরি হয়ে থাকে। একটা ধারা আছে, যে ধারায় অবতাররূপে ভগবানের আবির্ভাব। ভগবান যখন আসেন তখন যুগোচিত-সময়োচিত প্রয়োজন সাধনের উপযোগী পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মর্তের মাটিতে ভগবানের লীলা পূর্ণ করার জন্যে অখিলেশ্বরী যোগমায়া দেবী, যিনি অবতারের একান্তশক্তি, সেই মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। এই যোগমায়ার কৃপা করুণা ও শক্তিতে শ্রীভগবানের নিত্যলীলা মর্তের মাটিতে হয় পরিব্যাপ্ত, আর সেই লীলামাধুর্য, লীলাময় খেলা—ভক্ত আচার্যদের একান্ত আপন ঐশ্বর্যস্বরূপে, মন্ত্রবীর্যে উপদিষ্ট হয়ে বিশ্বমানবকে করে ত্রাণ।

আগে জাগেন মা। এ সেই মা, যিনি পৌর্ণমাসী, যিনি যোগমায়া। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, এই ধরাধাম হলো দেবীধাম। দেবীর শরণাগতি ছাড়া এখানে ভগবানের ব্যক্তভাব উপলব্ধি করা যায় না। শাক্তরাও সেই একই কথা বলেছেন—শক্তি এখানে সব। শক্তি এখানে সর্বময়ী কর্ত্রী। শিবের গর্ব যেমন শর্বাণীকে পেয়ে। এদিক থেকে ভাবলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর রাণী রাসমণির আবির্ভাবের মূলেও সেই যোগমায়া সর্বশক্তিরূপিণী মায়ের শক্তিই বীজরূপে কাজ করেছে।

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব বিধি নির্দিষ্ট। তিনি আসবেন—আসবেন বিশেষ কাজ করার জন্য, এ যেমন বিধি নির্দিষ্ট, তেমনি রাণী রাসমণির জন্মও বিধি নির্দিষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুগাবতার রূপে স্পষ্ট হবার আগেই রাণী রাসমণির বিধি নির্দিষ্ট কর্ম সাধনার ফলস্বরূপ দক্ষিণেশ্বর এক পবিত্র তীর্থে পরিণত

হয়েছিল। মঙ্গলময়ী করুণাময়ী মা ভবতারিণীর অভিনব লীলা, রাণী রাসমণির সাধনার ভিতর দিয়েই পূর্ণচন্দ্রের মত প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর সেই মহান আদর্শ আর দৃঢ় সংকল্পের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে।



প্রস্ফুটিত কুঁড়ির দিকে যদি এক মন নিয়ে তাকিয়ে থাকা যায় দেখা যায় কেমন করে একটু একটু করে পাপড়ি খুলে খুলে ফুল ফোটে, পূর্ণ বিকাশ হয় পুষ্পের। তেমনি করে পূর্ণিমার কদিন আগে থেকে চাঁদের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় কেমন করে একটু একটু করে পূর্ণচন্দ্র হয়। রামপ্রিয়া বুকের ভিতরে সেই এক রত্তি মেয়েটাকে জড়িয়ে নিয়ে আনন্দে খুশিতে ভরে থাকতেন যখন তখন তিনি যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করতেন—সেই আকাশ থেকে খসে পড়া চাঁদের টুকরো কেমন করে পূর্ণচন্দ্র হয়ে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে . . একদিন কথাটা স্বামীকে বলেই ফেললেন রামপ্রিয়া, মেয়ে আমাদের বড় হচ্ছে, এবার একটা ভাল নাম রাখ ওর।

হরেকৃষ্ণ বললেন, আমি বলি কি, তুমি মা—তাই মেয়ের নামটা তুমিই রাখ বরং—

আকাশে ঘন কালো মেঘ, সেই মেঘের ছায়া নদীতে আর সেই নদীতে ভরা জোয়ার। টল টল করা জলের মত রামপ্রিয়ার দুচোখে হঠাৎ জল টল টল করে উঠল। হরেকৃষ্ণ বললেন, জানি তোমার চোখে জল এল কেন!

রামপ্রিয়া সেই কথার পৃষ্ঠে আর কথা বললেন না। হরেকৃষ্ণ বলতে থাকলেন,—যে সংসারে দুবেলা ভালভাবে অন্ন জোটে না, ছেঁড়া বস্ত্রের মত একদিকে তালি মারলে আর একদিকে ছিঁড়ে যায় তেমনি হাল যে সংসারে—সেখানে মা ষষ্ঠীর কৃপা, ভাবছ কেমন করে এই মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবে? —কেমন করে বেঁচে থাকবে ও এখানে, ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছ না বলে দু'চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছ—

রামপ্রিয়া আঁচলে চোখ মুছলেন। হাসলেন। কান্নার মধ্যে হাসি, যেন মেঘের মধ্যে রোদ। রামপ্রিয়ার মুখের ওপরে আলোছায়ার খেলা। রামপ্রিয়া বললেন, ওগো, না গো না, আজ আমার কোন দুঃখ নেই, কোন ভাবনা নেই—বরং মা ষষ্ঠীর কৃপা পেয়ে আজ আমাদের ঘর আলো হয়েছে। যিনি ওকে দিয়েছেন তিনিই ওর ভাবনা ভেবে রেখেছেন—

হরেকৃষ্ণ যেন হালকা হলেন। তাঁর আত্মা যেন পরম তৃপ্তি লাভ করল। বললেন, তা হলে তোমার চোখে জল দেখলাম কেন বৌ ?

রামপ্রিয়া বললেন, কেন যেন আমার চোখে জল এলো তা আমিও তোমাকে বলতে পারব না, তবে—রামপ্রিয়া কথা শেষ না করে থামলেন। কি যেন ভাবছেন তিনি। কি যেন মনে মনে বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন। হরেকৃষ্ণের চিত্ত বিহ্বল হল। ভিতরে ভিতরে তিনি বড়ই অস্থির হয়ে পড়লেন. বললেন,—কথা শেষ না করে থামলে কেন বৌ—কি ভাবছ বল দিকিনি—

রামপ্রিয়া মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। দেহ ছিল কুঁড়ের ভিতরে, মনটা চলে গিয়েছিল অন্য কোথাও। স্বামীর কথায় সম্বিত ফিরল তাঁর। বললেন,—হ্যাঁগো. শুনেছি ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয় ?

হরেকৃষ্ণ বললেন, হয় বৈকি !

পরক্ষণেই হরেকৃষ্ণ ভাবলেন, মিথ্যে স্তোকবাক্যে কাউকে ভোলানো উচিত নয়। যেখানে মিথ্যার বেসাতি করার কোন প্রয়োজন নেই সেখানে মিথ্যা বলার মত মহাপাপ আর নেই। রামপ্রিয়া সাধারণ একটি মেয়ে। রামপ্রিয়া সাধারণ একজন মা। রামপ্রিয়া অবলা, বড় সাধাসিধে, সেই রামপ্রিয়া জানতে চেয়েছেন ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় কিনা। অনেকের মতে, ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় যদি সঠিক লগ্নে সঠিক মুহূর্তে ঠিক গণে স্বপ্ন দেখা যায়। সব ভোরের স্বপ্ন সত্য হতে নাও পারে এটা নাকি পণ্ডিত জনের উক্তি।

আবার অনেকের মত, স্বপ্ন হলো মনের-ভাবনার প্রতিচ্ছবি !—

হরেকৃষ্ণ বললেন—ঠিক কখন তুমি স্বপ্ন দেখেছ তা যদি বলতে পার আমি হালিশহরে গিয়ে পণ্ডিতজনের কাছ থেকে জেনে এসে বলতে পারি তোমার স্বপ্ন সত্যি হবে কি না—স্বপ্ন তুমি কি দেখেছ রামপ্রিয়া তাই বলো—

রামপ্রিয়া নিজের মনের আঙিনায় গত রাতের দেখা স্বপ্নের স্মৃতি বারকতক খুঁজে খুঁজে ফিরে আপন মনেই উচ্চারণ করলেন,—বৃন্দাবন—

বৃন্দাবনধাম—

এই অমৃতনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রিয়া যেন এক নতুন ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। হরেকৃষ্ণর মন ব্যাকুল হল। বললেন—বৌ, বৃন্দাবনের কথা কি বলতে চাইছ বলো— তুমি কি বৃন্দাবনের স্বপ্ন দেখেছ? কি সে স্বপ্ন !

রামপ্রিয়া বললেন.—বৃন্দাবনের সেই নিধুবনের স্বপ্ন দেখেছি আমি—

এই নিধুবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীবঙ্কুবিহারী। প্রেমের ঠাকুর মুরলীধারী ব্রজসুন্দর কৃষ্ণকেশব এই নিধুবনে রচনা করেছিলেন সুন্দর প্রেমবাসর।

বংশীধ্বনিতে বৃন্দাবনের পথ-প্রান্তর আকাশ-বাতাস এক অনির্বচনীয় সৌরভে আমোদিত করেছিলেন।

সেই মুরলীর ধ্বনি শুনে ঘর ছেড়ে, সব ছেড়ে নিধুবনে এসেছিল ব্রজের গোপীরা। আসলে সেই মুরলীর ধ্বনিতে ছিল আহ্বান। পূর্ণচন্দ্রের আলোকে দিগন্ত সেদিন উদ্ভাসিত হলেও সে আলোক যাঁর সেই আলোকদুলাল শ্রীমধুসূদন স্বয়ং আহ্বান জানিয়েছেন যাদের সেই ব্রজপুরনারীরা এসেছে নিধুবনে।

এসেছে প্রেম অভিলাষী প্রকৃতি সুন্দর !

মুরলীধারী নিজেকে নিতান্ত ভালমানুষ সাজিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রজের সব কুশল তো? বল তোমাদের জন্য আমি কি করতে পারি? এই যে জিজ্ঞাসা আর সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে গোপীদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা পদ্মপলাশলোচনে, এ যেন "প্রেমসিন্ধু গাহনি" অর্থাৎ গোপীদের প্রেমসিন্ধু কতটা গভীর তাই দেখে নেবার জন্যে যেন সেই সিন্ধুতে তাঁর অবগাহন। গোপীদের ভ্রূ যুগল হলো বক্রাকৃত। চাহনি হলো কুটিল।

অবাক ভঙ্গিমায় কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলাম আর তোমরা চাহনি করলে কুটিল এ আবার কেমন? তা যাই হোক, এই ঘোর রজনীতে তোমরা তরুণীরা পতির শয্যা ছেড়ে যখন এসেছ তখন ব্যাপার স্যাপার তো সহজ মনে হচ্ছে না। এমন কি হলো যে বেশবাস বেসামাল অবস্থায় তোমরা এসেছ! ঘরে কি তোমাদের ঝগড়াঝাটি হয়েছে না তীরন্দাজেরা তোমাদের ঘর ঘিরে ফেলেছে? অবশ্য এও হতে পারে, তোমরা এই শরৎচন্দ্রে উজ্জ্বল. রাতের অপরূপ রূপটি দেখতে এসেছ! এত কথা—

এত প্রশ্ন করছি অথচ তোমাদের কারো মুখে রা নেই। আবার দেখি রাইও নেই। 'রাখত কাহে মনহি গোই'—মনের মধ্যে সব গোপন করে রাখছ কেন?

'ইহহি আন নহই কোই'—বলই না গো, এখানে তো অন্য লোক কেউ নেই. সবই আমরা আপন লোক, বলেই ফেল—

'দূতিমুখ শুনইতে ঐছন ভাষ।
ঝর ঝর লোচন ঘন ঘন শ্বাস॥
পরিহরি মাথুর করল পয়ান।
লোরহি পঙ্ক বিপথ নাহি জান॥
দূতি অনুসারে চলল অনুসারি।
ছুটল কুঞ্জর গতি অনিবারি॥
কর ধরি দূতি মিলাওল কুঞ্জে।
চিরদিনে পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
হেরি সখি জয় জয় মঙ্গল দেল।
শিবানন্দ সহচরি জীবন ভেল॥'

এরপর বৃন্দাবনের নিধুবনে শাশ্বত প্রেমের অপরূপ রূপ গাথা। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলায় নিধুবনের মাটি পবিত্র। তবু দীনবন্ধু, পতিতপাবন প্রেমের রাখালের দুচোখে রাশি রাশি বেদনা ঝরেছিল। শ্রীরাধিকার অদর্শনে উদ্বেলিত হয়েছিল মুরলীধারীর হৃদয়। দূতীর মুখে শ্রীরাধিকার বর্ণনা শুনে কৃষ্ণের দুচোখে কান্নার ঢল নেমেছিল। আবার সেই দূতী হাতে ধরে শ্রীরাধিকার সঙ্গে মুরলীধারীর মিলন করিয়েছিলেন। সেদিন আকাশে ঝলমল করে উঠেছিল পূর্ণশশী। পাখীরা গেয়েছিল গান। নেচেছিল ময়ূর-ময়ূরী। সখীরা মঙ্গলসূচক জয়ধ্বনি করেছিলেন, উলুধ্বনিতে নিধুবন হয়েছিল আনন্দ নিকেতন।

সেই নিধুবনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অপরূপ ছবি দেখেছিলেন রামপ্রিয়া স্বপ্নে। কদম গাছে বাঁধা ঝুলনায় রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি দুচোখ ভরে দেখেছিলেন রামপ্রিয়া।

দেখেছিলেন সেই যুগল মূর্তির সামনে গোপীরা অপরূপ ছন্দে নাচছেন হেলে-দুলে। হঠাৎ একটি মেয়ে তেমনি নাচতে নাচতে এসে যেন রামপ্রিয়ার কোলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙে গেল রামপ্রিয়ার। সে যেন হস্তচ্যুত একটি ফুল! যেন শ্রীরাধার দেবী অঙ্গ থেকে ভেসে আসা জ্যোতি। মাতৃ বক্ষে তৃপ্তি খোঁজার তাগিদ তার!

স্ত্রীর মুখে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে হরেকৃষ্ণ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। ভাবাবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন পথে। এ স্বপ্নবৃত্তান্তের অর্থ জানার জন্য অস্থির হয়ে দ্রুতপায়ে চলতে থাকলেন তিনি। যেতে হবে হালিশহর। পণ্ডিত জনের মতামত জানতে হবে তাঁকে। হালিশহরে যদি এই মুহূর্তে কোন পণ্ডিত জনের দেখা না পাওয়া যায়—যেতে হবে কাঞ্চন পল্লী (এখন কাঁচড়াপাড়া) !

এখানে শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল শিবানন্দ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছেলে কবি পণ্ডিত কর্ণপুর গোস্বামীরও জন্ম এই মাটিতে। সুতরাং হালিশহর থেকে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত সব জায়গায় পণ্ডিত জনের অভাব ছিল না। আবার সেই পণ্ডিত জনের মধ্যে স্বয়ং হরেকৃষ্ণ দাসের পরিচিতি ছিল। পরিচিতি ছিল আপন স্বভাবটির জন্য যেমন ছিলেন তিনি ধার্মিক তেমনি ছিলেন উদার-নিষ্ঠাবান। সংসারে অনটন তবুও হরেকৃষ্ণ দাসের বাড়ি থেকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কেউ কখনও ফিরে আসেনি, অভুক্ত অবস্থায় কোন অতিথি চলে আসেন নি। রামপ্রিয়া যেন স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা।

হালিশহর থেকে ফিরে এসে হরেকৃষ্ণ যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠলেন। আনন্দ তাঁর আর ধরে না। ভাবখানা পাগল পাগল। এ পাগলামী মাতৃভাবে। বাড়ির ভিতরে পা দিয়ে হরেকৃষ্ণ বারকতক শ্রীচৈতন্যের মত দুবাহু তুলে ধিন ধিন করে নাচলেন। বিধবা ক্ষেমংকরীর যেমন রামপ্রিয়ারও তেমনি দুচোখে বিস্ময় ! এ কী হলো হরেকৃষ্ণর। ক্ষেমংকরী বললেন, কি হয়েছে তোমার—সকালে সূয্যি ওঠার আগে ঘর ছেড়ে বেরুলে, বলে গেলে হালিশহরে যাচ্ছ—

হরেকৃষ্ণ এবার দাওয়ায় বসলেন। বোনকে বললেন, তোর বৌঠানকে ডেকে আন—

ক্ষেমংকরীকে আর ডেকে আনতে হলো না, রামপ্রিয়া কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ছেলেমানুষের মত দুহাত তুলে খুব তো ধিন্ ধিন্ করে নাচলে, এবার আসল খবরটা বলো—দেখা হলো পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে !

হরেকৃষ্ণ বললেন, দেখা হলো মানে ? একেবারে বিধান নিয়ে এলাম—, তুমি ধন্য বৌ—ঈশ্বর কৃপা লাভে তুমি আজ ধন্য। ঠিক যে সময়ে স্বপ্ন দেখেছ সেটা হলো যথার্থ সময়। স্বপ্ন তোমার মিথ্যে নয় গো ! যে

মেয়েটি তোমার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—সেই মেয়েই এই মেয়ে ! স্বামীর কথাগুলো যত রামপ্রিয়ার কানে যেতে থাকে, ততই রামপ্রিয়ার মুখখানা আকাশে প্রভাত-সূর্য ওঠার মত আনন্দে যেন ঝলমল করে ওঠে।

হরেকৃষ্ণ বলেন—আচ্ছা বৌ, আমাদের মেয়ের এখন বয়স কত হলো ?

ক্ষেমংকরী বলল, তা দেখতে দেখতে আমাদের রাণীর বয়েস কম হলো না. পাকা দেড় বছর—

হরেকৃষ্ণ বললেন, দেড় বছর—বাঃ তা এবার ওর একটা ভাল নাম রাখো বৌ—তোমার যেমনটি পছন্দ তেমনটি—

রামপ্রিয়া বললেন, আসছে রাসপূর্ণিমা ঐদিন আমাদের রাণীর নাম দিলে ভাল হয়—না গো ?

হরেকৃষ্ণ রাসপূর্ণিমার কথা শুনে অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের পানে শুধু চেয়ে রইলেন। ভাবলেন. একবার যখন বলেছিলুম মেয়ের নাম রাখ, বৌ বৃন্দাবনের স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিল. আবার যখন বললুম নাম রাখতে, বৌ শোনাল রাসপূর্ণিমা—আসল কাজটা তুলে রাখার চেষ্টা ;

হরেকৃষ্ণর কৌতূহল বাড়ল, বললেন—বেশ ভাল কথা। তোমার মন যা যায় তাই করো। ঐদিন বরং তুলসীমঞ্চের গোড়ায় আমি বসব রামায়ণ পাঠে—তুমি রাণীকে নিয়ে আমার পাশে বসবে, সবাইকে আসতে বলবো পাঠ শুনতে। পাঠ শেষ হলে তুমি তোমার মেয়ের নাম রেখ, তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে. রাসপূর্ণিমার দিনটি তুমি বেছে নিলে কেন বৌ ?—

রামপ্রিয়া এবার স্বামীর মনের কথাটি বুঝলেন। বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, বৃন্দাবনের নিধুবনে কৃষ্ণের রাসলীলা, তাই রাসপূর্ণিমার দিনে আমাদের রাণীর নাম রাখার কথা মনে এল। আর নামটাও আমি ভেবে রেখেছি—

নাম জানার জন্যে হরেকৃষ্ণ যেন আকুল হলেন। দেরী যেন তাঁর সয় না। বললেন, বলো বৌ বলো—কি নাম রাখবে তোমার মেয়ের—?

রামপ্রিয়া বললেন— রাসমণি—

রামপ্রিয়ার মুখের কথাটি ঝরতে না ঝরতে দেওয়ালের গায়ে বসে থাকা টিকটিকিটা ডেকে উঠল। ক্ষেমংকরী তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের গায়ে দু'আঙুলে তিনবার টোকা দিয়ে বলল—সত্যি সত্যি সত্যি—

রাসপূর্ণিমার দিন হরেকৃষ্ণ দিনের আলো ফোটার আগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। ক্ষেমংকরী আর রামপ্রিয়া আকাশে এক তারা থাকতেই

রোজ বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসেন। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ব্যতিক্রম যা হবার হরেকৃষ্ণের বেলায় হয়েছে। হরেকৃষ্ণ ঠিক এই সময়ে ওঠেন না। জবা রঙের বিরাট একটা থালার মত অন্ধকারের বুক চিরে সূর্য যখন আকাশের গায়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন হরেকৃষ্ণের ঘুম ভাঙে। তার আগে ওঠেন রামপ্রিয়া আর ক্ষেমংকরী। আজ তার ব্যতিক্রম হয়েছে। হরেকৃষ্ণ বিছানা ছেড়ে উঠে—গামছাটা কাঁধে ফেলে ক্ষেমংকরীকে বললেন, আমি গঙ্গা স্নানটা সেরে আসি—

তারপর হন হন করে পা চালিয়ে দিলেন। কিছুটা হাঁটলে ঘাট। কোনাগাঁয়ের সবাই এ ঘাটেই আসে গঙ্গা স্নানে।

হরেকৃষ্ণ যখন ঘাটে পেঁছিলেন. আকাশে তখন সেই বড় লাল টুকটুকে সূর্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্নানের সঙ্গে সূর্যস্তব সেরে এক ঘড়া জল নিয়ে হরেকৃষ্ণ আবার ফিরে এলেন বাড়িতে।

আসবার পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই তিনি ডেকেছেন কাছে। বলেছেন, আজ রাসপূর্ণিমা. আমার মেয়ের নাম রাখা হবে আজ—তোমরা পাঠ শুনতে এস, হরির লুঠ দেব—। বাড়ি ফিরে জলের ঘড়া দাওয়ায় রাখতে না রাখতে রামপ্রিয়া কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্বামীর কাঁধের ওপরকার ভিজে গামছাটা দাওয়ার দুটো বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে মেলে দিতে দিতে বললেন আজ ক্ষেতিতে যাবে না বুঝি ?

হরেকৃষ্ণ মনে মনে হয়ত ভেবেছিলেন আজ আর ক্ষেতে যাবেন না, কিন্তু রামপ্রিয়া প্রশ্ন করাতে একটু থতমত খেয়ে আসল কথাটি বলে ফেললেন, যাব বৈ কি বৌ—আজ ক্ষেতে না গেলে কি চলবে ?—

হরেকৃষ্ণ দাসের ছিল কিছু জমি। সেই জমি ছিল তাঁর জীবন। নিজে হাতে জমি চাষ করতেন। ধান বুনতেন। ধান তুলতেন। ধানের মড়াই দিতেন। যা আয় হতো এই জমি থেকে তাতেই হরেকৃষ্ণ দাসের সংসারটা চলতো। না চলার মতই চলতো! মেয়ে হবার পর হরেকৃষ্ণর মাঝে মাঝে ক্ষেতে যাওয়া হতো না। আজ, শরীরটা ভাল নেই—কাল, লাঙ্গলের হালটা ভাল নেই, এইসব অজুহাতে ক্ষেতে না গিয়ে শুধু সারাদিন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন।

হরেকৃষ্ণ মেয়েকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। ক্ষেতে গেলে সেখানেও মেয়ের কথা। আর পাঁচটা জমির চাষীদের ডেকে শুধু মেয়ের কথা বলতেন তিনি।

এসব কথা রামপ্রিয়াও জানতেন। হরেকৃষ্ণ নিজেই সব কথা বলতেন

স্ত্রীকে। কোন কথাই গোপন রাখতেন না। আজও তেমনি কোন কথাই গোপন করতে পারলেন না। বললেন, জানো বৌ, সত্যি কথা বলতে কি আজ আর ক্ষেতিতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না— তবুও যাই একবার—

হরেকৃষ্ণ লাঙ্গল কাঁধে তুলে নিয়ে জমির দিকে পা বাড়ালেন। রামপ্রিয়া দু'চোখ ভরে দেখলেন স্বামীকে। কত সহজ। কত সরল। কত পবিত্র মানুষ!

ক্ষেতে গিয়ে আজ এক বিপত্তি ঘটে গেল।

হরেকৃষ্ণ সবাইকে ডেকে ডেকে যখন বললেন, আজ আমার কুঁড়েতে একবার এস তোমরা ভাবছি হরির লুঠ দেব, সেই সঙ্গে পাঠও হবে—

কথাটা সবাই শুনেছিল, খুশিও হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কে একজন বলল, দেখ হরেকৃষ্ণ, তোমার মেয়ে হবার পর থেকে দেখছি তুমি বাপু সব কিছুতে বাড়াবাড়ি করছ, মেয়ে হয়েছে তাতে আদিখ্যেতার কি আছে! যদিও তোমার দুটো ছেলে আছে তবুও আর একটা ছেলে হলে মানুষ আদিখ্যেতা করলেও করতে পারে, মেয়ে হয়েছে এত বাড়াবাড়ির কি আছে।

কথাটা হরেকৃষ্ণকে আঘাত করেছিল। আচমকা কেউ যদি ধারালো কিছু দিয়ে খোঁচা দেয় দেহে, তাহলে যাকে খোঁচা দেওয়া হলো তার যে যন্ত্রণা হয়—হরেকৃষ্ণ তেমনি যন্ত্রণা উপলব্ধি করলেন। বিশেষ তর্কের ভিতরে না গিয়ে হরেকৃষ্ণ বললেন,—এই আমার একমাত্র মেয়ে—তাছাড়া মেয়ে হলে যতটুকু যা করেছি তার মধ্যে আমার আদিখ্যেতা কোথায় দেখলে তোমরা? কন্যে সন্তান যে কি জিনিস তোমরা জান না বলে কন্যে জন্মালে ভাব বোঝা বাড়লো—

কথা বলেই হরেকৃষ্ণ সর্বকালে হিন্দুপরিবারে কন্যার স্থান কতটা মর্যাদাপূর্ণ তার ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, মহাভারত পড়েছ কখনো তোমরা? যদি পড়ে থাক তা হলে নিশ্চয়ই এইভাবে আমাকে আঘাত করতে না মহাভারতের 'অনুশাসন পর্বে' মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশ্নের জবাবে দেবর্ষি নারদ যে উক্তি করেছিলেন তা কি তোমরা জান?

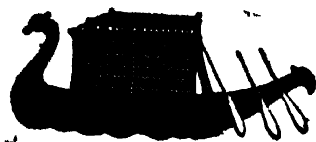
যারা হরেকৃষ্ণকে আঘাত করেছিল, যারা কন্যাসন্তান মানেই ভার মনে করে, তাদের বললেন,—দেবর্ষি নারদ বলেছিলেন, 'কন্যাগণের মধ্যে লক্ষ্মী নিত্য নিবাস করেন, এজন্য কন্যা সর্বপ্রকার শুভকর্মের যোগ্যা ও মঙ্গল কার্যে পূজ্যা হইয়া থাকেন। সদাচারের দ্বারা পিতৃকুলের পরীক্ষা বিষয়ে কন্যাকে কষ্টি পাথর বলা যায়—

হরেকৃষ্ণর কথা চুপ করে শুনল সবাই। প্রতিবাদীর দল যেন চুপসে

গেল। ক্ষেতে আর মন বসল না হরেকৃষ্ণর, ঘরে ফিরে এলেন তিনি।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠল আকাশে। কোনাগাঁ যেন রাশি রাশি জ্যোৎস্নায় স্নান করছে তখন। তুলসীতলায় গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রদীপের আরতি করে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সেই প্রদীপ রাখলেন পিলসুজের ওপর রামপ্রিয়া। ক্ষেমংকরী বেতের একটা ছোট ধামায় বাতাসা রাখল পাশে। হরেকৃষ্ণ গঙ্গাজল ছিটিয়ে রামায়ণ নিয়ে বসলেন পাঠে। পাশে রাণীকে কোলে নিয়ে বসলেন রামপ্রিয়া। দেখতে দেখতে গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ছেলে ছোকরায় হরেকৃষ্ণ দাসের কুঁড়ের সামনে একফালি উঠোন গেল ভরে। পাঠ শেষ হল এক সময় বাতাসা ছড়িয়ে লুঠ দিলেন। রামপ্রিয়া বললেন সবাইকে, আজ এই রাসপূর্ণিমার দিনে মেয়ের নাম রাখলাম রাসমণি— আপনারা আমার মেয়েকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলে আমাদের জীবন সার্থক হবে, মেয়ের মঙ্গল হবে।

সবাই রাসমণির মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গেলেন।



শেষ হয়ে গেল পলাশীর যুদ্ধ।

যে পলাশীর প্রান্তর পলাশফুলে রাঙা হয়ে থাকত, সেই পলাশীর প্রান্তর রঞ্জিত হয়ে গেল শত শত সৈনিকের বুকের রক্তে। আর এই যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হয়ে গেল বাংলাদেশের সর্বময় কর্তা। নবাবের অস্তিত্ব হলো ম্লান। নবাবকে সামনে রেখে বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎপর হয়ে উঠল স্বার্থসিদ্ধিতে।

নিজেদের ব্যবসা প্রসারের জন্য এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস প্রয়োজন, নিজেদের প্রভু করে তুলবার জন্য, এ দেশের মানুষদের দাসে পরিণত করার প্রয়োজন বিবেচনা করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত কৌশলে আর চাতুরিতে মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তি করল যে, কোম্পানীর কাজে নবাব যেন কোনরকম হস্তক্ষেপ না করেন।

চুক্তি হলো। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা শুরু করে দিল যথেচ্ছাচার।

যারা 'তন্তুবায়', কোম্পানী তাদের জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করল।

তাদের ওপর নির্দেশজারী করা হলো, একমাত্র কোম্পানী ছাড়া তারা যেন আর কারও কাছে কাপড় বিক্রি না করে। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলো, যে সময়ের মধ্যে এই তন্তুবায়েরা তৈরী করে দেবে বেশী সংখ্যক বস্ত্র। আর সেই বস্ত্র বাজারের যে দর তা অপেক্ষা পনের থেকে পঞ্চাশভাগ কম দামে নেবে কোম্পানী। অন্যথায় অত্যাচার। এই অত্যাচারের ভয়ে নিতান্ত দীন-দরিদ্র মানুষেরা কোম্পানীর সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত।

শুধু কোম্পানীর এই অত্যাচারই যথেষ্ট ছিল না, সেই সঙ্গে ছিল অত্যাচারী ইংরেজ বেনিয়াদের গোমস্তাদের দৌরাত্ম্য। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘরের যুবতী মেয়েদের পাইক দিয়ে বার করে নিয়ে গিয়ে উপহার দিত কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন সাহেব, কর্মচারীদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে। যদি কখনো সাধারণ মানুষেরা গোমস্তাদের এই নির্লজ্জ ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাত, গোমস্তারা তাদের নামে নালিশ করত কুঠি সাহেবদের কাছে। যা বিন্দুমাত্র সত্য নয়, তাই নালিশ করত তারা। ফরাসী বা পর্তুগীজদের কাছে বস্ত্র বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষেধ, সেই নিষেধ ভঙ্গ করে তন্তুবায়েরা তাদের কাছেই লুকিয়ে বস্ত্র বিক্রি করেছে এমন সাজানো অভিযোগ কুঠিসাহেবদের কাছে পেশ করত নীচ গোমস্তার দল। ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই না করে সাহেবরা পাঠিয়ে দিত সেপাই। তারা নির্বিচারে অত্যাচার চালাত তন্তুবায়দের ওপর। ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিত তারা। মেয়েদের ওপর নির্যাতন করত। এমনি করেই একদিন পুড়ে গেল বাঙালীর সেই শিল্পকর্ম। এই অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার কৌশল হিসেবে তন্তুবায়েরা ধারালো ছুরি দিয়ে নিজেদের আঙুল নিজেরাই কেটে ফেলত।

কাশেম আলীর সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য সামগ্রীর উপর ধার্য মাশুল দিতে অস্বীকৃত হলো, সেই সঙ্গে তারা এ কথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল যে, বাঙালীদের কাছ থেকে এই মাশুল অবশ্যই নিতে হবে। কোম্পানীর এই আব্দারকে যেহেতু কাশেম আলীর পছন্দ হলো না, সেই হেতু সিংহাসন থেকে নেমে যেতে হলো তাঁকে। অত্যাচার বাড়তে থাকল তাদের। সৃষ্টি হলো বণিকসভা। যে সভার সদস্য হলো ইংরেজ কর্মচারীরা।

এরপর জাফর আলী খাঁর সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজরা প্রসারিত করল তাদের লোলুপ হাত। ভূমির রাজস্ব বাড়ল। প্রজাদের দুর্দশা পেঁছে

গেল চরমে।

১৭৬৫ সালে মীরজাফর মারা গেলেন। এই সালেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ। তবুও চতুর ইংরেজ কিন্তু প্রত্যক্ষ শাসনক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করল না।

১৭৬৭ সালে সিলেক্ট কোম্পানীকে লর্ড ক্লাইভ একটি পত্র দিলেন।

ক্লাইভ জানালেন—

To appoint the Company's servants to the office of Collectors or to do any act by any exertion of English power which can be equally done by the Nabab, would be throwing off the mask and declaring the company Soubah (Government) of the province.

অতএব রাজস্ব আদায়ের ভার পড়ল মহম্মদ রেজা খাঁর ওপর। এই রেজা খাঁ ছিলেন ইংরেজদের কৃপাপ্রার্থী। সুতরাং তিনি ইংরেজের কৃপালাভে আরও বেশী ধন্য হবার জন্য নির্মম হয়ে উঠলেন রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে। এবার উৎপীড়ন অত্যাচারে সারাদেশ জর্জরিত হয়ে উঠতে থাকল।

১৭৭০ সালে এলো দুর্ভিক্ষ। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল হাহাকার। সমগ্র দেশ রূপান্তরিত হলো মহাশ্মশানে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জয় হলো। এরা দেশের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করে, মানুষকে দাস করে, অত্যাচারে অত্যাচারে চতুর্দিকে দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি করে, প্রভাবশালী জমিদারদের পৈতৃক জমিদারী থেকে উৎখাত করে পথে বসিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করল।

এমনি করে ১৭৭২র সালে ৪ঠা মে কোম্পানীর অধিকার ঘোষিত হলো বাংলাদেশে। Hunter's Annals of Rural Bengal বলছে—"On the 4th of May I772. the East India Company, by a solemn act, stood forth, as the visible Governors of Bengal."

এল নতুন যুগ! শেষ হয়ে গেল বাংলার নবাবী আমল। শেষ হয়ে গেল দ্বৈত শাসন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হলো এ দেশের একক শাসনকর্তা।

জনসাধারণ হলো ইংরেজের দাস। বাঙালী হলো আত্মবিস্মৃত গোলামমাত্র। বাঙালী-জীবনে একটু করে সৃষ্টি হতে থাকল অবক্ষয়!

হিন্দু ধর্ম সুমহান ঐতিহ্য হারিয়ে হয়ে উঠল রক্ষণশীল। চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল হিন্দু তথা বাঙালী সমাজ। শাস্ত্রচর্চার প্রতি

মানুষের যে শ্রদ্ধা তা যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়ে এল শুকনো আচারের অনুবর্তন।

দেখা গেল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভাব কিছু কর্তাভজার দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আখড়া আর আখড়া থাকে না, ঈশ্বর কীর্তনের পরিবর্তে আখড়াগুলো হয়েছে ব্যাভিচারের লীলাক্ষেত্র। মানুষের মধ্যে সুরা, কামিনী আর ভোগের প্রাদুর্ভাব। মানুষ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে কল্যাণকর কোন কাজ এই মানুষই করে! শিক্ষার বালাই নেই। সাহিত্য-রস সুধা আহরণ করার একমাত্র মাধ্যম হয়েছে পাঁচালী, তরজা, ঝুমুর আর হাফ আখড়াই। অশ্লীল খিস্তি-খেউড়ে মানুষের মন তৃপ্ত হয়।

এইভাবে গোটা বাংলাদেশের গায়ে ফুটে বেরিয়েছে তখন বিষাক্ত দগদগে ক্ষতের মত এক অস্বাভাবিক বিকৃত মনুষ্যত্বের ঘা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এবার মনে হলো শোষণের সঙ্গে শাসন দরকার।

শাসনভার তখন ওয়ারেন হেস্টিংসের ওপর! ইনিই প্রথম গভর্ণর জেনারেল।

কালের চাকা ঘুরবেই; অন্ধকারের পর আলো আসবেই। সূর্যের পর চন্দ্র আবার চন্দ্রের পর সূর্য উঠবেই। মানব জীবনেও তার অন্যথা হলোনা! সেই অন্ধকার একটু একটু করে সরে যাওয়ার সূচনা হতে থাকল।

১৭৭৪ সালে স্থাপিত হলো সুপ্রীম কোর্ট।

১৭৭৫ সালে বেনারসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল সংস্কৃত কলেজ।

বিলেত থেকে নির্দেশ এল সিভিলিয়ানদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য। তৈরী হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। ১৮০০ সালে।

এসবই কোম্পানীর শাসনকাজের সুবিধার্থে।

পাশাপাশি শ্রীরামপুরে হলো মিশনারীদের প্রাদুর্ভাব। তাঁরা মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তোলার প্রচার চালিয়ে যেতে থাকলেন।

ইংরেজরা চাইলেন দেশ শাসন করে যেতে আর মিশনারীরা চাইলেন সবাইকে খৃষ্টধর্মে উদ্বুদ্ধ করতে। আসলে পশ্চিমের আলো-হাওয়ায় এই বাংলার লুপ্তপ্রায় চেতনা হলো অভিষিক্ত।

পাশ্চাত্যে তখন জীবনের সবুজ সূচনা। সবাই তখন মানুষের কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োজিত।

সেই পাশ্চাত্যে শিক্ষা-জ্ঞান আর মানব-হিত সাধনার আলোয়

বাংলাদেশের যে মানুষটির চিত্ত নতুন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তিনি রামমোহন রায়।

তিনিই জাতির জীবনে সঞ্চারিত করলেন স্বাধীনতার চেতনা।

দেখা দিল নবজাগরণের মঙ্গল প্রভাত!

এই নবজাগরণের মঙ্গল প্রভাতের এক বিশেষ লগ্নে যৌবনের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল রাজচন্দ্রের। নব যৌবনের দূত রাজচন্দ্রের বয়স তখন বছর পনের হবে। বয়সের তুলনায় রাজচন্দ্র অনেক বেশী বলিষ্ঠ, অনেক বেশী তেজোদীপ্ত। যাকে সবাই বলে সুপুরুষ।

পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে যে বিদ্যা রাজচন্দ্রের ভিতরে বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই বয়সে, তা হলো বিনয়, ব্যবহার আর বৈষয়িক জ্ঞান। সেই পুত্রেরই জনক প্রীতিরাম একদিন যোগমায়ার কাছে এসে দাঁড়ালেন।—

বাড়িতে গৃহদেবতা রঘুনাথের মূর্তি। যোগমায়া রোজ দিনের দুটি বেলাতেই নিজের হাতে রঘুনাথের পুজো করেন। নিজের হাতে ভোগ রান্না করে সেই ভোগে রঘুনাথের সেবা করেন। নিজের হাতে মালা গেঁথে পরিয়ে দেন রঘুনাথের গলায়। তারপর সেই পরম আপন দেবতার বন্দনা করেন চোখ বুঁজে। আজও যখন সন্ধ্যারতি দিয়ে রঘুনাথের সামনে আত্মনিবেদনের ভঙ্গিমায় বসে আছেন যোগমায়া, প্রীতিরাম এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে যোগমায়ার পিছনে! হয়তো প্রীতিরামের পায়ের শব্দে অথবা নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশে তাঁর চাপা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে যোগমায়ার আত্মনিমগ্নতা ছিন্ন হলো। গলায় আঁচল জড়িয়ে রঘুনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে যোগমায়া এসে দাঁড়ালেন স্বামীর সামনে। একরাশ তৃপ্তি ওঁর সারা অন্তরে। এক গাল হাসি ছড়িয়ে যোগমায়া বললেন, কোনদিন এই সময়ে তুমি তো ঠাকুর ঘরে আস না কী ব্যাপার! শরীর ভাল আছে তো?

প্রীতিরাম আজ যেন একটু বেশীমাত্রায় চিন্তিত। এক বুক শুকনো নিশ্বাস ফেলে বললেন, রাজচন্দ্র কোথায়?

যোগমায়া বললেন, হয়তো বৈঠকখানায়—

মাঝে মাঝেই রাজচন্দ্র বৈঠকখানায় বসতেন। সমবয়সী বন্ধুবান্ধবেরা এসে জমায়েত হতো। বিষয়-আশয়ের, বিলাস-বৈভবের আর আমিত্বের কোন আলোচনা নয় অহংকার নয়, আত্মপ্রচার বা পরচর্চা নয়। ওঁরা তখন রামমোহন রায়ের আলোচনায় মুখর! ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু হয়েছে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন। কয়েকজন

বাঙালী-হিন্দু পণ্ডিত জন এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। চারিদিকে রামমোহনকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা! ধর্মের নামে নরবলির মত হিন্দুদের পৈশাচিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সতীদাহের বিরুদ্ধে তখন পূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন রামমোহন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এ নিয়ে বিশেষ কোন চিন্তা নেই তখন। তাই বলে রামমোহন তো চুপ করে থাকতে পারেন না। পূর্ণ সহযোগিতা চাইলেন মিশনারীদের কাছ থেকে। মিশনারীরা সতীদাহের বিরোধিতা করল। স্বয়ং কেরী সাহেব এবং তাঁর সহকর্মীরা এই পৈশাচিক প্রথার বিরুদ্ধে শুধু রুখে দাঁড়ালেন না, তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। এ দেশে এই অন্যায় ভাবে মেয়েদের পুড়িয়ে মারার ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখার জন্যে কেরী স্থির করলেন, বছরে ক'জন মেয়েকে এই ভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় তার সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। দেখতে পেলেন প্রায় চার'শ মেয়ে বছরে এই অহেতুক মৃত্যু বরণ করেন। তাতেও কেরী সন্তুষ্ট হলেন না, তাঁর মনে হলো এই সংখ্যা সঠিক নয়, তখন তিনি বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে দায়িত্ব দিলেন সঠিক সংখ্যা নিরূপণের। এতে দেখা গেল ছ-মাসে প্রায় তিনশ মেয়েকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সতীদাহ চিরদিনের মত বন্ধ করে দেবার একটা বিরাট আন্দোলন চলছে তখন গোটা কোলকাতায়। যদিও রামমোহন ১৮১৮ সালে সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামেন তবুও ১৮০৩ সাল থেকেই অর্থাৎ শ্রীরামপুরের মিশনারী এবং স্বয়ং কেরী সাহেব যখন থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালাচ্ছেন তখন থেকেই রামমোহনও এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন! রাজচন্দ্রের মনে এই সতীদাহের বর্বরোচিত প্রথা রেখাপাত করেছিল। নব্যযুবক রাজচন্দ্রের মন একরাশ ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল বলেই রামমোহন রায়ের এই ভূমিকা তাঁর সেই ব্যথায় ভরা মনের সান্ত্বনা হয়েছিল আর তাই বোধকরি রামমোহন রায়কে মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে যখনই বসতেন, আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠতেন রামমোহন –!

প্রীতিরাম আর যোগমায়া ঠাকুর ঘরের কাছ থেকে এলেন শোবার ঘরে! পালঙ্কের উপর বসতে বসতে প্রীতিরাম বললেন—জানো যোগমায়া -- আমি চাই রাজচন্দ্রের বিবাহ দিতে! এই বয়সে আমাদের ছেলে সর্ববিষয়ে যেমন বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে তা সত্যিই আনন্দের বিষয়—তবে চতুর্দিকে যে ভাবে সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে—আন্দোলন হচ্ছে, আমাদের হিন্দু পণ্ডিত জনের মধ্যে কেউ কেউ যেভাবে শাস্ত্রের বিধান নিয়ে তর্ক শুরু করেছেন,

রামমোহন রায় ধীরে ধীরে রাজচন্দ্রের মত ছেলেদের মনেও যেভাবে আসন করে নিয়েছেন, তাতে করে এখুনি ঘর সামলানো দরকার—

যোগমায়া নিতান্ত সাধারণ। যোগমায়া একান্তভাবেই এ বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ এক সাধারণ গৃহবধূ। তিনি সতীদাহ-সহমরণ এসব ঘটনার খবর মাঝে মাঝেই পান বটে—এসব খবর শুনে তিনি দুঃখিতও হন ; একটি কিশোরী বধূ সহমরণে যেতে চায় নি বলে সবাই মিলে তাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে চিতেয় তুলে দিয়েছে, এমন খবরে মেয়ে হয়ে মাঝে মাঝে যোগমায়া শিউরে উঠেছেন বটে, তবে সেই প্রথা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেবার যে চেষ্টা সবাই করছেন—রামমোহন রায়ও নারী হত্যার বিরুদ্ধে সর্বস্বপণ করে রুখে দাঁড়াবার যে বীজমন্ত্র যুবমানসে বপন করে দিতে বদ্ধ পরিকর, তার জন্যে ঘর সামলাবার কি হলো বুঝতে পারেন না যোগমায়া। শুধু দু-চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। প্রীতিরাম বলেন, ঘর সামলানো কেন দরকার জানো ? দরকার এই কারণে—এই সংসারে আমার একমাত্র ভরসা, একমাত্র শক্তি ঐ রাজচন্দ্র—সে যদি ঘর ছেড়ে রামমোহন রায়ের এই মতবাদের সপক্ষে দাঁড়িয়ে পথে নেমে যায় সতীদাহ বন্ধ করার আন্দোলনে, তা হলে আমার সব ভাবনা—আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন যে মাটি হয়ে যাবে যোগমায়া—আমি চাই এখন থেকে এই বিষয়-আশয়, স্থাবর-অস্থাবর সব কিছু রাজচন্দ্র বুঝে নিক। সে সংসারী হবে—সে বংশরক্ষা করবে—, এ ব্যাপারে তোমার কি মত যোগমায়া ?

যোগমায়া বললেন, তোমার মতই আমার মত—

প্রীতিরাম খুশি হলেন। একবুক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, —আমি তা জানি যোগমায়া। আর জানি বলেই কন্যার সন্ধান পর্যন্ত নিয়েছি আমি। আসছে একটা শুভদিন দেখে রাজচন্দ্রের বিয়ে দেব—

প্রীতিরাম চিরকাল বড় একরোখা। একবার যা মুখ দিয়ে বার করেন তার খণ্ডন হয় না। একবার যা করবেন বলে স্থির করেন, তা করেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। নিজে দেখে-শুনে যথা সময়ে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে রাজচন্দ্রের বিয়ে দিয়ে জানবাজারের বাড়িতে বরণ করে নিয়ে এলেন পুত্রবধূ। কোলকাতায় তখন ধনাঢ্য ব্যক্তির অভাব ছিল না। কোলকাতাকে যদি আকাশ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে সেই আকাশে তখন এক গুচ্ছ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজ করছেন অর্থে-প্রাচুর্যে-বৈভবে-বিলাসে শ্রেষ্ঠ আবার আপন আপন ধর্ম-কর্মে মহিমায় মহিমান্বিত একাধিক মানুষ !

তাঁরা অনেকেই সেদিন অবাক হয়ে দেখেছিলেন—দূর থেকে শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বিবাহ উৎসব প্রসঙ্গে। একটা বিয়েতে এত অর্থ ব্যয় এ যেন কল্পনাও করা যায় না !

বিয়েতে রাজচন্দ্র কোন দ্বিমত পোষণ করেন নি। তেমন রেওয়াজ ছিল না। জন্মদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরিবারের প্রভু। সেই প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত মন তখন ছেলেদের তৈরী হয় নি। মেয়ে নিজে দেখে পছন্দ-অপছন্দ মত প্রকাশ করার কোন ব্যাপারই ছিল না। রাজচন্দ্র তো সেক্ষেত্রে একেবারে অন্য মানসিকতার ছেলে। রামমোহনেব আদর্শে তৈরী এক বিবেক সর্বস্ব মানুষ ! তাই এই বিয়েতে রাজচন্দ্রও যাঁকে স্ত্রীরূপে আনছেন তাঁকে দেখে-শুনে পছন্দ মত গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন না। বিবাহ উৎসব শেষ হলো ! চানক গ্রামের এক সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে প্রকৃতই এক কিশোরের বিয়ে হলো সেদিন।

এ ঘটনা ১২৩৮ সনের। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এ অবশ্যই বিধি নির্দিষ্ট ! ভাগ্য যার যেখানে বাঁধা আছে তাকে সেখানেই যেতে হবে। ভাগ্যের লিখন খন্ডন করবে এমন সাধ্য কার ! প্রীতিরাম কিংবা রাজচন্দ্র অবশ্যই সেই বিধির দাসানুদাস ! এই বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বেশ কিছুদিন হাসিতে-খুশিতে আনন্দে ঝলমল করেছিল জানবাজারের প্রাসাদ ! হঠাৎ অসময়ে আকাশে মেঘ জমার মত—এই প্রাসাদের ভাগ্যাকাশও মেঘাচ্ছন্ন হলো। রাজচন্দ্রের সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী অসুস্থ হলেন।

প্রীতিরাম পুত্রবধূকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখলেন না। যোগমায়া সেই কিশোরী বধূর সেবা করলেন দিবারাত্র ! অসুস্থতা কমলো না, বরং বেড়ে যেতে থাকল। যমে-মানুষে টানাটানি শুরু হয়ে গেল জানবাজারের বাড়িতে !

ভারাক্রান্ত রাজচন্দ্র শুধু নীরবে দু-চোখ ভরে দেখলেন কেমন করে একটি তাজা মেয়ে চির নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রীতিরাম অনেক চেষ্টা করেও—অনেক অর্থ ব্যয় করেও পুত্রবধূকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না ! মারা গেলেন সদ্যবিবাহিতা কিশোরী বধূ ! মারা গেলেন বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই।

মৃত্যু মহান, মৃত্যু শ্যাম সমান এই ভাবনার স্তরে যিনি নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন তিনি তো পরম পুরুষ ! ক'জন সংসারী মানুষ—ক'জন গৃহী পারেন নিজেকে সেই স্তরে নিয়ে যেতে ? প্রীতিরামও পারলেন না।

আকস্মিক এই মৃত্যুতে তিনি অনেকটা ভেঙে পড়লেন। যতখানি

ভেঙে পড়লেন পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুতে তার চাইতে অনেক বেশি মর্মাহত হলেন রাজচন্দ্রের ভাগ্য বিপর্যয় চোখের সামনে দেখে

প্রীতিরাম স্থির করলেন আবার রাজচন্দ্রের বিয়ে দেবেন। রাজচন্দ্রের ভাঙা মনটাকে জোড়া দিতেই হবে—এমন একটা জেদ তাঁকে যেন পেয়ে বসল।

সব কথা খুলে বললেন যোগমায়াকে। যোগমায়া বললেন—তুমি সেই ব্যবস্থাই কর—

প্রীতিরাম নিজেকে যেন অনেকটা হাল্কা বোধ করলেন। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন রাজচন্দ্রের কাছে। রাজচন্দ্র ইদানীং আর বৈঠকখানায় বসে সময়ের অপচয় করেন না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই তারা পুরনো ক্ষতস্থানে খোঁচা দিয়ে বসে। স্ত্রী বিয়োগে ভারাক্রান্ত রাজচন্দ্রকে বন্ধুরা সহজ স্বাভাবিক ভাবেই যখন সান্ত্বনা দিত, তারা জানত না এই সান্ত্বনার সুরে কেমন বেহাগের সুর হয়ে বাজত রাজচন্দ্রের মনে। রাজচন্দ্র এ ব্যাপারে কাউকে কোন কথা বলেন নি কখনও; নীরবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বন্ধুদের আসর থেকে।

রাজচন্দ্র নিজে গান গাইতে পারতেন না। কিন্তু যেখানে গান সেখানেই রাজচন্দ্র! গানের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই একটি ঘর মনের মত সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি। কী ছিল না সে ঘরে। দামী গালিচার ওপর মাঝখানে ফরাস। সেই আসরের এখানে ওখানে ছড়ানো-ছিটানো এসরাজ, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার আরো কত কি! মন চাইলেই রাজচন্দ্র সেই গানের ঘরে আড্ডা জমাতেন! বন্ধুদের গান শুনতেন—। বেশ কিছু দিন হলো সেই গানের ঘর বন্ধ। সে ঘরে প্রবেশ করার মত মনটা হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

ইদানীং নিজের ঘরে বসে রামমোহন রায়ের প্রবন্ধ পড়েন রাজচন্দ্র। নিজেকে ভুলিয়ে রাখেন। সেদিনও তেমনি করে পালঙ্কের ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে রাজচন্দ্র পড়ছিলেন রামমোহনের প্রবন্ধ। এমন সময় প্রীতিরাম সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন ছেলের কাছে।

রাজচন্দ্র তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আমাকে কিছু বলবেন বাবা—

প্রীতিরাম বললেন, আমি চাই তুমি জমিদারীর সকল বিষয় এখন থেকে একটু একটু করে বুঝে নাও—যদি তোমার আপত্তি না থাকে আমার সঙ্গে কাল থেকে সেরেস্তায় বেরুবে—

রাজচন্দ্র বললেন, আপত্তি কেন থাকবে—আপনি আদেশ করলে আমি নিশ্চয়ই বেরুবো।

রাজচন্দ্র এবার নিজেকে কাজের মধ্যে মিশিয়ে দিলেন! মনের আকাশে জীবনে প্রথম পর্বের যে অন্ধকার জমা হয়েছিল—সেই অন্ধকার একটু একটু করে সরে যেতে থাকল! এক সময়ে নিয়মের আবর্তে।

রামপ্রিয়া যত দেখেন ততই যেন খুশি আর তৃপ্তিতে বুকটা তাঁর ভরে যায়। একদিন রামপ্রিয়া ভাবতেন, স্বামী যখন রামায়ণ পাঠে বসেন তখন ক্ষেমংকরী দাওয়াতে গঙ্গা জল ছিটিয়ে আসন পেতে দেয়! প্রদীপ জেবলে দেয়। সযত্নে রামায়ণ রেখে যায়। হরেকৃষ্ণ ঘটির জলে পা ধুয়ে দাওয়ায় উঠলে ক্ষেমংকরী গামছা দিয়ে দাদার পা মুছিয়ে দেয়। পা মুছে হরেকৃষ্ণ এসে বসেন আসনে। প্রদীপের আলোয় শুরু করেন রামায়ণ পাঠ। রামপ্রিয়া তখন মনে মনে কামনা করতেন একটি কন্যা সন্তানের। নিজের পেটের মেয়ে। লাল পাড় কাপড় পরে দাওয়াতে গঙ্গা জল ছিটিয়ে—আসন পেতে প্রদীপ জবালিয়ে বাবার পা মুছিয়ে দিচ্ছে! সেই স্বপ্ন দেখা সার্থক হয়েছে। এখন আর ক্ষেমংকরীকে কিছু করতে হয় না। দশ বছরের মেয়ে রাসমণি নিজের হাতে সব করে! বাবা রামায়ণ পাঠে বসলে পাশে বসে থাকে! আজও রামপ্রিয়া দুচোখ ভরে দেখছিলেন সব!

রামায়ণ পাঠ শেষ করে হরেকৃষ্ণ উঠলেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল বালিকা রাসমণি। বোঝার মত মনও তখন তার তৈরী হয় নি। রাসমণি সেই আকাশে এক তারা থাকতে মায়ের সঙ্গে বিছানা ছেড়ে ওঠে। বিছানার ওপরে বসে রামপ্রিয়া কিংবা হরেকৃষ্ণ যেমন রঘুনাথের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করেন—রাসমণি ঠিক তেমনি করে প্রণাম জানিয়ে মায়ের পিছন পিছন বাড়ির উঠানে নেমে আসে। ক্ষেমংকরী সারা বাড়ি ঝাঁট দিয়ে গোবর-জল ছিটিয়ে যেমন করে বাড়ি শুদ্ধ করে—রাসমণিও তেমনি করে এখানে ওখানে গোবর-জল ছিটিয়ে দেয়। রামপ্রিয়া সাত সকালে স্নান সেরে আহ্নিক করতে বসলে, রাসমণি ফুলের মালা গাঁথে মায়ের পাশে বসে! রামপ্রিয়া এ সব দেখেন আর গর্বে যেন তাঁর বুক ভরে যায়! মেয়ের মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন।

হরেকৃষ্ণ মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলেন, আমি বুঝতে পারি না আমাদের রাসমণির দেবদ্বিজের ওপর এমন ভক্তি এলো কেমন করে-—

রামপ্রিয়া বলেন, শুধু কি তাই—আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকবে—,

যত বলি একটু পুতুল খেলা কর—ও ততই বলে আমি তোমার মত তোমার সঙ্গে সব কাজ করবো—তাই তো মাঝে মাঝে ভয় হয় আমার—

হরেকৃষ্ণ অবাক হন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, কিসের ভয় বৌ?

রামপ্রিয়া বলেন. ভয় হয়—ভালরা নাকি বাঁচে না বেশিদিন—রাসমণির কিছু হলে আমি বাঁচবো না—

অহেতুক অমঙ্গল কল্পনা করে রামপ্রিয়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হরেকৃষ্ণ সান্ত্বনা দেন, বলেন, রামপ্রিয়া—সব সময় এটা কেন মনে রাখ না—ঈশ্বর প্রদত্ত ফল ঈশ্বরেরই সেবায় লাগে—তিনি যেদিন গ্রহণ করবেন সেইদিনই মোক্ষ।

খবর এল আর এক কন্যার।

ঘটক মশাই যখন বৃত্তান্ত পেশ করলেন প্রীতিরাম যেন মুহূর্তের মধ্যে নিতান্ত ছেলেমানুষ হয়ে পড়লেন। একটি বালকের মত। কত সহজ, কত সরল, কত স্বাভাবিক আবার কত আনন্দে উশ্বেল। সেরেস্তার কাজকর্ম ফেলে দিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খবরটি যোগমায়াকে না জানানো অবধি এই ভাবের পরিবর্তন হবে না! স্রোতস্বিনী কোন গতি কোথাও অবরুদ্ধ হলে সেখানে জলে যেমন মাতন লাগে যেমন আন্দোলিত হয়, প্রীতিরামের মনের গভীরে ঘটকের দেওয়া খবরটিও তেমনি আন্দোলিত হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন যোগমায়ার সামনে। যোগমায়ার দু-চোখের তারা দুটো একরাশ কৌতূহল নিয়ে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল! তাঁর মুখে কোন ভাষা ফোটার আগে প্রীতিরাম বললেন, যোগমায়া, ঈশ্বর বোধহয় আবার আমাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন—যে অশান্তির আগুনে আমি অহর্নিশ পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলাম এই মুহূর্তে সেই আগুন নিভে গেছে। ঘটক মশাই একটি সুপাত্রীর খবর এনেছেন—

কথা শুনে যোগমায়া খুশি হলেন! খুশি হবারই কথা! বিধির বিধান হেতু প্রথম পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুর পর এই বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছিল। সব আছে কিন্তু কোথায় যেন অনেকটাই কিছু নেই! ঝাড় লণ্ঠনের ভিতরে যখন আলো জ্বলে তখনই ঝাড় লণ্ঠনের সৌন্দর্য বোঝা যায়; বাড়িটা যেন আলো বিহীন ঝাড় লণ্ঠনের মত! ফুল যতক্ষণ তাজা থাকে ততক্ষণই সে সুন্দর; শুকিয়ে গেলে যেমন দেখায় এ বাড়ির অন্দরমহল

যেন তেমনি। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ মানুষ নানা বৈচিত্র্যের —যখন মারা যায় তখন যেমন মরদেহ মাত্রেই ফ্যাকাশে—বিবর্ণ, এ বাড়ির ভিতরটাও ঠিক তেমনি।

আর সেই রাশি রাশি অহেতুক ব্যথা ছড়ানো প্রাসাদে যোগমায়াকে প্রতিদিন বেঁচে থাকতে হয় একটা যন্ত্রণা নিয়ে। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা! রাজচন্দ্র আবার বিয়ে করবে, এ বাড়িতে আবার পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াবে টুকটুকে একটা বৌ— আনন্দে ঝলমল করে উঠবে বাড়িটা রাজচন্দ্রের সন্তান লাভ হবে—রক্ষা পাবে স্বামীর বংশ; যোগমায়াও সেই দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করছেন!

এবার ছেলের কাছে মায়ের আর্জি। ছেলেকে সংসারী করার জন্য মায়ের দাবী। তেমনি নিজের খুশির চাইতে মায়ের তৃপ্তি বড় কথা। কথা রাখলেন রাজচন্দ্র।

পুনরায় বিয়েতে মত দিয়েছেন তিনি। সুতরাং আবার বেজে উঠল মঙ্গল শঙ্খ! আবার প্রীতিরাম বরণ করে নিয়ে এলেন পুত্রবধূ! আবার জানবাজারের প্রাসাদ হলো প্রাণময়! এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন রাজচন্দ্র।

প্রথম বিবাহের মত এই দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে তেমনি আড়ম্বর হলো না। উৎসব হলো, মহা উৎসব হলো না। শহর কলকাতার মানুষ এবার আর বিস্মিত হলেন না, সবাই বোধহয় বুঝলেন এর ভিতরকার আসল রহস্য। একের পর এক সন্তানের অকালমৃত্যু হলে অনেক সময় শেষ সন্তানের প্রতি যত্নবান হন না অনেকে, নামকরণের মধ্যেও কোন মুন্সিয়ানা দেখান না, ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে দেন, নিতান্ত হেলায়-ফেলায় সন্তানটিকে মানুষ করেন। যেখানে যত যত্ন—যত তুক তুক ভাব সেখানেই তত অঘটন! এ সব সংস্কার! অথচ আশ্চর্যভাবে, অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়! আর তাই এই সংস্কার থেকেই প্রীতিরাম এবার রাজচন্দ্রের বিবাহে কোন বাহুল্য দেখান নি। শুধু হাত জোড় করে নিমন্ত্রিত অতিথিদের বলেছেন—আপনারা রাজচন্দ্রকে আশীর্বাদ করুন যেন সুখে থাকে—আশীর্বাদ করুন আমার পুত্রবধূ যেন অক্ষয় সিঁদুর নিয়ে আমার সংসারের গৃহলক্ষ্মী হিসেবে অধিষ্ঠিতা থাকেন—, স্বামী-সন্তান নিয়ে যেন সুখে থাকে ওরা, সেদিন সবাই নব দম্পতিকে বুক ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক! যোগমায়া এই পুত্রবধূকে

নিজের মেয়ের মত বক্ষে ধারণ করেছিলেন। পুত্রবধূকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু অলক্ষ্যে বিধির অধরে ছিল খেয়ালি হাসির রেখা!

বধূর বাপের বাড়ি থেকে যখনই কেউ এসে দাঁড়ান মেয়েকে অন্তত কদিনের জন্য নিজেদের কাছে নিয়ে যাবার ইচ্ছা নিয়ে, যোগমায়া সেই ইচ্ছা তাঁদের পূর্ণ করার সুযোগ দিতে পারেন না। এ চিরন্তন বন্ধন। সেদিনের সামাজিক পটভূমিতে গৌরীদানের যেমন মাধুর্য ছিল, তেমনি ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। শাশুড়ি যদি মা হতে না পারতেন, মায়ের মমতা-স্নেহ বন্ধন দিয়ে যদি সেই একরত্তি গৌরীকে গড়ে তুলতে না পারতেন, নিজেকে ভাল করে চিনবার আগে—সংসারকে ভাল করে বুঝবার আগে—জ্ঞানের আলোয় স্বামীকে ভাল করে দেখার আগেই গৌরীদের ভাগ্য হতো বিষময়। যোগমায়া তা হতে দেন নি। যোগমায়া শাশুড়ির চাইতে প্রথম হয়েছিলেন মা!

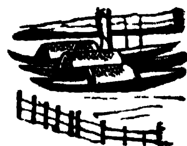
একটি করে ফুল তুলে নিয়ে মালা গাঁথার মত করে যোগমায়া তাঁর এই পুত্রবধূকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন! নিজের কাছে কাছে রেখে তিনি পুত্রবধূকে শেখাতেন ঘর সাজাবার কাজ। রাজচন্দ্র ঘরে ফিরলে সেই একরত্তি বৌ জলখাবারের থালা নিয়ে পেঁাছে দিত স্বামীর কাছে। এমনি করে পুতুল খেলা-সংসার আর সংসারের টুকিটাকি কাজ শেখার মধ্যে কয়েকটা মাস কেটে গেল। নির্মল আকাশের আলো, প্রকৃতির স্বচ্ছ মাধুরিমায় যেমন করে দিনগুলো চলতে থাকে, তেমনি করে জানবাজারের প্রাসাদ অলিন্দে দিনগুলো কাটছিল বেশ! অকস্মাৎ আকাশের আলো নিভে গেলে, প্রকৃতির রূপ অকস্মাৎ মলিন হলে-সবার মন যেমন করে ভারাক্রান্ত হয়, তেমনি জানবাজারের প্রাসাদ অলিন্দে সবার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

এ বাড়ির সবার প্রিয়—সবার স্নেহের ধন, রাজচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী অকস্মাৎ শয্যা নিলেন।

সেই একই দৃশ্যের অবতারণা। সেই যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যোগমায়ার চোখে ঘুম নেই। প্রীতিরাম অস্থির। এবারও পুত্রবধূকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রীতিরাম অর্থ খরচে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলেন না।

গৃহ-দেবতা রঘুনাথের পায়ে মাথা রেখে—দু-চোখের জলে রঘুনাথের পদযুগল সিক্ত করে যোগমায়া পুত্রবধূর জীবনভিক্ষা করলেন। ডাক্তার-বদ্যি, কবিরাজ এমন কি টোটকা কোন কিছুতেই কিশোরী বধূকে সুস্থ করা গেল না। মাত্র কটা দিনের মধ্যে মৃত্যু সেই একরত্তি মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল! মূক হয়ে গেলেন যুবক রাজচন্দ্র! মাত্র ক'-বছরের মধ্যে দুই দুটি

আকস্মিক মৃত্যু জানবাজারের প্রাসাদ অভ্যন্তরের সবটুকু আনন্দ-খুশিকে যেন তছনছ করে দিয়ে গেল !



আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে বৃদ্ধ নায়েবের দুটি হাত ধরে প্রীতিরাম বললেন, শুনেছেন নায়েব মশাই, ঐ ছোট্ট মেয়েটি আমাকে কি বললে—

নায়েব মশাই বললেন, শুনেছি—কী মধুর বাণী, আপনি পিছন পিছন আসুন আমি আগে আগে যাই—

বোধকরি এ বাণীর ভাবার্থ বৃদ্ধ নায়েব মশাইয়ের মনের এমন একটি স্থান স্পর্শ করে গেল যেখানে সঞ্চিত ছিল একরাশ আবেগ। সেই আবেগ মিশ্রিত অশ্রুধারা যেন বাঁধন হারা হয়ে গেল মুহূর্তে। নায়েবের দু-চোখে টল টল করে উঠল জল। প্রীতিরামেরও দু-চোখের কোল ভিজল আনন্দ-অশ্রুতে।

দূরে অন্ধকারে প্রদীপ হাতে নেচে নেচে কেউ যদি পথ চলে, মনে হয় প্রদীপশিখা একাকী যেন চলেছে নৃত্য করে করে। ঠিক তেমনি সন্ধ্যা নেমেছে কোনাগাঁয়ের বনপথে। নৃত্যের ছন্দে পথ দেখিয়ে প্রীতিরামকে নিজেদের কুঁড়ে ঘরে নিয়ে চলেছে রাসমণি—মনে হয় যেন অন্ধকারে অপরূপ এক নৃত্যছন্দে মেতেছে পূর্ণিমার শশী। সে চলেছে নেচে নেচে. আর এক বুক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মবিমুগ্ধ প্রীতিরাম চলেছেন তাকে অনুসরণ করে।

এক সময় রাসমণি এসে থেমে গেল নিজেদের কুঁড়ে ঘরের পাশে—দরজার সামনে !

সে ভীতা—যেন নিতান্ত অপরাধিনী !

বাবা হরেকৃষ্ণ দাস একেবারে সামনে। বললেন, সন্ধ্যে নেমেছে—পাঠে বসবার সময় উত্তীর্ণপ্রায়—একলা তুমি গিয়েছিলে কোথায় রাসমণি ? তোমার মা—আমি, তোমার পিসিমা সবাই উদ্বিগ্ন—এটা তুমি ভাল করনি। কতদিন বলেছি যেখানেই থাক—যে খেলা নিয়েই থাক, দিনে দিনে ঘরে ফিরে এস—তুমি আমার কথা উপেক্ষা করছ,—তোমার ঘরে ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে তোমার মা ঐ দেখ তুলসীতলায় মাথা কুটছেন আর চোখের জলে বুক

ভাসাচ্ছেন—এমন করে কি সবাইকে ভাবাতে হয়—কথাগুলো শেষ করে সহসা যেন চমকে উঠলেন হরেকৃষ্ণ ! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি অপরিচিত মানুষটির দিকে। কে ইনি !

প্রীতিরাম অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে করজোড়ে বললেন—মায়ের আমার কোন দোষ নেই—আমার জন্যে ওঁর ঘরে ফেরায় বিলম্ব ঘটেছে –

হরেকৃষ্ণ তখনও প্রীতিরামকে বুঝতে পারেন নি। তবুও বোধকরি নিতান্ত অবচেতন মনেই প্রীতিরামের মত দু-খানা হাত জোড় করেছিলেন তিনি ! দু-চোখে ছিল জিজ্ঞাসা—

বৃদ্ধ নায়েব মশাই বললেন—আপনি নিশ্চয়ই এই কিশোরীর পিতা ?

হরেকৃষ্ণের যেন সম্বিত ফিরল ! বললেন—হ্যাঁ ;

নায়েব মশাই বললেন, আর ইনি হলেন কলকাতার জানবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রীতিরাম দাস—

হরেকৃষ্ণ যেন এই নামের সঙ্গে অনেকদিন জড়িয়ে আছেন—এই নামটি যেন তাঁর কত শোনা তেমনি অভিব্যক্তি নিয়ে বললেন,—কি সৌভাগ্য আমার ! আজ আমি ধন্য ! আমার এই সামান্য কুঁড়েতে আপনাদের পদার্পণ ঘটেছে এটা কম বড় সৌভাগ্যের কথা নয়,—আসুন আসুন ; কথা বলতে বলতে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন হরেকৃষ্ণ। নিতান্ত শিশুর মত চিৎকার করে বলে উঠলেন, রামপ্রিয়া রামপ্রিয়া দেখ. আমাদের এই ভিটেতে কার পদার্পণ ঘটেছে—বসতে দাও রামপ্রিয়া এঁদের পা ধোয়ার জল দাও—, রাসমণি যাও যাও, সবাইকে বল আমাদের বাড়িতে আজ যে অতিথি এসেছেন তাঁদের যেন সেবার ত্রুটি না হয়—অবরোধ মুক্ত হলে যেমন করে কলশব্দ-গীতে জলের ধারা বয়ে যায়, ঠিক তেমনি হরেকৃষ্ণের ভিতরকার সহজ-সরল মনের কথাগুলো ঝরে গেল ঝর ঝর করে !

অবাক হবার রেখাগুলো তখন রামপ্রিয়ারও চোখে মুখে। এক হাত ঘোমটার মধ্যে মুখ ঢেকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রামপ্রিয়া।

প্রীতিরাম বললেন—আপনি ব্যস্ত হবেন না—আমি অর্থে-সম্পদে-প্রাচুর্যে হয়তো জানবাজারের জমিদার, কিন্তু আমি নিতান্তই দীন—, আমি ভিখারী মাত্র—হরেকৃষ্ণ অবাক হলেন ! সব কথা শেষ করার আগে প্রীতিরামকে সাদরে বসতে দিলেন দাওয়ায় !

হরেকৃষ্ণ বললেন, একটা ব্যাপারে কৌতূহল দমন করতে পারছি না দাস মশাই—

প্রীতিরাম তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সত্যি কথা বলতে কি—, আমি

ক্লান্ত—জমিদারী-টাকা-পয়সা-বিষয়-বৈভব এ সবের ভিতরে থাকতে থাকতে ক্লান্ত—সেই ক্লান্তি জুড়তে নৌকা যোগে এসেছিলাম এদিকে! হালিশহরে সাধক রামপ্রসাদের ভিটেতে বসেছিলাম, এক সময় দেখলাম আমার এই মাকে—, চলে এলাম—ও-ই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল—, একসঙ্গে দুটো কাজই সারা গেল। আজ আর আমার কোন ব্যথা নেই—কোন ক্লান্তিও নেই—

হরেকৃষ্ণ দাস সবিনয়ে বললেন, যদি আর কোনদিন এদিকে আসেন, তাহলে এই কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধুলা দিতে ভুলবেন না যেন,—

প্রীতিরাম বললেন, জানবাজারে ফিরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু মন আমার পড়ে রইল এখানে, - কারণ আমার মায়ের আকর্ষণে আমাকে তো আসতেই হবে দাস মশাই—

কথাটা অতি সহজ ভাবে প্রীতিরাম বললেন বটে, কিন্তু হরেকৃষ্ণের মনের আকাশে একটা ঝড় উঠলো! আশঙ্কার ঝড়! নানা প্রশ্নের ঝড়—

প্রীতিরাম ফিরে এলেন কোলকাতায়।

ফিরে এলেন বটে কিন্তু মনটিকে যেন রেখে এলেন সেই কোনা-গাঁয়ে। সারা মন জুড়ে শুধু সেই কিশোরী কন্যার অবস্থিতি। সে যেন বার বার বলছে—আমি আগে আগে যাই, আপনি পিছন-পিছন আসুন—

প্রীতিরাম যেন কোন ভাবেই নিজেকে সহজ করে তুলতে পারছেন না, বার বার তাঁর মনে আসছে—এই কিশোরী কন্যাটিকে যদি পুত্রবধূ করে আনা যেত, তা হলে মন ভরে যেত। একরাশ তৃপ্তি নিয়ে যাওয়া যেত পরপারে!

কথাটা যোগমায়াকে না বলে পারলেন না প্রীতিরাম। সব ঘটনাই স্ত্রীর কাছে বিবৃত করলেন। বললেন—জানো যোগমায়া—সে সাধারণ নয়—সে যেন মমতার আধার! কল্যাণের প্রতীক। যেমন রূপবতী—তেমনি সর্বগুণে গুণান্বিতা, যেমন চঞ্চলা-তেমনি শান্ত স্বভাবা—

যোগমায়া বললেন, যখন তুমি কোনা-গাঁয়ে তাদের ঘরে গেলে—তখন কথাটা পাড়লেই পারতে—আমার তো মনে হয় ওঁরা এই প্রস্তাবে নিশ্চয়ই রাজী হতেন—

প্রীতিরাম বললেন, ভেবেছিলাম কথাটা উত্থাপন করি—কিন্তু পারিনি। কেন পারিনি জানো যোগমায়া? পারিনি শুধু রাজচন্দ্রের জন্যে—ইদানীং তাকে সংসার প্রসঙ্গে যেমন উদাসীন দেখেছি তাতে করে তার মতামত না নিয়ে দাস মশায়ের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে আমার সাহস হয় নি। তা ছাড়া কোন ভাবেই এই মনটাকে বোঝাতে পারছি না। ঘর পোড়া গরু যেমন

সিদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়—আমার মনটা হয়েছে তেমনি। আমি জানি যোগমায়া, হাত পেতে ভিক্ষে চাইলে ভিক্ষে পাবই, কিন্তু এই পোড়া কপালে যদি তা না টেকে তা হ'লে মুখ দেখাবো কেমন করে!

যোগমায়া বললেন, তুমি যা ভাল বুঝেছ তাই করেছো আমারও মন বলছে এবার রাজচন্দ্রের কাছ থেকে বিয়ের ব্যাপারে মতামত নেওয়া দরকার—সে যদি বিয়েতে রাজী হয় তখন তুমি না হয় দাস মশায়ের কাছে কথা পেড়ো। —যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে তা হলে এই ঘরেই কাজ হবে। তুমি বরং রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথাটা বলে নাও—

রাজচন্দ্র! এখন এই মুহূর্তে রাজচন্দ্র অনেক দূরে। ত্রিবেণী সঙ্গমে। পর পর দুটি অকাল মৃত্যুতে রাজচন্দ্রের মনটাও ভেঙ্গে চুরে তালগোল পাকিয়ে গেছে। এই সামান্য বয়সে মাত্র দু-তিন বছরের মধ্যে দুই দুটি স্ত্রী বিয়োগ রাজচন্দ্রকে যেন সংসার প্রসঙ্গে বৈরাগ্য এনে দিয়েছে!

বাড়িতে ওঁর মন বসে না। বন্ধু বান্ধবেরা বৈঠকখানায় এসে দাবা নিয়ে বসলে রাজচন্দ্র সেই আসরে নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেন না। বলেন, তোমরা খেল আমি বরং দেখি—

সেরেস্তার কাজে বেরিয়ে রাজচন্দ্র সোজা গিয়ে বসেন গঙ্গাতীরে। কাজে মন বসে না। তীরে তীরে আছড়ে পড়া গঙ্গার স্রোতের যে কলতান রাজচন্দ্র তার মধ্যে যেন শুনতে পান সেই অসময়ে ঝরে যাওয়া দুটি কিশোরী বধূর দীর্ঘশ্বাস। মাঝে মাঝে নিজেদের মাঝি মাল্লাদের ডেকে পাঠান বাড়িতে। নৌকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে! যতক্ষণ মন চায়—যতদূরে যেতে চায় মন, ততক্ষণ ততদূরে চলে যান তিনি!

ইদানীং কোন পার্বণ এলেই রাজচন্দ্র যেতেন ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা স্নানে।

বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে স্নান সেরে যখন ফিরতেন তখন যেন আলাদা একটা মানুষ ফিরে আসতেন। যোগমায়া কাছে গিয়ে যখন বসতেন. ছেলের গায়ে যখন সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতেন তখন রাজচন্দ্র নিজের মনের কথাটি প্রকাশ করে ফেলতেন। বলতেন, মা একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে—

যোগমায়া বলেন, বলো কি জানতে চাও বাবা—

রাজচন্দ্র বলেন, এই সংসারে তোমার ভূমিকা যে কি মা তা কি তুমি জান?

যোগমায়া অবাক হয়ে বলেন, আমি তো সাহেবী লেখাপড়া জানিনে, কোন বিষয়ে জ্ঞানও নেই--শুধু এইটুকু জানি, এই সংসারে আমি একদিকে দাসী অন্যদিকে তোমার মা, নৌকা বাইতে যেমন মাঝির দরকার হয়, সংসার বাইতে তেমনি মাঝির দরকার—তোমার বাবা আর আমি দুজনেই মাঝি,—

রাজচন্দ্র বলেন, তাই তো ভাবি, সংসার থেকে মেয়েদের এই দাসপ্রথা কবে ঘুচবে! —তাই তো মা এই সংসার আমার কাছে আর ভাল লাগে না—

যোগমায়া মনে মনে শিউরে ওঠেন। পাঁচটা নয়—সাতটা নয়—একটি মাত্র ছেলে—সে যদি এই সামান্য বয়সে সংসার প্রসঙ্গে এমন বৈরাগ্যভাব পোষণ করে তা হলে সর্বনাশ!

প্রীতিরামও সেই ভয় পেয়েছিলেন!

রাজচন্দ্রের দু-দুবার স্ত্রী বিয়োগের পর সংসার-বিবাহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে তার উদাসীনতাই স্বাভাবিক আর তাই প্রীতিরাম চান পুনবায় রাজচন্দ্র দার-পরিগ্রহ করুক!

যথা সময়ে প্রীতিরাম ডেকে পাঠালেন রাজচন্দ্রকে। রাজচন্দ্র এসে দাঁড়াতে নিজের কাছে বসিয়ে প্রীতিরাম বললেন, তুমি আর একবার আমার কথা ভেবে দেখ রাজচন্দ্র! এই বিষয়-আশয়ে তোমার অনাসক্তির কারণ আমি মনে প্রাণে উপলব্ধি করছি বাবা—কিন্তু ভুলে যেও না, সংসারে দুর্বল চিত্তের স্থান নিতান্তই নগণ্য! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ভাবে আমাদের ওপর জুলুম চালাচ্ছে তাতে করে তারা যদি বুঝতে পারে আমরা সবাই দুর্বল-তা হলে এ দেশটায় মানুষের স্থান থাকবে না! অমানুষে ভরে যাবে যেহেতু আমার অর্থ আছে সেইহেতু এখনও এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাকে তাদের সরাসরি পদসেবায় নিয়োগ করতে পারে নি, যদি তা না থাকত তা হলে এতদিনে আমাকে ইংরেজদের পদসেবা করেই বেঁচে থাকতে হতো—তাদের কদর্য মনোবৃত্তির শিকার হতে হতো আমাদের সবাইকে! তাই আমার অনুরোধ রাজচন্দ্র, তুমি এমন করে সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ো না! এ পর্যন্ত আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমার বিশ্বাস তুমি তার চাইতে অনেক বেশী এগিয়ে যাবে। অর্থ-সম্পদ যদি বাড়াতে পার—তা হলে প্রয়োজন মত মানুষের কল্যাণে সেই অর্থ ব্যয় করে দিও।—তুমি যদি দুর্বল চিত্ত হও যদি সংসার-বিষয়-আশয় প্রসঙ্গে উদাসীন হও—তা হলে ইংরেজ বণিকের দল চোখ রাঙিয়ে কথা বললে—পাল্টা চোখ রাঙিয়ে জবাব দিতে পারবে না,—

রাজচন্দ্র হয়তো মনে মনে বাবার এই উপদেশকে যথার্থ উপদেশ হিসেবে মেনে নিতে পারলেন। বললেন, বলুন আমাকে কি করতে হবে—

প্রীতিরাম বললেন, আর একবার ভাগ্যের পরীক্ষা তোমাকে দিতে হবে রাজচন্দ্র,—এটা আমার এবং তোমার মায়েরও ইচ্ছা—

রাজচন্দ্র বললেন, আপনি পুনরায় বিবাহের কথা বলছেন?

প্রীতিরাম বললেন, হ্যাঁ বাবা আর একবার আমরা তোমার বিবাহের আয়োজন করতে চাই— আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবার ঈশ্বর মঙ্গল করবেন—

রাজচন্দ্র বললেন, আপনাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা; কথাটা শেষ করে রাজচন্দ্র আবার বললেন, আগামী পৌষ সংক্রান্তিতে আমি ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে যেতে চাই—

প্রীতিরাম আনন্দে টলমল করে উঠলেন। রাজচন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন এর চাইতে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে। সুতরাং ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে যাওয়ার ব্যাপারে প্রীতিরাম বিন্দুমাত্র দ্বিমত পোষণ করলেন না। শুধু বললেন, এবার আমার একটা কথা তাহলে তোমাকে মেনে নিতেই হবে বাবা—

রাজচন্দ্র বললেন,—বলুন আপনার কি আদেশ—যে আদেশই করবেন আমি তা পালন করব—

প্রীতিরাম বললেন, এবার নায়েব মশাইকে সঙ্গে নাও—জানি না কেন হঠাৎ একথা বললাম, হয়তো ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করলাম— ইদানীং পথে যে সব অঘটন ঘটছে তাতে শুধু নায়েব মশাই নয়—ক'জন লাঠিয়ালকেও সঙ্গে নিও—

রাজচন্দ্র মুখে কোন আপত্তি জানালেন না। যথা দিনে যথা সময়ে সদলবলে যাত্রা করলেন।

তখন যানবাহন বলতে জলযান মানুষের একমাত্র সম্বল। দূর দেশান্তরের জন্য জাহাজ-স্টীমার বড় বড় পানসী আর নৌকা। শহরের জীবনযাত্রায় পাল্কি, টমটম্ ইত্যাদি! প্রীতিরাম তেমনি বড় নৌকা করেই মাঝে মাঝেই বেরুতেন। সেই নৌকা সাজিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাজচন্দ্র। যাবার আগে আশীর্বাদ নিতে একবার এসেছিলেন মায়ের কাছে।

যোগমায়া ছেলেকে বুক ভরে আশীর্বাদ করলেন। নিজে সঙ্গে করে তাঁকে নিয়ে এলেন ঠাকুর ঘরে! ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল রাজচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ত্রিবেণীতে স্নান করেই ফিরে এস—

বেশীদিন দেরি হলে আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ব বাবা. তাছাড়া তুমি তো তোমার বাবাকে জান, তোমার দেরী হলে তিনি হয়তো পাগল হয়ে যাবেন—

রাজচন্দ্র বললেন—মা. আমি স্নান সেরেই চলে আসব। তবে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে মা—এই মায়া, এই মোহ. এই বন্ধন কেন মা? এই সংসারটা হলো বাবার কাছারী বাড়ির মত। কাজের জন্য কাছারী। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ কাছারী—এ সংসারে কে কার মা? মায়া যত বাড়াবে ততই খারাপ।—মায়াময় আত্মার মুক্তি পেতে বিলম্ব হয়—অথচ এই মুক্তির মধ্যে সব জীবের পরিত্রাণ। যিনি পরিত্রাতা তিনি সব জীবের মধ্যে আছেন—মায়া বন্ধন না খুললে পরিত্রাতা কষ্ট পান।—

যোগমায়া অবাক হয়ে যান! এ কী শুনছেন তিনি! রাজচন্দ্রের মুখে এ সব কথা কে জোগালেন। কী বিশ্বাস ঈশ্বরে তাঁর! যোগমায়া ছেলেকে পেঁছে দিলেন দরজা পর্যন্ত—কিন্তু তাঁর কথাগুলো যেন বার বার ঘুরে বেড়াতে থাকল মন জুড়ে।

যথা সময়ে নৌকা ছাড়ল।

তরঙ্গায়িত গঙ্গা বক্ষে এক অপরূপ ছন্দ রচনা করে রাজচন্দ্রের নৌকা এগিয়ে যেতে থাকল ত্রিবেণী অভিমুখে।

আজ আবার থমকে দাঁড়ালেন হরেকৃষ্ণ!

দাঁড়াতে হলো তাঁকে। গ্রামের মুরুব্বীরা আবার হরেকৃষ্ণকে দাঁড় করালেন। তাঁদের সেই একই ভাবনা একই কথা—হরেকৃষ্ণ, ব্যাপারটা কি ভালো হচ্ছে? তুমি ধার্মিক লোক হয়ে গ্রামের মুখ হাসাবে দেখছি—. সমাজের মুখে চুনকালি মাখাবে শেষে—

হরেকৃষ্ণ বললেন. আপনাদের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

সমাজপতিরা বললেন, পারবে—বুঝতে পারবে · যখন তোমার কপাল পুড়বে তখন বুঝতে পারবে। দেখ হরেকৃষ্ণ, আজ পর্যন্ত এই কোনা গাঁয়ের একটা ঘর দেখাতে পার যে ঘরে দশ-এগার বছরের সমস্ত মেয়ের বিয়ে হয় নি—পড়ে আছে—

হরেকৃষ্ণ এবার যেন কেঁপে উঠলেন। সত্যিই তো, দশ-এগার বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রেখে দেওয়া অন্যায়! আর এ অন্যায় বোধ একরাশ বিষাক্ত পোকার মত অহর্নিশি হরেকৃষ্ণকে যে কুরে কুরে খাচ্ছিল, যন্ত্রণা দিচ্ছিল তার খবর রাখে কজন! হাত দুখানা জোড় করে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভেজা ভেজা স্বরে বললেন হরেকৃষ্ণ—বিশ্বাস করুন আপনারা—

আমি সব জানি সব বুঝি, কিন্তু কি করবো বলুন—আপনারা তো জানেন আমার অবস্থা —সামান্য জমিজমা যা আছে তা চাষ করে দুবেলা পরিবারের মুখে আহার জোগাতে পারি না, যদি নুন আনতে যাই এদিকে পান্তা ফুরোয়—একদিকে যদি তালি মারি—অন্যদিকে ছিঁড়ে যায়—এর মধ্যে রাসমণির জন্য পাত্রের সন্ধান যে কত করেছি তার হিসেব নেই, কিন্তু যাঁরাই আমার রাসমণিকে দেখে গেছেন তাঁরাই বলেছেন —আমার কন্যা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—ভগবানের অংশে জন্ম, যখন বলেছি—যদি পছন্দ হয়েছে তবে বিলম্ব কেন ; শুভ কাজের জন্য পাকা ব্যবস্থা করা দরকার—কেউ রাজী হয় নি। পণ যা চেয়েছে তা আমি দিতে পারি নি। জমিজমা — মাথা গোঁজার মত কুঁড়েটা পর্যন্ত বিক্রী করলেও পণের টাকা হবে না জেনে আমি চুপ করে আছি—ঈশ্বরকে ডাকছি—তিনি যা করবেন তাই হবে—

সমাজপতিরা বললেন, তা তো করবেনই—দেখবে, একদিন ঐ মেলেচ্ছ ইংরেজগুলো বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার মেয়ের ওপর - তারপর বাঘ যেমন টুঁটি টিপে নিয়ে যায় তেমনি করে টেনে নিয়ে যাবে তোমার রাণীকে. এটা তোমার কতখানি লাগবে জানি না বাপু - তবে সমাজ কলঙ্কিত হবে—. তার চাইতে যেমন করে পার, যার সঙ্গে পার মেয়েকে পার করে দাও—

হরেকৃষ্ণ বললেন, তাই দেব -, যদি তা না পারি তা হলে ওকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব—কথাগুলো বলতে বলতে হরেকৃষ্ণর দুচোখ জলে ভিজে গেল !

বাড়ি ফিরে এলেন তিনি ! উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন,—রাসমণি— মা গো —

রামপ্রিয়া এক রকম ছুটে এলেন ঘর থেকে ! স্বামীর কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন বড় করুণ সুর ! রামপ্রিয়া দেখছেন, স্বামী যেন আজ বড় বেশী ক্লান্ত। ভাবনায় ভাবনায় মানুষটা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছেন !

সব কথাই খুলে বললেন হরেকৃষ্ণ ! সব কথা শুনে রামপ্রিয়ার মুখখানাও বিষন্নতায় ভরে গেল !

হরেকৃষ্ণ বললেন —রাসমণিকে দেখছি না কেন ?

রামপ্রিয়া বললেন, ওরা গঙ্গায় স্নান করতে গেছে—

হরেকৃষ্ণ বললেন. মেয়েটাকে আর গঙ্গায় যেতে দিও না বৌ—দিনকাল ভাল নয়—ইদানীং কোম্পানীর লালমুখোদের কথা যা শুনছি তা ভাল নয়, বিপত্তি ঘটতে কতক্ষণই বা লাগে—

রামপ্রিয়া সম্মতি জানালেন।

গতি মন্থর হলো।

রাজচন্দ্রের নির্দেশে নৌকার গতি মন্থর হলো। বন্ধুরা লক্ষ্য করলেন রাজচন্দ্রের দৃষ্টি স্থির। দুচোখের পাতায় কোন স্পন্দন নেই। তিনি যেন আত্মসমাহিত। রাজচন্দ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন, অবাক হওয়ার মত কিছু দেখেছেন তিনি। বন্ধুরা এবার সেই দৃষ্টি অনুসরণ করলেন। আবিষ্কার করলেন এক অপরূপ ছবি।

এমন করেই তো যা কিছু সুন্দর তাকে দেখতে হয়। এমন করেই তো সৌন্দর্যের প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে ঢেলে দিতে হয়। এ এক ভাব। এ যেন কৃষ্ণের সেই প্রেম ভাব। শ্রীরাধিকাকে দেখে শ্রীমাধবের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, এ যেন সেই ভাব—

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-খণ্ডন-খণ্ডন
বদন-বিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর-ভীত
চোরামণি হাস॥
আজু শ্যাম-বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু-সুখ-শত-সেবিত লাবণি
বরণি না যাই॥
কবরি-বকুল ফুলে আকুল অলিকুল মধু
পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিনি
রণরণি বোল॥
পদ পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর রণঝন
খঞ্জন-ভাষ।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণি দরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস॥

শরৎকালের চন্দ্রের শোভাকে পরাজিত করে, রাধার এমনই মুখের সৌন্দর্য। আর তাঁর অধরে যে স্মিত হাসি যা একটু প্রকাশ পেয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে—তা শ্যামের চিত্তকে হরণ করতে সক্ষম।

তার (রাধার) প্রত্যেক অঙ্গে (তনু তনু) যেন কাম দেবেরা শত শত দল বেঁধে সেবা করছে···ইত্যাদি।

বন্ধুদের মধ্যে কে যেন একজন বললেন, রাজচন্দ্র তোমার দৃষ্টির তারিফ

করতে হয় !

কথাটা কানে যেতেই লজ্জায় রাজচন্দ্রের মুখখানা রাঙা হয়ে গেল।

বন্ধুরা এবার দেখলেন, গঙ্গার তীরে যেন হাট বসেছে। রূপের হাট !

হালিশহর কোনাগাঁয়ের মেয়েরা স্নান করছেন ঘাটে।

ওদের মধ্যে আছে কিশোরী রাসমণি। পিসিমা ক্ষেমংকরী আছেন সঙ্গে। সকলের চাইতে রাসমণিই একটু বেশী উজ্জ্বল ! যেমন রূপ-তেমনি চেহারা। দশ বছরের মেয়ে যেন অষ্টাদশী। নীল আকাশে যেন পূর্ণিমার চাঁদ !

রাজচন্দ্র বোধহয় সেই পূর্ণিমার চাঁদই দেখছিলেন। দুচোখ ভরে দেখছিলেন। এক সময়ে তিনি বন্ধুদের বললেন. তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু গোপন আলোচনা আছে—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আলোচনা

বন্ধুরা কৌতূহল দমন করতে না পেরে রাজচন্দ্রকে ঘিরে বসলেন।

রাজচন্দ্র বললেন. আমার বাবার খুব ইচ্ছা—আমি আবার বিবাহ করি—

বন্ধুরা সকলেই এক সঙ্গে বলে উঠলেন, তিনি যথার্থই বলেছেন, আমরাও চাই রাজচন্দ্র তুমি পুনরায় বিবাহ কর, বিবাহ করা তোমার কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

পরক্ষণেই তাঁরা প্রশ্ন করেন, তোমার বাবা কি পাত্রীর সন্ধান পেয়েছেন ?

রাজচন্দ্র বললেন, আমি অনেক ভেবে বিবাহে সম্মতি দিয়েছি বটে. তবে উপযুক্ত পাত্রী না হলে আমি তৃতীয়বার বিবাহ করব না আমি নৌকা বিহারে আসবার আগে বাবাকে বলে এসেছিলাম, ত্রিবেণী থেকে না ফেরা পর্যন্ত তিনি যেন পাত্রীর সন্ধান না করেন—, এখন ভাবছি কেন বলেছিলাম সে কথা. তোমরা অনায়াসেই আমাকে বিশ্বাস করতে পার যে, এই ত্রিবেণী যাত্রার সঙ্গে পাত্রীর সন্ধানের কোন সম্পর্ক ছিল না ! এখন ভাবছি সে কথা আমি বলিনি. ঈশ্বরই আমার মুখ থেকে বলিয়ে নিয়েছিলেন—

বন্ধুরা আরও বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠলেন. হঠাৎ ত্রিবেণী যাবার পথে ঠিক এইখানে এই সময়ে তোমার এ কথা মনে এল কেন ? নৌকাকেই বা মন্থর করার নির্দেশ দিলে কেন—আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না !

রাজচন্দ্র বললেন, ঐ ঘাটে যাকে তোমরা দেখলে অমন একটি পাত্রী পেলে আমার বিবাহে অমত নেই—এ কথা শেষ হতে না হতেই রাজচন্দ্রকে নিয়ে ঠাট্টার বন্যা বয়ে গেল। —তার মানে ঐ মেয়েটিকে তোমার মনে ধরেছে ? বেশ তো ! যদি বলো, আমরা নৌকা ঘুরিয়ে ঐ ঘাটে ভিড়তে পারি—অনুসন্ধান করতে পারি সে কাদের ঘরের মেয়ে। মনে হয় এ সব ব্যাপারে

আমরা কৃতকার্য হতে পারব, এমন কি বিবাহের ব্যাপারটাও একেবারে পাকা করে ফিরতে পারি আমরা।

রাজচন্দ্র এবার বিরক্তির সুরে তাঁদের থামতে নির্দেশ দিলেন, আসলে ঠাট্টা করা থেকে তাঁদের বিরত থাকতে বললেন। নির্দেশ দিলেন, নৌকা ঘোরাও—

নির্দেশ জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

রাজচন্দ্র বললেন, চল জানবাজারে ফিরে চল—

এবার নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ল বাতাস। মধুময় আনন্দের বাতাস!

সব বৃত্তান্ত শুনলেন প্রীতিরাম।

বিস্তারিত শোনার পর প্রীতিরাম আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। এও কী কখনও হয়? এই তো সেদিন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে যাকে দেখেছিলেন, যাকে কল্পনার রঙে পুত্রবধূ রূপে রাঙিয়েছিলেন, রাজচন্দ্রের বর্ণনায় সেই একই প্রতিচ্ছবি! ভাবলেন প্রীতিরাম, তা হলে কি রাজচন্দ্র রাসমণিকে দেখেছেন ঘাটে! সর্বকাণ্ডের যিনি হোতা, সেই বিধির নির্দিষ্ট বিধান কি তবে এমন করে প্রকাশ করলেন তিনি! প্রীতিরাম অস্থির হলেন। ডেকে পাঠালেন বৃদ্ধ নায়েব মশাইকে। এর আগে, প্রীতিরাম যদিও বলেছিলেন নায়েব মশাই আর ক'জন লেঠেলকে সঙ্গে নিতে—কিন্তু রাজচন্দ্র কথা দিয়েও সে কথা রাখেন নি শেষ মুহূর্তে। আসলে বন্ধুদের নিয়ে নৌকা বিহারে নায়েব বা লেঠেল বড় বেমানান, তাই যাবার আগে ওটা বাদ দিয়েছিলেন রাজচন্দ্র। এখন নায়েব মশাই এসে দাঁড়াতেই আনন্দে দিশেহারা হয়ে বললেন, সব শুনেছেন নায়েব মশাই?

—হ্যাঁ শুনেছি, মায়ের কৃপা হয়েছে, বৃদ্ধ নায়েব মশায়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

প্রীতিরাম বললেন, আমি ধন্য-আমি ধন্য! আপনি আর দেরী করবেন না নায়েব মশাই, ঘটক মশাইকে একবার খবর দিন।

বৃদ্ধ নায়েব বললেন,—সে ব্যবস্থা আমি পূর্বেই করেছি, ঘটক মশাইকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি, তিনি এসে পড়বেন এখুনি; —কিন্তু আমি বলছিলাম, বাবা রাজচন্দ্র যে কন্যাটিকে দেখে এসেছে সে যে আপনার দেখা সেই কন্যা—সেই রাসমণি—এমন কথা ভাববার কি কোন কারণ আছে?—

প্রীতিরাম বললেন, নায়েব মশাই, যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন, আমি

নির্দেশ পালন করছি মাত্র রাজচন্দ্র যখন বিবাহে সম্মতি দিয়েছে এবং নৌকা থেকে যে মেয়েটিকে দেখে ওর অশান্ত মন প্রশান্তির প্রলেপ নিয়ে শান্ত হতে পেরেছে, সে রাসমণিই হোক আর অন্য কেউ হোক আমি সেই কন্যার অনুসন্ধানের জন্য ঘটক পাঠাব, প্রজাপতির নির্বন্ধ খণ্ডন করবে কে— !

ঘটক গেল হালিশহরে।

জানবাজার হলো মুখরিত। সকলের মুখে মুখে একই কথা, এতদিনে প্রীতিরামের প্রতি ঈশ্বরের করুণা হয়েছে, ছেলে রাজচন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন !

শুধু কথা নয়, এ তল্লাটে সকলের শুধু সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষা। সকলেই জানে, প্রীতিরাম ছেলের বিয়ে দেবেন যেমন তেমনভাবে নয়—রীতিমত রাজকীয়ভাবে। রাজপুত্রের বিয়ে মানে প্রজাকুলের লাভ। প্রীতিরাম তো রাজাই। অর্থে-সম্পদে রাজা না হলেও মনের দিক থেকে প্রীতিরাম তো রাজার-রাজা।

যথাসময়ে ঘটক মশাই ফিরে এলেন। ঘটক মশায়ের ফিরে আসবার খবর পেয়ে উদ্‌গ্রীব প্রীতিরাম নিতান্তই ছেলেমানুষের মত ছুটে গেলেন ঘটকের কাছে,—বলুন বলুন ঘটক মশাই, খবর বলুন—সন্ধান পেয়েছেন আমার মায়ের ?—বিস্তারিত জেনেছেন ?

ঘটক মশাই জানালেন, হ্যাঁ জেনেছি—

বিলম্ব যেন আর সয় না, বিলম্বে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চায়, তাই ঘটক মশায়ের কথা শেষ হবার আগেই প্রীতিরাম বলেন, কন্যার নাম রাসমণি, হরেকৃষ্ণ দাস মশায়ের একমাত্র কন্যা, কোনা গাঁয়ের কৈবর্ত পরিবার—? বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ?

ঘটক মশাই এই বর্ণনায় হতবাক ! নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন তিনি।

প্রীতিরাম সহসা যেন ধৈর্যের বাঁধন হারালেন। আনন্দে-উল্লাসে মুহূর্তে গোটা বাড়িটা মাতিয়ে তুললেন তিনি। তাঁর দুচোখ থেকে নেমে এল আনন্দের অশ্রুধারা। সেই আনন্দের অমৃতধারায় যোগমায়াও হলেন আত্মবিমোহিতা। এমন অদ্ভুত যোগাযোগ, এমন ঘটনা পার্থিব জীবনে কারও বোধ করি ঘটে না।

স্বয়ং রাজচন্দ্রও সংবাদটি শুনে বিস্মিত হলেন। একরাশ খুশিতে তাঁরও মন ভরে গেল।

প্রীতিরাম বললেন, নায়েব মশাই আপনি কোনাগাঁ যাবার আয়োজন

করুন—আমি আমার মাকে আশীর্বাদ করতে যাব, আসছে বোশেখে আমি এই শুভকর্ম সমাধা করতে চাই। পুরোহিত মশাইকে ডেকে বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট করুন—

প্রীতিরামের নির্দেশে কোনাগাঁয়ে যাবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করা হলো। পুরোহিত নির্দিষ্ট করলেন বিবাহের তারিখ। ৮ই বৈশাখ। ১২১১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ।

কান্নায় যার বুক ভেসে যাবার কথা তিনি কাঁদছেন না!

গর্বে যাঁর বুক ভরে যাবার কথা তিনি অনুপস্থিত!

একমাত্র মেয়ের সুখই যাঁর চরম কাম্য ছিল এই মুহূর্তে একমাত্র তিনিই নেই!

দু'চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে রামপ্রিয়ার আদরের নিধি, রামপ্রিয়ার নয়নের মণি 'রাণী'র!

রাণীর দুচোখের ধারায় ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে দু'গালের অংকিত শ্বেতচন্দন-আলপনা, মাতৃহারা বালিকা রাণীর বুকটা ফেটে যাচ্ছে। মায়ের মুখখানা বার বার মনে পড়ছে রাসমণির। মা নেই—অথচ চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মায়ের স্মৃতি! সেই শত স্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামপ্রিয়ার রক্ত-মাংসে. অস্তিত্বে সৃষ্ট একাদশবর্ষীয়া রাসমণি এই মুহূর্তে মায়ের জন্য বড় বেশী কাতর! সে কাঁদছে। মৃতা রামপ্রিয়ার দুপায়ের তলায় আলতা মাখিয়ে দুখানা কাগজে যে ছাপ তোলা হয়েছিল, মায়ের সেই পদচিহ্ন বুকের ভিতরে আঁকড়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদছে নব বিবাহিতা রাসমণি। তার কান্নায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে হরেকৃষ্ণর পর্ণকুটির! কোনাগাঁয়ের আলো-বাতাস!

পিসিমা ক্ষেমংকরী থেকে এ কুটিরে এই বিবাহ উপলক্ষে যাঁরা এসেছেন সবার চোখে জল। রাসমণি শ্বশুরবাড়ি যাবে এর মত আনন্দের আর কী থাকতে পারে, তবুও এই বিদায় মুহূর্তে হরেকৃষ্ণও ভেঙে পড়েছেন! বার বার যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন রামপ্রিয়ার কণ্ঠস্বর। পরলোক-অমৃতলোক থেকে রামপ্রিয়া যেন বলছেন—মেয়েকে নিয়ে তুমি এত ভেবো না গো, ঈশ্বর যখন মেয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর ভাবনা তিনিই ভেবে রেখেছেন, আমাদের রাণী, দেখে নিও রাজরাণী হবে—; *

* বাড়ির লাগোয়া আম-জাম-কাঁঠাল বাগানে বালিকা রাণী সহচরীদের সঙ্গে খেলা করত। আম গাছের ডালে দড়ি বেঁধে দোলনা করে সেই দোলনায় দোলা ছিল তার প্রধান খেলা। একদিন দোল খেতে খেতে রাণী দেখেছিল, এ বাগানের সব চাইতে পুরনো ডুমুর গাছে, ডুমুরের

রাসমণি রাজরাণী হয়েছে। রামপ্রিয়ার নয়নের মণি রাসমণি চলেছে শ্বশুরবাড়ি!

বড় দ্রুত ঘটনা ঘটে গেছে! অকালে চলে গেছেন রামপ্রিয়া। প্রিয়াহারা হরেকৃষ্ণ নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করলেন; মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন, সুখে থাক মা—সুখী হ—

ক্ষেমংকরী তার দাদা হরেকৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন—দাদা. রাণী তোমার পুণ্যের ফল, রাণী আমাদের চলার পথের আলো; রাণী জ্ঞানের আলো—ভক্তির আলো—বিশ্বাসের আলো, সেই আলোয় আমাদের অন্ধকার ঘুচবে—

রাজরাণী বেশে বালিকাবধূ রাসমণির শুভযাত্রার ক্ষণ সমাগত।

কোনাগাঁয়ের হরেকৃষ্ণ দাসের পর্ণকুটিরে অনেক যত্নে, অনেক ভাবনায়, অনেক কষ্টে যে শিউলি গাছের চারাটি নব শাখা-প্রশাখা আর পল্লবে প্রাণবন্ত হয়েছিল, হরেকৃষ্ণ নিজের হাতে সেই চারাটি তুলে অর্পণ করলেন জানবাজারের ধনাঢ্য প্রীতিরাম দাসের হাতে। এই চারা একদিন মহীরুহ হবে।

এই গাছ একদিন অজস্র শিউলিতে ভরে যাবে। শিউলির সুবাসে আমোদিত হবে রাজচন্দ্রের আঙিনা। হরেকৃষ্ণ এবার রাজচন্দ্রের দুখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললেন, আমার ঘরের, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ যে সম্পদ তা তোমার হাতে তুলে দিলাম বাবা—রাণী আমাদের অনেক সাধনার ফল! রাণীর মা রামপ্রিয়া যদি আজ থাকতেন তা হলে তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করতেন. স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই তিনি আশীর্বাদ করছেন—

রাজচন্দ্রের মনটাও ভারাক্রান্ত। এই শুভক্ষণে শাশুড়ি মাতা ঠাকুরাণী রামপ্রিয়া যদি থাকতেন তা হলে ষোলকলা পূর্ণ হতে পারত! রাসমণিকে

ফুল। এক গুচ্ছ ডুমুরের মধ্যে একটি ফুল। রাণী তার সহচরীদের সেই ফুল দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু একমাত্র বালিকা রাণী ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পেল না, রাণী কথাটা মাকে বলেছিল সবিস্তারে। মা শুনে মেয়েকে বলেছিলেন—তুই রাজরাণী হবি—, পরবর্তী কালে তাই হয়েছিল। এই ঘটনাকে অনেকেই হয়তো অবিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হয়। ইতিহাসে তার নজিরও আছে অনেক! এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ:

পুঁটিয়ার রাজবাড়িতে পূজারী ব্রাহ্মণ হয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন. নাটোর রাজ-বংশের আদিপুরুষ। একবার তিনি একটি গাছের তলায়, দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুখের উপর ছড়িয়ে ছিল সূর্যের প্রখর রশ্মি। হঠাৎ একটি কেউটে সাপ সেই সূর্যরশ্মি যাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে তার জন্য ফণা বিস্তার করে রোদের তাপ প্রতিরোধ করেছিল! এও এক দৈব ঘটনা! এরই ফলশ্রুতি, সেই পূজারী ব্রাহ্মণ পরে রাজা হয়েছিলেন। এই কাহিনী যদি সত্যি হয়. বালিকা রাসমণির ডুমুরের ফুল দেখাও অসম্ভব নয়।

পৃথিবীর আলোয় এনে দেবার দায়িত্ব-কর্তব্যটুকু পালন করার জন্যেই বোধ করি রামপ্রিয়া বেঁচে ছিলেন। কাজ ফুরিয়েছে, তাই বোধ হয় হাসতে হাসতে চলে গেলেন তিনি!

রাসমণি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল!

শুভক্ষণে দুর্গানাম স্মরণ করে বজরা ছাড়ল। কোনাগাঁয়ের মাটির প্রতিমা চলেছেন জানবাজারের দেবালয়ে। ওখানে বোধন। ওখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এখানে বিসর্জন!



জানবাজারে সেদিন বোধন!

গোয়ালটুলির চার নং জমির ওপরে প্রীতিরাম দাসের যে বাড়ি, সেই বাড়িতে বসেছে নহবত নহবতে সানাইয়ের সুর। সেই সুরে শুধু জানবাজার নয় গোটা কলকাতা যেন এক অনাস্বাদিত খুশিতে ঝলমল।

আজ বৌভাত; আজ ফুল-শয্যা। ধনাঢ্য প্রীতিরাম কোন কার্পণ্য করেন নি! অনুষ্ঠানের কোথাও কোন ত্রুটি রাখেন নি! প্রভূত অর্থ ব্যয়ে আজ বধূবরণ উৎসব!

গোটা বাড়িতে শুধু ব্যস্ততা, আর সেই ব্যস্ততার মধ্যে আর এক অচিন্তনীয় ঘটনার জন্ম!

এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব! পরনে তাঁর গৈরিক বসন। জটা-জুটধারী, সৌম্য-নধর কান্তি। হাতে কমণ্ডলু। কাঁধে গৈরিক বস্ত্রের ঝোলা। সন্ন্যাসী বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে কাকে যেন খুঁজছেন। দু'চোখে তাঁর সেই খুঁজে ফেরার চঞ্চলতা। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। সামনে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের মানুষ। পরনে তাঁর একফালি চেলির ধুতি। খালি গায়ে একটি সাদা চাদর। মাথায় চুল নেই, বিনিময়ে প্রদীপের সলতের মত একটি টিকি। দেখলে সহজে বোঝা যায় তিনি এ বাড়ির নিত্য পূজারী।

সন্ন্যাসী আরও দু'পা এগিয়ে গিয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ডাকতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তাঁর মুখে ভাষা ফোটার আগেই ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে একটু বেশী মাত্রায় অসন্তোষের ভঙ্গিমায় বললেন, তোমার স্পর্ধা তো কম নয় দেখছি!

বলি, বলা নেই কওয়া নেই—একেবারে অন্দর মহলে ঢুকে যাচ্ছ যে! ভেবেছ তুমি কাপালিক বলে পার পাবে? সন্ন্যাসী বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ করলেন না। শান্ত-নম্র স্বরে বললেন, তোমার গলায় পৈতে, হাতে কমণ্ডলু, খালি পা—তুমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ পূজারী। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর—

পূজারীর মুখখানা এবার খুশিতে ঝলমল করে উঠল। সন্ন্যাসীর ব্যবহারে ব্রাহ্মণ খুশি। আর সেই খুশি খুশি ভাব নিয়ে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বললেন তিনি, আমি শুধু পূজারী নই বুঝলে, আমি এই বাড়ির নিত্য পূজারী ভট্‌চাজ বামুন। শুধু মুখে, প্রণাম গ্রহণ করুন বললে তো হবে না, এই শ্রীচরণ যুগলের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর—

সন্ন্যাসী বললেন, আমি তো দেখছি তুমি বেশ মজার লোক, তোমার তিল পরিমাণ সময় নষ্ট কর র উপায় নেই বলে আজ রাধাগোবিন্দের পূজায় মন বসাতে পারনি, রোজ রোজ যে ছাগল ছানাটা তোমার বাগানের বেড়া ভেঙে তোমার সাধের সব সব্জী খেয়ে ফেলে—তোমার মন পড়ে আছে সেই বাগানে, ছাগল ছানাটাকে মোক্ষম শিক্ষা দেবার জন্যে তুমি পূজা শেষ না করেই যাচ্ছ বাগানে—অথচ আমার প্রণাম নেবার জন্যে যে সময়টুকু যাবে তা তুমি দিতে চাও—তা হলে এগুলো তোমার মুখ্য, গৌণ এ পূজা-অর্চনা কি বলো?

সন্ন্যাসীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিস্ময়ে হতবাক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ পর নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়ে বললেন, তুমি কাপালিকের বেশে একজন জ্যোতিষী। বেশ, তা হলে একটা কথা তোমাকে বলি, মনের কথাটা যখন টেনে বার করেছ—তখন আমায় একটা পথ বাতলে দাও। যদি ঠিক ঠিক আমি যে পথের সন্ধান করছি সেই পথের সন্ধান দিতে পার, যদি সেই পথ ধরে গিয়ে মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারি তা হলে আমি তোমাকে ছ'আনা বখরা দেব। দশ আনা ছ-আনা, দশ-আনা আমার আর ছ'আনা তোমার—

সন্ন্যাসীর দু'চোখের দুই তারা জয়ের আনন্দে যেন দিশেহারা। ব্রাহ্মণ বংশজাত, কুলশ্রেষ্ঠ একটি মানুষের অহঙ্কারী-লোভী-ঘৃণ্য মনোবৃত্তির এই রূপটিকে প্রকটিত হতে দেখে সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে কৌতুকের ছোঁয়া! যেন আনন্দিতভাবেই তিনি বললেন, বলো ব্রাহ্মণ, কোন পথের সন্ধান চাও—

পূজারীর সারা মন জুড়ে তখন একটা আশংকা! বাড়ির ভিতরের অংশে দাঁড়িয়ে একজন কাপালিকের সঙ্গে কথা বলার জন্য হয়তো ভয় নেই, কিন্তু ভয়, মনের কথাগুলোকে ঠিক এখানে এই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করায়। যে পথের সন্ধান, সে একান্ত গোপনীয়, সুতরাং একটু আড়ালে গিয়ে আলোচনা

বাঞ্ছনীয় মনে করে ব্রাহ্মণ বললেন, তা হলে একটু আড়ালে চল · আমি যা বলব তা একান্ত নিভৃতে বলা দরকার। ব্যাপারটা যদি কেউ শুনে ফেলে, আমি হয়তো নানাভাবে কথা ঘোরাতে পারব, আমাকে হয়তো কেউ অবিশ্বাস করবে না—সন্দেহও করবে না, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করতে পারব না – জমিদার প্রীতিরামের লেঠেলরা তোমার কোন কথা বিশ্বাস করবে না, হয়তো পিটিয়ে তোমাকে মেরেও ফেলতে পারে। তাই একটু আড়ালে চল. সব কথা বলাও যাবে আর তাতে নির্বিঘ্নে তোমার আমার কার্যোদ্ধারও হবে--

সন্ন্যাসী নির্ভিকভাবে শান্ত স্বরে বললেন, ব্রাহ্মণ,. তোমার কোন ভয় নেই –এখানেই বলো. আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি-ঠিক এই মুহূর্তে কেউ এদিকে আসবে না, কারও কানে যাবে না এ সব কথা—

পূজারী বললেন. দেখ. আমি বহুদিন যাবৎ এ বাড়িতে রাধা-গোবিন্দের পুজো করছি—আমার চোখের সামনে এ বাড়ির কর্তা প্রীতিরামের শুধু উন্নতি দেখলুম। আমার পুজোর গুণে এ বাড়িতে শুধু টাকা আর টাকা! কিন্তু আমি যা ছিলুম তাই আছি, বিঘে দশেকের জমি কিনবো—অথচ সামান্য টাকার জন্য কিনতে পারছি না, যেটুকু জমি আছে তাতে ফসল ফলেছে অনেক, কিন্তু টাকার অভাবে বেড়া দিতে পারছি না বলে ছাগলে খেয়ে যাচ্ছে—তুমি বলে দাও দিকিনি কি ভাবে ঐ দশ বিঘে জমি কেনা যায়—কিভাবে অনেক টাকা পাওয়া যায়--

সন্ন্যাসীর মুখে হাসির রেখা। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বললেন. সে পথ তো আমার জানা নেই ব্রাহ্মণ, বরং তুমি আমার একটি পরম উপকার কর, আমাকে এ বাড়ির অন্দর মহলে একবার নিয়ে চল, আজ এখানে দেবীর বোধন—

সন্ন্যাসীর কথায় ব্রাহ্মণ উত্তেজিত হলেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন, তুমি শঠ-প্রবঞ্চক। আমার সঙ্গে ফাজলামো করা হচ্ছে। আজ এই বাড়িতে দেবীর বোধন মানে?

সন্ন্যাসী বিনয়ের স্বরে বললেন, আজ এ বাড়ির রাজপুত্তুরের মধু মিলনের রাত, আজ প্রীতিরামের পুত্র রাজচন্দ্রের বৌভাত—আজ শ্রীরাধিকা আর শ্রীমাধবের মধু যামিনী, তাই আজ প্রীতিরামের বাড়িতে দেবী বোধন—আমাকে একবার অন্দর মহলে নিয়ে চল; সন্ন্যাসীর কণ্ঠে আকুতি!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে ব্রাহ্মণ বললেন, তোমার সাহস তো কম নয়। ভেবেছ তোমার চালাকি আমি ধরতে পারিনি, নানাভাবে অনেক খবর সংগ্রহ করে এই সাধুর বেশ ধরে

এসে ভেবেছ আজ ফুলশয্যার রাতে বেশ বড় ধরনের একটা ডাকাতি করে যাবে --দাঁড়াও আমি তোমার দেখাচ্ছি মজা—

ব্রাহ্মণ যত বেশী উত্তেজিত—সন্ন্যাসী তত বেশী মাটির মানুষ। আর এ সবই ঈশ্বরের নির্দিষ্ট খেলা।

সেই খেলার মধ্যে অকস্মাৎ রাজচন্দ্রের প্রবেশ।

মাত্র একুশ বছরের দৃপ্ত যুবক রাজচন্দ্র যেন সাক্ষাৎ রাজপুত্র। একুশ বছরের ছেলের এমন চেহারা খুবই বিরল। সুপুরুষ। সেই রাজচন্দ্রের দু'চোখে বিস্ময়। সন্ন্যাসীর দিকে চোখ রেখে রাজচন্দ্র অভিভূত। এ তো সন্ন্যাসী দর্শন নয় যেন দেব দর্শন।

রাজচন্দ্রকে দেখে ব্রাহ্মণ এক রকম ছুটেই কাছে গেলেন। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে তিনি যুবক রাজচন্দ্রের দু'পায়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করার মত ভঙ্গি করে সহর্ষ উচ্ছ্বাসে বললেন, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন -

রাজচন্দ্র চমকে উঠলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—পিতৃতুল্য নিত্য পূজারীর এই অস্বাভাবিক আচরণে রাজচন্দ্র বিস্মিত হলেন। ব্রাহ্মণের হাতের স্পর্শ শূদ্রের পায়ে লাগুক সেই ভয়ে রাজচন্দ্র দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ. এ কী করছেন আপনি! আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন! আপনি একে আমাদের গৃহদেবতা রাধামাধবের নিত্য পূজারী তার উপর ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ —আপনি কি আমাকে অহেতুক পাপের ভাগী করতে চান—তারপর ব্রাহ্মণের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রাজচন্দ্র সন্ন্যাসীর উদ্দেশে বললেন, আপনি আমার প্রণাম নিন, বলুন আজ এই শুভ দিনে আমি আপনার কেমন সেবায় লাগতে পারি—

কুল পুরোহিতের সামনে একজন কাপালিকের প্রতি রাজচন্দ্রের এই আচরণ ঠিক নয়, এই আচরণে কুল-পুরোহিতের অসম্মান, শুধু এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যুবক রাজচন্দ্রের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। রাজচন্দ্র বিন্দুমাত্র মানসিক ভারসাম্য না হারিয়ে অনাহূত সন্ন্যাসীর জন্য সেবা-আয়োজনের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন! বললেন, প্রভু, আপনি আমাদের পরম অতিথি—আজ এই দিনে আপনার পদধূলিতে আমাদের গৃহ পবিত্র হয়েছে, সন্ন্যাসী রূপে আপনি কে তা জানবার অধিকার আমার নেই—আপনি নররূপে নারায়ণ—বলুন আপনার কোন বাসনা পূর্ণ করবো?

সন্ন্যাসী বললেন, কথা দাও আমি যা চাই তা দিতে তুমি দ্বিধাবোধ করবে না। রাজচন্দ্র বললেন, আমি কথা দিলাম প্রভু। আপনি যা চাইবেন আমি

হাসি মুখে আপনার পায়ে তা অঞ্জলি দেব, এমন কি আপনি যদি আমার প্রাণ ভিক্ষা করেন, আমি হাসিমুখে প্রাণ দান করব—

রাজচন্দ্রের কথা শেষ হতে না হতে উত্তেজিত বৃদ্ধ পুরোহিত বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। রাজচন্দ্রের এই ছেলেমানুষীতে একটা বিরাট অঘটন ঘটে যেতে পারে, সুতরাং সময় থাকতে তাকে সংযত করা দরকার মনে করে পুরোহিত সোজা গেলেন প্রীতিরামের কাছে। উদ্দেশ্য, প্রীতিরামকে সব ব্যাপারটা জানিয়ে রাজচন্দ্রের এই উচ্ছ্বাস বন্ধ করে দেওয়া।

রাজচন্দ্র তবুও থামলেন না। অন্তরে তখন তাঁর ভক্তির ফল্গুধারা।

সন্ন্যাসী জানালেন তিনি এ বাড়ির বালিকা বধূ রাসমণি দাসীর সঙ্গে একবার দেখা করবেন। নিভৃত সাক্ষাৎ। একান্ত গোপনীয় সাক্ষাৎকার। সন্ন্যাসীর এই অভিপ্রায় জেনেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তেজিত হয়ে চলে গেলেন। রাজচন্দ্র এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। এক সন্ন্যাসীর অযাচিত অনুপ্রবেশ শুধু নয় নববধূ রাসমণির সঙ্গে তাঁর নিভৃত সাক্ষাতের একান্ত বাসনা অর্থাৎ জানবাজারের জমিদার প্রীতিরাম দাসের প্রাসাদ অভ্যন্তরের যে রক্ষণশীল জীবনধারা সেখানে আকস্মিক বিপর্যয়।

বিপর্যয় বৈ কি। প্রীতিরাম যখন শুনবেন এ কথা তখন হয়তো সহজভাবে মেনে নিতে পারবেন না। নব-পুত্রবধূকে হয়তো অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে আসবার অথবা নিভৃতে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নাও দিতে পারেন। রাজচন্দ্র তবুও সংযম হারালেন না। অতি বিনয়ের সঙ্গে সেই সন্ন্যাসীকে নীচে অতিথি শালায় বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে ফিরে এলেন অন্দরমহলে।

প্রথমে মায়ের কাছে সব কথা পরিষ্কার করে বললেন রাজচন্দ্র। সব শুনে যোগমায়া দেবী একটু বেশী মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলে উঠল তাঁর অন্তর। সন্ন্যাসীকে যে মুহূর্তে যোগমায়া নররূপী নারায়ণ ভাবছেন আর পর মুহূর্তেই সন্ন্যাসীর এই প্রস্তাবকে ঈশ্বরীয় ঘটনা ভাবতে পারছেন না। তবুও তিনি রাজচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেন না, সম্মতি জানালেন। সম্মতি জানালেন প্রীতিরামও। প্রীতিরামের বিশ্বাস, এ ঈশ্বরের এক পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর স্বয়ং নববধূ রাসমণির অনুমতি একান্ত প্রয়োজন। রাজচন্দ্র গেলেন রাসমণির কাছে। রাজচন্দ্রের মুখে ভাষা ফোটার আগেই রাসমণি বললেন, আমি যাব—আপনি আমাকে নিয়ে চলুন ; —বিস্ময়ে হতবাক রাজচন্দ্র। কি প্রার্থনা নিয়ে তিনি এসেছেন, কি ভাবনা নিয়ে তিনি এসেছেন,

কোন কিছু প্রকাশ করার আগেই নিতান্ত অন্তর্যামীর মত রাসমণির এই আবেদন। তথাপি রাজচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেন এসেছি—কি চাইতে এসেছি তাতো বলিনি তোমাকে, অথচ—

রাসমণি বললেন, আপনি তো আমাকে নিতে এসেছেন, আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে যাব—;

রাজচন্দ্রের কৌতূহল আরও বেশী তীব্র হয়ে উঠল। এ বাড়িতে একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছে সে সংবাদ রাসমণি পেলেন কেমন করে! মনে পড়ল নিত্যপূজারীর কথা। পূজারী ব্রাহ্মণ কি তা হলে সবার আগে সন্ন্যাসীর কথা পেঁাছে দিয়ে গেছেন রাসমণির কাছে! নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে রাজচন্দ্র বললেন, আমি অবাক হয়ে গেছি একটি ব্যাপারে—

রাজচন্দ্রের কথা শেষ হবার আগেই রাসমণি বললেন, আমি জানি কি ভাবছেন আপনি…

রাজচন্দ্র বললেন, কি ভাবছি তাও তুমি বলে দিতে পার?

রাসমণি হাসলেন। শান্ত, মৃদু হাসি। হাসতে হাসতে বললেন, আপনি ভাবছেন আমি কেমন করে জেনেছি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা, কেউ আমাকে বলেছেন কিনা—এই তো? না, কেউ আমাকে কিছু বলেন নি। আমি জানি। আমাদের কোনাগাঁয়ের বাড়িতে যে রঘুনাথ ছিলেন, স্বপ্নে সেই রঘুনাথই বলেছেন আমাকে—উনি সাধারণ সন্ন্যাসী নন, আপনি আমাকে নিয়ে চলুন—

রাজচন্দ্র বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। ফুল-সাজে সজ্জিতা, চন্দন চর্চিতা বালিকা বধূ রাসমণিকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়ে রাজচন্দ্র এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়ে সন্ন্যাসীকে আহ্বান জানালেন তিনি। আত্মনিবেদনের ভাব ভঙ্গিমায় রাজচন্দ্র সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন প্রাসাদ অভ্যন্তরে, একেবারে আপন শয়নকক্ষে।

রাসমণির সারা মন জুড়ে তখন এক অনাস্বাদিত খুশির হিল্লোল। এক রকম ছুটে এসে সন্ন্যাসীর পাদপদ্মে অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে যখন দু'চোখ মেলে তাকালেন, তখন দু'চোখে অবিরাম অশ্রুধারা।

সন্ন্যাসীর অধরে হাসির রেখা। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। সন্ন্যাসী তাঁর গৈরিক বর্ণের ঝোলা থেকে অতি সন্তর্পণে বার করলেন এক কৃষ্ণবর্ণের শিলাখণ্ড। বালিকাবধূ রাসমণির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তোমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস আর ভক্তিতে স্বয়ং রঘুনাথ প্রীত হয়েছেন, ইনিই তোমার আরাধ্য রঘুনাথ। এঁকেই প্রতিষ্ঠা করবে তুমি—

আনন্দে দিশাহারা রাসমণি রঘুনাথের সেই শিলাখণ্ড বক্ষে ধারণ করে ছুটে গেলেন রাজচন্দ্রের কাছে, ছুটে গেলেন শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে। যাঁরা দেখলেন—যাঁরা শুনলেন, তাঁরাই বিস্ময়ে হতবাক! এও কী সম্ভব!

সকলের স্থির বিশ্বাস-স্বয়ং রঘুনাথ সন্ন্যাসীর বেশে এসেছেন এই জানবাজারের বাড়িতে।

সকলে ছুটে এলেন। তন্নতন্ন করে খুঁজলেন গোটা বাড়িটা! প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে যে দারোয়ান, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সবাই, কিন্তু কোথাও সন্ন্যাসীর সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ সেই সন্ন্যাসীকে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও দেখেননি।

রাসমণি আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। সেইদিন স্বয়ং রঘুনাথের পাদস্পর্শে জানবাজারের প্রাসাদ পরমতীর্থে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর ধর্মতলা পোস্ট অফিসের পাশে কমলালয় স্টোর্সের বিপরীত দিকের সংকীর্ণ গলিটার নাম গোয়ালটুলি। *

এই শীর্ণকায় পথ ধরে সোজা এগিয়ে অনেকটা ভিতরে পেঁছে এখন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও সেদিনের সেই স্মরণীয় স্মৃতির কিছুমাত্র চোখে পড়বে না। রাজচন্দ্র আর রাসমণির বিবাহ-বাসর বসেছিল যে বাড়িতে সেই বাড়িটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। কিন্তু ইতিহাস বলছে এই গোয়ালটুলির গলিতে একটি বাড়ি ধনাঢ্য প্রীতিরাম তাঁর পুত্র রাজচন্দ্রের বিয়ের জন্য এবং কিছুদিনের জন্য বসবাসের ব্যাপারে মনোনীত করেছিলেন।

পুত্রের বিবাহ বাসরের জন্য গোটা কলকাতায় তখন অজস্র বাড়ি পেতে পারতেন প্রীতিরাম, কিন্তু সব ছেড়ে এই গোয়ালটুলি কেন? অবশ্যই কারণ ছিল। এখন এই গোয়ালটুলি গলিটা দেখলে কারণ সহজেই ধরা পড়তে পারে। গোয়ালটুলির এক মুখ মিশেছে ধর্মতলা স্ট্রীটে, অন্যমুখ এস, এন, ব্যানার্জী রোড অধুনা রাণী রাসমণি রোডে। ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে ঢুকে ওদিকে বেরুতে গেলে সামনেই যে বিশাল-বিস্তৃত প্রাসাদ প্রথমেই নজরে পড়ে ওটিই প্রীতিরামের আর এক কীর্তি।

রাজচন্দ্রের বিয়ের দিন ধার্য করার আগেই ঐ বিশাল জমিতে মনের মত বাড়ি তৈরি করার বাসনায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রীতিরাম। ছিল বিরাট আস্তাবল। আজ ওপথে চলতে গিয়ে এই প্রাসাদের

* এখন আর কমলালয় স্টোর্স নেই। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে

দিকে নজর পড়লে শহর কলকাতার অনেক উল্লেখযোগ্য পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে। মনে আসে এক অভিজাত, ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাপরাক্রমের কথা। মনে পড়ে এক মহৎ প্রাণ আর এক মহীয়সী নারীর কথা, যিনি একাধারে ভক্তি এবং শক্তির আধার। মনে পড়ে সেই পুণ্যবতী, অষ্ট সখীর এক সখী রাণী রাসমণির কথা।

প্রীতিরাম তাঁর পুত্র রাজচন্দ্রের তৃতীয়বার বিয়ে দিলেন রাসমণির সঙ্গে ১৮০৩ সালে, আর ঐ বিশাল প্রাসাদ তৈরির কাজ শেষ করেছিলেন ১৮১৩ সালের মধ্যে। এই দশ বছরে একাধিকবার প্রীতিরাম আনন্দ সাগরে ডুব দিয়েছেন। একরাশ খুশিতে ঝলমল করে উঠেছেন। আঘাতে আঘাতে প্রীতিরামের যে দরাজ মনটা ভেঙেগ—দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল, এই দশ বছরের মধ্যে সেই মনটাকে পূর্ণমাত্রায় প্রশান্তিতে ভরিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। অনেক বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে চলতে হয়েছিল তাঁকে। সহজ পথে সাফল্য করায়ত্ত হয়নি তাঁর।

প্রীতিরামের পুণ্যের জোর ছিল বৈকি। পূর্ব জন্মের পুণ্যফল ভোগ করতে এ জন্মে প্রীতিরামের জন্ম হয়েছিল। যাকে প্রারব্ধের ফলভোগ বলতে পারেন অনেকে। তাই বোধ করি অতি সাধারণ অবস্থার ভিতর দিয়ে পুরুষকারকে সম্বল করে প্রীতিরাম পেঁছে গিয়েছিলেন সৌভাগ্যের শিখরে! প্রীতিরাম হয়েছিলেন দুই পুত্রের জনক! আবার সেই পুত্রদের ভাগ্য লিখন প্রীতিরামকে বার বার আঘাত করেছে!

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রীতিরাম প্রথম পুত্র হরচন্দ্রকে লাভ করেন। এরপর মাত্র চার বছর কাটল না, আবার প্রীতিরামের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম হলো রাজচন্দ্রের। প্রীতিরামের দ্বিতীয় সন্তান ঐশ্বর্যের পর ঐশ্বর্য। তবুও মাঝে মাঝে প্রীতিরাম আর যোগমায়া দেবীর মনের গভীরে একটা ব্যথা টনটন করে উঠত। একটি মেয়ে জন্মালে ষোলআনা পূর্ণ হত। সেখানে তখনও ঈশ্বর বিমুখ। কন্যা সন্তানের অভাব বোধ থেকে প্রীতিরামের আলাদা একটা অস্থিরতা ছিল। সারাদিন কাজকর্ম সেরে প্রীতিরাম যখন ঘরে ফিরতেন তখন এই ব্যথাটা বড় বেশি করে বুকে বাজত!

স্বামীর সামনে অন্ন-ব্যঞ্জন সাজিয়ে যখন তালপাতার পাখা নিয়ে বসতেন যোগমায়া, তখন ঘরের কথা শোনার, মনের কথা বলার সুযোগ ঘটত দাস মশায়ের।

একদিন তেমনি এক সুযোগে যোগমায়া বললেন, ভগবান আমাদের সব

দিয়েছেন, আমার মত ভাগ্যবতী ক'জন আছে বলো? নাই বা পেলাম আমরা মেয়ে, হিরের টুকরো দু'টো ছেলে পেয়েছি। রাধাগোবিন্দর যদি ইচ্ছে থাকে দেখবে আমরা মনের মত ছেলের বৌ আনব—

এবার অন্য যন্ত্রণা। ঐশ্বর্য যত বেশি, জীবন তার তুলনায় অনেক ছোট। তাই প্রীতিরাম অধীর হয়ে ওঠেন ছেলেদের জন্য। ঐশ্বর্য অনুপাতে দুই উত্তরাধিকারের যেন বয়স বাড়তে চায় না। প্রীতিরামের মনের ইচ্ছে, ছেলে দু'টোর বয়স তরতরিয়ে বেড়ে যাক। কিশোর বেলায় পিসিমার মাচায় যেমন লাউডগাটা তরতরিয়ে বাড়ত তেমনি করে তরতরিয়ে হরচন্দ্র আর রাজচন্দ্র বড় হোক। যৌবনে পা দিলেই বাজিমাৎ। মনের মত পুত্রবধূ এনে বাড়ি সাজাতে বিলম্ব হবে না প্রীতিরামের।

মনের কথা বোধ করি শুনলেন ইষ্টদেবতা। হরচন্দ্র তখন সদ্য যুবক। অনেক আশা নিয়ে, ভরসা নিয়ে ঘটক পাঠালেন প্রীতিরাম এক দিক থেকে আর এক দিকে। ঘটক ছুটলেন ঘরে ঘরে। লেখাপড়া শিখে হরচন্দ্রের বিদ্বান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না প্রীতিরাম। সেরেস্তার কাজকর্ম দেখার জন্য, কোম্পানীর কাগজ-পত্তর বোঝার জন্য যতটুকু বিদ্যের প্রয়োজন ততটুকু শেখাবার ব্যাপারটা দ্রুত পণ্ডিত রেখে সারলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে হরচন্দ্রের বিয়ের ফুল ফুটল। ঘটক খবর নিয়ে এলো ভাল মেয়ের। মহা সমারোহে হরচন্দ্রের বিয়ে দিলেন প্রীতিরাম। ঘরে লক্ষ্মী নিয়ে এলেন তিনি।

বিধি বাম। পুত্রবধূ আনলেন। কিন্তু হঠাৎ মহাসর্বনাশ ঘটে গেল।

১৮০২ সাল। বিয়ের ক'দিনের মধ্যে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। মাত্র ক'দিনের অসুস্থতায় হরচন্দ্রের মৃত্যু হলো। হতভাগিনী নববধূ, এ বাড়ির প্রথম পুত্রবধূ বিয়ের অর্থ বোঝার আগে, নব জীবনের স্বাদ পাবার আগে, শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর মুছে শ্বেতবস্ত্রে নিজেকে সাজিয়ে প্রবেশ করল নিঃসঙ্গ জীবনে। প্রীতিরাম এই প্রথম কঠিন-কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। জীবনের অর্থ বুঝলেন তিনি। দুনিয়ায় সত্য বলতে মৃত্যু, শ্রেষ্ঠ সেই সত্য উপলব্ধি করলেন। মৃত্যু হলো শ্যামসুন্দর, এই সত্য উপলব্ধি থেকে প্রীতিরাম বুক বাঁধলেন। অপুত্রক হরচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রীতিরাম হলেন বাস্তবধর্মী।

আবার ঘটক ছুটলেন। এবার রাজচন্দ্রের জন্য মনের মত মেয়ে খোঁজার তাগিদ। ততদিনে রাজচন্দ্র উপযুক্ত হয়েছেন।

খবর এলো। প্রভূত অর্থ ব্যয় করে রাজচন্দ্রের একবার নয় পর পর

দু'বার বিয়ে দিলেন প্রীতিরাম।

ভাগ্য বিরূপ হলে রক্ত-মাংসের মানুষ কিছুই করতে পারে না, সব মানুষই তার ভাগ্যের দাসানুদাস। ভাগ্য মানুষকে চালিত করে। প্রীতিরাম একটার পর একটা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে চলতে থাকলেন আর জীবন সম্পর্কে একটার পর একটা সত্যের সিংহদ্বার তাঁর চোখের সামনে উন্মুক্ত হতে থাকল। চানক গ্রামের (বর্তমান ব্যারাকপুর) একটি মেয়েকে রাজচন্দ্র প্রথম বিয়ে করেন। রাজচান্দ্রর প্রথম বিবাহের পর মাত্র ক'টা দিনও কাটেনি, নববধূর মৃত্যু হলো। দ্বিতীয়বার বিবাহের পরও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এরপর প্রীতিরাম থামলেন। পুরুষকারকে যে মানুষটি সব চাইতে বেশি বিশ্বাস করতেন, এবার সেই মানুষটি নতুন করে যেন ভাগ্যের লিখনকে বিশ্বাস করতে শিখলেন।

যোগমায়া আর প্রীতিরাম ভগ্ন হৃদয় নিয়ে সংসারের চার দেওয়ালের মধ্যে একটা করে দিন পার করতে থাকলেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে রাজচন্দ্রের মলিন মুখ ওঁদের ব্যথাকে তীব্র করতে থাকল। আসলে যা থাকার নয়, তা থাকে না। যিনি আসবেন. যাঁকে ঘিরে প্রীতিরামের ভাগ্যলক্ষ্মী সম্বর্ধিতা হবেন—তাঁর জন্যই শূন্য রয়ে গেল জানবাজারের বাড়ির আঙিনা। তার অন্য ইতিহাস। রাণী এলেন। রাণী রাসমণি। প্রীতিরামের জয় হলো!



মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ দেশের মাটিতে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা। তার আগের ইতিহাস যেমন ভয়াবহ তেমন মর্মান্তিক। অশিক্ষা, অনাচার. অত্যাচার আর পরাধীনতার শিকলে বাঁধা এ দেশের মানুষের কোন আলাদা মূল্য না থাকার মর্মন্তুদ কাহিনী। সেই পুরাতন চোখের জলের কাহিনীর সূচনাপর্ব থেকে এই জীবন-ইতিহাস রচনার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন এমন একটি সময় বা কাল—যেখান থেকে এই পর্বের শুরু না করলে রাণী রাসমণির প্রকৃত রূপ বা ব্যক্তিত্বের নিখুঁত ছবি আঁকা যাবে না।

আগেই ধর্মীয় চেতনার অবক্ষয়ের কথা বলেছি। সেই সঙ্গে সন্তান হত্যা, আত্মহত্যা হু হু করে বেড়ে যেতে থাকল চারদিকে। জগন্নাথের রথ যদি পবিত্র হয়, জগন্নাথের অস্তিত্ব যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, দুনিয়ার কোথাও যদি নররূপে নারায়ণ থেকে থাকেন, তিনি যদি আজও কোন রথের চাকায় চোখ রাখেন তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সভ্যতার চাপ চাপ রক্তের দাগ লেগে আছে রথের চাকায়। এই রথের চাকার তলায় সেদিন কত নর-নারী যে আত্মাহুতি দিয়েছিল তার হিসাব নেই।

বিধবাকে পিটিয়ে মেরে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে সহমরণের সূচনা সেই থেকে তৈরি করল মানুষ।

ইতিমধ্যে—শ্রীরামপুর হয়ে উঠেছে মিশনারীদের একচ্ছত্র পীঠস্থান। বাইবেল নিয়ে তাঁরা নেমে পড়লেন আসরে। এ দেশের মানুষ মাত্রেই খৃষ্টধর্ম অবলম্বী হবে এই তাঁদের প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য।

ধীরে ধীরে আর এক বিবর্তনের সূচনা হলো। তৈরি হতে থাকল অন্য ইতিহাস। মানুষের যে চেতনার বিলুপ্তি ঘটেছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে সেই চেতনা আবার ফিরে আসতে থাকল নতুন ভাবে। নতুন চিন্তার আলোয় অভিষিক্ত হয়ে। এল নব চেতনা আর নব জীবনের নবতম ধারা।

এ দেশের মানুষ পেল এক দেবতার সন্ধান। তিনি মানব-দেবতা। তিনি রাজা রামমোহন। তিনি জাতির জীবনে দিলেন স্বাধিকার চেতনা। এল নব জাগরণের কাল।

এ দেশের শাসনভার নিয়ে সর্বময় কর্তা হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৭৪ সালে, আর ইণ্ডিয়া গেজেট-এর বিবরণ অনুসারে রাজা রামমোহনের জন্ম বৎসরও সেই ১৭৭৪।

বাংলা তথা ভারতবাসীর পরিত্রাতা হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম বর্ষটি তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে শাসকের সিংহাসন লাভ, অন্যদিকে জনগণের মুক্তি ত্রাতার শুভ আবির্ভাব।

এর ঠিক বিশ বছরের মধ্যে রাণী রাসমণির জন্ম। এই সময়টিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই তাৎপর্যের পূর্ণ ব্যাখ্যার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সে কথায় পরে আসছি।

১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার চলন তখন এ দেশটাকে পুরোপুরি গ্রাস করেনি। ধীরে ধীরে এ

দেশের মাটিতে নানা নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে থাকে। এই নৈরাশ্য থেকে দেশকে, জাতিকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে রামমোহন তৈরি করেন 'আত্মীয় সভা'। এই সভায় যোগ দিলেন সেদিনকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোপীনাথ ঠাকুর, বৃন্দাবন মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু। বাংলার নব জাগরণের সূচনা সেই থেকে।

রামমোহনই মূলতঃ চেয়েছিলেন একটা গোষ্ঠী তৈরী করে দেশ ও দশের সর্বস্তরের কল্যাণ সাধন। চেয়েছিলেন শিক্ষার প্রসার। চেয়েছিলেন অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে গণদেবতাদের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করতে। এই সভায় নানা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হতো। বেদ পাঠ হতো। গীত হতো ব্রহ্মসংগীত।

এদিকে এ দেশে শুধু নয়, গোটা ভারতবর্ষে সহমরণ-এর মত কুপ্রথা ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকল। 'সতীদাহ'র মত নৃশংস হত্যালীলার শিকার হয়ে অকালে ঝরে গেল কত তাজা প্রাণ। অল্প বয়সের তরতাজা সদ্য স্বামী হারানো বধূদের একরকম জোর করে স্বামীর চিতায় তুলে দেবার মত বর্বর অত্যাচার—কুসংস্কারের হাত ধরে বেড়ে যেতে থাকল। এই সতীদাহ নিবারণের ব্যাপারে চারদিকে প্রতিবাদ ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল।

ইংরেজ সরকার কিন্তু তখনও নীরব। সতীদাহ চিরতরে বন্ধ হোক তা বোধ হয় চায়নি ইংরেজ সরকার! তখন প্রয়োজন হলো জনমত গঠন। জনগণকে একত্রিত করে, এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার মন্ত্রে জনগণকে দীক্ষিত করে তোলা দরকার মনে করলেন অনেকে! কাজটা সহজ ছিল না মোটেই। তবুও জনমত গঠন করার দীক্ষায় জনগণকে দীক্ষিত করে তোলার শপথ নিয়ে যিনি সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি রামমোহন! রামমোহনের যুদ্ধ যেমন থামল না, তেমনি রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ও বিন্দুমাত্র স্তিমিত হলো না।

নারীজাতির দুঃখ রামমোহনের হৃদয়কে বড় বেশী উদ্বেল করেছিল! একের পর এক প্রতিবাদ পুস্তিকা রচনা করলেন তিনি। নারীজাতির প্রতি সমাজের যতরকম অবিচার-অত্যাচার ছিল তার মধ্যে কন্যাপণ প্রথাও একটি। রামমোহন সেখানেও আঘাত হেনেছিলেন তীব্রভাবে! তিনিই সমাজে নারীজাতিকে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য, সব রকম দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি দেবার জন্য, পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে তদানীন্তন সরকারের কাছে আবেদন পেশ করেছিলেন

তীব্র ভাষায় !

১৮০৩ সালে রাণী রাসমণি জানবাজারের প্রাসাদে যখন বধূ হয়ে প্রবেশ করেছিলেন তখন নারীজাতির সব দিক থেকেই পরম দুর্ভাগ্যের কাল। সে যুগ পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্যাতনের যুগ ! রাণী রাসমণির জন্মকালের সামাজিক পরিস্থিতি এবং বিবাহের সময়কালের সামাজিক চেহারার রূপ ছিল একই। সেইকালে, সেই অসহায়তার যুগে জন্ম জন্মান্তরের আশীর্বাদ নিয়ে এ দেশের মাটিতে এক পুণ্যবতীর আবির্ভাব ঘটেছিল, নারী-কল্যাণ, নারী জাতির মর্যাদা রক্ষার প্রেরণা হিসাবে। তিনি রাসমণি !

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বলেছেন,—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

এই ভাবেই তো ঈশ্বর আসেন !

এই ভাবেই তো যাঁরা যে মূর্তি গড়েন, সেই মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি যে দেবতাকে আহ্বান জানান, মূর্তি অনুসারে সেই দেবতা এসে মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন রামের প্রতিমা গড়ে রামকে আহ্বান জানালে আবিভূর্ত হন রামচন্দ্র। কৃষ্ণ প্রতিমায় আসেন শ্রীকৃষ্ণ। অসুর মূর্তিতে অসুরেরই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

এই তো কর্মের বিধান। আমরা যেমন কর্ম করবো আমাদের ঠিক তেমনি ফললাভ হবে বৈ কি।

ঈশ্বর যাঁরা মানেন না, ঈশ্বর যাঁরা বিশ্বাস করেন না তাঁরা এক, আবার সেই বিশ্বাস যাঁদের আছে তাঁরা অন্য।

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। তাই ঈশ্বর আর অসুরের পাশাপাশি অবস্থান

এঁরাও কর্মী। এঁরা সবাই বিধি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি। বিধাতার নানা কর্মের দায়িত্ব নিয়ে মানুষের জন্ম। কর্ম ফুরলে সেই বিধাতার কোল। সেখানে কোন ভেদ নেই। যত ভেদাভেদ এখানে। পরম পরিত্রাতা যিনি তিনিই প্রকৃত বিচারক।

দেশে যখন অনাচার ও আসুরিক শক্তি প্রবল হয়ে অনিষ্ট সাধন করে

তখনই সব রকম পাপাচার থেকে পরিত্রাণের জন্যে পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘটে। মর্তে আবির্ভূত হন দেব-দেবী নররূপে আসেন নারায়ণ। নারীরূপে আসেন জননী যোগমায়া। আমাদের চারপাশে এমনি করে কতবার যে দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে, শুভশক্তির প্রকাশ হয়েছে তার হিসাব রাখে কে? বিশ্বাস করে ক'জন? সু আর কু কর্মের বিচার করতে শিখলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

হিন্দুধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যখনই নিদারুণ অবক্ষয় দেখা দিয়েছে ঠিক তখনই সেই অবক্ষয় থেকে ধর্ম আর সমাজকে রক্ষা করার জন্য জন্ম নিয়েছেন দেবতা! নারী সমাজের ভাবমূর্তি যখনই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে তখন স্বয়ং জগন্মাতার আবির্ভাব ঘটেছে নারীরূপে! এইভাবেই এক শুভ মুহূর্তে রাণী রাসমণি হয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন জগন্মাতা!

তাঁর মধ্যে ছিল শুভশক্তি। একদিকে যেমন লৌকিক ভাব-ভাবনার অভিনবত্বে সমাজে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন মায়ের আসনে, রাণীর যোগ্য মর্যাদায়, অন্য দিকে অলৌকিক আধ্যাত্মিকতায় তিনি হয়ে উঠেছেন- প্রণম্যা, ত্যাগে-তিতিক্ষায় অসামান্যা এক রমণী। লীলাময়ীর এ কোন লীলা! তাই বোধ করি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, রাণীমা অষ্ট সখীর এক সখী!



নারীকুলের জন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—'নিঃস্বার্থ স্বামী-সেবা রমণীর পরমধর্ম।'

ভগবান আরও বলেছেন, সেই সঙ্গে স্বামীর পিতামাতা, দেবর-ভাসুর, আত্মীয়-পরিজনেরও সেবা করতে হয় স্বার্থহীন মন নিয়ে। সন্তান সন্ততিদের যথাযোগ্য প্রতিপালন নারীর ধর্ম। নারীর কর্তব্য।

ভাগবতের সেই মর্মবাণী যে সময়ে আমাদের দেশের নারী-সমাজকে পুরুষ শাসিত সাম্রাজ্যের কুসংস্কার-ঘৃণ্য বেড়াজাল ভেংগে স্পর্শ করতে-পারছিল না, যখন ঘরে ঘরে মেয়েদের শাশ্বত মাতৃরূপ অনাদরে, অবহেলায় দলিত-মথিত হচ্ছিল ঠিক তখনই জানবাজারের প্রাসাদের গৃহলক্ষ্মীর আসনে সত্যি সত্যি রাণী রাসমণি লক্ষ্মী হয়ে বসলেন ! যেন মানব কল্যাণের ত্যাগিদে সংসার বেদীতে জগন্মাতার প্রতিষ্ঠা হলো !

'যেমন মা তেমনি মেয়ে'—মা-মেয়ের স্বভাব-ব্যবহার-আচার-আচরণ এ সবের শুভ-অশুভ দু'দিকেই এই প্রবাদ উচ্চারিত হয়। পারতপক্ষে শাশুড়ি-পুত্রবধূর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কারও মুখে এই প্রবাদ শোনা যায় না !

কিন্তু যোগমায়া দেবী আর রাণী রাসমণিকে নিয়ে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা ! সবাই বলতে লাগলেন —যেমন শাশুড়ি তেমনি ছেলের বৌ—; এ সব কথা যোগমায়ার যত কানে যায় ততই গর্বে বুকটা ভরে যায় তাঁর।

কথাটা স্বামীর কানেও তুলেছিলেন তিনি। একদিন প্রীতিরাম যখন নিজের ঘরে, সেগুন কাঠের কারুকার্য করা পালংকের ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন, তখন এ বাড়ির নব পুত্রবধূ রাসমণি ময়ূরীর মত ধীর পদক্ষেপে ঘরে এসেছিলেন। তাঁর দু'চরণে জড়ানো ছিল নূপুর। সর্বাঙ্গে ছড়ানো ছিল সোনার গয়না ! পদক্ষেপে সেই নূপুরের মৃদু শব্দ গোটা বাড়িতে অদ্ভুত একটা খুশির হিল্লোল তুলতো। প্রীতিরামের মনও খুশিতে ভরে যেত। প্রীতিরামের মনে একটা বিশ্বাস স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, তা হলো পুত্রবধূরূপে যেন স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী বিরাজ করছেন এখানে। শ্রীরাধিকা যেন মৃদু পদক্ষেপে চলেছেন অভিসারে। কুঞ্জবনে !

কথাটা যোগমায়াকে একদিন বলে ফেলেছিলেন প্রীতিরাম। রাতে সংসারের সব কাজ সেরে রাসমণি যখন স্বামীর ঘরে যান তখন সেই নূপুরের ধ্বনি কানে যায় প্রীতিরামের। সেদিনও গিয়েছিল। চাপা স্বরে প্রীতিরাম বলেছিলেন, বৌমার ঐ নূপুরের ধ্বনি তুমি রোজ শোন যোগমায়া ?

যোগমায়া বলেছিলেন, শুনি। আগের মত যদি সর্বক্ষণ তোমার সংসারের যাবতীয় কাজ নিয়ে আমাকে ডুবে থাকতে হতো তা হলে হয়তো কানে যেত না। বৌমা এখন আমাকে কোন কাজ করতে দেয় না। বলে, সারাজীবন কত পরিশ্রম করেছেন আপনি, এখন আমি এসেছি, এখনও যদি সেই পরিশ্রম করেন আমি যে কষ্ট পাব মা ! আপনি বরং আমাকে সব দেখিয়ে দেবেন, আমাকে কাজ শেখাবেন, আমি সব পারব মা—,

কোন কাজই তো করি না আমি, এখন সর্বক্ষণ আমার ছুটি, তাই

তোমার চাইতে আমি অনেক বেশী শুনি। প্রাণটা আমার জুড়িয়ে যায় গো। তাই তো ভয় হয়, এত সুখ কি কপালে আমাদের সইবে -, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল। হয়তো তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল আগের কথা। ঘটা করে ছেলেদের বৌ আনা হয়েছিল, মাত্র ক'দিনের মধ্যে তারা সব ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেই ভয় যোগমায়ার সারা মন জুড়ে বসেছিল। কিন্তু প্রীতিরামের আর সে ভয় ছিল না। প্রীতিরাম তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,— বড় বৌ, আমার বিশ্বাস আমাদের পথ দেখাতে স্বয়ং জগন্মাতা এসেছেন বৌমা হয়ে। তা ছাড়া একটা আশ্চর্যের ব্যাপার তো আমরা দেখলাম, কোনা গাঁয়ের ভাঙ্গা ঘরে আমাদের বেয়াই-মশাই যে রঘুবীরের পূজা করতেন, বৌমার সঙ্গে তিনিও আশ্চর্যভাবে এখানে চলে এলেন এক সাধুবেশে। তুমি ভেবো না, আমাদের আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ইষ্ট দেবতা আমাদের পরীক্ষা করছেন। সেই পরীক্ষায় আমরা জয়ী না হলে এমন পুত্রবধূ কেন পাব আমরা ?

যোগমায়া মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

আজ প্রীতিরামের বুকটা খুশিতে ভরে গেল। রাসমণি নূপুরের মৃদু শব্দ ছড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রীতিরাম বললেন,—বৌমা, শুনলাম তুমি নাকি তোমার মাকে বলেছ, নূপুর খুলে রাখবে, তুমি নাকি গয়না পরতে চাও না—

রাসমণি শান্ত, মৃদু স্বরে বলেছিলেন, নূপুরের শব্দে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই মাকে বলেছিলাম আপনি ঘরে এলে আমি নূপুর খুলে রাখব বাবা—

প্রীতিরাম বলেছিলেন, গয়না তোমার ভাল লাগে না কেন মা ?

রাসমণি বলেছিলেন, আমাদের দেশের মেয়েদের বড় কষ্ট বাবা ! শুনতে পাচ্ছি আমাদের দেশের কিছু মানুষ দিনরাত মেয়েদের লাঞ্ছিত করছে, ছোট ছোট মেয়েদের ওপর কী অত্যাচারই না করছে। যারা সহমরণে যেতে চায় না, যারা বাঁচতে চায়, তাদের মেরে মেরে জোর করে জ্বলন্ত চিতেয় তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে রাজা রামমোহন থেকে শুরু ক'রে আমাদের যাঁরা নমস্যজন তাঁদের চোখে ঘুম নেই বাবা। তাঁরা চাইছেন এই সহমরণ উচ্ছেদ করতে। এই বড় কাজে আমাদের কিছুই করার নেই। আমরা মেয়েরা শুধু মার খাব। পর্দার আড়াল থেকে, জানলার ফাঁক দিয়ে শুধু দেখবো, একদল মানুষ তাজা তাজা মেয়েদের মারতে মারতে, টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে চিতের ওপরে তুলবে বলে, আমিও দেখেছি বাবা। তাই এই গয়না আমার পরতে

মন চায় না। আপনার দেওয়া গয়না গা থেকে খুললে সংসারের অমঙ্গল হতে পারে, আপনার প্রতি অসম্মান দেখানো হতে পারে, তাই এখনও খুলিনি। আপনি অনুমতি করলে খুলে রাখবো, তুলে রাখবো। যখন দেখব আমার মত সব মেয়েরা সুখী হয়েছে, যখন দেখবো ঘরে ঘরে আপনার মত বাবারা সব মেয়েদের চোখের জল মুছিয়ে গয়না পরিয়ে দিচ্ছেন, স্নেহের গয়না, সেদিন আপনি যখন আবার আমাকে গয়না পরতে বলবেন, আমি পরবো বাবা—

বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন প্রীতিরাম। বছর বারো বয়সের এক রত্তি মেয়ের মুখে কী অসাধারণ কথা। এক রত্তি মেয়ের বুকের মধ্যে যেন গোটা নারী সমাজের জমাট বাঁধা ব্যথা।

প্রীতিরামের স্থির বিশ্বাস এ কথা তাঁর পুত্রের বালিকাবধূ রাসমণির কথা নয়। যেন জগন্মাতা তাঁর মন-বাসনা প্রকাশ করেছেন এই মুখ থেকে। তবুও প্রীতিরাম বলেছিলেন, বৌমা, আমি একজন সাধারণ মানুষ। গায়ে-গতরে খাটা সাধারণ মানুষ হলেও তোমার কথা আমি বুঝেছি। রাজা রামমোহন আর সেই সঙ্গে যাঁরা আজ যে মহান ব্রত নিয়েছেন, আমার মত সাধারণ একটা মানুষ সেই ব্রতে কোন কাজেই লাগে নি। শুনেছি, রাজচন্দ্র নাকি মাঝে মাঝে রামমোহনের এই আদর্শকে সামনে রেখে একটা কিছু করতে চায়। আমি শুনে খুশি হয়েছিলাম, আজ দেখছি তোমার মনেও সেই একই ভাব। একেই বোধহয় বলে রাজযোটক। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে, দেশের কল্যাণে তোমরা দুজনে যদি কোনদিন মেতে ওঠো আমি খুশি হবো, সেই কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম মা। তবে যতদিন বেঁচে থাকব, তুমি আমাকে নূপুরের ধ্বনি শুনিও। সব গয়না পরে আমার চোখের সামনে ঘুরে ফিরে বেড়িও। নূপুরের শব্দ শুনলে আমি শ্রীরাধিকার অস্তিত্ব অনুভব করি! আর তোমার সর্বাঙ্গে স্বর্ণঅলঙ্কার শোভা পেলে আমি মনে করবো আমার গৃহলক্ষ্মী মাকে আমি সাজিয়ে রাখতে পেরেছি! অসুর নিধন যজ্ঞ শুরু করে দেবতারা মিলিতভাবে শক্তির আরাধনা করেছিলেন, দশভুজা জগন্মাতা আবির্ভূতা হয়েছিলেন। রণক্ষেত্রে যাবার আগে যাঁর যা ঐশ্বর্য ছিল তাই দিয়ে মনের মত করে সাজিয়েছিলেন মাকে সবাই! শুধু অস্ত্রে নয়, স্বর্ণ অলঙ্কারেও মাকে রাজরাণী করে সাজানো হয়েছিল।

সেদিন ভিখারিণী বেশে যুদ্ধে যদি মাকে পাঠানো হতো তাহলে বোধ হয় মানাতো না। আমাদের চারিদিকে এখন অনেক সমস্যা, এ দেশের শাসনভার নিয়েছে ইংরেজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমরা ভৃত্য ছাড়া

আর কিছুই নয়, ওরা আমাদের অস্তিত্বকে পর্যন্ত স্বীকার করতে চাইছে না। এ ব্যাপারেও আমাদের দেশের শিক্ষিত, জ্ঞানী মানুষরা একদিন ফুঁসে উঠবে বৌমা,—আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, ইংরেজদের তাঁবেদারি করতে কেউ চাইবে না, পরাধীনতার শিকল ভেঙে বেরিয়ে পড়ার জন্য এ দেশের মাটিতে একটা বড় রকমের আগুন জ্বলবে। তখন যদি তোমরা সেই মহাযজ্ঞের অংশীদার হও আমার আত্মা যেখানেই থাক না কেন, সে তৃপ্তি পাবে। তাতে আমি তোমাকে ভিখারি রূপে দেখতে চাই না, দেখতে চাই রাণীর বেশে। যেদিন তোমরা জিতবে, সেদিন জেতার আনন্দে যদি সব কিছু ত্যাগ কর—তার অর্থ দাঁড়াবে গৌরবের।

রাসমণি মেনে নিয়েছিলেন প্রীতিরামের যুক্তি-উপদেশ। সেই দিন থেকে রাণী রাসমণির মধ্যে অন্য প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

একদিন আবার বিস্ময়ে হতবাক হলেন সবাই!

দেখলেন, রাসমণি একপাত্র জল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রীতিরাম বলেছিলেন, এক পাত্র জল কেন মা?

রাসমণি বলেছিলেন, এই জলে আপনি আপনার পা দিয়ে স্পর্শ করুন।—

এইভাবে ভিক্ষাপাত্রের মত জলপাত্র নিয়ে রাসমণি শাশুড়ি এবং স্বামীর কাছ থেকে পাদোদক ভিক্ষা করেছিলেন।

রাজচন্দ্র বলেছিলেন, রাণী, তুমি নাকি রোজ অন্ন গ্রহণ করার আগে এই পাদোদক খাও?

রাসমণি বলেছিলেন, আমরা মন্দিরে গিয়ে চরণামৃত পান করি! শরীর মন জুড়িয়ে যায়! আমরা বিশ্বাস করি প্রতিমার মধ্যে দেবতা আছেন, তাই দেবতার চরণামৃত খেয়ে আত্মসুখ পাই। কিন্তু আমার বাবা বলেন, পুজো-অর্চনা, দেবতার নাম-গান সবই করবে, কিন্তু মনে রাখবে সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। সেই ঈশ্বর হলেন মা-বাবা, ঈশ্বর হলেন পতি। সেই ঈশ্বরের চরণামৃত খেলে দোষ কী?

এই জানবাজারের বাড়িতে রাণী রাসমণি এলেন আর প্রীতিরামের জমিদারীর আয় বাড়তে লাগল।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রীতিরাম ধীরে ধীরে তাঁর সব কিছুরই দায় এবং দায়িত্বভার ছেলে রাজচন্দ্রর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। আবার জমিদারীর সব কিছুর দায়িত্বভার হাতে তুলে নিয়ে রাজচন্দ্র কিন্তু আয়াসে-আরামে থাকতে

পারেন নি। তিনিও আয় বাড়িয়েছিলেন।

লোকে কথায় বলে 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন,' রাজচন্দ্রের জীবনে সেই কথা সত্য হয়েছিল।

রাসমণিকে স্ত্রীরূপে বরণ করে আনার পর থেকে এবাড়ির আয় বৃদ্ধি হয়েছে। ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সঙ্গে সংসার থাকলে মানুষ যা যা চায় ঈশ্বর তা দু'হাত ভরে দিয়েছেন।

প্রীতিরাম আর যোগমায়া দু'জনে দু'বেলা যা কামনা করতেন ঈশ্বর তা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।

তাঁদের স্বপ্ন ছিল, এই বাড়ি শিশুর কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠুক। রাজচন্দ্র আর রাসমণির আশাও ছিল তাই। পিতা-মাতার বর্তমানে যদি সন্তান লাভ হয়—ষোলকলা পূর্ণ! তাই হয়েছিল। ১২১৩ সনে রাসমণির কোলে সন্তান এলো।

কন্যা সন্তান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রথমেই কন্যা সন্তান জন্মেছে বলে কিন্তু এ বাড়ির কারও মনে কোন ব্যথা লাগেনি। অথচ এমন একটা কুসংস্কার তখন ঘরে ঘরে বেঁচে ছিল।

পুত্র সন্তান জন্মালে সংসারের নাকি ষোল আনা কল্যাণ। তাই একটি কন্যা সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হতো তখন একটি পুত্র সন্তানের মত সবাইকে আনন্দে-খুশিতে ভরে উঠতে দেখা যেত না।

ছেলে জন্মালে শাঁখ বাজবে মেয়ে জন্মালে ও শাঁখ কেউ বাজাল কি বাজাল না অন্ততঃ অভিভাবকস্থানীয় কারও তাতে কিছু যায় আসে না। নারী-জন্মের অভিশাপ লগ্নে রাসমণি জন্ম দিলেন কন্যাসন্তান।

প্রীতিরাম বা যোগমায়া তাতে খুশি হয়েছিলেন। ঘটা করে নাতনির নাম রেখেছিলেন তাঁরা পদ্মমণি!

ঈশ্বরের ভাণ্ডে যত রূপ ছিল তার সবটুকু দিয়ে যেন এই নবজাতিকাকে রচনা করে পাঠিয়েছিলেন তিনি। তাজা পদ্মের মত। শুধু পদ্ম নয়, আরও কিছু বিশেষণ দরকার, তা না হলে নামকরণ-এর ব্যাপারে প্রীতিরামের খুশির পাত্র যেন পূর্ণ হয় না। বিশেষণ পাওয়া গেল। নাম হলো পদ্মমণি!

পদ্মমণির জন্মের পর আরও পাঁচটি বছর কেটেছে। প্রীতিরাম আর যোগমায়ার চোখের মণি পদ্মমণি। পদ্মমণি বাড়িতে লেখাপড়া করে, আদরে-যত্নে মানুষ হয়। এই সময়ে আবার গোটা বাড়িটা আনন্দে ভরে উঠল। আসন্নপ্রসবা রাসমণি। যথাসময়ে সন্তান প্রসব করলেন তিনি।

এবারও কন্যা সন্তান। ১২১৮ সন। জন্ম হলো কুমারীর।

এবার প্রীতিরাম আর যোগমায়া দুজনেই একটু মুষড়ে পড়লেন। দ্বিতীয় সন্তান পুত্র সন্তান হবে এই কামনা করেছিলেন সবাই। পুত্র সন্তান প্রয়োজন। বংশ রক্ষার জন্যে কেই বা না পুত্র কামনা করে? শুধু বংশই বা কেন, এই অতুল বৈভব ভোগ করবে কে? কিন্তু সব কামনা ব্যর্থ করে দিয়ে যখন কন্যা সন্তান এসেছে তখন তাকে বরণ করে নিতে হবে বৈ কি। এবারও ঘটা করে এই দ্বিতীয় সন্তানের অন্নপ্রাশন দেওয়া হলো। মেয়ের নাম রাখা হলো। কুমারী এলো, কিন্তু রাজচন্দ্র-রাসমণির উভয়ের মন ভারাক্রান্ত। একটি পুত্র সন্তান তাঁদেরও কামনা।

এরপরও তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর জন্ম হয় ১২২৩ সনে।

প্রীতিরামের মন ভাঙল. মনের সঙ্গে দেহও ভাঙল। তা ছাড়া বেশ কিছুদিন ধরেই প্রীতিরাম শারীরিক ভাল ছিলেন না। সবাই বলেছিলেন, বিশ্রাম নিতে। রাসমণির চোখে ঘুম ছিল না! দিন রাত শ্বশুর মশায়ের সেবায় নিজেকে যেন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি!

প্রীতিরামের কঠিন কোন ব্যামো ছিল না। রাসমণি বুঝেছিলেন শ্বশুর মশায়ের বড় ব্যামো হলো মনে। একটি নাতির মুখ দেখে গেলে প্রীতিরাম হয়ত তৃপ্তির সঙ্গে মরতে পারতেন, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে মরতে পারতেন না। সেই স্বস্তি বেশ কিছুদিন হলো কেড়ে নিয়েছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আর সেই কারণেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রীতিরাম।

কবিরাজ মশাই বার বার অনুরোধ করেছিলেন—প্রীতিরামবাবু যেন কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত না হন। বেশী উত্তেজিত হলে ফল বিপরীত হতে পারে। কবিরাজ মশাই কথাটা বিশেষ করে পুত্রবধূর কানে তুলে দিয়েছিলেন।

সেই থেকে রাসমণির চোখে ঘুম ছিল না।

বিধির বিধান খণ্ডন করবে এমন সাধ্য কার! রাসমণিও পারেন নি! হঠাৎ একদিন জানবাজারের বাড়িতে মহাবিপর্যয় ঘটে গেল।

নায়েব-গোমস্তা এদের সঙ্গে কথা বলছিলেন প্রীতিরাম। বেশ শান্তভাবেই ধীরে ধীরে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। স্থাবর-অস্থাবর বিষয় সম্পত্তির সব কিছু রাজচন্দ্র আর অত্যন্ত স্নেহের পুত্রবধূ রাসমণির নামে উইল করা হয়েছে—এ ব্যাপারে হয়তো প্রত্যেককে ওয়াকিবহাল করছিলেন, এমন সময় খবর এলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা অত্যন্ত জরুরী কাজে দেখা করতে এসেছে প্রীতিরামবাবুর সঙ্গে।

বাড়ির দারোয়ান থেকে লেঠেলরা সবাই জানিয়ে দিয়েছে কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। কোম্পানীর লোকেরা শোনেনি! তারা প্রীতিরামের সঙ্গেই কথা বলতে চায়।

প্রীতিরাম সব শুনে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়েছিলেন। পুত্রবধূর নিষেধ পর্যন্ত গ্রাহ্য করেননি তিনি। বলেছিলেন,—দিন যত যাচ্ছে, একটু একটু করে যতই পরপারের দিকে যাচ্ছি ততই এই ইংরেজ কোম্পানীর জন্য আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনে। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। দেখি ওরা কি বলে, কি চায়। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তো বুঝে নিতে পারব ওরা কি চায়। তুমিও এখানে থাক মা, সব দিকটা বুঝে নেওয়া দরকার—

রাসমণি বলেছিলেন,—ওরা কি চায় বাবা?

প্রীতিরাম বলেছিলেন, ওরা জানে আমরা ওদের চাকর! তাই চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে আমাদের সব কিছু ওরা গ্রাস করতে চায়—, ওদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলছে অনেকদিন। এখনও পর্যন্ত আমাকে কাবু করতে পারেনি। হয়তো আমাদের প্রজাদের মুখ থেকে ওরা শুনেছে আমি শয্যাশায়ী, আমি মারা গেলে ওরা সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওরা জানে—আমি মারা গেলে এমন কেউ নেই যে ওদের অত্যাচার বন্ধ করতে পারে, তাই বোধহয় এসেছে আমার এখনকার অবস্থা কতটা খারাপের দিকে বলতে খারাপ লাগছে বৌমা—ওরা বোধ হয় দেখতে এসেছে, আমার মরণ আর কতদূর?

কথাগুলো যত শুনেছেন রাসমণি তত বেশী চাপা উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে ফুঁসেছেন আর তত বেশী নিজেকে তৈরী করে নিয়েছেন।

কথা শেষ হতে না হতে এক লালমুখো গোরা সৈনিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। অসুস্থ প্রীতিরামের সঙ্গে কোন ভদ্রতা-সৌজন্য দেখাবার মানসিকতা তার নেই। কণ্ঠস্বর যেন সপ্তমে বাঁধা।

সাহেব ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করেছিল—সেই ব্যাপারটার খবর কি?

রাসমণির চোখে মুখে যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল মুঠো মুঠো উত্তেজনা, তেমনি প্রশ্ন শুনে বিস্ময় লেগেছিল তাঁর। মুখে একটিও কথা বলার ইচ্ছে রাসমণির ছিল না, ঘোমটার ভিতর মুখ ঢেকে শ্বশুর মশায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু সংযমের বাঁধন ছিঁড়ল তাঁর। সাহেবের মুখে শুধু 'ইউ প্রীতিরাম' শুনে রাসমণির মনের ভিতরে দপ করে আগুন ধরে গিয়েছিল। সাহেবের কথার উত্তরে প্রীতিরাম কথা বলতে পারলেন না।

তাঁর মুখে ভাষা ফোটার আগেই, এক কুলবধূর স্বভাব-রীতি অনুসারে চাপা অথচ উত্তেজনা মেশানো স্বরে রাসমণি বলেছিলেন,—আস্তে কথা বলুন,—শুধু তাই নয় আমার বাবা আপনাদের একটি কথারও জবাব দেবেন না যতক্ষণ না আপনি 'বাবু' সম্বোধন করবেন। আপনারা সব শিখেছেন, কিন্তু একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে ভদ্রতা দেখাতে হয় এটা শেখেননি কেন? আমার বাবা, 'তুমি' শুনতে রাজী নন, আমাদের দেশের আচার-আচরণ মত আপনি—'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন এটা আশা করি।

পুত্রবধূর সহসা এই মহাশক্তিরূপিনী মহামায়ার রূপ দেখে প্রীতিরাম একদিকে যেমন বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন, তেমনি এতদিনে তিনি যেন একরাশ স্বস্তি লাভ করলেন। আনন্দে-খুশিতে তাঁর নিস্তেজ চোখ জোড়া জলে ভরে এলো!

রাসমণির চাপা স্বর সাহেব হয়তো শুনতে পায়নি সেই কথা মনে করে, সেই উক্তির সারমর্ম তিনি তর্জমা করে দিলেন। বললেন, সাহেব তোমাদের কোন দোষ দেখি না, তোমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতন ভোগী এক একটা কুকুর, সুতরাং তোমাদের কাছ থেকে আমরা ভদ্রতা আশা করবো কেন? তবুও বলছি, আমার মা যা বলেছেন—তা না করলে আমি তোমার কোন কথার জবাব দেব না—

সাহেব এবার উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। সে সরাসরি বলেই ফেলল, একজন ইনোসেণ্ট লেডি কি বলল আর না বলল তাতে কান দেবার সময় তার নেই, সে যা জানতে চাইছে তার উত্তর প্রীতিরাম দিন—

প্রীতিরাম এবার উত্তেজিত হলেন। তিনি পরিষ্কার বললেন, প্রীতিরাম মাড় হলেন রাজা, সেই রাজার সঙ্গে যদি কথা বলতে হয় তা হলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় কাউকে কথা বলতে হবে। সাধারণ কোন কর্মচারীর কোন কথার উত্তরই তিনি দেবেন না!

•

কথাটা মিথ্যে নয়। প্রীতিরাম মাড়কে একজন জমিদার মাত্র বললে ভুল করা হয়। প্রীতিরাম ছিলেন রাজা। রাজার মত ঐশ্বর্য যেমন ছিল, খাঁটি রাজার মেজাজও তাঁর ছিল। সেই রাজার সামনে দাঁড়িয়ে কোম্পানীর বেতনভুক সাহেব কিছুতেই মাথা নত করবে না, কিছুতেই সৌজন্য দেখাবে না, তেমনি প্রীতিরামও একচুলও বশ্যতা স্বীকার করবেন না। এই অবস্থায় প্রীতিরাম যত উত্তেজিত হন, রাসমণির মন ততই ভয়ে উদ্বেলিত হতে থাকে!

রাসমণি অনেক ভেবে ব্যাপারটা সহজ করে দেবার জন্য কোন রকম উত্তেজনা না দেখিয়ে, আইনকে মনে রেখে আবার মুখ খুললেন। বললেন, আমার বাবা অত্যন্ত অসুস্থ, আপনি তাঁকে উত্তেজিত করবেন না। আপনারা আমাদের বিশাল অতিথিশালাকে আপনাদের কোম্পানীর দপ্তর করবেন বলে আপনাদের হাতে লিখিতভাবে তুলে দেবার জন্য যে আদেশজারী করেছেন, আপনি জানিয়ে দিতে পারেন, আমরা সেই আদেশ মেনে নিতে রাজী নই। আপনাদের কোম্পানী আইনের জোরে আমাদের অতিথিশালা কেড়ে নিন, নতুবা কোম্পানী লিখিতভাবে কিছুদিনের জন্য ব্যবহার করবে বলে আমাদের কাছ থেকে অতিথিশালা ভিক্ষা করুন -- সাহেব আরও উত্তেজিত হয়েছিল। রাসমণি তখন ওপরে কোন উত্তেজনা না দেখিয়ে, প্রীতিরামকে একদিকে শান্ত করতে করতে অন্যদিকে বাড়ির বিশ্বস্ত লেঠেলকে দিয়ে সাহেবকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

সেইদিন প্রীতিরাম এক বুক দুঃখ নিয়ে মারা গেলেন।

১২২৪ বঙ্গাব্দ ইংরাজীর ১৮১৭ সালে মাত্র ৬৪ বছর বয়সে কলকাতার অন্যতম ধনাঢ্য, উদার-হৃদয় প্রীতিরাম মাড় পরলোক গমন করলেন।

প্রীতিরাম যখন মারা যান তখন তাঁর ধন-সম্পত্তির মূল্য ছিল সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার মত!



প্রীতিরামের মৃত্যুর পর রাজচন্দ্রকে পুরোপুরিভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যবসা ও জমিদারীর কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়।

রাজচন্দ্র এবার রাজা হয়ে বসলেন! মাহিষ্য সমাজের গর্ব রাজচন্দ্র!

জমিদারীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব যেমন তিনি মাথা পেতে নিলেন তেমনি কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন মুহূর্তের মধ্যে!

শুধু কাজ আর কাজ। শুধু মাত্র জমিদারী দেখা আর বাবার রেখে দেওয়া ঐশ্বর্যের রক্ষণাবেক্ষণ করে যাওয়া রাজচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়। আয় বৃদ্ধি, বিষয় বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজ কল্যাণের বিষয়টিও তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমেই রাজচন্দ্র যোগাযোগ করলেন ইংল্যান্ডের কলভিন কাউই কোম্পানীর সঙ্গে। ইংল্যান্ডের এই কোম্পানীর তখন ব্যবসায়ে ভারত

জোড়া খ্যাতি। কস্তুরী, নীল, আফিম ইত্যাদি আমদানীতে এই তখন কোম্পানীর জুড়ি মেলা ভার!

রাজচন্দ্র এই কোম্পানীকে এক সময়ে তাঁর এই ব্যবসার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। কিছুদিনের মধ্যে তিনি ঐ সব জিনিস রপ্তানী করে একজন পাকা ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত হলেন।

আগেই বলেছি, অনেকের বিশ্বাস স্ত্রী-ভাগ্যে ধন লাভ হয়! সেদিক থেকে বিচার করলে এই বাড়িতে বধূ হয়ে আসার পর থেকে রাণী রাসমণির ভাগ্যে প্রীতিরামের ব্যবসায় ঘটেছিল শ্রীবৃদ্ধি; একথা প্রীতিরাম নিজেও স্বীকার করতেন। এবার পালা রাজচন্দ্রের। তিনি যাতেই হাত দেন তাই যেন সোনা হয়ে যায়! তবে যা করেন তার আগে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে নিতে তাঁর ভুল হয় না।

রাজচন্দ্র বিবাহের পর উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী নিতান্ত গ্রাম্য একটি কিশোরী মাত্র নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ। রাজচন্দ্র যা দেখতেন, জানতেন, যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেন—রাসমণি সেই বিষয়কে ভালভাবে জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেন, বুঝে নিতেন। এইভাবে সমকালীন সমাজ ও পরিবেশ, বিষয়-আশয় ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারেই রাসমণি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

অল্প কয়েক মাসের মধ্যে সবাই বলতে লাগলেন, রাজচন্দ্র ভাগ্যবান ব্যবসায়ী।

এই খ্যাতি বলতে গেলে একদিনেই অর্জন করেছিলেন রাজচন্দ্র। বুকের পাটাও ছিল তাঁর। একেই বোধ হয় বলে পুরুষকার। একদিন নীলামে পঁচিশ হাজার টাকার আফিম কিনে সেই দিনই রাতারাতি তা পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে ঘরে তুলেছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। লাভের টাকা।

রাজচন্দ্র এ সবের মধ্যে আর এক নতুন ব্যবসাও শুরু করেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে। তা হলো বাড়ি কেনা-বেচা। একটার পর একটা বাড়ি কিনে তাকে একটু সারিয়ে আবার বেশী লাভে যেমন বিক্রি করতেন তেমনি পাশাপাশি একের পর এক বাড়ি তৈরি করে সেই নতুন বাড়ি বিক্রি করে দিতেন।

রাসেল স্ট্রীটের জমি এবং বাড়ি রাজচন্দ্র তখনকার দিনে ইংরেজ সরকারের কাছে দুই লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছিলেন। এছাড়া মাকিমপুরে ইত্যাদি চারটি

মহাল থেকে যে আয় হতো তাও আকাশ ছোঁয়া !

অর্থ সমাগম যত হয় রাজচন্দ্র দাসও তত উদার হতে থাকেন। ধনকুবেরদের চরিত্রের সংগে ধনকুবের রাজচন্দ্রের এখানেই বড় পার্থক্য।

দিনে দিনে রাজচন্দ্রের পরিচিতির পরিধিও বাড়তে থাকল। সমাজ সংস্কার, মানব কল্যাণ, স্ত্রী-শিক্ষা ব্যাপারে সারা কলকাতায় তখন যে বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল রাজচন্দ্র ধীরে ধীরে সেই কর্মযজ্ঞের যাঁরা পুরোহিত তাঁদের শরিক হলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, স্যার রাধাকান্ত দেব রাজাবাহাদুর, মতিলাল শীল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে তাঁর গভীর সৌহার্দ্য স্থাপন হলো। মাঝে মাঝে জানবাজারের বাড়িতে এঁদের সংগে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আসর বসাতেন তিনি।

ইতিমধ্যে রাজচন্দ্র আর রাসমণির জীবনে একবার ঝড় উঠেছিল। চরম সুখের মধ্যে চরম বেদনার ঝড় !



১২২৬ সনে, ইংরাজী ১৮১৯ সালে রাণী রাসমণি আবার মা হলেন ! এবার এক মৃত পুত্রের জন্ম দিলেন তিনি। এবারই রাণীর মন এক অজানা আশংকায় ভরে উঠল ! তখনকার দিনে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে রাণী একের পর এক কন্যা সন্তান প্রসব করায় আত্মীয়-পরিজন মহলে একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছিল। অনেকেই যে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে চাইছিল, প্রীতিরামের পুত্রবধূ বলে রাসমণিকে উদ্দেশ করে কেউ সে কথা উচ্চারণ করেনি বটে, কিন্তু একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছিল। একটি পুত্র সন্তান যে নারী গর্ভে ধারণ করতে পারে না, যে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করতে পারে না, সে আবার কেমন ধারা মেয়েমানুষ ! এই যদি পুণ্যবতীর লক্ষণ তা হলে সত্যিকারের পুণ্যবতী কে ?

কথাটা এমন করে ছড়িয়ে পড়েছিল—যে ইচ্ছে করলেই একজন নারী বিশেষ করে রাসমণি যেন একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারতেন। ওটা যেন-প্রসূতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে।

চাপা গুঞ্জন রাসমণির কানেও গিয়েছিল। একরাশ ব্যথায় টন টন করে উঠেছিল বুকটা।

চতুর্থবারে মৃত পুত্র প্রসব করায় রাসমণি নিজেও অনেকটা ভেঙে পড়েছিলেন!

বাবার পাশে বসে রামায়ণ পাঠ শুনতে শুনতে রামায়ণের সব পর্ব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল রাসমণির। 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' পর্ব বালিকা রাসমণির হৃদয় স্পর্শ করেছিল একটু বেশী মাত্রায়।

শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করে ফিরে আসার পর রাজ্যে সীতার চরিত্র এবং ভাবমূর্তি প্রসঙ্গে সকলেরই আলাদা একটা ধারণা হয়েছিল। তাঁরা সীতাকে চরম পরীক্ষা করার প্রশ্ন তুলেছিলেন। তারপরেই সীতার অগ্নি-পরীক্ষা!

মৃতপুত্র প্রসব করার পর রাসমণির মনে সেই আশংকা দেখা দিয়েছিল। এই সমাজ যদি তাঁকে কোন কটাক্ষ করে তা হলে কী পরীক্ষা দেবেন তিনি? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে স্ত্রীকে সব সংশয় থেকে, অহেতুক আশংকা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন স্বয়ং রাজচন্দ্র। বলেছিলেন, এত মন খারাপ করে রাখলে কি চলে? কন্যা সন্তান প্রসব আর মৃত সন্তান প্রসব সবই বিধির বিধান। অদৃষ্টের লিখন। সেই লিখন পাল্টাবে কে? এ সব তুচ্ছ কারণে, আমাদের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের মূর্খজনেরা কি বলছে এই নিয়ে কি রাণীর নীরবে চোখের জল ফেলা মানায়?

রাসমণি সহজ হয়েছিলেন।

এর কিছুকাল পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! সবাই খবর পেল রাসমণির আবার সন্তান হয়েছে। বিধির বিধানকে এবারও সবাই মেনে নিলেন। এবারও মেয়ে হলো। এবারও আনুষ্ঠানিক নামকরণ হলো মেয়ের। এই মেয়ের নাম রাখা হলো জগদম্বা। এটা ১২৩০ সনের কথা।

জগদম্বার জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে উঠলো হাহাকার আর আর্তনাদ!

হঠাৎ প্রকৃতি রুষ্ট হলেন! খরতাপে যেন আগুন ধরে গেল সর্বত্র। অস্বাভাবিক গরম পড়ায় সকলের মনে যে আশংকা দেখা দিয়েছিল তাই সত্য হয়ে গেল। বাংলাদেশের প্রতিটি নদীতে অসময়ে এলো জোয়ার। আসলে জোয়ার নয়, এলো বন্যা! মুহূর্তে ভয়াল-ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে

গেল পথ-প্রান্তর। ভেসে গেল কয়েক সহস্র ঘর। ভেঙে গেল অগণিত সংসার।

বন্যা এসে কেড়ে নিয়ে গেল—ঘুমন্ত শিশু, অসহায় মানুষ আর নিরীহ জীব-জন্তুর প্রাণ। গৃহহারা-সর্বহারাদের আর্তনাদে একদিকে যেমন আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো, অন্যদিকে সেই আর্ত চিৎকারে রাণী রাসমণির হৃদয় হলো উদ্বেলিত!

কাতারে কাতারে মানুষ, সর্বহারার দল একমাত্র প্রাণটুকু সম্বল করে এলো শহর কলকাতায়! এদের সবাই রাজচন্দ্রের প্রজা। কেউ কৃষক, কেউ শ্রমিক। কেউ হারিয়েছে কোলের শিশু, কেউ হারিয়েছে স্ত্রী, আবার কেউ বা উদ্দাম জলরাশির মধ্যে নাবিকের মত যুদ্ধ চালিয়েও স্বামীকে উদ্ধার করতে পারেনি। বন্যার জলে ভেসে যাওয়া স্বামীকে হারিয়ে, এক ফালি বস্ত্র সম্বল করে ওরা বাঁচার তাগিদে এসেছে জানবাজারে।

সকলের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে 'মা'। সবাই ডাকছে 'মা' বলে। সেই ডাক কানে যেতে রাণী রাসমণির অন্তরের গভীরে যে দেবী ছিলেন নীরবে, সেই দেবী অন্নপূর্ণার দু'চোখে জল। চার দেওয়ালের আবেষ্টনীর মধ্যে চারকন্যা-সন্তানের যে মা একটি পুত্রের কামনায় নিয়ত চোখের জল ফেলতে ফেলতে, পাষাণ প্রতিমার মত নিছক এক 'মা' হয়ে বেঁচে ছিলেন—আর্তের মাতৃ সম্বোধনে সেই 'মা' মুহূর্তে হয়ে গেলেন প্রাণময়ী অন্নপূর্ণা! হলেন জগজ্জননী!

রাসমণি ধীর-স্থির পদক্ষেপে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে ভাষা ফোটার আগে রাজচন্দ্র বললেন, আমি জানি রাণী তুমি কি চাও,—যাও আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি,—এখুনি অতিথি শালার দরজা ওদের জন্য শুধু খুলে দেওয়াই নয়, সেই সঙ্গে যতদিন না আমি ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারব, যতদিন না আবার ওরা জমিতে লাঙল দিতে পারে, ততদিন এখানেই ওরা আমাদের কাছে থাকবে। তুমি এতগুলো সন্তানের মা হয়ে সন্তানদের জন্য যা মন চায় তাই করার ব্যবস্থা কর রাণী।

এই বোধহয় নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই বোধ হয় পুণ্যবতী নারীর জীবনের পথ নতুন দিকে বেঁকে যাবার ইংগিত! পার্থিব জীবনের মধ্যে থেকেও মহাজীবনের সন্ধানে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার পরম লগ্ন।

রাজচন্দ্র এলেন বাড়ির বিশাল তোরণের কাছে। এসে দাঁড়ালেন আর্তদের মাঝখানে। চিৎকার করে জানালেন,—তোমাদের সব কথা আমি

জানি। তোমরা যাঁকে 'মা' বলে ডাকছ তিনি সত্যিকারের তোমাদেরই মা। তোমাদের মা সবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তোমরা এসো। সন্তান হারাবার, স্বামী হারাবার, স্ত্রী হারাবার যে ব্যথা তোমরা পেয়েছ তা আমরা হয়তো কোনদিন মুছে দিতে পারব না, কিন্তু তোমাদের জন্য আমাদের আর যা করার আছে তা করবো। এখন তোমরা এসো আমাদের ঘরে। তোমাদের মা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

জানবাজারের প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবার নির্দেশ দিলেন রাজচন্দ্র। দ্বার উন্মুক্ত হলো। সর্বহারারা আশ্রয় পেল। রাণী রাসমণি দিলেন আহার। যারা ক্ষুধার্ত তাদের মুখে অন্ন দিলে হয়তো চলে, কিন্তু এরা তো সর্বহারা। সুতরাং শুধু অন্ন দিয়েই মায়ের কাজ শেষ করলেন না রাণী. স্বামীর প্রতিশ্রুতি এবং নিজের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে রেখে আর্তদের হাতে তুলে দিলেন অর্থ। টাকা পেলে আবার তারা নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারবে. আবার তারা ঘর বাঁধতে পারবে, আবার তারা নতুন উৎসাহ নিয়ে যে যা করে পেটের ভাত যোগাড় করত, তাই করতে পারবে। রাণী তাই দ্বিধাহীন চিত্তে অকাতরে অর্থদান করলেন।

গোটা কলকাতার মানুষ সেই প্রথম শুনলেন এমন এক রমণীর নাম যিনি নিছক 'মা' নন. 'লোকমাতা'। কিন্তু খুশি হতে পারলেন না রাসমণি। এই ব্যাপক প্রচারে হয়তো সকলেই খুশি হন, দান করে এমন প্রতিদান কেই বা না চায়—সবাই প্রচার চান, আত্মপ্রচারে মুখর হতে চান, কিন্তু রাণী এসবের ভাবনা মনেও আনেন নি। তিনি মানুষ হয়ে মানুষের দুর্দিনে সামান্য কিছু করছেন আর তাকে কেন্দ্র করে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রচার।

আঘাত পেয়েছেন রাণী। তাঁর মন অসন্তোষের ভারে ভারী হয়েছে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সব কথা খুলে বলেছেন স্বামীর কাছে। বলেছেন, এ সব তো আমরা চাই নি. অথচ কী আশ্চর্য দেখ এ-বাড়ি, ও-বাড়ির সবাই আমাদের গুণকীর্তনে মেতে উঠেছে—কথা বলতে বলতে রাণীর ভাবনায় আর এক নতুন ভাবনা যোগ হয়েছে ; বলছেন, আমার মনে হয় ওরা আমাদের নিয়ে যা শুরু করেছে তা ওদের চালাকি, পরশ্রীকাতরতা—

রাজচন্দ্র বলেছিলেন, শুধু এ-বাড়ি ও-বাড়ির লোকেরাই নয় আমাদের এই সামান্য কাজের প্রশংসায় বাইরের অনেকেই পঞ্চমুখ। এই তো সেদিন বাবু দ্বারকানাথ বললেন, এখন তো আপনারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমাদের কাছে, আমাদের দেশের কাছে কম গৌরবের নয়—

বুঝলাম উনিও শুনেছেন, সুতরাং আমরা যদি কিছু করে থাকি, দেশের-দশের কল্যাণের কথা ভেবে যদি কোন কিছু করে থাকি—তার প্রচার এমনি করে হতে পারে। এতো লোকের মুখ চাপা দেওয়া যায় না। তবে এই প্রচার আমাদের যেন অহংকার না এনে দিতে পারে—সেদিকে নজর দিয়ে চলতে হবে—

কথা বলতে বলতে রাজচন্দ্র 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার কথাও তুলেছিলেন। কোথা থেকে যেন শুনেছিলেন বন্যা-পীড়িতদের অকাতরে যে দান তাঁরা দিয়েছেন সেই সংবাদ নাকি মিশনারীদের কাগজ 'সমাচার দর্পণ'ও ছাপতে চলেছে। সংবাদ পেয়েই রাজচন্দ্র প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছেন পত্রিকা দফতরে সংবাদটি যাতে প্রকাশিত না হয় সেই অনুরোধ করে।

সব শুনে রাণী আশ্বস্ত হলেন।

রাণী প্রতিদিনকার মত দিনের আলো ফোটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠেন। গৃহস্থালীর কিছু কাজ নিজের হাতে না করতে পারলে তৃপ্তি পান না, তাই রোজই কিছু না কিছু কাজ করে স্নান সেরে নেন। তারপর একে একে যখন সবার ঘুম ভাঙে রাসমণি নিজে তাদের পরিচর্যা করেন।

বিশেষ করে নাবালিকা মেয়েদের পরিচর্যা। স্বামী সেবা ইত্যাদি।

এরপর রাণী যান ঠাকুর ঘরে। নিজের হাতে ঈশ্বরের সেবা। এই কাজই রাণীকে সবচাইতে বেশী তৃপ্তি দিত। ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে একাত্ম হন তিনি। রঘুবীরের পুজো করেন। ধ্যানে বসলে আত্মসমাধিস্থ হন।

দেব সেবার পর রাণী আসেন রান্না ঘরে। নিজের হাতে রান্না করেন। মেয়েদের বায়না মেটান। স্বামীর জন্য তাঁর পছন্দ মত দু একটি পদ নিজের হাতে প্রস্তুত করেন তিনি।

এত কাজ, এত ভাবনার মধ্যে মাঝে মাঝে কোনা গাঁয়ের খবর নিতে তাঁর ভুল হয় না।

বিয়ে হবার পর বাপের বাড়িতে একদিনের জন্যও রাসমণির যাওয়া হয় নি। তা বলে কোনা গাঁয়ের কেউই রাণীকে না দেখার ব্যথা ভোগ করে নি। কেউ তাঁর অভাব বোধ করে নি। বৃদ্ধ বাবা হরেকৃষ্ণ দাস অবশ্য তাঁর ভিটে ছেড়ে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে আসেন নি কোনদিন। রাসমণি

জানতেন তাঁর জন্মভিটের একবিন্দু ধূলোমাটি ছেড়ে বাবা দু-দণ্ড কাটাতে পারবেন না কোথাও।

হরেকৃষ্ণ দাস লোক পাঠিয়ে মেয়ের খবর নিতে পারতেন না, কিন্তু রাণী রাসমণি বাবার খবর নিতেন, সেই সঙ্গে গোটা গ্রামের।

হঠাৎ একদিন রাণীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। পূজোর ঘরে রঘুবীরের স্নানের আয়োজন করছিলেন, এমন সময় হাত থেকে গঙ্গাজল ভর্তি রূপোর ঘটিটা পড়ে গেল। ডান চোখের পাতা নাচল! রাসমণির কোন কুসংস্কার ছিল না। দৈবকে মানতেন, কিন্তু হাত থেকে জল ভর্তি ঘটি পড়ে যাওয়ার অর্থ কোন সর্বনাশের ইঙ্গিত, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আজ যেন এই ঘটনায় রাণীর মনটা একটু বেশি মাত্রায় দুর্বল হল। একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল মনের ওপরে। তবুও অনেক কষ্টে যখন নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিলেন তখন আর একটা নতুন বিপত্তি! পূজো সেরে ঘরের বাইরে বেরোতে যাবেন এমন সময় একটা খোঁচায় পরনের লাল পাড় গরদের শাড়িটা ছিঁড়ে গেল! অজানা আশঙ্কায় মনের ভেতরটা একটু বেশি মাত্রায় তোলপাড় করে উঠল। ঠাকুর ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে একেবারে সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল স্বামীর সঙ্গে।

কোন খবর জানাবার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন রাজচন্দ্র। মুখের ওপর দুঃসংবাদের ছায়া। ভারাক্রান্ত অভিব্যক্তি। স্বামীর মুখের দিকে চোখ রেখেই রাসমণির বুঝতে বাকি রইল না যে কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন। রাসমণি বললেন, বাবার খবর এনেছ বোধ হয়—

রাজচন্দ্র চমকে উঠলেন! কেমন করে রাসমণি বুঝলেন তাঁর মনের ভাব! মুখে বললেন, – হ্যাঁ সেই খবরই এসেছে—তোমার বাপের বাড়ির একজন পেঁৗছে দিয়ে গেল।

রাজচন্দ্র কথা বলছেন আর রাণীর দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে কান্না। বাবার শরীরটা অনেকদিন যাবৎ খুবই খারাপ যাচ্ছিল—এই খবর আগেই পেয়েছিলেন রাণী। লোক মারফত বাবাকে এই বাড়িতে চলে আসার জন্য আবদারও জানিয়ে ছিলেন। রাণী বলে পাঠিয়েছিলেন, বড় কোবরেজ দেখাবার ব্যবস্থা হবে, তাছাড়া আদর-যত্নের, সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি থাকবে না। আরও জানিয়েছিলেন জানবাজারে রাণীর এ বাড়িতে ঠাকুর দালান আছে, অনেকগুলো ঘর ফাঁকা আছে, খুবই খোলা মেলা, আলো বাতাসের অভাব নেই। এই বাড়িতে বাবা হরেকৃষ্ণ দাসের থাকার ব্যবস্থা

করা হয়েছে তাও জানিয়ে খুশি খুশি মন নিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন, এই বাড়ির নাম 'রাসমণি-কুঠি'। * আদরের একমাত্র মেয়ে রাণী বিয়ের পর রাজরাণী হয়েছে জেনে হরেকৃষ্ণ তৃপ্ত হয়েছিলেন। সেই আদরের মেয়ের নামে নতুন বাড়ির নামকরণ হয়েছে শুনলে বাবা খুশি হবেন, নিজেকে সুস্থ করে তুলবার জন্য মেয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাবা চলে আসবেন— এই আশা নিয়ে রাণী দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বাবা আসেননি। পরিবর্তে খবর এসেছিল হরেকৃষ্ণ দাসের অসুস্থতা বেড়েছে। খবর পেয়ে রাণীর বাসনা হয়েছিল ছুটে যাবেন কোনা গাঁয়ে। যেতে পারেননি। বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট সংসার, সদ্যজাত কন্যা সন্তান, পরিশ্রান্ত স্বামীকে রেখে রাণীর ছুটে যাওয়া হয়নি। তারপর মাত্র তিন চারটে দিনও কাটেনি, চরম আঘাতের খবর এলো কলকাতায়।

কোনা গাঁ থেকে লোক এসেছে জানবাজারে। খবর পেয়ে রাজচন্দ্র নিজে বেরিয়ে এলেন বাইরে। বিশাল প্রাসাদ, চরম বৈভব সব আছে—কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, একটি জিনিস নেই রাজচন্দ্রের। তা হলো অহঙ্কার। অহঙ্কার নেই বলেই কোনা গাঁ থেকে লোক এসেছে তাদের রাণী মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, এ খবর কাণে যেতেই স্বয়ং রাজচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন প্রধান ফটকের কাছে।

ব্যাপার কী! খবর এসেছে হরেকৃষ্ণ দাস আর ইহজগতে নেই। রাজচন্দ্র কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বাক্‌হারা হয়েছিলেন, তেমনি হয়েছিলেন

---

* ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ওপরই ছিল রাসমণি-কুঠি। ৭১ নং ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের এই বাড়িটি রাজচন্দ্র তৈরীর কাজ শেষ করেন ১২২৮ সনে। এ বাড়ির প্রধান প্রবেশ দ্বার ছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের দিকেই। সেই বিশালতম সিংহদ্বারের কপাট ছিল লৌহ কারুকার্যময়। বৃহৎ কপাটের নিচে ছোট কপাট। দু'ধারে দারোয়ানদের বিশ্রামের স্থান। দু'দিকে চোখ রাখলে দেখা যেত দেওয়ালে ঝোলান তরবারি, ঢাল, সড়কি, বন্দুক, রূপো দিয়ে বাঁধান শংকর মাছের চাবুক, এছাড়া বল্লম, বর্শা, ভোজালি, খেটক, টাঙ্গী, মোটা বাঁশের লাঠি—যার মধ্যে সিসা ভরা ও মাথাগুলি পিতল দিয়ে বাঁধান। এছাড়া ছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও প্রাসাদরক্ষী কোচোয়ান লেঠেলদের পাগড়ি, তাজ, মুরাঠা, কোমরবন্ধ, উষ্ণীষ, বুকবন্ধ, চাপরাস আরও অনেক কিছু। সার্দ্ধদ্বি সহস্রাধিক দ্বার ও তোরণরক্ষক ছিল রাজচন্দ্রের। বহির্মহলে দেওয়ানখানা, ঘড়িঘর থেকে আরম্ভ করে পৃথক কাজের পৃথক ঘর। তিনমহল ঠাকুর দালান। শেষ মহলে ঠাকুরের স্থান। তারপর ছিল ফুলের বাগান। উপরে বৈঠকখানা—ঝাড়লন্ঠন, দেওয়ালগিরি ও বড় বড় আয়না বসান। প্রথম মহলে দরদালান, রঘুনাথ জীউর মন্দির। দ্বিতীয় মহলের গোল সিঁড়ি দিয়ে ছাতে যাওয়া যেত। এরপর ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম মহল। ৬ষ্ঠ মহলে একটি পুষ্করিণী ছিল। ৭ম মহলে অন্যান্য নানা ঘর। সর্বমোট ৭ মহলা বাড়িতে ৩০০টি ঘর ও ৬টি প্রাঙ্গন। ব্যয় হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা।

বিচলিত। ভাবছিলেন, শ্বশুর মশায়ের মৃত্যু-খবর কেমন করে পেঁছে দেবেন রাসমণির কাছে! একটু ভাবলেন। তারপরই নিজেকে অনেকটা সহজ করে নিয়ে কোনা গাঁ থেকে আসা মানুষগুলোকে অতিথিশালায় থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন রাণীর কাছে!

স্বামীর মুখের দিকে চোখ রাখলেন রাসমণি। রাজচন্দ্রের চোখে-মুখে তখনও একরাশ ব্যথার ছায়া ছড়ানো। স্বামী যে কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন সেটুকু বুঝতে দেরী হয়নি রাসমণির। রাসমণি নিজেকে শক্ত করে বললেন,—যে খবর তুমি এনেছ আমি তা জানি—

চমকে উঠলেন রাজচন্দ্র। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ। বললেন,—যে খবর আমি বয়ে এনেছি তা তোমার জানা? কী বলছ রাণী!

রাসমণি বললেন,—ঈশ্বর যাকে সব দেন তাকে আঘাত দেন অনেক বেশি। আঘাত সহ্য করতে হয়। আমি সুখ ভোগ করবো, অথচ দুঃখ ভোগ করবো না তা কি হয়?—তুমি নিশ্চয়ই বাবার খবর এনেছ?—

এবার রাজচন্দ্র পরিষ্কার বুঝলেন, বাবার কথা মন থেকে মুখে আনার সঙ্গে সঙ্গে রাসমণির দুটো চোখ ছল ছল করে উঠল। কিন্তু কী নিদারুণ সহ্যশক্তি! সেই জল দু'চোখের তারায় ধরে রেখেছেন রাণী। বুঝতে দিচ্ছেন, কিন্তু ঝরতে দিচ্ছেন না। রাণী বললেন, আমি জানি আমার বাবা নেই—

রাজচন্দ্রের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। রাণী তখন বললেন তাঁর স্বপ্নের কথা!

গত কাল শেষ রাতে রাণী স্বপ্ন দেখেছিলেন, বৃদ্ধ কুল পুরোহিতের মৃত্যু হয়েছে! ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়! ভোর হতে রাণীমা স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে স্বপ্নের দোষ কাটাতে তুলসীমঞ্চে তিনবার জলদান করে মনে মনে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে বলেছিলেন,—ঠাকুর যে মৃত্যুর স্বপ্ন আমি দেখেছি তা যেন সত্য না হয়—।

আসলে অপরের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখলে নাকি আপনজনের মৃত্যু খবর আসে! ভয় সেখানে। কুল পুরোহিতের মৃত্যুর স্বপ্ন মানে পিতৃস্থানীয় কারও মৃত্যু; এ সব স্বপ্ন তত্ত্বের গল্প রাণীমা ছেলেবেলায় শুনেছিলেন কারও কাছ থেকে! এই অশুভ স্বপ্নের মত ইতিপূর্বে আর কোন স্বপ্ন তিনি দেখেননি। এ সব স্বপ্নের সত্যাসত্য তাই যাচাই করাও হয়নি তখনও। কিন্তু একটা সংস্কার সেই শৈশব থেকে সারা মন জুড়ে বসে ছিল রাণীর। আর

শুনেছিলেন, এই ধরনের কোন স্বপ্ন দেখলে, ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে, সিক্ত বস্ত্রেই তুলসিমঞ্চে জল দান করে স্বপ্ন খন্ডন করার আকুতি জানাতে হয় ! একরাশ অস্থিরতা নিয়েই রাসমণি জলদান করে কুল পুরোহিতের সুস্থতা কামনা করেছিলেন। অথচ বাবার সুস্থতা কামনা করা রাণীর বিবেকে বেধেছিল ! বিধির বিধান যা হবে তাকে মেনে নেওয়াই বড় কথা ! তাই মনটা শক্ত করে রেখেছিলেন তিনি। স্বপ্নতত্ত্ব যদি সত্য হয় তা হলে সেই সত্যের সঙ্গে কী ভাবে মোকাবিলা করবেন তাও মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন তিনি।

আর আশ্চর্যজনক ভাবে স্বপ্ন সত্য হয়ে গেল !

রাজচন্দ্র সব শুনে বলেছিলেন,—অপরের মৃত্যু স্বপ্ন দেখলে আপনজনের বিয়োগ হয় এমন কথা তো আমার জানা ছিল না রাণী - -

রাণীমা কান্না ভেজা স্বরে বলেছিলেন,—আমার বাবা ! আমার পরম দেবতা ! আমার গুরুর গুরু মহাগুরু ! সারা জীবন ধরে যে কষ্ট পেয়েছেন তা থেকে ঈশ্বর তাঁকে মুক্তি দিলেন ! আমাকে সুখী করা, আমার যাতে বড় ঘরে বিয়ে হয়, আমি যাতে স্বামীর ঘর আলো করে রাখতে পারি এমন কত স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। আমার বিয়ে দিলেন, আমি রাজরাণী হলাম—

স্ত্রীর স্মৃতিচারণার সূত্র ধরে রাজচন্দ্রও অবচেতন মনে বলে যেতে থাকলেন,—আমাদের বিয়ের পর, তুমি তো জানো রাণী, আমার বাবা শুধু নন, আমিও কতদিন অনুরোধ করেছিলাম, কতদিন কত অনুনয়-বিনয় করে বলেছিলাম, আপনি জীবনের বাকি দিনগুলো আমাদের সঙ্গে থেকে কাটাবেন চলুন—, কোনা গাঁয়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক রেখে কী লাভ আপনার ? কিন্তু তিনি আমাদের কোন অনুরোধই রক্ষা করেননি বার বারই শুধু বলেছিলেন, কোনা গাঁয়ের মাটি আমার স্বর্গ, কোনা গাঁয়ের এই এক চিলতে ভিটে আমার তীর্থ, এখানে আমার মন পড়ে থাকবে, দেহ থাকবে জানবাজারের বাড়িতে—তা কি হয় ?

রাণী বলেছিলেন,—আমার মা মারা যাবার পর থেকেই বাবা যেন কেমন হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন, জানিস মা, এই মাটি—এই ভিটেতে তোর মায়ের সারা জীবনের স্মৃতি জড়ানো আছে, তুইও জন্মেছিস এই ভিটেতে, সেই ভিটে কি সহজে ছেড়ে আসা যায় ? আমি এখানে বেশ আছি।

রাজচন্দ্র কথার পৃষ্ঠে আবার কথা জুড়ে দিলেন। বললেন, তারপর

থেকে আর কোন অনুরোধ আমরা করিনি —

রাণীমা বললেন, সেই বাবা সব রেখে চলে গেলেন !

দু'জনে প্রায় এক সঙ্গে চোখ মুছলেন। এই তো নির্ভরতা ! এখানেই তো পতি-পত্নীর পরম বন্ধন ! কিন্তু শোক করে সময় কাটিয়ে দেবার চাইতে মানুষের কল্যাণের কথা ভাবলে অনেক বড় কাজ করা হবে। মুহূর্তে ওঁরা নিজেদের সহজ করে নিয়ে আবার কাজের কথায় ডুব দিলেন !

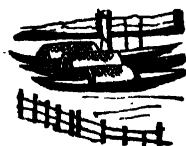
রাজচন্দ্র বললেন, এবারে আমাদের কর্তব্য স্থির করা দরকার রাণী —

রাণীমা বললেন, ভাবছি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সব কিছুই কোনা গাঁয়ে সারা দরকার, যে মাটিতে তিনি জন্মেছিলেন সেই মাটিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, এই সময়ে আমার ওখানে যাওয়া বড় দরকার। "চতুর্থীকরণ" ওখানেই করবো, যদি তুমি অনুমতি দাও

অনুমতি দিলেন রাজচন্দ্র। তিনি বললেন, তোমার মন-বাসনা পূর্ণ করতে যা যা করতে চাও তুমি তাই করবে রাণী, তা হলে আমি ওঁদের জানিয়ে দিয়ে আসি তোমার ইচ্ছার কথা, সেই সঙ্গে তোমার কোনা গাঁয়ে যাবার সব আয়োজন করে দিই—

কথাগুলো শেষ করে রাজচন্দ্র এলেন অতিথিশালায় ! কোনা গাঁ থেকে আসা সবাইকে রাজচন্দ্র জানিয়ে দিলেন—আপনারা ফিরে যান। আপনাদের রাণীমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যাব কোনা গাঁয়ে ! আমার শ্বশুর মশায়ের আত্মার শান্তি যাতে হয় তার জন্য সব কাজ ঐ ভিটেতেই হবে—

আগন্তুকেরা রাজচন্দ্র আর রাণীমায়ের জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন জানবাজার থেকে !



কৈবর্তের ঘরে জন্ম হলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি হরেকৃষ্ণ দাসের ছিল চিরজন্মের আসক্তি বৈষ্ণব ধর্মের যা কিছু আচার-বিচার সব কিছুই পালন করতেন তিনি। চৈতন্য নাম গানে যেমন মুখর থাকতেন হরেকৃষ্ণ, তেমনি কৃষ্ণ নামের নামাবলীর মত সৎ আচার ও সৎ আচরণে তাঁর পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল রঞ্জিত। তাই রাজচন্দ্র আর রাসমণিও সেই প্রথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখলেন না। গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে পিতৃদায়

থেকে মুক্তির বিধান ভিক্ষা করেছিলেন রাণীমা। গরীব চাষীদের মধ্যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে অন্ন-বস্ত্র অকাতরে দান করেছিলেন তাঁরা। হরির লুঠের আয়োজন করেছিলেন ঘটা করে! চারদিনের দিন "চতুর্থীকরণ"-এর জন্য রাসমণি গিয়েছিলেন গঙ্গার ঘাটে! গঙ্গার ঘাটে পেঁছেই রাসমণির সারা দেহমনে খেলে গিয়েছিল বিচিত্র শিহরণ! এক মধুর স্মৃতিতে রাসমণির মন রাঙা হয়ে গিয়েছিল! এই সেই গঙ্গার ধার—যেখানে প্রথম দেখেছিলেন প্রীতিরাম তাঁর গৃহলক্ষ্মীর মুখচান্দ্রমা। এই সেই ঘাট, যেখানে কিশোরী রাসমণিকে প্রথম দেখেছিলেন রাজচন্দ্র। হঠাৎ রাসমণির যেন সম্বিত ফিরল। ঘাটের ভগ্নদশা রাণীমার মনকে ব্যথিত করে তুলল। গঙ্গার ঘাটের সেই জীর্ণ দশাকে দেখিয়ে রাসমণি তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন,—দেখ কী দশা হয়েছে এই ঘাটের! এখানে সবাই স্নান করে। একদিন একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাবে এখানে!—এখুনি এই ঘাটের সংস্কার প্রয়োজন—

তাই করলেন রাজচন্দ্র!

এ দেশে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তখন বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে চারদিকে। তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গে যে অজস্র ফাটল ছিল, সেই ফাটল সারিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে তখন মেতে উঠেছেন সকলেই। শিক্ষা আর জ্ঞানের আলোয় মানুষের মত মানুষ গড়ার নব জাগরণ দিকে দিকে। কোনা গাঁয়ের ভগ্ন ঘাটের সহস্র ফাটল সারাবার ভিতর দিয়েই বোধ করি রাজচন্দ্র আর রাণীমাও নতুন করে মানব কল্যাণব্রতের দীক্ষা নিয়েছিলেন সেদিন।

প্রভূত অর্থের অধিকারী অনেকেই হন, অর্থ থাকলেই যে মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের বিকাশ ঘটে, অর্থের কৌলীন্য মানুষের বিবেক-কৌলীন্য বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে, এমন নজির খুবই কম। বরং প্রভূত অর্থই অনর্থ ঘটায়। অর্থ অহংকার আনে। বিবেকহীনতা আসে অনেক সময়ে প্রাচুর্যের হাত ধরে। মানুষের মধ্যে লোভ আর পাপ এই দুই সত্তাকে অর্থ-প্রাচুর্য অনেক সময় প্রকট করে দেয়। কিন্তু রাণী রাসমণির ক্ষেত্রে তার বিপরীত ব্যাপারটাই ধীরে ধীরে অঙ্কুর থেকে মহীরুহ হয়েছিল। রাণী ঘরের বাইরের রূপ দুচোখ ভরে দেখার অবকাশ পাননি কখনও। সেদিন ঘরের চাইতে বাইরের এমন কোন আকর্ষণ ছিল না যাতে আকৃষ্ট হয়ে বাইরের হাতছানিতে ঘরের বন্ধন উপেক্ষা করার মত মানসিকতার জন্ম হতে পারত।

বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে তো অন্য প্রথা। সমাজের কঠোর শাসন। সেই শাসন উপেক্ষা করে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাই বোধ করি খোলা জানলা

দিয়ে আকাশ দেখার সুযোগটাও পেতেন না।

রাণী রাসমণির ক্ষেত্রে সেদিনকার সেই অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সংস্কারের গ্লানি নিয়ে দগদগে ক্ষতের মত সমাজটা যেমন স্পষ্ট হয়েছিল তেমনই রাজচন্দ্রের আভিজাত্য বোধ, রাজচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, রাজচন্দ্রের প্রাচুর্যের কাছে তদানীন্তন সমাজপতিদের রূপটা বড় বেশী ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। জানবাজারের প্রাসাদের রাণীকে সবাই "রাণীমা" বলেই সম্বোধন করতেন। সুতরাং মায়ের দাবি নিয়েই রাণী আপন ঘরের সাম্রাজ্যের আসনে অধিষ্ঠিতা থাকতে চেয়েছেন বেশী। বাইরের জগত, একের পর এক জমিদারী পত্তন প্রসঙ্গে স্বামী রাজচন্দ্রই ছিলেন ওয়াকিবহাল। তাই তখনও এই প্রাসাদের বাইরে যে জগৎ তার চেহারাটা দু'চোখ মেলে দেখা হয়নি রাণীমা'র।

সবার মুখে এক কথা, সাক্ষাত লক্ষ্মী। স্বয়ং অন্নপূর্ণা।

লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণা না হলে কি এমন হয়? রাসমণি এ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন দ্রুত লয়ে পাল্টে যেতে লাগল। মরা গাছে ফুল ফোটার মত। মরা গাং-এ বন্যা আসার মত! বন্ধ্যা জমিতে সোনার ফসল ফলার মত। ভাঁটার সময় জোয়ার আসার মত।

প্রীতিরাম ছিলেন ধনবান। রাসমণির আগমনে রাজা হলেন ধনকুবের। যাতে হাত রাখতে বলেন রাণী, রাজচন্দ্র তাতেই হাত দিলে সব যেন সোনা হয়ে যায়। ছিল অনেক, হলো অঢেল! রাসমণি জানবাজারের প্রাসাদে বধূ হয়ে প্রবেশ করার পর থেকে শুধুমাত্র এই কলকাতা শহরে তাঁর ঐশ্বর্যের রূপটি কেমন ছিল এখানে তার একটা তালিকা দেওয়া যায়।

ঐশ্বর্যের তালিকা। সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ ঃ

বাড়ি/জমি	বাড়ি/জমির ঠিকানা	পরিমাণ ঃ
দোতলা বাড়ি সমেত	১২ রাসেল স্ট্রীট	৯/১৸৵
দোতলা বাড়ি সমেত	২ পোলক স্ট্রীট	৬২৸৶
দোতলা বাড়ি সমেত	৭৪ ধর্মতলা স্ট্রীট	১৬০৶০
দোতলা বাড়ি সমেত	৫১ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট	৮/২৸০
দোতলা বাড়ি সমেত	৭৫ ধর্মতলা স্ট্রীট	১।৪॥৵০
জমি	৩ কোবার্ণ লেন	।২॥৴০
জমি	৪ উমাচরণ দাসের লেন	।৩।০

জমি	১৭ মার্কেট স্ট্রীট	॥০/০
বাড়ি	৪৭ মনোহর দাস স্ট্রীট	/০।৶০
দোতলা বাড়ি	৬৪ ডাক্তার লেন	২/৪
জমি	১ রামহরি মিস্ত্রী লেন	/১।৵০
বাড়ি	৭১ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট	৬।৩
দোকান }	৭২ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট	
জমি }	৩ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট	
জমি	৩৮, ৩৯, ৪০, মার্কেট স্ট্রীট	
জমি	১৩০ জানবাজার স্ট্রীট	/২।৶০
গুদাম	১০ মির্জাপুর লেন	॥১৶০
গুদাম	৩৬ নীলমণি হালদার লেন	॥৪
দোতলা বাড়ি	২০১-২০৫ পুরাতন চীনাবাজার	১/২৶৶০
জমি	৮ ওয়েলেসলি স্ট্রীট	৩৶৩॥৶০
জমি	২৬ ওয়েলেসলি স্ট্রীট	॥০॥০
জমি	৭৭ ধর্মতলা স্ট্রীট	১॥৪৶/০
বাড়ি	৯৯ জানবাজার স্ট্রীট	১/২।/০
জমি	১ মুন্সি সদরুদ্দী লেন	/৪৶৵০
জমি	৪ গোয়ালটুলি	/৪৶০
বাড়ি	৪৫ মটস্ লেন	১।২
জমি	১৬ মার্কেট স্ট্রীট	॥৪৶০
জমি	১২৫ জানবাজার স্ট্রীট	॥০।০
দোতলা বাড়ি	৭৬ ধর্মতলা স্ট্রীট	১॥০৶/০
জমি	৭ উমাচরণ দাসের লেন	৶৩॥৶০
বস্তি	৮৭ তালতলা	।৪
বস্তি	৪৬ জানবাজার	৯৶০।৶০
বস্তি	৩৭ জানবাজার	—
দোকান	১৮ জানবাজার	/১॥৶০
বস্তি	১১২ জানবাজার	।৩৶০
জমি সহ বাড়ি	১১৫ জানবাজার	/৩৶০

আস্তাবল সহ বাড়ি	৭৫।১ ধর্মতলা স্ট্রীট	/২৮৵৹
দোকান	৪ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট	/০॥/৹
বস্তি	৫ গোয়ালটুলি	/৩॥৶৹
বস্তি	৯ দত্ত লেন	।০/৹
বস্তি	১২ মার্কুইস স্ট্রীট	১।৶৹
জমি	১৬ মিস্ত্রী খানসামা লেন	।৪ ৶৹
জমি	১২ শাঁখারীটোলা লেন	/২।৵৹
বস্তি	১ সরিফ দপ্তরী	।০৮৹
তিনতলা বাড়ি	২ কীড স্ট্রীট	৫॥৪॥৵৹
দোতলা বাড়ি	১ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট	১।৪৸৶৹
দোতলা বাড়ি	২৪ চৌরঙ্গী	২।০ ৵৹
জমি ও দোকান	২৫ ওয়েলেসলি	১৸২
জমি	৬৪ জানবাজার স্ট্রীট	।২।০
জমি	১৫ মটস্ লেন	।১।৵৹
বস্তি	১২ কোড়া বরদার লেন	।৩।০
বস্তি	৯ তালতলা	/২॥০
বাজার, বাগান, কুঠিবাড়ি, জমি, পুষ্করিণী ইত্যাদি —	বেলেঘাটা	২৫/৩
যদুবাবুর বাজার —	ভবানীপুর	৩/০
বাগান, কুঠিবাড়ি, পুষ্করিণী, গঙ্গার ঘাট —	কালিঘাট	২/০
বাগান, পুষ্করিণী —	সিঁথি	৩/৪

এছাড়া ঘি-পুকুর, জগন্নাথপুর, মাকিমপুর, কানারা, হোসেনপুর আরও বহু জায়গায় আয়ের সম্পত্তি ছিল। প্রসঙ্গক্রমে জানান দরকার, এই তালতলা অঞ্চলেই রাণী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্রের নামে রাস্তা আজও বিদ্যমান।

এ তালিকা থেকেই বোঝা যায়—তৎকালে তাঁর সম্পত্তির আয় কত ছিল। অস্থাবর সম্পত্তির কথা তো বাদই দিলাম।



১৮২৩ সালের কথা। বাংলার ১২৩০ সন।

সেবার রাণীমা দু' চোখ ভরে যেমন দেখেছিলেন বাইরের জগতের কঠিন কঠোর রূপ, তেমনি দেখে দেখে নীরবে দু'চোখের জলে বুক ভাসিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, ১২৩০ সনের ভয়াল-ভয়ংকর বন্যায় যখন এদেশের সাধারণ-অতি সাধারণ মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়েছিল তখনই রাণীমার মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠেছিল! আশ্রয়হীনদের আশ্রয় আর মুখে অন্ন দেবার দায়িত্ব-কর্তব্যভার মাথায় তুলে নিয়ে মানুষের বিপন্ন অবস্থায় মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াবার নৈতিক কর্তব্যর নজির রেখেছিলেন। তখনই তিনি প্রথম দেখেছিলেন এ দেশের মানুষের কুসংস্কার কত ভয়ংকর হতে পারে।

একদিন বাড়ির জুড়ি গাড়িতে ফিরছিলেন রাণী রাসমণি। সঙ্গে ছিলেন রাজচন্দ্র। স্বামী রাজচন্দ্রের সঙ্গে কোথায় যেন যেতে হয়েছিল তাঁকে। ফেরার পথে হঠাৎ গাড়ির গতি মন্থর হলো। গাড়ির ভিতরে রাজচন্দ্রের চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ চিন্তার ছায়া। সহস্র জিজ্ঞাসা যেন চারদিক থেকে তাঁর মনটাকে ঘিরে ধরেছিল। কোচোয়ান গাড়ি থামল কেন? গাড়ির ভিতর থেকে রাজচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন। কোচোয়ান বলল, বাবু অন্তর্জলির জন্য একটা মানুষকে খাটে চাপিয়ে অনেকগুলো মানুষ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে! এ যেন মগের মুলুক পেয়েছে ওরা! আমি পাশ কাটিয়েও যেতে পারছিনে

রাণীর দু'চোখেও বিস্ময়! স্বামীর কাছে অন্তর্জলির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

রাজচন্দ্র প্রথমেই সেই অর্থ বোঝালেন না। পরিবর্তে গাড়ির পর্দা কিছু সরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি দেখ, দেখে নাও, একটা অসুস্থ লোককে, আধমরা লোককে কেমন ঘটা করে নিয়ে যাচ্ছে—

রাণী গাড়ির ভিতর থেকে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলেন। একটা ছোটখাট

মিছিল চলছে যেন। ঢোল বাজছে, কাঁসর ঘণ্টা বাজছে হাতে হাতে। রাজচন্দ্র বললেন, আমাদের দেশে মানুষের মনে এই আর এক কুসংস্কার। একদিকে সহমরণের মত কুপ্রথা, অন্যদিকে এই অন্তর্জলি। গভর্নমেণ্ট এই প্রথা উচ্ছেদও করছে না আবার শ্মশানঘাটগুলোতে এই শ্মশানযাত্রীদের জন্য পাকা বন্দোবস্তও কিছু করছে না—

রাণী জিজ্ঞাসা করলেন. অন্তর্জলি কি ?

রাজচন্দ্র এবার এই প্রসঙ্গে বর্ণনা দিলেন।

সে যুগে পারতপক্ষে কোন মুমূর্ষুকে নিজের বাড়িতে মরতে দেওয়া হতো না। বাড়িতে মরার অর্থ ছিল দুর্ভাগ্য ও অধর্মের লক্ষণ। যে ব্যক্তি বাড়িতে মরত. লোকে ধরে নিত সে পাপী। তাই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করান হত ঘটা করে। তখনকার দিনে বহু অর্থবান ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করে এমন গঙ্গাযাত্রীদের জন্য খড়ের ঘর তৈরি করে দিতেন। জোয়ারের সময় মুমূর্ষুকে তার আত্মীয়স্বজনরা সেই ঘর থেকে বার করে এনে গঙ্গার জলে তার দেহ অর্ধেকটা চুবিয়ে রেখে দিত। একে বলা হতো অন্তর্জলি। এইভাবে মৃত্যু হলে তার মত পুণ্যবান ব্যক্তি আর কেউ নেই প্রমাণিত হত। এইভাবে দিনের পর দিন অন্তর্জলি করার ফলে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে. বৃষ্টিতে. শীতে কষ্ট পেয়ে মানুষটি মারা যেত। তাকে মেরে ফেলাই হত একরকম। অনেক ক্ষেত্রে সেই মরা মানুষের মুখে একটু আগুন দিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো—

সব শুনে রাণীর মনে যদিও একরাশ ক্ষোভ জমা হয়েছিল, তবুও সমাজের এই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই প্রথার শিকার তাঁকেও হয়ত হতে হবে একদিন—এইসব ভেবেই বললেন, নিমতলা শ্মশানঘাটের গা লাগোয়া আমাদের জমির ওপরে গঙ্গাযাত্রীদের সব রকম দুর্ভোগের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একটা পাকা ঘর তৈরি করে দিলে কেমন হয় ?

কেমন হয় কথা নয়, রাণী যখন জিজ্ঞাসা করেছেন তখন তার ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার—এটা বুঝেছিলেন রাজচন্দ্র। বুঝেছিলেন বলেই পরের দিন থেকে নিমতলা শ্মশানের দক্ষিণ দিকে একটা পাকা হল ঘর তৈরি করার নির্দেশও জারি করেছিলেন তিনি। মাত্র ক'দিনের মধ্যে সেই নির্দেশ-মত তৈরিও হয়ে গিয়েছিল পাকা ঘর।

১৮২৮ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় তৈরি হয় নিমতলা মহাশ্মশানঘাট। ১৬০ ফুট লম্বা আর ৯০ ফুট চওড়া জায়গার তিন দিকে ৫ ফুট উঁচু পাঁচিল

দিয়ে ঘেরা, গঙ্গার দিকে খোলা এই শ্মশানে ১৭ই মার্চ থেকে শব দাহ করা শুরু হয়। আর এই মার্চ মাসের শেষের দিকে রাণী রাসমণির চাহিদা অনুসারে বাবু রাজচন্দ্র গঙ্গাযাত্রীদের জন্য পাকা ঘর তৈরির কাজ শেষ করেন। শুধু মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ঘর তৈরি করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি। একজন দারোয়ান, দু'জন চাকর আর একজন ডাক্তারকে নিযুক্ত করে তবেই থেমেছিলেন।

এর পরের ঘটনা অন্যরকম।

বাবার বৎসরান্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সারতে রাণী গিয়েছিলেন গঙ্গায়। এখন যেটি 'বাবুঘাট' নামে পরিচিত সেই ঘাটে। ঘাটে গিয়ে খুবই বিব্রত অবস্থার মধ্যে পড়তে হল তাঁকে। ঘাট তো নয় মরণ ফাঁদ! একটু অন্যমনস্ক হয়ে পা রাখলেই স্নানযাত্রীদের হয় পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে যাবে, নতুবা মুখ থুবড়ে পড়তে হবে কাদায়। মনে মনে বিরক্ত হলেন যতটা তার চাইতে অনেক বেশি উত্তেজিত হলেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কি এদেশের মানুষগুলোকে কুকুরের অধম মনে করে? এসব দিকের উন্নতির কথা ভেবেও দেখেনি কখনও! যদিও এসব জমির মালিক স্বয়ং রাণী, শ্বশুর মশায়ের মৃত্যুর পর যদিও এ সব কিছুর ওপরে রাজচন্দ্র আর রাণীর একমাত্র অধিকার, তবু রাসমণি একবার ভাবলেন, মানুষের কল্যাণে গভর্নমেণ্ট যদি এখানে ভাল করে ঘাট তৈরি করার জন্য অনুমতি চাইত, হাসি মুখে দিতেন তাঁরা। অথচ তা চায়নি কখনও। এদিকটার দুরবস্থা আগে কখনও দেখাও হয়নি।

মনের ক্ষোভ মনে রেখে ফিরেছিলেন রাণী। স্বামীর কাছে সব কথাই খুলে বলেছিলেন একসময়। বাবু রাজচন্দ্রও ব্যাপারটা অনুধাবন করলেন। বুঝলেন, সত্যিই তো, না আছে ভাল রাস্তা—না আছে ঘাট। সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অনেক কিছুই নেই—তার মধ্যে এই আর একটা।

রাজচন্দ্র চুপ করে থাকতে পারলেন না। যোগাযোগ করলেন তখনকার ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ামের সঙ্গে। জানবাজার থেকে একটা বড় পাকা রাস্তা আর গঙ্গার ঘাট তৈরি করার জন্য অনুমতি চাইলেন। লর্ড উইলিয়াম সব দিক ভাল করে দেখে যথা সময়ে অনুমতি দিলেন।

শুরু হয়ে গেল বিরাট কর্মযজ্ঞ।

একসঙ্গে দু'টি কাজ পুর্ণোদ্যমে চলতে থাকল। প্রথমেই তৈরি হলো ঘাট। ১৮৩০ সালের এক শুভদিনে জনসাধারণ এই ঘাটে একখণ্ড "প্রস্তর

ফলক'-এর সামনে জমায়েত হয়ে তাতে কি লেখা ছিল শুধু তাই পড়লেন না, এই নতুন স্নান-ঘাটে উদ্বোধনের দিনই স্নান করে বাবু রাজচন্দ্র দাসের জয়ধ্বনি দিলেন !

এই প্রস্তর ফলকে লেখা আছে : "The Right Honourable Lord William Cavendish Bentinck, G. C. B. & G. C. H. Governor General & c. & c. & c. with a view to encourage the direction of private munificence to works of public utility has been pleased to determine that this Ghaut constructed in the year 18 30 at the expense of Baboo Raj Chandra Doss. Shall here .fter he called Baboo Raj Chandra Doss's Ghaut."

সেই প্রস্তর ফলক থেকে লোকে জানল এই ঘাটের নামকরণ হয়েছে, বাবুঘাট। বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট। সাধারণ মানুষ একরাশ বিস্ময় নিয়ে ছত্রিশটি বিশাল থাম আর অপরূপ কারুকার্য করা চন্দ্রাতপ শোভিত বাবুঘাট দেখল। এই ঘাটের উপর দিয়ে এক সময়ে তৈরি হয়েছিল পোর্ট ট্রাস্টের রেলপথ, মাঝে বহু বছর বন্ধ থাকার পর এখন আবার সেই পথে চলে সার্কুলার রেল। এই সঙ্গে তারা আরও দেখল, বাবু ঘাট থেকে তৈরি হচ্ছে বিশাল-বিস্তৃত একটি পথ, কয়েকশত কর্মী দিন রাত মানুষেরই কল্যাণে তৈরী করে চলেছে নতুন পথ। অবশেষে সেই পথ তৈরীর কাজও শেষ হয়ে গেল।

রাজচন্দ্র একদিন বীর যোদ্ধার মত, রাজ্য জয়ের গৌরব বহন করে আনার মত, একরাশ আনন্দ আর তৃপ্তি নিয়ে ঘরে এসে রাণীকে বললেন, পথ বাঁধার কাজ শেষ হয়েছে—

রাণী এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

নিমতলা মহাশ্মশানের গা লাগোয়া জমিতে রাজচন্দ্র যে পাকা ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেই সংবাদ ফলাও করে ছেপে দিয়েছিল 'সমাচার দর্পণ'। ১৮৩৪ সালের ১ জানুয়ারি এই সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বিশিষ্ট মহলে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল !

সেদিন সেরেস্তার কাজকর্ম সেরে 'সমাচার দর্পণ' হাতে করে রাজচন্দ্র অন্দরমহলে এলেন, তখন তাঁকে খুব যে একটা আনন্দিত দেখাচ্ছিল তা নয়। আসলে কল্যাণকর কাজ করতে গিয়ে এই সব সংবাদ কাজের মনটা অহংকারী করে দিতে পারে আশংকায় রাজচন্দ্র খুশি হতে পারেন নি।

রাণী বলেছিলেন, তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ?

রাজচন্দ্র নীরবে কাগজটি এগিয়ে দিলেন রাসমণির সামনে। বললেন, পড়ে শোনাই তোমাকে— কথা শেষ করে সংবাদটি পড়তে থাকলেন রাজচন্দ্র :

মুমূর্ষু ব্যক্তিদের আশ্রয় স্থান।—ইণ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে যে সকল মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং যাহাদের কোন প্রকারে জীবন সম্ভাবনা নাই এমন ব্যক্তিদের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতি ধনী ও বদান্য এক ব্যক্তি মনোযোগ করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ মহাশয় গঙ্গাতীরে পাকা দুই ঘাট করিয়া দেওয়াতে অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ঐ বাবু শ্রীযুত রাজচন্দ্র দাস প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজ খরচে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিকা নির্ম্মাপণে অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে আসন্নকালে গঙ্গাতীরে নীত ব্যক্তিদের ঐ স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষাদিরূপ উপকার হয়। এবং এই অতি হিতজনক কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন এবং শুনা গিয়াছে যে অত্যল্পকালের মধ্যেই ঐ অট্টালিকা প্রস্তুতার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহাতে ঐ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে। অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু ব্যক্তিদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে রূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়—

সংবাদ পড়ে 'সমাচার দর্পণ' সযত্নে ভাঁজ করে রাখতে রাখতে একটু হাসলেন রাজচন্দ্র। সেই হাসির অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে রাণী বললেন, হাসছ যে!

রাজচন্দ্র বললেন, খবরের কাগজের লোকেরা দেখছি সবার হাঁড়ির খবর রাখে! নিমতলা শ্মশানে যে ঘর আমরা তৈরি করেছি তাতে কত টাকা খরচ হয়েছে তাও লিখেছে—

মানুষ জন্ম নিলে তার মৃত্যু খণ্ডায় এমন সাধ্য কার?

মৃত্যুই সত্য আর ঈশ্বরের সব চাইতে মহান সৃষ্টি হলো মানুষ! সেই মানুষ হয়ে জন্ম যখন লাভ করেছেন রাসমণি, যখন বিধির বিধান মতে রাজচন্দ্রের মত স্বামীদেবতা লাভ হয়েছে, এই অর্থ-সম্পদ-বিষয়-বৈভব যখন পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হবে না, অথচ মৃত্যু হলে যখন এর একটি কণাও সঙ্গে যাবে না, তখন মানুষের কল্যাণে কিছু করাটা মানুষের ধর্ম। সেই ধর্ম পালন করলে মন উদার হয়। উদার আকাশটার দিকে চোখ মেলে তাকালে সেই ধর্ম পালনের কথা বড় বেশী করে মনে

জাগে। মনকে সর্বদা সেইভাবে তৈরি করার জন্যেই বোধ করি রাণী রাসমণি মাঝে মাঝে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশ দেখেন। আকাশ আর মন দুয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়!

একবার রাজচন্দ্র দূর থেকে স্ত্রীর সেই আকাশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার ছবিটা দেখেছিলেন।

সুযোগ এলে বলেছিলেন. আকাশের দিকে চোখ রেখে তুমি কী দেখ রাণী?

রাসমণি বলেছিলেন, আকাশ দেখি, আর আমার ঐ আকাশের মত ছড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে! চাঁদ-তারা আর সূর্য দেখি, আর ওদেরই মত উদার হতে ইচ্ছে করে! ঈশ্বরের কী মহিমা দেখ, আকাশের কাছে কোন ভেদাভেদ নেই। সূর্য-চন্দ্র-তারা'র মধ্যে কোন অহঙ্কার নেই। ওরা আমাদের জন্য! সবার জন্য! অমন করে সবার জন্য যেদিন হতে পারব সেইদিনই মন শান্ত হবে।

আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়—এই গৌরব যেদিন আসবে সেদিনই আমার শান্তি—

রাজচন্দ্র বলেছিলেন, তাই তো তোমার পথই আমার পথ. আমার পথই তোমার পথ! সেই আলোর পথে তোমার হাত ধরে চলতে চলতে আমিও সেই আলোয় লীন হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখি—

সব মানুষের সব স্বপ্ন সার্থক হয় না। রাজচন্দ্রের হয়েছিল!

১৮২৯ সালের কথা।

কলকাতায় একটা ব্যাঙ্ক তৈরী হওয়া দরকার। একটা নতুন ধরনের ব্যাঙ্ক তৈরী হলে প্রদেশের সাধারণ. অসাধারণ. হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ সবার উপকারে লাগবে। খবরটা মন্দ নয়, এ জন্য আমার যদি কিছু করার থাকে আমি অবশ্যই করব, এমন উক্তি সেদিন রাজচন্দ্র দাস করেছিলেন।

এই সংবাদটি একেবারে সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা থেকে তুলে দেওয়া দরকার।

১৮২৯ সালের ৩০ মে আর বাংলার ১২৩৬ সনের ১৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখল:

কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক:

গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার একস্‌চেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয়ই করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন

সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেব-লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল সেই কাগজে প্রায় একশত সাহেবলোক প্রভৃতি সহী করিলেন. তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেবলোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক হইয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল। শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র। শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।

এই কমিটির সাহেবরা পুনর্ব্বার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে।···

১৮২৯ ২৭ জুন (১৫ আষাঢ় ১২৩৬) এই মর্মে আবার সংবাদ প্রকাশিত হল। এক্সচেঞ্জ ঘরেই গত সোমবার বহু ধনী ও গুণী ব্যক্তির সমাবেশে ভোট গ্রহণ করে কর্মসমিতি তৈরি হয়। জন স্মিথ ছিলেন সভাপতি। নামের বিবরণ ছিল এই রকম ঃ—

ট্রাস্টি (বিশ্বস্ত)—কম্পটন সাহেব, ডিকিন সাহেব ও রাজা নৃসিংহ চন্দ্র রায়।

ডাইরেক্টর (অধ্যক্ষ)—জন পামার. মেং গার্ডন. মেং স্মিথ, মেং বাইড, মেং ব্রেকন. মেং কলেন, মেং স্মিথসন, মেং বুরুস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এপক্যার. মেং সটন, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস।

সেক্রেটারী (সম্পাদক)—হরি সাহেব।

টেজারার (খাজাঞ্চী)—বাবু রমানাথ ঠাকুর!

ওই একই সংবাদে এই প্রসঙ্গে আরও লেখা হয়েছে. বৃহস্পতিবারের সভায় সেক্রেটারী বদল হয়েছে। কার সাহেব আর গাডার্ড সাহেব সেক্রেটারী হয়েছেন। আর কোষাধ্যক্ষকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে, তবে তাঁকে ৪ লক্ষ টাকা জমা রাখতে হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল সমাচার দর্পণের ভাষায় ঃ

"···ফলিতার্থ এ প্রকার সভা করিয়া উভয় পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মার্থিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্ব্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিলনা অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল॥"

এইভাবে এগিয়ে যেতে থাকলেন রাজচন্দ্র। এইভাবেই তো একজনকে এগিয়ে যেতে হয়!

একজন মাটি খুঁড়ে খুঁটি পুঁতে মঞ্চ তৈরী করবে, অন্যজন সেই মঞ্চে এসে নিত্য করবে অভিনয়। একজন বীজ বপন করবে, অন্যজন করবে পরিচর্যা। সেই পরিচর্যার ফলে বীজ থেকে অঙ্কুর আসবে, অঙ্কুর হবে মহীরুহ। এমনি করে আবহমানকাল চলবে সৃষ্টি। এইভাবে বেঁচে থাকবে একটা ধারা! সেই ধারার উত্তর সাধিকা রাণী রাসমণি!

যিনি সাধিকা, তাঁর জন্য অনেক কাঁটার পথ বিছিয়ে রাখেন বিধাতা। সেই কাঁটার পথ ধরে, অনেক আঘাত সহ্য করে যিনি লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যান, জীবনের অর্থ যাঁর কাছে বিপ্লবের নামান্তর তিনিই তো পারেন মহাবিপ্লবের ভিতর দিয়ে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে। কিন্তু তা পারেন ক'জন?

যিনি সংসারী তিনি তো মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মায়া-মোহ-ত্যাগের মধ্যে আত্মসুখ থাকে, পরমাত্মার তৃপ্তি থাকে না। কিন্তু মায়া-মোহ-দায়-দায়িত্ব-প্রেম-প্রীতি, আঘাত, সুখ আর অসুখ এসবের মধ্যে থেকে যিনি পরমাত্মার সিদ্ধিতে মুক্তি খোঁজেন তিনিই তো ঈশ্বরের দেখা পান!

জানবাজারের সোনার পালঙ্কে শুয়ে, সন্তান-স্বামী, আত্মীয়-স্বজন, চেনা-অচেনাদের মধ্যে থেকেও রাণীমা পরমাত্মার সিদ্ধি চেয়েছিলেন বলে পুত্র সন্তানের মুখ দেখেও মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দিতে না পারার শোক ভুলতে পেরেছিলেন। দেবতাতুল্য শ্বশুর মশায়ের মরদেহের পদযুগলে আলতাপাতার রঙ লাগিয়ে কাগজের গায়ে সেই পদচিহ্ন ধরে রাখতে গিয়ে দু'চোখে যে জল এসেছিল তার একটি ফোঁটাও মাটিতে যাতে ঝরে না পড়তে পারে তার জন্য নিজেকে কঠিন-কঠোর করেছিলেন।

মায়ের আকস্মিক অকাল মৃত্যু যেমন সহ্য করেছেন, স্বামী যখন বাবা হরেকৃষ্ণ দাসের মৃত্যুর খবর দিলেন তখন মুখের ওপর মুহূর্তে যে ব্যথার ছায়া পড়েছিল, সংসারের অনেক দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্পাদনের অছিলায় সেই ছায়া সরিয়ে ফেলেছিলেন মনের আলোয়। তারপর গভীর ভাবনা আদরের মেয়ে করুণাময়ীকে নিয়ে।

দিনকতক হোল মেয়েটা বড় ভুগছে।

একের পর এক ডাক্তার-কোবরেজ আসছেন, দেখছেন আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। করুণাময়ীর রোগটা কি, কেন ঐ এক রাত্রি চাঁদের মত

মেয়েটা বিছানায় শুয়ে আছে নীরবে—তার সঠিক কারণটা কেউ ধরতে পারছেন না। মা হয়ে রাসমণির একটার পর একটা রাত কেটে যাচ্ছে ফ্যাকাশে-বিবর্ণ মেয়েটার মুখের দিকে চোখ রেখে! ক'দিন আগে বাবা মারা গেছেন, আজ নিজের কোলের মধ্যে নিজের আদরের মেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, অথচ রাণীমা ভেঙে পড়ছেন না।

এই তো সত্য। দেহ হল রোগের মন্দির। মানুষ হয়ে জন্মালে জরা আসবেই, জরা এলে মৃত্যুও হতে পারে এই সত্যকে অস্বীকার করবে কে? আবার অসময়ে কেউ চলে যায়, তার নির্দিষ্ট কাজটুকু শেষ করে। করুণাময়ীর মরণ হলে মা হয়ে তো তার সঙ্গে সহমরণে গিয়ে সে ব্যথা জুড়ানো যাবে না। যে মরে মাত্র ক'দিনের মধ্যে পার্থিব জীবন থেকে সেই ব্যথা, সেই স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য সবাই কত সহজে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু সে যতক্ষণ কোলের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তার সেবা দরকার, শুশ্রূষা দরকার। সেই কর্তব্যের চেতনা-বোধ থেকে রাণীমা অসুস্থা করুণাময়ীর মাথাটাকে কোলের ওপর রেখে শুধু কয়েকটা বিনিদ্র রজনী পার করে দিয়েছিলেন।

১৮৩১ সালে মাত্র ক'দিনের মধ্যে পর পর দু'টি মৃত্যু! কোনা গাঁয়ে বাবা হরেকৃষ্ণ দাস আর জানবাজারের প্রাসাদে করুণাময়ী। করুণাময়ীর আকস্মিক মৃত্যুতে রাণী রাসমণির বক্ষ বিদীর্ণ হলো কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে বুকের ব্যথা বুকের মধ্যে জমা করে রাখলেন! কিন্তু বড় বেশী ভেঙে পড়েছিলেন রাজচন্দ্র! স্বামীর মুখের দিকে চোখ রেখে, মা হয়েও রাসমণি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, এত ভেঙে পড়লে আমরা বুক বাঁধবো কী দিয়ে! যার থাকার কথা নয়, সে থাকবে কেন? যারা আছে তাদের জন্য আমাদের অনেক কাজ করে যেতে হবে—

বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন রাজচন্দ্র! নারী হৃদয়, মাতৃ হৃদয় কত সহজে কঠিন-কোমল! রাজচন্দ্র হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর মুখে ভাষা ফোটার আগে রাণীমা বলেছিলেন—

—মৃত্যুই পরমসুন্দর! মৃত্যু পরমাত্মীয়!—

দুনিয়ার যা কিছু সুন্দর তার সংজ্ঞা নেই, কিন্তু মৃত্যুর সংজ্ঞা আছে! মৃত্যু হলো চরম এবং একমাত্র সত্য। মৃত্যু সমাপ্তি আনে না। শ্রীগীতায় ভগবান বলছেন,

> 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥'

যেমন মানুষ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নূতন শরীর ধারণ করে ! আত্মার বিনাশ নেই। লয় নেই।

কিন্তু সেই মৃত্যুকে ভুলে থাকাই মানুষের ধর্ম। জন্মের পর মৃত্যু এই চেতনা বোধ যদি চির জাগ্রত থাকে তা হলে মানুষ তো জন্ম থেকেই পঙ্গু হয়ে যেত ! তাই কে যেন সব কিছু ভুলিয়ে রাখে। রাজচন্দ্রও তাই ছিলেন। এমন কিছু মৃত্যু আছে যা দগদগে ক্ষতের মত। আঘাতে যন্ত্রণার মত। করুণাময়ীর মৃত্যু তেমনি। মনে পড়লে চাপা ব্যথা টনটন করে ওঠে রাজচন্দ্রের।

একদিন কথা প্রসঙ্গে রাসমণি বললেন,—তুমি বরং আহেরীটোলার ঘাটটা আর ফেলে রেখ না। শুনেছি গয়লা পাড়ার লোকেরা জলের অভাবে খুব কষ্ট পাচ্ছে, গঙ্গায় স্নানটুকুও করতে পারছে না—

রাজচন্দ্র একটা শুকনো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বেশ তাই হোক—, বললেন তিনি। আরও বললেন, —স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে আলোচনাও করেছি, তারা বলেছে আহেরীটোলার ঘাট বাঁধাবার ব্যাপারে তারা সব রকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, তা ছাড়া ও জমি আর অঞ্চল যখন আমাদের, তখন কোন কিছু আটকাবে না

কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। আহেরীটোলার ঘাট তৈরির কাজও শেষ হয়ে গেল অতি দ্রুত।

রাজচন্দ্র একদিন বাড়ি ফিরে এসে বললেন, ঘাট তো তৈরি হলো, ভাবছি ঘাটের নাম তোমার নামেই রাখবো—রাণী রাসমণির ঘাট।

রাণী হাসতে হাসতে বললেন, তুমি যদি মনে করে থাক তোমার রাণী মরেছে তা হলে তাই করো, আমার নামেই ঘাটের নাম রাখ—

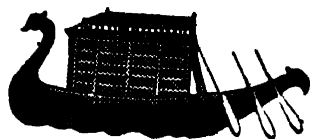
কেঁপে উঠলেন রাজচন্দ্র। রাণীর কথাটা তাঁর বুকের ভিতরে তীরের মত বিঁধে গেল।—ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ তুমি কী বলছ। এ সব অলক্ষুণে কথা আমাকে কেন শোনালে রাণী। কেন আমাকে আঘাত করলে।

স্ত্রীর এই ঠাট্টা রাজচন্দ্রকে আরও একটি কারণে বড় বেশী আঘাত করেছিল। সেটা করুণাময়ীর মৃত্যু। আদরের মেয়ে করুণাময়ীর আকস্মিক মৃত্যুর ছবিটা তখনও মন থেকে মুছে যায়নি। মৃত্যু যে কত ভয়ংকর, কত নিষ্ঠুর তার সদ্য রূপটা এখনও ফ্যাকাশে হয়নি। এই অবস্থায় প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখে মৃত্যু কামনা রাজচন্দ্রকে কাতর করল বেশী।

রাসমণি বললেন, আঘাত পেলে ? পরক্ষণে স্বামীকে সহজ করে তুলবার

জন্য হাসতে হাসতে বলেছিলেন, না গো না, এত সহজে আমার মরণ নেই, তোমারও না—আমারও না। আমরা ঈশ্বরের কাজ করতে এসেছি, তাঁর কাজ যেদিন আমাদের দিয়ে তিনি শেষ করে ফেলবেন সেদিন তিনিই আমাদের কাছে টেনে নেবেন, আমি তোমাকে ঠাট্টা করেছি। শুনেছি যাদের অনেক টাকা তারা কেউ মরলে টাকা দিয়ে স্মৃতিসৌধ তৈরি করে, আমি বেঁচে থাকতে আমার নামে ঘাট করলে লোকে কী বলবে, তাই ভেবে ঠাট্টা করেছি—যাকগে যাক, ও সব ভুলে যাও—

রাজচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন। যা ভুলতে পারেন নি তা হল করুণাময়ীর হঠাৎ মৃত্যু! এই ঠাট্টা থেকে সেই কথা মনে পড়ে বড় বেশি কাতর করেছিল তাঁকে। রাজচন্দ্রের মনে পড়ে গিয়েছিল সব কথা! করুণার জন্ম, কত ধুমধাম করে বিয়ে তারপর হঠাৎ মৃত্যু!



করুণাময়ীর জন্য অনেক খুঁজে মনের মত পাত্র যোগাড় করেছিলেন রাজচন্দ্র। একে ত যোগাড় করে আনা বলে না, আসলে জোগান দেওয়া। পূজায় যেমন পুরোহিতের জোগানদার থাকে, যারা ঘর বাঁধে তাদের যেমন জোগাড়ে থাকে, ডাক্তারের যেমন কম্পাউণ্ডার তেমনি রাজচন্দ্র আর রাসমণির জন্য একজন উপযুক্ত জোগাড়ী দরকার যাঁর মনে হয়েছিল, সেই সর্ব কর্মের নিয়ন্ত্রা, পরমেশ্বরই করুণাময়ীর জন্য মথুরামোহনকে পাঠিয়েছিলেন জানবাজারের বাড়িতে।

২৪ পরগনার বিথুরী গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের লেখাপড়া জানা ছেলে মথুরামোহন বিশ্বাসের সন্ধান পেয়ে রাজচন্দ্র ছুটে গিয়েছিলেন সেজ মেয়ে করুণাময়ীর সঙ্গে বিয়ে দেবার আর্জি নিয়ে। মথুরামোহনকে দেখে যতটা মন ভরে গিয়েছিল রাজচন্দ্রের তার চাইতে ঢের বেশী খুশি হয়েছিলেন তাঁর ব্যবহারে। যেমন দেখতে সুপুরুষ, তেমনি ব্যবহারে চমৎকার, যেমন বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞ, তেমনি ইংরেজী শিক্ষায় অনেকটাই শিক্ষিত। মেধাবী, জ্ঞানী। রাজচন্দ্র এমন জামাই পেলে যেমন ভাবনা মুক্ত হতে পারেন, তেমনি রাসমণির হৃদয় ভরতে পারে। আসলে ওঁদের পুত্র সন্তান ছিল না বলে একটা ব্যথা ছিল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে জামাই এনে ছেলের ব্যথা ভুলে

থাকার বাসনা ছিল। সেই বাসনা পূর্ণ করার তাগিদে রাজচন্দ্র আর রাণী প্রভৃত অর্থ খরচ করে একে একে বড় মেয়ে, মেজ মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই এনেছিলেন, কিন্তু ছেলে পাওয়ার সুখ মেটে নি। তারপর করুণাময়ী। করুণাময়ীর সঙ্গে মথুরামোহনের বিয়ে হল এক শুভ দিনে। গোটা বাড়িটা আনন্দ-খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল।

এমন খুশি আগের দুই মেয়ের বিয়েতে ছড়িয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু পুত্রের অভাব ঠিকভাবে মেটাতে পারেন নি তাঁরা। আসলে সেই খুশি যাদের জন্য বরণ করা হয়েছিল তারা সুখী হয়েছে, তৃপ্ত হয়েছে—এটাই ছিল রাণী আর রাজচন্দ্রের একমাত্র তৃপ্তি। সিঁথির বর্ধিষ্ণু পরিবারের ছেলে রামচন্দ্র দাসের সঙ্গে প্রথম মেয়ে পদ্মমণির বিয়ে হবার পর, পদ্মমণি যখন শ্বশুর বাড়িতে চলে গেল, রাসমণির ছেলে পাওয়ার সুখ হল না ; ওরা সুখী হল। তারপর যখন খুলনা জেলার সোনাবেড়িয়ার স্বনামখ্যাত চৌধুরী বাড়ির ছেলে প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয় মেয়ে কুমারীর বিয়ে হল তখনও সেই একই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল রাজচন্দ্র আর রাসমণিকে। ওঁরা ত মেয়েদের সুখ কামনা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে। কুমারী তাঁর স্বামীর হাত ধরে চলে গিয়েছিল জানবাজারের বাড়ি ছেড়ে সোনাবেড়িয়ায় শ্বশুর বাড়ি! হয়নি, প্যারীমোহনকেও ছেলে হিসেবে কাছে রাখার বাসনা পূর্ণ হয়নি। সামাজিক প্রথার বাইরে বেরিয়ে এসে মনের মত কিছু চাইবার অধিকার থাকলেও তা প্রকাশ করার মত স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না। সব পাবার বাসনা পূর্ণ হয় না।

রাজচন্দ্র আর রাসমণি মেয়েদের বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই রাখার ইচ্ছা পোষণ করতেন না বটে. কিন্তু জামাতা পুত্রের সমান, তাই পুত্রের আসনে বসে জামাইরা পুত্রহীনের ব্যথা মুছিয়ে দেবে এমন নজিরও বিরল। রাজচন্দ্রের দুশ্চিন্তা সেখানে! বংশ রক্ষা, কুল রক্ষা, বিষয় রক্ষা করার মত ঈশ্বর যদি সেদিন সেই পুত্র সন্তানটিকে বাঁচিয়ে রাখতেন, তা হলে ষোল কলা পূর্ণ হতো। কোন দুঃখই থাকত না ওঁদের। একটি ছেলের জন্য রাসমণির মাতৃহৃদয় এমন করে হাহাকার করত না।

তা হয়নি!

অবশেষে করুণাময়ীর সঙ্গে মথুরামোহনের বিয়ে। একেবারে গোড়া থেকেই আচারে-আচরণে মথুরামোহনের মধ্যে আপন সন্তানের মতই একটা লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। রাজচন্দ্র মাঝে মাঝেই বলতেন,—জানো রাণী, আমাদের ছেলে থাকলে তার কাছ থেকে বাবা হয়ে যা প্রত্যাশা করতাম,

আমাদের মথুর হয়তো তার অধিক ! এমন ছেলে দুর্লভ ;—

রাণী বলতেন, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়, তবে যার শেষ ভাল তার সব ভাল ! কথাগুলো বলে রাণীমা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার সংসার সাগরে ডুব দিয়েছিলেন !

কিন্তু বিধি বাম ! মাত্র দেড়টি বছরও কাটল না, করুণামরী শয্যা নিল। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল সে। প্রভূত অর্থ ঢেলে, শ্রম ঢেলে, সেবা আর শুশ্রূষা দিয়ে মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য যমের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করেছিলেন রাজচন্দ্র-রাসমণি। পুত্রবৎ মথুরামোহনের মুখের দিকে চোখ রেখে কথা বলার মত মনটাও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী করুণাময়ীর রক্তশূন্য মুখের দিকে চোখ রেখে মথুরামোহন নিজে একরাশ ব্যথায় কাতর হলেও মাঝে মাঝেই শ্বশুর আর শাশুড়ি মায়ের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। নিজের পেটের ছেলে থাকলেও বোধ করি এমন করে কাছে এসে দাঁড়াতে পারত না। সেখানেই পরম তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ওঁরা। পুত্র কামনা যেন সার্থক হয়েছিল। কিন্তু আদরের কন্যা করুণাময়ীকে ধরে রাখা যায়নি।

সেই মৃত্যুর ছবি রাজচন্দ্র এখনও তাঁর মনের ঘরে সযত্নে ধারণ করে রেখেছিলেন বলেই বোধ হয় স্ত্রীর ঠাট্টায় বড় বেশী আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। রাসমণি অবশ্য সেই আঘাত, সেই ব্যথা মুছিয়ে দিয়েছিলেন পরমুহূর্তে।

রাজচন্দ্র বলেছিলেন, রাণী তোমাকে একটা কথা বলে রাখি ; টেবিলের ওপরে ঐ যে ছবিটা রুপোর ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছ, ঐ ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে তুমি ভেঙ্গে ফেলার স্বপ্নও দেখনি কোনদিন, কিন্তু ছবিটা যদি কখনও তেমনি করে অন্য কেউ ভেঙ্গে ফেলে তুমি কিন্তু সহ্য করতে পারবে না, কেন পারবে না জানো ? কেন এমন হয় বলতে পার ?

রাণী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চোখ রেখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়েছিলেন। মুখে ভাষা ছিল না। স্বামীকে আজ বড় দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল তাঁর ! রাজচন্দ্র বুঝেছিলেন, এ কথার অর্থ না বোঝালে রাণীকে আঘাত করা হবে। তাই নিজেকে সহজ-স্বাভাবিক করে রাজচন্দ্র বলেছিলেন, আসলে ছবিটা যার তাকে তুমি ভালবাস। ঐ রুপোর ফ্রেমটার ওপরেও মানুষের মায়া থাকে। আসলে যে যাকে গভীর ভাবে ভালবাসে, সে তার বাঁধানো ছবিটাও ভাঙ্গতে পারে না, অন্য কেউ ভাঙ্গলে

ব্যথা পায়, পাগল হয়ে যায়—,ঠিক তেমনি তোমার মরণ হবে এ আমি ভাবতে পারি না, আমার জীবনে তুমি নেই তা কল্পনাতেও আনতে পারি না, তুমি ছাড়া আমি? এ হয় না, তাই ঈশ্বরের কাছে আমার কামনা তিনি যেন আমাকে তোমার আগে তাঁর কোলে টেনে নেন। আমার আগে তুমি চলে গেলে আমার মনের ঘর শূন্য হয়ে যাবে!

কথাগুলো রাসমণির কানে যত যায় ততই তাঁর দু'চোখ থেকে ঝরে পড়ে কান্না। রাণী নিজের শাড়ির আঁচলে নিজের দুটো চোখ মুছে নিয়ে বলেন, তুমি স্বার্থপর! আমি থাকব কিন্তু তুমি থাকবে না, আমাকে রেখে তুমি চলে যাবে আর কোনদিন ফিরবে না, একাকীত্বের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আমি তোমার এই বিষয় আগলাব, তোমার কথা ভেবে ভেবে দিন কাটাব? বাঃ চমৎকার বলেছ—তুমি স্বার্থপর ছাড়া আর কী!

রাজচন্দ্র বলেছিলেন রাণী আমার কথা শুনে তুমি আঘাত পেয়েছ বুঝতে পারছি, কিন্তু কেন বলছি, কে বলাচ্ছেন আমি জানি না, তবুও আমার বিশ্বাস তুমি শুধু এক সাধারণ মেয়ে হয়ে জন্মাওনি। আমার বিশ্বাস আর পাঁচজনের মত শুধু সংসার চালাবার জন্য তোমাকে ঈশ্বর পাঠান নি। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে আরও এমন কিছু করাতে চান যা শুধু তোমার জন্য নির্দিষ্ট! সুতরাং একটা চরম আঘাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আঘাতের পর আসে সুন্দর। সেই সুন্দরকে পেতে গেলে আঘাত তোমাকে সইতে হবে! আর তা হবেই—

রাজচন্দ্র ছিলেন গৃহী। রাজচন্দ্র ছিলেন বিষয়ী। রাজচন্দ্র আর পাঁচজনের মত সাধারণ একজন মানুষ। সেই রাজচন্দ্রের মুখ থেকে যে কথাগুলো সেদিন প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তার একটি শব্দও মিথ্যে হয়ে যায়নি। বিস্ময় সেখানে! থাক সে সব কথা!

মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গে যে অজস্র ফাটল ছিল, সেই ফাটল সারিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে তখন মেতে উঠেছেন অনেকেই! উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি।

এসবেরই একটা অংশ ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গরীব লোকদের কল্যাণ করার বাসনায় তৈরি হয়েছে এই সোসাইটি। এই সোসাইটির মধ্যে একটি সাধারণ কমিটিও তৈরি হয়েছিল। সেই কমিটিতে ছিলেন লর্ড বিশপ, সুপ্রীম কাউন্সিলের সাহেবরা, সুপ্রীম কোর্টের জাজেরা। সোসাইটির কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানর জন্য বছরে ১০০

টাকা করে যাঁরা চাঁদা দিয়ে থাকেন তাঁরাও জড়িত। এই সোসাইটির যে আয়—জনহিতকর কাজে তা ব্যয় হতো। আর তা হল এই রকম : জেঃ মার্টিন সাহেব, অন্য ১২ জন সাহেব ও পরলোকগত বারাটো সাহেব এবং চার্লস উয়েস্টনের চাঁদা, প্রতি মাসে গভর্নমেণ্টের দেওয়া ৮০০'শ টাকা, গীর্জায় জমা টাকা এবং হিতৈষীদের চাঁদা। এর সংগে ছিল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক সাহেবের মাসিক ৫০০ ও চার্লস মেটকাফ সাহেবের বার্ষিক ১০০০ টাকা।

১৮৩২ সালে সর্বজাতীয় দরিদ্র লোকেদের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান মোট ৩৯,৭৩৫ টাকা দান করে। এই ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সঙ্গে কলকাতার ৩২ জন বিশিষ্ট ও ধনাঢ্য যাঁরা জড়িত ছিলেন, যাঁদের বদান্যতায় এই সমাজ কল্যাণের কাজ শুরু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বিশ্বনাথ মতিলাল, রাধাপ্রসাদ রায়, রসময় দত্ত, রাধানাথ মিত্র, রামচন্দ্র গাঙ্গুলী, রামলোচন ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, কালাচাঁদ বসু, শ্যামলাল ঠাকুর, রামকমল সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, গোপাললাল ঠাকুর, হরলাল মিত্র, হরচন্দ্র লাহিড়ী, রামধন ঘোষ, রামপ্রসাদ দাস, কৃষ্ণমোহন চন্দ্র, শ্যামচন্দ্র দাস, ভবানী ব্যানার্জী, কাশীরাম মল্লিক, মতিলাল শীল, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, অভয়াচরণ বসু, শ্রীনাথ মুখার্জী, ভগবতীচরণ মিত্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ বসু, রাধানাথ মিত্র। এঁদের মধ্যে রাজচন্দ্র দাসও একজন!

এইভাবে একটা পর একটা জনহিতকর কাজের মধ্যে রাজচন্দ্র যত নিজেকে জড়াতে থাকলেন, ততই বাইরের জগৎ আর জীবনের আসল রূপ প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল হতে থাকলেন। যত কান পাতেন শুনতে পান অগণিত মানুষের কান্না আর হাহাকার! বড় বেশি আঘাত পেয়েছিলেন সেদিন, যেদিন দেখেছিলেন এদেশে প্রকৃত দুঃস্থ যারা, রোগে ভুগে ক্লিষ্ট, বিকলাঙ্গ প্রায়, তাদের জন্য এদেশে সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। যেমন করেই হোক ওদের পাশে দাঁড়াতে হবে। একটা বড় হাসপাতাল দরকার, দরকার ওষুধ।

১৮৩৫ সালের ২০ মে তারিখে রাজচন্দ্র নিজেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জড়ালেন তৎকালীন সদর বোর্ডের স্মিথ সাহেবের সেই একই ভাবনার সঙ্গে—নেটিভ হাসপাতাল চাই। এই হাসপাতাল নির্মাণে একটা সাব-কমিটি তৈরি হল কলকাতার স্বনামধন্য ও অর্থবান ব্যক্তিদের নিয়ে। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন সার এডওয়ার্ড রেয়ন, লর্ড বিশপ, স্যার

জে. পি গ্র্যাণ্ট, সি. ডব্লু. স্মিথ, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, জে. আর. মার্টিন আরও অনেকে। রাজচন্দ্র দাস সসম্মানে সেই কমিটিভুক্ত হলেন।

হাসপাতালের নতুন বাড়ি ও ওষুধ-পত্র ইত্যাদির জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে টাউন হলে একটা বড় ধরনের সভা ডাকা হয়েছিল। ১৫০০০ টাকা করে অনুদান দেবার ব্যাপারে সবাই সম্মতি দিলেন। রাজচন্দ্র দাসও সমপরিমাণ টাকা দিয়েছিলেন।

ভাল কাজ করলে তার পুরস্কার সে সময়ে পাওয়া যেত অতি দ্রুত। ভাল কাজের বিচার হয়ে যেত হাতে-নাতে। বাবু রাজচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। সরকার তাঁকে সম্মানিত করলেন! এ প্রসঙ্গে সমাচার দর্পণ ১৮৩৫ সালের ৯ মে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিল। সংবাদটি এই রকম ঃ

এতদ্দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট ঃ হরকরা-পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে নীচে লিখিতব্য এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে ম্যাজিস্ট্রেটীকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দ্র মল্লিক রাজা কালীকৃষ্ণ রসময় দত্ত রাধামাধব বাঁড়ুয্যে রাধাকান্ত দেব রুস্তমজী কাওয়াসজি।

স্বামীর গৌরবে গরবিণী হওয়া নারীর ধর্ম। রাণীমায়ের তেমনি গৌরব ছিল।

স্বামী যত বেশি দেশের আর দশের কল্যাণ সাধন করেন তত বেশি রাণীমার গর্বে হৃদয় ভরে যায়। রাজচন্দ্র যত অকাতরে অর্থ দান করেন ততই যেন রাসমণির আত্মতৃপ্তি! এসব ব্যাপারে রাসমণি যেন অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। অনেক বড়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা! স্বামী অর্থ বিলিয়ে আসেন, স্ত্রী বিলোবার মত অর্থ-ভাণ্ডার নিয়ে প্রতীক্ষা করেন! সেই রাণীমা একদিন আনন্দ আর খুশির আবেগে ঝলমল করে উঠলেন!

জানবাজারের প্রাসাদ আর আত্মীয়স্বজনের ঘরে সেই আনন্দ-খুশির হিল্লোল বয়ে গেল! মাড় বংশের যে যেখানে ছিলেন সবাই হলেন গর্বিত। ব্যাপার কী! কীসের এই আনন্দ-হিল্লোল!

রাজচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্রটি হাতে তুলে দিলেন রাণীর। রাজচন্দ্রের জনহিতকর কাজের নানা নজির পেয়ে কোম্পানী রাজচন্দ্রকে দিয়েছেন 'রায় বাহাদুর' খেতাব!



রাজচন্দ্র একদিন হাসি-খুশি মুখ আর বসন্তের নির্মল ও প্রশস্ত আকাশের মত দরাজ বুকটা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাণীর পাশে। বললেন, রাণী শুনেছ, আমাদের দেশের শিক্ষিত-অর্থবান-উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিরা আর এক নতুন পথে মানুষ গড়ার কাজে লেগেছেন —

রাসমণি তাঁর স্বামীকে অবাক করে দিয়ে বললেন,—শুনেছি বৈকি। কলকাতায় একটা বড় পাঠাগার তৈরির জন্য বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের দেশের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা অর্থসংগ্রহ করছেন—তাই না ?

রাজচন্দ্র হাসলেন। যাক, এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আমার রাণী শুধু সংসারের সব খবরই রাখেন তা নয়, সেই সঙ্গে কলকাতা নামক বিশাল সংসারের কোথায় কি নিত্য ঘটে যাচ্ছে তার খবরও তাঁর নখদর্পণে। রাজচন্দ্র বললেন, তুমি ঠিকই জান দেখছি, হ্যাঁ লাইব্রেরির ব্যাপারে সরকারি মহলে একটা নয়, একাধিক মিটিং হয়ে গেছে। রাসমণি বললেন, তুমি বরং একটা কাজ কর, মেটকাফ হলে গিয়ে যাঁরা এই মানুষ গড়ার রাজসুয়যজ্ঞ করছেন – তাঁদের হাতে পাঠাগারের জন্য দশ হাজার টাকা দিয়ে এস—

গৃহলক্ষ্মীর নির্দেশে, মনের তাগিদে রাজচন্দ্র যথারীতি তাই করলেন। যথাদিনে মেটকাফ হলে গিয়ে রাজচন্দ্র ঘোষণা করলেন, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি তৈরীর ব্যাপারে আপনাদের যে ভাবনা, যে শ্রম, যে আত্মত্যাগ, আমি তাকে শুধু অভিনন্দনই জানাচ্ছি না, আমাকে আপনাদের সব কিছুরই ভাগীদার-অংশীদার করে নেবার আবেদন জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে আমি আপনাদের তহবিলে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করছি, টাকা যদি আপনারা গ্রহণ করেন —বাধিত হব।

সেদিন সভার সকলে করতালি দিয়ে রাজচন্দ্রের মত উদার মনের মানুষকে অভিনন্দিত করেছিলেন। করারই কথা। শুধু এই অর্থদানই নয়, আরও অনেক কারণে এই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রাজচন্দ্রকে চিনেছিলেন অনেক আগেই। জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাস যে কোনদিন দেশের কথা—দশের কথা না ভেবে সোনার পালঙ্কে শুয়ে দিন যাপন করেছেন তা নয়, মনের

তাগিদে খুঁজেছেন সমাজ এবং সাধারণ মানুষের কোথায় কিসের যন্ত্রণা। সন্ধান পেয়ে সোজা নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাদের যন্ত্রণা লাঘব করতে।

পুষ্প কাননের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে সৌরভ, এ তো পুষ্প জন্মের গৌরব। ভাগীরথীর সলিল প্রবাহে নিত্য ভেসে যায় কত শত পূতিগন্ধময় আবর্জনা, কলঙ্কের কালিমা ধারণ সলিল-বক্ষের সৌন্দর্য। তাই ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করলে পাপ মুক্তির বিশ্বাস। আবর্জনা ভেসে যায়, বিশ্বাস বিদীর্ণ হয় না! গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা আদি ও অনন্ত ঐতিহ্য! গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—ঋতু ষষ্ঠের স্ব স্ব ভূমিকা যেমন বৃত্তাকারে লালিত-পালিত, কোন বিকল্প নেই, মানবজন্মের ইতিবৃত্তে কিন্তু কোথায় যেন একই বর্ণের রক্ত প্রবাহে মিশে আছে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা! আর সেই জিজ্ঞাসা থেকে মানব আর মহামানবের মধ্যে জন্ম জন্মান্তরের ব্যবধান। এখানেই ঐতিহ্যের সার্থক ব্যঞ্জনা। বংশগত ঐতিহ্য সে তো ভাবাবেগ। ধমনীর রক্তপ্রবাহে মিশে থাকে মহামানব সৃষ্টির পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা-কণিকা। এই তো ঐতিহ্যের রূপ।

রাজচন্দ্র মহামানব কিনা জানিনা, কিন্তু ইতিহাসের পাতা একের পর এক মেলে ধরলে বিষয়ী রাজচন্দ্র যে সেই ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক তা অনায়াসেই মেনে নিতে হয়। যেমন মেনেছি রাজা রামমোহনকে। রাজা রামমোহন সে তো অনন্ত সলিল। সেই সলিলের অতলান্ত থেকে যাঁরা মানব চরিত্রের অমৃতভাণ্ড আহরণ করে মানব সভ্যতার স্বরূপ দর্শন এবং কর্মযজ্ঞের হোমপাত্র থেকে কণিকামাত্র বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে আপনার পথ আপনি রচনা করেন—তাঁরা হন রাজচন্দ্রের সমগোত্রের।

তখন লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল। সারাদেশ জুড়ে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন শুরু করেছেন রামমোহন। রাজা ডাক দিলেন সকলকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন রাজচন্দ্র দাস। আন্দোলনের শুরু থেকেই এই আহ্বানের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করেছিলেন রাজচন্দ্র। এই মহান কর্মযজ্ঞের অংশীদার না হতে পারলে মানব জন্ম বৃথা, এমন একটা চেতনা বোধ রাজচন্দ্রকে সর্বক্ষণ অধীর করে রাখত। স্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছিলেন তিনি। পথ খুঁজে ফিরছিলেন, কোন পথে ছুটে গিয়ে রাজা রামমোহনের পাশে দাঁড়ানো যায়। যা হক, মেটকাফ হলের লাইব্রেরির কথা শেষ করা হয়নি আগে। সেই লাইব্রেরির নামকরণ হয়েছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। আজকের জাতীয় গ্রন্থাগার 'ন্যাশনাল

লাইব্রেরি' সেদিনকার সেই ইম্পিরিয়াল। রাজচন্দ্র স্বল্প কর্মময় জীবনে বাইরে যেমন কাজ করেছেন জনকল্যাণের তাগিদে, তেমনি নিজের ঘরের কথা ভেবেছেন এক বৃহৎ পরিবারের একমাত্র কর্তার সব দায়িত্ব যে মানসিকতা থেকে সুসম্পাদিত হওয়া দরকার—সেই মানসিকতা ও চেতনাবোধ নিয়ে।

তাই আবার ফিরে আসি রাসমণি-কুঠির কথায়! রাজচন্দ্র এতদিন ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের পল্লীতে সপরিবারে যে বাড়িতে বসবাস করছিলেন সেই বাড়িটি পিতৃস্মৃতি। রাজচন্দ্র ভাবলেন, পিতৃস্মৃতির সংগে তাঁর ভাগ্যবতী লক্ষ্মী-স্বরূপা স্ত্রীকে জড়িয়ে দেবেন। এই বাড়ির লাগোয়া ছয় বিঘা জমি পড়েছিল। রাজচন্দ্র সেই ছয় বিঘা জমির ওপরে এক অবাক করা প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

যথাসময়ে বাড়ির নকশা তৈরি হলো। সেই নকশা হাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রীর কাছে। নকশা মেলে ধরলেন রাসমণির সামনে। বললেন, রাণী, ভাবছি শুভ কাজ আর ভাবনা ফেলে রাখতে নেই, অবহেলা করতে নেই। কোন বড় কাজ ফেলে রাখলে সে কাজ সুসম্পাদিত হয় না, হয়তো শুরু করাই যায় না।

রামায়ণের রাবণ যদি মিথ্যে না হয় তাহলে তাঁর পরিকল্পনা মিথ্যে ছিল না, কিন্তু বিলম্বে স্বর্গের সিঁড়ি রচনা—এক বিচিত্র ভাবনার পরিচয় বহন করছে। যদিও এই প্রসঙ্গটির বাস্তব কোন প্রমাণ মেলে না, তবুও স্বীকার করতেই হয়, এই হল স্বর্গ আর মর্তের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের রহস্যময় ইতিকথা। সিঁড়ি তৈরি হলে স্বর্গের রহস্যময়তার প্রতি বিন্দুমাত্র কৌতূহল থাকত না! সৃষ্টির অনন্ত নেশায় মানুষ দুর্বার হয়ে উঠত না। দেবতার রূপ কল্পনায় মানবের নিত্য সাধনার প্রয়োজন হতো না! স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যোগ কল্পনাপ্রসূত কিনা জানিনা, কিন্তু এই রূপক রামায়ণ সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে!

রাজচন্দ্র দেবতা নন! এক সাধারণ মানুষ। তাই ঘরের—সংসারের সৌন্দর্য যাঁদের জন্য—তাঁদের সুখ আর শান্তি কামনায় এই প্রাসাদ তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করতে রাণীর সম্মতি ছিল।

প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেল। সময় লেগেছিল ৮ বছর। আনুমানিক খরচ হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা। আগেই বলেছি বাড়ির ভিতরে ছিল সাতটি মহল। অসংখ্য ঘর। ৬টি বিশাল মুক্ত প্রাঙ্গন, একটি পুকুর। শোবার ঘর, রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, বসবার ঘর, ঠাকুর ঘর, এসব তো সব গৃহস্থ বাড়িতেই থাকে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে বাগিচা বা পুকুর সে তো এখন কল্পনার

অতীত ! তাছাড়া, রাজচন্দ্র এই বাড়ির মধ্যেই আরও অনেক পরিকল্পনার রূপদান করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন নাটমন্দির, দেওয়ানখানা, কাছারি বাড়ি, দারোয়ান আর ভৃত্যদের থাকার ঘর, অতিথিশালা, গো-শালা, অশ্বশালা আরও কত কি ! ছিল নহবতখানা। একটি নয়, একাধিক বিশালতম প্রবেশ পথ ছিল বাড়িতে। প্রাসাদের নামকরণ নিয়েও রাজচন্দ্র বিন্দুমাত্র অস্থির হন নি। একেবারে গোড়া থেকেই তো স্থির ছিল বাড়ির নাম কি রাখবেন তিনি ! কিন্তু আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশের আগে যখন রাণী শুনলেন তাঁর স্বামী এ বাড়ির নাম রেখেছেন 'রাণী রাসমণি-কুঠি' তখন প্রতিবাদ করেন নি। একরাশ তৃপ্তির প্রকাশ ঘটেছিল একটুকরো লজ্জা জড়ানো হাসিতে। রাজচন্দ্র অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী ব্যাপার রাণী— তুমি বাড়ির নামকরণের বিষয়ে কিছু বলছ না যে ! রাণী বললেন, তোমার মনের কথা এমন করে ফুটে উঠবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি—

রাজচন্দ্র বলেছিলেন, কী আমার মনের কথা !

রাণীর মুখে একমুঠো লজ্জার আবির ছড়িয়ে পড়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের সব কথা মনের মধ্যে সযত্নে লালিত হয় ! তার প্রকাশ থাকে না। আবার যে কথাগুলো অপরূপ ভালবাসার সৌরভ মেশানো সে কথা তো একেবারেই ঠোঁটে আনা যায় না। চোখের ভাষায় বোঝানো যায়। রাসমণি হয়তো তাই বোঝাতে পেরেছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল নিয়ে কত কথাই না আছে। কেউ বলেছেন তাজমহল জঘন্য বিলাসের সার্থক স্মৃতিসৌধ। কেউ বলেছেন, শোষণবাদের শ্রেষ্ঠ নমুনা। কিন্তু কবিরা-প্রেমিকজনেরা বলেছেন, প্রেমের প্রতীক। মমতাজের কবরে কান পাতলে একটি সুর হয়তো চিরকালই শোনা যাবে, তা হলো নারী জন্মের চরম তৃপ্তির সুর। মমতাজের প্রতি সম্রাটের কী অপরূপ ভালবাসা !

রাণীরও ঠিক সেই একই তৃপ্তি। তাঁর জীবদ্দশায় এই প্রাসাদ তাঁর প্রতি স্বামীর গভীরতম ভালবাসারই প্রতীক। তাই কোনা গাঁ থেকে বাবা হরেকৃষ্ণকে আসতে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বামীকে নিয়ে গর্ব ছিল তাঁর।

এই বাড়িতেই কোন না কোন সময়ে এসেছেন রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শুধু নন, তদানীন্তন গভর্নররা, অধিকাংশ রাজপুরুষ। পরবর্তীকালে এই প্রাসাদ তীর্থে পরিণত হয়েছিল—ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে।

কিছুদিন হলো শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না রাজচন্দ্রের।

মহাসমুদ্রে চলমান অথচ স্পন্দনহীন জাহাজে হঠাৎ একটু বেশিমাত্রায় বাতাস লাগলে যেমন দোলা লাগে, তেমনি কর্মসাগরে পাড়ি দেওয়া রাজচন্দ্রের দেহে হঠাৎ শ্রান্তির বাতাস লাগল। মাঝে মাঝেই অসময়ে ঘরে ফেরেন রাজচন্দ্র। রাণীর মন চঞ্চল হয়। ভাবনার ছায়া ছড়ায় মনের ওপরে। মুখ হলো মনের দর্পণ, রাজচন্দ্র সেই মুখের দিকে চোখ রেখে বুঝতে পারেন রাণীর মনের কথা রাণীকে সহজ করার জন্য রাজচন্দ্র নিজেকে শক্ত করে তোলার চেষ্টা করেন। বলেন. এত ভাবছ কেন রাণী—আমি ভাল আছি। একদিকে সান্ত্বনা দেন, অন্যদিকে সব কাজ দ্রুত শেষ করতে চান। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তখন অল্প সময়ে অনেকটা ক্ষয় ধরেছে। তবুও লর্ড বেণ্টিঙ্কের ডাকে সাড়া দিয়ে আর এক পবিত্র কর্ম সম্পাদন করলেন তিনি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় অর্থ সাহায্যের যে আবেদন এসেছিল, রাজচন্দ্র সেই অর্থ শুধু দেননি, কলেজের মেধাবী দশজন ছাত্র যাঁরা দুঃস্থ, তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন।

অসুস্থ শরীর নিয়েই শয্যায় শায়িত রাজচন্দ্র কাছারি বাড়িতে খবর পাঠালেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন নায়েবমশাই, এলেন সরকার, এলেন খাজাঞ্চীখানার দায়িত্বভার যাঁর ওপর ছিল তিনি।

রাজচন্দ্র বললেন, এই পত্রটিকে সযত্নে রেখে দিন। এখানে যে দশটি ছাত্রের নাম ঠিকানা আছে, এদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমি নিয়েছি, দেখবেন ভবিষ্যতে যেন এ ব্যাপারে কোন গাফিলতি না থাকে—

এছাড়া রাসমণির পরামর্শ মত রাজচন্দ্র বেলেঘাটায় খাল তৈরীর জন্য গভর্নমেণ্টকে জমি ছেড়ে দেন। আর খালের ওপর পুল তৈরী হবার আগে সবাই যাতে বিনামূল্যে পারাপার করতে পারে তার ব্যবস্থা করেন।

ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপারে রাসমণি রাজচন্দ্র দুজনেই আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে রামমোহনের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়েছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সহমরণ প্রথা রোধ করতে আইন পাশ করলেন। এতদিনের সংগ্রাম সফল হওয়ায় রাজচন্দ্র খুশী মনে সে সংবাদ এনে দিয়েছিলেন রাণীর কাছে। স্বস্তি পেয়েছিলেন উভয়ে।

ইদানীং বিভিন্ন সভা-সমিতি থেকে ডাক পড়ছিল রাজচন্দ্রের। এমন সময় এল সেই চরম বিপর্যয়ের সংবাদ। দেরিতে এল। রাজা রামমোহন আর নেই। ১৮৩২ সালের শেষদিকে প্যারিসে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই সামান্য রোগ ভোগের পর মারা গেছেন! নিয়তির কি নিষ্ঠুর

পরিহাস। কর্মযজ্ঞের হোতা, সেই মহান মানুষটির শেষ নিশ্বাস স্বদেশের ভূমিকে স্পর্শ করল না, বাতাসকে ছুঁয়ে গেল না। হাহাকার করে উঠলেন সবাই! বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হল রাজচন্দ্রের!

১৮৩৪ সালের ২৬ মার্চ, ১২৪০ বঙ্গাব্দ, ১৪ চৈত্র 'সমাচার দর্পণে' একটি শোক-সভার প্রস্তুতি-সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

"রাজা রামমোহন রায়।—৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচে লিখিত বিষয় পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই উৎসুক হইবেন।

পশ্চাত স্বাক্ষরিত আমরা ৺প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের অশেষ গুণ যাহাতে চিরস্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামি ৫ আপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টা সময়ে টৌনহালে ৺প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি।

জেমস্ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্লোডন। রসময় দত্ত। ডবলিউ এস ফার্বস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং। কালীনাথ রায়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। লঙ্গ ইবিল ক্লার্ক। রুণ্টমজি কওয়াসজি। আর সি জিন্‌কিন্স। ডি মাকফার্লন। এ এয়র। এচ এম পার্কর। ডবলিউ আর ইয়ং। তামস ই এম টর্টন। উলিয়ম কব হারি। ডবলিউ কার। সি ই ট্রিবিলয়ন। ডেবিড হ্যার। মথুরানাথ মল্লিক। রমানাথ ঠাকুর। রাজচন্দ্র দাস। জি জে গার্ডন। জেম্স সদর্লণ্ড। সি কে রাবিসন। ডি মাকিন্টায়র। ডবলিউ এচ স্মোল্ট সাহেব।"

রামমোহনের মৃত্যু রাজচন্দ্রের পক্ষেও একটা চরম আঘাত!

এরপরই ইন্দ্র পতন হলো!

গোটা কলকাতা শোকে মুহ্যমান! শোকাহত হলেন ছোট বড় সকলেই।

১৮৩৬ সনের ১৮ জুন বাংলার ১২৪৩ সনের ৬ই আষাঢ় 'সমাচার দর্পণ' লিখল ঃ

"বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু ; স্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতিখ্যাত্যাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র দাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরাপত্র হইতে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। তাহার অনুবাদ জ্ঞানান্বেষণপত্র হইতে নীত হইল চন্দ্রিকাতেও তাঁহার মৃত্যু বিষয়ক বার্ত্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এতদ্রূপে লিখিত

হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ৺প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিজনের মনঃপীড়া জন্মিতে পারে। উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাতা মহানগরের শোভা ও ধর্ম্মার্থ যে-যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

দুঃখের খবর বাতাসের সঙ্গে ছড়ায়। রাজচন্দ্রের মত মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণের সংবাদ গোটা কলকাতায় বাতাসের সঙ্গে মিশে দ্রুততর গতিতে ছড়াবে তাতে বিচিত্র কী! 'সমাচার দর্পণ'ই শুধু এই মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করল তা নয়, সংবাদ প্রকাশিত হলো 'সমাচার চন্দ্রিকা'তেও। ১৮৩৬ সালের ১৮ই জুন অর্থাৎ বাংলার ৬ আষাঢ় ১২৪৩ এই পত্রিকা যে সংবাদ প্রকাশ করল তা এই রকম ঃ

"স্বীয় দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দ্র দাস ইংরেজ বাঙালির মধ্যে অতি সুবিদিত ছিলেন, তিনি ৮ তারিখে বেলা দশ ঘণ্টা সময়ে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫ ঘণ্টা পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ বাবুর মরণে কেবল তাঁহার আত্মীয়বর্গের মহাশোক হইয়াছে এমন নহে তাঁহার মরণে সর্ব্বসাধারণের বিশেষত এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে। বাবু রাজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে দুইটা পাকা ঘাট * বন্ধন এবং এক রাস্তা ও রোগী লোকেদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজপ্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তুল্য দানশীল কোন আত্মীয় লোকের স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিবেন তাঁহার আরও ইচ্ছা ছিল হিন্দু কলেজে কতক বিদ্যার্থীর বেতন নিয়মিত করেন কিন্তু হায়! এমত সময় কাল মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সকল আশাই শেষ করিল যৎকালীন তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে তৎকাল অবধি জীবন শেষ পর্য্যন্তই একেবারে বাক্‌রোধ হইয়াছিলেন"

যে জীবন ইতিহাস, সেই ইতিহাসের বিকৃতি কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় নয়। রাণী রাসমণির মত এক জীবন প্রসঙ্গে এযাবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, আমি গভীর মনযোগ সহকারে সেই গ্রন্থের অধিকাংশই পড়েছি এবং অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছি।

অনেকে বলতে পারেন রাণী রাসমণির জীবন ইতিহাস তো ব্যাসদেব

---

* ১৮৩১ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর রাজচন্দ্র হাটখোলায় একটি নতুন ঘাট নির্মাণ করে সাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেন।

বিরচিত মহাভারত নয়, যে এই ইতিহাসের বিকৃতিতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। হবে বৈ কী ? যে ইতিহাসের সাল-তারিখ বা তথ্য নির্ভুল বা বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেই ইতিহাসের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না ! রাসমণির জীবন-ইতিহাসের মধ্যেও সেই একই বিকৃতি আছে। ভুল তথ্য পরিবেশন করা হলে সেই তথ্যকে নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে অন্য কেউ যদি নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভঙ্গিতে সেই ইতিহাস পরিবেশন করেন, দেখা যাবে একই ভুল বা বিকৃতি অনায়াসে স্থান পেয়েছে। বহু ইতিহাসের মতই রাণী রাসমণির জীবন ইতিহাসেও সেই ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে

প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র সেনের 'লোকমাতা রাণী রাসমণি' বইটির ৩১ পৃষ্ঠার কথা উল্লেখ করছি। শ্রীসেন এই পৃষ্ঠায় রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়েছে সাঁদ-গর্মীতে বলেছেন। আমার জানতে ইচ্ছে করে এই তথ্য তিনি পেয়েছেন কোন গ্রন্থ থেকে ?

শুধু তাই নয়, সমাচার চন্দ্রিকার সংবাদটিকে তিনি সমাচার দর্পণ' বলে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখে পরিবেশনও করেছেন। কিন্তু বিস্মিত হই যখন দেখি রাজচন্দ্রের সাঁদ-গর্মীতে মৃত্যু হয়েছে এটাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে শ্রীসেন প্রকাশিত সংবাদও ইচ্ছাধীন সম্পাদনা করেছেন।

এইভাবেই রাণী রাসমণির জীবনীর আর একটি বইও আমার হাতে এসেছে ঃ নাম "করুণাময়ী রাসমণি"। এর লেখক নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় রাজচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ দিয়েছেন ১লা জুন ১৮৩৬ সাল। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই তারিখটি পেলেন কোথায় ? আমার হাতে যে নথিপত্র আছে তাতে স্পষ্টতই বলা যায়, রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল ৯ই জুন ১৮৩৬। গোপালচন্দ্র রায়ের লেখা 'রাণী রাসমণির জীবনী'তে দেখি তিনি ১২৪৩ সাল পর্যন্ত উল্লেখ করে থেমেছেন। তারিখের মধ্যে যাননি। কিসে মারা গেছেন তারও উল্লেখ নেই।

'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও রাজচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ নেই। মৃত্যুর তারিখ কে কোথায় ভুল লিখেছেন অথবা একদম লেখেননি এটা বর্তমান রচনার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়।

বড় কথা মৃত্যু ! কার মৃত্যু ? না-রাজচন্দ্র দাসের। তদানীন্তন কলকাতার সেরা মানুষগুলির একজন ! এক বিশেষ মানুষ। বিশেষ মানুষের মৃত্যু সংবাদ সাধারণ মানুষের মনে বিশেষভাবে দোলা দিয়ে যায়। যাবারই কথা ! বাগানের সেরা গোলাপ গাছে যদি একটি দুটি সেরা ফুল

ফোটে মন খুশিতে ভরে, ফুলটিকে কেন্দ্র করে মনের ভাবও পাল্টায় ! দেবতার পায়ে সেই ফুলটিকে হয়তো কারও অর্ঘ্য দিতে মন চায়, আবার কারও মনে হয় যে ফুলেই মালা গাঁথি না কেন তার মধ্যমণি করতে হবে সেরা সেই গোলাপকে।

কেউ সযত্নে সেই গোলাপ তুলে নিয়ে প্রেয়সীর কবরীতে গুঁজে দিতে চায়। আসলে গোলাপের সার্থক জন্ম হোক এটাই থাকে অন্তরের একান্ত কামনা। কিন্তু সেই গোলাপ যদি হঠাৎ খসে পড়ে মাটিতে, অথবা তাজা-প্রাণবন্ত গোলাপটি যদি শুকিয়ে যায় কার না মন ব্যথিত হয় ?

তেমনি রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন সবাই। আসলে রাজচন্দ্র দাসের বেঁচে থাকাটাই ছিল সকলের একান্ত কামনা। রাজচন্দ্রের জীবন গড়ে উঠেছিল জনহিতের জন্য। জনহিতকর. জন-কল্যাণকর অনেক কাজই জীবদ্দশাতে করেছিলেন তিনি, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু না হলে হয়তো এদেশের মানুষ আরও অনেক কিছু পেত তাঁর কাছ থেকে। সেই রাজচন্দ্র বড় অসময়ে চলে গেলেন ! মাত্র ৪৯ বছর বয়সে হারিয়ে গেল এক মহাপ্রাণ।

স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে রাণীর অস্তিত্ব এক মহাশূন্যতার মধ্যে এসে থমকে দাঁড়াল !

মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসমণি-কুঠি পূর্ণ হয়ে গেল শোকাতুর মানুষে। একান্ত আপনজন-প্রিয়জনদের বুক ফাটা কান্না। প্রাসাদের পাথরগুলো যদি হৃদপিণ্ড হতো. যেত ফেটে !

সব চোখেই জল, কিন্তু কী আশ্চর্য ঐ দুটো চোখ। ঐ দু'চোখে এখন কোন জল নেই। গণ্ডদেশে স্পষ্ট হয়ে আছে বারি রেখা ! আসলে ঝর্ণা ধারা বন্ধ হলে পাহাড়ের গায়ে যেমন দাগ থেকে যায়—এ যেন তেমনি। একটা হৃদয় সহসা যেন পাহাড় হয়ে গেছে। নিথর—নিস্তব্ধ রাণীমা। তিনি যেন এক মর্মর মূর্তি !

জগদম্বা কাঁদতে কাঁদতে মায়ের স্পন্দনহীন দেহটাকে নিজের বুকের ভিতরে আঁকড়ে ধরে বার বার আকুতি জানাতে থাকল,—মা, মাগো, তুমি কাঁদ মা—, বাবা চলে গেছেন, এবার তুমি যদি কথা না বলো তা হলে আমরা কেমন করে থাকব মা ; মা কাঁদো—কাঁদো মা—

সহসা পাহাড়টা যেন ফেটে গেল। এবার আবার রাণীমার দু'চোখ দিয়ে নেমে এলো জলের ধারা !···

রাজচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর যে বর্ণনা প্রবোধচন্দ্র সাঁতরা তাঁর 'রাণী

রাসমণি' গ্রন্থে দিয়েছেন, এখানে তার পুনরুল্লেখ করা যাক—

"...পালঙ্কে রাজচন্দ্রবাবুর সংজ্ঞা শূন্য দেহ শায়িত করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের বড় বড় ডাক্তার, মান্যগণ্য-সম্ভ্রান্ত, ধনী, পরিচিত ব্যক্তিরা রাজচন্দ্রবাবুর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহু জনে বহু উপায়, বহু ঔষধ নির্বাচন করিলেন। রাস্তায়, বাটীর সম্মুখে, সিঁড়িতে, নীচে-উপরে ঘাস-বিচালী-সতরঞ্চ, গালিচা বিছাইয়া দেওয়া হইল যেহেতু গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ, পদশব্দে রোগীর রোগ বাড়িতে পারে। রাণী কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাজচন্দ্রবাবু দিবালোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। রহিল মাত্র কীর্ত্তি। কীর্ত্তিমতী পত্নী আর রহিল নগদ ৬৮ লক্ষ টাকা। ৮ লক্ষ টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শেয়ার, ২ লক্ষ টাকা প্রিন্সকে * ঋণ ও ১ লক্ষ টাকা হুক ডেভিডসন্ এণ্ড কোংকে ঋণ দেওয়া।."

মায়ের রূপের তো বর্ণনা দেওয়া যায় না। যিনি মা তিনিই ধরিত্রী! ধরিত্রীর বুকে নিত্য কত শত আঘাত আছড়ে পড়ে। সব সইতে হয় মাকে। তেমনি যিনি জগতের জননী তিনিই জগদ্ধাত্রী। জগদ্ধাত্রী যিনি তাঁকে কত কিছুই না ধারণ করতে হয়। তেমনি এই বিরাট বিশাল সংসারে রাণী রাসমণি এই মুহূর্তে আর শুধু মাত্র মা নন, তিনি রাজাহীন রাজত্বের একমাত্র রাণী! সত্যি সত্যি রাণী! সুতরাং আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে নিজেকে একটু একটু করে কঠিন কঠোর করে নিলেন। নিজেকে উৎসর্গ করে অপরের কল্যাণ সাধনাই সনাতন হিন্দু ধর্মের অঙ্গ, এ যদি সত্য হয়— বিরাট-বিশাল জমিদারীর মধ্যে প্রজাকুলের কল্যাণ সাধনের ব্রত নিয়ে, ব্রত ভঙ্গ করার অর্থ পাপাচার। স্বামীর অকাল প্রয়াণে ভেঙ্গে পড়লে, নিজেকে দুর্বল করলে প্রজাকুলের কথা ভাবা যাবে না। নিজেকে দুর্বল করলে শত্রু পক্ষ সচেতন হয়ে যায়। বিশেষ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত শত্রুকে শিয়রে রেখে স্বামী হারাবার ব্যথা নিয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে নিজেকে সরিয়ে রাখা অন্যায় ভাবছিলেন রাণীমা

প্রাসাদ নিশ্চুপ। একরাশ নিস্তব্ধতার মধ্যে এক টানা টিক্ টিক্ শব্দ। টেবিলের ওপর সযত্নে রক্ষিত বড় মাপের ঘড়িটা শুধু নিজের কাজ করে চলেছে। সেও যেন এই মুহূর্তে তার মালিকের স্মৃতি রোমন্থনে বড় বেশী মুখর। রাজচন্দ্রের বন্ধু জন বেব সাহেবের উপহার দেওয়া পকেট ঘড়িটাও

* প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

যেন আকস্মিক এই বিয়োগ ব্যথায় কাতর! সেই ঘড়ির কথা এখানে বলা যাক কিছুটা—

সেটা ১৮২৬ সালের কথা।

কলকাতায় এলেন জন বেব। তিনি আসলে লণ্ডনের নাগরিক। সেখানেই তাঁর জন্ম। জন্ম লগ্ন থেকেই সৌভাগ্যের চাবি-কাঠিটি হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল তাঁর আর তাই ভারতের ইতিহাসের পাতায় এই বেব সাহেবের নাম এতই স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যা পড়লে বা জানলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। বেব সাহেব তাঁর জীবদ্দশায় শুধু ধনকুবের হয়েছিলেন তা নয়, তিনি ইংল্যাণ্ডের অভিজাতদের মধ্যে ছিলেন অগ্রজ মহাত্মা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিল, তখন সেই শক্তিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এই বেব সাহেবের মদত ছিল বেশী। কারণ তিনিই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম প্রধান মালিক। একমাত্র জন বেব ছাড়া আর কোন মালিকই ভারতে আসেননি কখনো। মজার ব্যাপার হলো, বেব সাহেব ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেছিলেন নিতান্তই কৌতুহলী মন নিয়ে, বাণিজ্য করার অছিলায়। আসলে ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গতি ও প্রকৃতি কেমন দাঁড়িয়েছে স্বচক্ষে দেখার ব্যাপারটাই প্রধান ছিল।

জন বেব কলকাতায় এসেই যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন বাবু রাজচন্দ্র দাস। শুধু পরিচয় নয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দু'জন প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে ছড়িয়ে পড়েন। এর মূলে ছিল নাকি রাজচন্দ্র দাসের উদার হৃদয়ের পরিচয়। ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েও জন বেব বিস্মৃত হননি রাজচন্দ্রকে। এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধন যাতে আজীবন অটুট থাকে তার জন্য বেব সাহেব পাঠিয়েছিলেন উপহার। সেই স্মরণীয় উপহারটি এই ঘড়ি। যে ঘড়িটি আজও আছে রাজচন্দ্র দাসের অন্যতম দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের ছেলেদের কাছে।

সেই ঘড়ির গায়ে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে জন বেবের স্মৃতি -

"A TOKEN OF ESTEEM
SENT BY
JOHN BEBB ESQ OF LONDON.
TO HIS FRIEND.
BABOO RAJ CHANDRA DOSS
JANUARY 1826".

আজ এই ঘাড়িটিই রাণীকে যেন তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলল। নিজেকে শক্ত করলেন রাসমণি। প্রীতিরাম যে তাঁকে রাজ রাজেশ্বরী মূর্তিতে দেখতে চেয়েছিলেন। রাজচন্দ্র বলেছিলেন, বিধাতা তাঁকে দিয়ে কোন একটি বিশেষ কাজ করিয়ে নেবেন। সে কথা তো বৃথা হবার নয়।

প্রথমেই রাণীর ইচ্ছা হলো, আকস্মিক এই বিপর্যয়ে যাতে স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কোন ত্রুটি না ঘটে, সেদিকে সবাই যাতে মন আর দৃষ্টি রেখে কাজ করতে পারেন, তার জন্য শক্তি আর সাহস যোগাতে হবে। বিশাল জমিদারির যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ. তার হিসাবনিকাশের ব্যাপারে সজাগ থাকাব জন্য সেরেস্তায় যাঁরা কর্মী হিসেবে দীর্ঘকাল জড়িয়ে আছেন তাঁদের সবার সঙ্গে আলাদা ভাবে নয়, এক সঙ্গে একই দিনে মিলিত হতে হবে। তাই হলো। জামাই মথুরামোহন এবং অন্য জামাইদের সঙ্গে আলোচনা করে একদিন রাণী ডেকে পাঠালেন সকলকে।

বাড়ির নিত্য দিনের পূজারী ব্রাহ্মণ, বাড়ির দারোয়ান থেকে শুরু করে স্বামীর পার্শ্বচরদের সমাবেশ ঘটল একত্রে। রাসমণি এসে দাঁড়ালেন তাঁদের সামনে।

উপস্থিত সকলের মধ্যে যাঁরা পুরনো লোক বা এ বাড়ির সঙ্গে যাঁদের দীর্ঘ কয়েক বছরের সম্পর্ক, তাঁরা অনেকেই রাণীমাকে দেখে নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। সবার চোখে জল। শুধু কর্তাকে হারাবার ব্যথায় নয়, যে রাণীমাকে সবাই একদিন এ বাড়ির লক্ষ্মী রূপে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন, বসনে-ভূষণে যে রাণীমাকে স্বর্গের দেবীর মত দেখে ওঁদের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, মন ভরে গিয়েছিল. সেই রাণীমার এই বৈধব্য রূপ দেখলে কারই বা চোখের জল নেমে আসবে না?

শুভ্র বসন, নিরাভরণ অঙ্গ। মলিন মুখ। যাঁরা রাণীমাকে খুব বেশী দেখেননি, তাঁরাও এত কাছ থেকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক! বিধবার বেশ হলে কি হবে, যেন মূর্তিমতি শক্তি আর পবিত্রতার আধার।

রাণী অনেকের অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও চেয়ারে বসলেন না। প্রবীণ কর্মীদের সামনে চেয়ারে বসে কথা বললে মনের মধ্যে অহঙ্কারের জন্ম হয়। তা ছাড়া এই বেশে সদ্য স্বামীহারা কোন স্ত্রীর চেয়ারে উপবেশন উচিত নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে শুরু করলেন রাণীমা।

—উনি গত হয়েছেন ঠিকই, সেই সঙ্গে আমাদের সবার ওপরে অনেক গুরুদায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আমরা সবাই যদি তাঁর দেওয়া সব দায়িত্ব তাঁর

মত করে পালন করতে পারি তা হলেই জানবো তাঁর প্রতি আমরা সঠিক শ্রদ্ধা জানালাম। সব ক্ষেত্রেই একজন কাণ্ডারীর প্রয়োজন হয়, নৌকায় যেমন মাঝি, আমি আপনাদের পাশে সেই ভাবেই থাকবো, আপনাদের অভাব-অভিযোগ-উপদেশ যাই বলুন, তা সব সময় যেমন শুনবো তেমনি গ্রহণও করবো। আমার শ্বশুর মশাই আর স্বামীর সব স্মৃতি যাতে আকাশের তারার মত সব সময়ে উজ্জ্বল থাকে, আমাদের প্রজারা যাতে কোন অসুবিধে বোধ না করেন, দেশের ও দশের কল্যাণে আপনাদের কর্তামশাইরা সব সময়ের জন্য যে ভাবে নিজেদের এগিয়ে দিতেন এখন থেকে তা আমরাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো!—

কথা শেষ হলো রাণীমার। সকলে মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাণীমা এবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা তুললেন। বললেন, নায়েব মশাই, আপনি বাবা মথুরের সঙ্গে বসে কর্তার শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারে কী করতে চান তা আলোচনা করুন, তবে আমার ইচ্ছে এই শ্রাদ্ধের দিন থেকে তিন দিন ধরে দানসাগরের ব্যবস্থা হোক। শুধু লক্ষ্য রাখবেন, এই তিন দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অনাথ-আতুর-গরীব-ভিখারী কেউ যেন ফিরে না যায়। এই দানসাগরের কথা যাতে সবাই জানতে পারে আপনি তার ব্যবস্থা করুন—

আরও বলেছিলেন, আপনি একবার বাগবাজারে যান, আমাদের কুলগুরু রামসুন্দর চক্রবর্তী মশাই আর কুলপুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য মশাইকে খবর দিন, যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে কোন অসুবিধা না থাকে, ওঁরা যেন একবার এখানে পায়ের ধুলো দেন—

সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের তুলনা ছিল না! অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনের ঘটনায় এ বাড়ি শুধু নয় গোটা কলকাতার প্রতিটি মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। রাণীমা তুলটের আয়োজন করার নির্দেশ দিলেন। তুলট কী? দাঁড়িপাল্লার একদিকে বসবেন রাণীমা, রুপোর টাকায় রাণীমাকে ওজন করা হবে! তাই হয়েছিল। দেহের ওজনে ৬০১৭ টি রুপোর টাকা রাণীমা মুঠো মুঠো করে মা অন্নপূর্ণার অন্নদানের মত দান করেছিলেন, তুলে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণদের হাতে! সকলে রাণীমাকে সেদিন বলেছিলেন, সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা!

এছাড়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অন্যান্য নিয়ম—যথা বৃষোৎসর্গ, সোনার ষোড়শ, তিলকাঞ্চন সবকিছুই নিখুঁতভাবে পালিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙালী বিদায় কোনটিও বাদ যায়নি। রাণী নিজে দাঁড়িয়ে সেই পঁচিশ-তিরিশ

হাজার কাঙালীকে অন্ন-বস্ত্র-অর্থ দান করেছিলেন।

এই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে মনে আসে মনুসংহিতার উপদেশ।

"মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিত।
স্বয়ং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।।"

অর্থাৎ পতির মৃত্যুতে সাধ্বী স্ত্রী বিধবা পুত্রহীনা হলেও ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে স্বর্গগমন করেন। হিন্দু বিধবার পক্ষে ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য বা সহমরণের বিধান আছে। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রাজা পৃথুর মহিষী অর্চি সহমৃতা হয়েছিলেন।

আমরা বোধকরি সবাই জানি এই পৃথুর নাম থেকেই মর্তের নাম হয়েছিল পৃথ্বী বা পৃথিবী।

রামায়ণ, মহাভারতেও আমরা এমন অনেক বিধবা নারীকে খুঁজে পাই যাঁরা হয় ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন, নতুবা সহমরণ বরণ করে নিয়েছিলেন! যেমন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণর অষ্টপত্নী সহমৃতা হয়েছিলেন। আবার রাজা পাণ্ডুর উভয় পত্নীর মধ্যে কনিষ্ঠা মাদ্রী যেমন সহমৃতা হয়েছিলেন তেমনি জ্যেষ্ঠা পত্নী কুন্তী ব্রহ্মচারিণী হয়েছিলেন। কোন কোন শাস্ত্র মতে সহমরণের অপেক্ষা ব্রহ্মচারিণী হওয়া শ্রেয়। কারণ ব্রহ্মচারিণী হলে সৎকর্মের মাধ্যমে ও ভক্তি পরায়ণা হয়ে সংসারে থেকেও সামাজিক জীবনের নানা কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব।

রাণী রাসমণি সেই মনুসংহিতার উপদেশে অনুপ্রাণিতা হয়েই বোধ করি নিজেকে ব্রহ্মচারিণী করেই সাজাতে চেয়েছিলেন। রাণীমার এই শান্ত গম্ভীর রূপটি সকলের কাছ থেকে সমীহ, শ্রদ্ধা আদায় করতে পেরেছিল। যথার্থই তিনি হয়ে উঠেছিলেন করুণাময়ী মাতৃমূর্তি!



স্মৃতি কখনও মধুর হয় কখনও ব্যথাও বাড়িয়ে দেয়।

স্মৃতি রোমন্থন করে সময় কাটাতে চাননি রাণী রাসমণি, কিন্তু কী আশ্চর্য! ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরের সেবা করতে বসলেই রাণীমার মনের গভীরে একটু একটু করে সব কথা, সব ছবি জমাট বাঁধতে থাকে। স্মৃতিভারে কতদিন রাণীমা নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়েছেন। আজ ঠাকুর

ঘরে বসে বড় বেশী করে মনে পড়ছে আগের অনেক কথা, স্বামীর শত স্মৃতি। সিঁথির রামচন্দ্র দাসের (আটা) সঙ্গে প্রথম মেয়ে পদ্মমণির যখন বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করলেন রাজচন্দ্র অথবা খুলনার সোনাবেড়িয়া গ্রামের বাঁধঙ্কু চৌধুরী পরিবারের ছেলে প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয় মেয়ে কুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করলেন, বা ২৪ পরগণার বিথুরী গ্রামের মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর বিয়ে দিয়ে মথুরামোহনের মত জামাইকে ঘরে তুলে নিলেন সে সব কথা! রাজচন্দ্রের তৃপ্ত মুখের ওপর যেন ছড়িয়ে পড়েছিল এক সঙ্গে শত পূর্ণিমার চাঁদের আলো। রাণীর পাশে বসে রাণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রাজচন্দ্র বলেছিলেন, আমাদের ছেলে না থাকার যে ব্যথা ছিল—ভগবান সেই ব্যথা মুছিয়ে দিলেন, তোমার মত ভাগ্যবতী ক'জন আছে রাণী? তুমি তোমার ঘরে এক নয়, তিন তিনটি জামাইকে পেয়েছ ছেলের মত, হাজার হাজার প্রজা সন্তান তোমার—স্মৃতি-পটে স্বামীর সেদিনকার সেই আনন্দ খুশিতে ঝলমল করা মুখখানা ভেসে উঠল রাণীর। পরক্ষণে সেই স্মৃতিই আবার রাণীর মনটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।

রাণীর মনে পড়ে গেল করুণাময়ীর হঠাৎ মৃত্যুর দিনটা। মথুরা-মোহনের সঙ্গে করুণাময়ীর বিয়ে দেবার দুটি বছরও কাটেনি হঠাৎ করুণাময়ী মারা গেল। মেয়ের মৃত্যু-শোকে রাজচন্দ্র যেন পাগল হয়ে গেলেন। দিনরাত শুধু রাণীর কাছে আসেন আর বলেন, বলতে পার রাণী, আমরা কী পাপ করেছি? কেন ঈশ্বর আমাদের এই চরম আঘাত করলেন—

সেদিন স্বামীর এই নিতান্ত কিশোরের মত কেঁদে ফেলা—আবার নতুন করে রাণীমার মনটাকে ভারাক্রান্ত করে দিল!

এমনি করে রাণী রাসমণি যখনই একা থাকেন তখন শত দুঃখ-সুখের স্মৃতি তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। ভরিয়ে তোলে। তেমনি আর এক স্মৃতি—সুখের স্মৃতি!

করুণাময়ীর মৃত্যুর পর মথুরামোহনের দিকে চোখ রেখে তাকাতে পারতেন না রাজচন্দ্র। তাকাতে পারতেন না করুণাময়ীর একমাত্র ছেলে ভূপালের দিকে। ভূপালকে পৃথিবীর আলোয় এনে দিয়েই করুণার মৃত্যু হয়। রাজচন্দ্র আর রাসমণির সেটাও ছিল ভাবনার কারণ। কে দেখবে ভূপালকে। করুণার মৃত্যুর পর রাসমণি তাঁর আদরের নাতিকে যদিও বুকের মধ্যে যত্ন করে রেখেছিলেন, তবুও ভূপালের জন্য বড় ভাবনা ছিল সবার।

জামাইকে আর ছেলের মত করে কাছে ডেকে বসিয়ে নিজের হাতে খাওয়াতে পারতেন না রাসমণি। স্ত্রীকে হারিয়ে মথুরামোহনেরও মনে শান্তি নেই। কেমন যেন উদাসীন। কেমন যেন বিষন্নতায় ভরা। তা ছাড়া ভূপালকে নিয়েও মথুরামোহনের ভাবনার সীমা ছিল না।

ছোট মেয়ে জগদম্বার তখনও বিয়ে হয়নি। জামাইবাবুদের মধ্যে মথুরামোহনের সঙ্গে শ্যালিকা জগদম্বার ছিল মিষ্ট সম্পর্ক। জগদম্বা এই মানুষটিকে যতটা ভালবেসেছিল, মথুরামোহনও ঠিক ততটাই জগদম্বার প্রতি স্নেহ বিতরণে কোন ত্রুটি রাখতেন না। ছোট শ্যালিকার সঙ্গে অনেক সময় অনেক ঠাট্টা তামাসাও করতেন মথুরামোহন। অনেক সময় জগদম্বা একবুক অভিমান নিয়ে সরে যেত।

একবার মথুরামোহন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তোমার বিয়ে দিয়ে বাবা-মা কিংবা তোমার দিদিরা যদি আমার চাইতেও বেশী গুণবান-রূপবান জামাই আনেন, আমি কিন্তু সেইদিন তোমার শত্রু হয়ে যাব—

জামাইবাবুর এই ঠাট্টার পরিপ্রেক্ষিতে জগদম্বা বলেছিল,—আমি বিয়েই করব না। বিয়ে যদি করি, আপনার মত কোন মানুষকে বিয়ে করব, আপনার চাইতে ভাল মানুষ আর আছে ?

বিধির বিধান বোধ হয় বিধিই প্রকাশ করলেন কুমারী জগদম্বার মুখ থেকে।

রাজচন্দ্র আর রাণীমা একদিন আলোচনা করে স্থির করলেন, ব্যাপারটা খুলেই বলবেন মথুরামোহনকে। সে যদি রাজি হয় তা হলে ষোলকলা পূর্ণ হতে পারে

মথুরামোহনকে সব কথা খুলে বললেন রাজচন্দ্র। বললেন, মথুর তুমি তো জান, করুণাময়ীকে হারিয়ে আমাদের ব্যথাও কম নয়। অন্য দুই জামাইয়ের কথা ভাবি না, তারা সুখে আছে, সুখী থাক ভাবনা তোমাকে নিয়ে। আমাদের কোন পুত্র সন্তান নেই। ভেবেছিলাম ঈশ্বর আমাদের পুত্র লাভের সুখ দিয়েছেন। তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক ভাবনা। কিন্তু ভয় কোথায় জানো ? করুণা মারা গেছে বলে যদি তুমি আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দাও, তা হলে সব স্বপ্ন আমাদের ভেঙ্গে যাবে! তাই আমার আর তোমার মায়ের একটা অনুরোধ রাখবে বলো—

মথুরামোহন প্রমাদ গুণলেন। বললেন, বাবা, আমার কাছে এভাবে কথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। বলুন, আমি কীভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি—

রাজচন্দ্র বললেন, যতদিন আমরা জীবিত থাকব, ততদিন আমাদের ছেলে হয়ে আমাদের কাছেই থাকবে তুমি-কথা দাও, তা ছাড়া আমাদের দু'জনার ইচ্ছে তুমি আবার বিবাহ কর !

মথুরামোহন চমকে উঠেছিলেন।—তা হয় না বাবা ! আমি বিবাহ করলে আমাকে নিয়ে আপনাদের কোন স্বপ্নই সার্থক হবে না, তার চাইতে এই ভাল বাবা, যেমনটি দু'বেলা আপনাদের সেবা করছি আমি তেমনি করে যাব।

কথা হচ্ছিল শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যে। এমন সময় সেখানে এলেন রাণীমা।

সচকিত হলেন মথুরবাবু। এ সময়ে রাসমণির প্রবেশ তাঁর কাছে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। রাণীমা এসে যদি একই বাসনার কথা ব্যক্ত করেন—সে বাসনা পূর্ণ না করে উপায় থাকবে না, ঠিক এমনি এক ভাবনা মথুরবাবুর মনের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। শাশুড়ি মাতাঠাকুরাণীকে আসতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মথুর। বিশাল দেহটা বিনয়ে নত। রাণীমা বললেন, না না উঠতে হবে না বাবা, বসো-বসো—

মথুরামোহন বিনম্র চিত্তে বললেন, আপনি বসুন মা—

রাণীমা বসবেন না, মথুরামোহনও না। এই দৃশ্যের মধ্যমণি রাজচন্দ্র এবার হাসলেন। মুগ্ধ হলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, কাছারি বাড়িতে অনেক কাজের বোঝা—আর কি আমার সময় দেওয়া চলে ? তুমি বসো রাণী, ও তো আমাদের শুধুমাত্র জামাই নয়, আমাদের ছেলে মা-ছেলেতে কথা বলো, আমি বিষয় সামলাতে যাই—

কথাগুলো একটানা বলে আর অপেক্ষা করলেন না রাজচন্দ্র। লুটিয়ে থাকা ধুতির কোচা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন তিনি।

বসলেন রাণীমা। রাণীর সামনে বসলেন মথুরামোহন। মাথা নত করে বসে থাকা জামাইকে উদ্দেশ করে রাণী বললেন, সব শুনেছ বোধ হয় ? আমার মনের একমাত্র বাসনা তুমি পূর্ণ কর বাবা। তুমি আমাদের জগদম্বাকে গ্রহণ করো। জগদম্বা তোমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। তা ছাড়া তুমি এ বাড়ির জামাই হয়ে আসার পর থেকে লক্ষ্য করেছি জগদম্বাও তোমাকে পেয়েছে আপনজনের মত। তুমি ঠাট্টা করলে ওর অভিমান হয়। দেখ বাবা, আমি মেয়েমানুষ হয়ে মেয়ের মনের কথা বুঝতে পেরেছি। আমি জানি, তুমি ওকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে ও খুশি হবে। আর দ্বিমত করো না বাবা, আমাদের এক মেয়ে চলে গেছে,

হারিয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস জগদম্বা, আমাদেরই মেয়ে হয়ে নিশ্চয়ই আর নতুন করে তোমাকে আঘাত করবে না। তা হতে পারে না। ঈশ্বর নিশ্চয় তা করবেন না। যদি অঘটন কিছু ঘটেই জানতে হবে এ হলো রঘুনাথের চরম পরীক্ষা। এরপর মথুরামোহন আর কথা বাড়াননি।

সানাই বেজেছিল। জগদম্বাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে মথুরামোহন এই জানবাজার প্রাসাদেই শুধু জামাতা হিসেবে নয় পুত্ররূপেও বাঁধা পড়লেন।

রাণীমা তুলে নিলেন ঘর-বাইরের কর্মভার।···

এই সূত্রে প্রথমেই মনে পড়ে রাণী ভবানী, রাণী স্বর্ণময়ীর কথা। আর তাঁদেরই উত্তরসূরী হিসেবে রাণী রাসমণি। রাণী বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নি, কিন্তু নিতান্ত বালিকা বয়স থেকে এ যাবৎকাল নীরবে-নিভৃতে বসে আত্মার পবিত্রতার জন্য শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। রাজচন্দ্রের সান্নিধ্যে বিষয়-কর্মে হয়ে উঠেছিলেন নিপুণ। সুতরাং রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পরই রাণী যতটা কাতর হয়েছিলেন ততটাই নিজের মনের তাগিদে নিজেকে সহজ করে নিতে পেরেছিলেন।

জানবাজারের প্রাসাদে কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তা ছাড়া রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পব দেখা গিয়েছিল অর্থ-সম্পদ-বিষয়-বৈভবে রাজচন্দ্র তাঁব রাণীকে সত্যিকারের রাজরাণীর সিংহাসনে বসিয়ে রেখে গেছেন। রাসমণি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বিব্রত হলেন না।

একদিন রাণীমা এসে দাঁড়ালেন কাছারি বাড়িতে।

রাণীমা এসেছেন অন্দরমহল থেকে বাইরের মহলে। সকলের চোখে-মুখে বিস্ময়! সকলেরই মনের গভীরে দুটি ভাবনা বেশ কিছুদিন ধরেই জট পাকাচ্ছিল। প্রথম ভাবনা—রাণীমার জামাইরা যখন এ বাড়িতে থাকেন, তখন এই বিশাল ভূসম্পত্তির হিসাব-নিকাশ দেখা শোনার দায়িত্বভার নিশ্চয়ই তাঁদের ওপরেই পড়বে। এ ক্ষেত্রে ভাবনা থাকে বটে এ বাড়ির পুরাতন কর্মীদের মনজুড়ে। কীসের ভাবনা? জামাতারা তো প্রাসাদের পোষা আয়েষী কবুতরের মত। এরা মাঝে মাঝে শ্বেত পাথরের ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে পাখার ঝাপটা দিয়ে অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করে। ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলে নেয় খাবার, আবার চোখ বন্ধ করে কেউ বা নিশ্চিন্ত মনে আরাম করে, কেউ বা নিদ্রা যায়। রাণীমার জামাইদের মধ্যে একমাত্র মথুরামোহন ছাড়া বাকি সকলেরই সেই কবুতরের ভূমিকা! অতএব দ্বিতীয় ভাবনা, জমিদারির দেখাশোনার ভার তাঁদের ওপর ন্যস্ত হলে কর্তার

আসলে যা তর তর শুধু এগিয়েছে, তা তদ্রূপভাবে তর তর করে পিছিয়ে যাবে।

আর রাণীর ভাবনা সেই স্বনামধন্য মানুষটিকে নিয়ে, তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথের সঙ্গে রাজচন্দ্রের সম্পর্ক যে মধুর ছিল সে খবর কলকাতা-বাসিদের কাছে যেমন অজানা ছিল না তেমনি করেই এ বাড়ির পুরনো যাঁরা তাঁরাও তা জানতেন। কিন্তু এ বাড়ির সবাই যা জানতেন, কলকাতার অনেক মানুষই তা জানতেন না। সে এক অন্য ইতিহাস।

রাজচন্দ্র সেদিন সবেমাত্র ফিরেছেন, এমন সময় খবর এলো বাবু দ্বারকানাথ এসেছেন দেখা করতে! রাণীমা দেখলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর এসেছেন শুনে শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষটির চোখে-মুখে খুশির ছাপ।

রাণীমা বলেছিলেন, এমন অসময়ে কেন?

রাজচন্দ্র বলেছিলেন, রাণী, মানুষ যদি মানুষের কাছে অসময়ে আসে জানতে হবে আগন্তুকের কোথাও কোন বিপদ ঘটেছে, সে সাহায্যপ্রার্থী। ভাল সংবাদও অসময়ে আসে বটে কিন্তু তা বিরল। দ্বারকানাথ এই দুপুরে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থী, মনে হচ্ছে অবশ্যই তার কোন অশুভ হেতু আছে—

কথা শেষ করে রাজচন্দ্র বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সোজা এলেন বৈঠকখানায় বসে আছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। টানা পাখা টেনে টেনে ঘরটিকে স্নিগ্ধ বাতাসে ভরিয়ে তুলছে পুরাতন এক ভৃত্য।

রাজচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করতে দ্বারকানাথ একটু ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। বাধা দিলেন রাজচন্দ্র, বসুন বসুন—এই সময়ে আপনি!

দ্বারকানাথ বললেন, আপনার কাছে এসেছি এক বিশেষ প্রয়োজনে। আপনি আমাকে দু' লক্ষ টাকা দিন, আমি অচিরেই আপনাকে তা ফিরিয়ে দেব—

প্রিন্স দ্বারকানাথ টাকা চাইছেন, এ যেন বিশ্বাস হয় না রাজচন্দ্রের! হবেই বা কী করে। যে মানুষটি নিজে ধনকুবের, তিনি টাকা ধার করতে পারেন?—পারেন বৈকি! যাঁর অনেক থাকে, তাঁর তো প্রয়োজনের সীমা থাকে না। দ্বারকানাথের তো তাই। যেমন ছিল অনেক, তেমনি খরচও কম করেননি। গোটা কলকাতার উন্নয়নে যখনই কোন অর্থের প্রয়োজন

হয়েছে—অনেকের মত দ্বারকানাথ তখনই চাঁদা দিয়েছেন অকাতরে। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি তৈরি হলো, দ্বারকানাথ দিলেন এক লক্ষ টাকা। মেডিকেল কলেজে যে ছাত্ররা সেরা প্রতিপন্ন হবে তাদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করলেন দ্বারকানাথ। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি গঠনে টাকার দরকার, তাছাড়া তিনি নিজেও একজন উদ্যোক্তা, সুতরাং টাকা দিলেন। মেডিকেল কলেজের বাড়ি তৈরি আর জমিদার সভা স্থাপনে দ্বারকানাথ যে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন সে খবর কে না জানে? বিলেতে যাবেন, অনেক টাকার দরকার। একটি নয় একাধিক পত্রিকার মালিক হয়েছিলেন তিনি। 'বেঙ্গল হরকরা', 'বেংগল হেরাল্ড, 'বঙ্গদূত' প্রভৃতি কাগজে মালিকানা ছিল। একবার অনেক টাকা দিয়েছিলেন 'ইংলিশম্যান' কাগজে। মিসেস লিচ্ যখন এ দেশে অভিনেত্রী হিসেবে দারুণ জনপ্রিয়, দ্বারকানাথ এবং আরও কয়েকজন গড়েছিলেন 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'। এই থিয়েটার শুধু নয় আরও বহু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মোটা অংকের টাকা দিয়েছেন তিনি।

একবার নয়—দু'বার দ্বারকানাথ বিলেত গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন বিলেত যান তখন চারজন ছাত্রকে সব খরচ দিয়ে বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। এর মধ্যে দু'জনকে তো দ্বারকানাথ নিজের কাছে রেখে বড় করেছিলেন, তাঁরা হলেন ভোলানাথ বসু আর গোপাললাল শীল।

ব্যবসার তালিকা দিলে তো শেষ করা যাবে না। দ্বারকানাথের জীবন এক বিস্ময়কর কর্মবীরের জীবন! শুধু এইটুকু বললে বোধ হয় ঠিক হবে, দ্বারকানাথ ছিলেন সেরা শিল্পপতি। তাঁর ইউনিয়ন ব্যাংক তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল কয়েকটি জীবনবীমা কোম্পানী। সেই হেন প্রিন্স দ্বারকানাথের দু' লক্ষ টাকার দরকার।

রাজচন্দ্র সেদিন বিনাবাক্যব্যয়ে সেই টাকা ধার হিসেবে তুলে দিয়েছিলেন দ্বারকানাথের হাতে। সেই টাকা অন্তত রাজচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিশোধ করেন নি দ্বারকানাথ। এর হিসাব এই কাছারি বাড়ির নথিপত্রে রক্ষিত আছে!

থাক সে কথা। রাজচন্দ্র দু' লক্ষ টাকা দ্বারকানাথকে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন শয়নকক্ষে এলেন, তখন রাণীমার মুখে কোন ভাবনার ছাপ ছিল না, এমনকি এ প্রসঙ্গে কোন কথাই আর সেদিন তোলেন নি রাসমণি। স্ত্রীকে নীরব থাকতে দেখে রাজচন্দ্রের ভাবনা বেড়েছিল। রাণীর এই নীরবতা তাঁকে বার বার এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এক সময়ে

রাজচন্দ্রই মুখ খুললেন। বললেন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা জানতে চাইলে না তো? তিনি কেন এসেছিলেন—তা তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না রাণী?

রাসমণি বললেন, উনি অসময়ে যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছেন। তুমি সেই বিপদের কথা সবিস্তারে শুনেছ, এবং তাঁকে বিপদমুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছ; সুতরাং ও সম্বন্ধে আমি আর কি জানতে চাইব বল, রঘুনাথ ওঁর মঙ্গল করুন—

রাজচন্দ্রের মুখে চাপা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। তারপর সব কথাই খুলে বলেছিলেন তিনি। পরের দিনই দু' লক্ষ টাকা রাজচন্দ্র তুলে দিয়েছিলেন দ্বারকানাথের হাতে!

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর একটা চাপা গুঞ্জন উঠেছিল চারদিকে। দ্বারকানাথ নাকি বিধবা রাণী রাসমণির জমিদারীর ম্যানেজার পদে নিজেকে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পুরাতন কর্মীদের মনে এখন অন্য ভয়, রাণীমা যদি এই বিরাট-বিশাল-শিক্ষিত এবং কলকাতার মধ্যে একজন সেরা মানুষ হিসেবে চিহ্নিত দ্বারকানাথের মত একজনকে নিজের জমিদারী দেখাশোনার দায়িত্বভার দেন—তা হলে পাওনা দু' লক্ষ টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি হিতে বিপরীতও কিছু হতে পারে!

এই প্রথম কাছারি বাড়িতে এসে রাণীমা সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে আসনে বসলেন। কারও মুখে কোন কথা ফোটার আগে রাণী বললেন, মাননীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে আমার জবানীতে একটি পত্র লিখে আজই পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—; লিখবেন, এই দুঃখের দিনে তিনি স্বইচ্ছায় যে সাহায্য দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাতে আমি খুবই তৃপ্তি লাভ করেছি, কিন্তু তাঁর মত একজন বিশিষ্ট মানুষকে আমার জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করা সম্ভব হবে না। কর্তামশায়ের নাম উল্লেখ করে আরও লিখবেন,—আমার এই দুঃসময়ের দিনে সেই দুই লক্ষ টাকা যদি উনি ফেরত দেন, আমার উপকার হয়—

রাণী রাসমণি সেদিন দ্বারকানাথকে আর একটি সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি নিজে বিষয়-কর্ম দেখাশোনা করব, জামাতা বাবাজীবন মথুরামোহন আমাকে সাহায্য করবে!

শোনা যায়, জানবাজারের বাড়িতে এরপরেও দ্বারকানাথ নিজে রাসমণির সঙ্গে এস্টেটের ম্যানেজারী প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলেন। রাণী একই

উত্তর দেন।

নগদ টাকা ফেরৎ না দিলেও দ্বারকানাথ সমমূল্যের একটি তালুক (রংপুর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত স্বরূপপুর) লিখে দেন। ওই তালুটির বার্ষিক আয় ছিল তখন ৩৬ হাজার টাকা।



রথের রশিতে টান দিয়ে নিজের কর্মজীবনের রথের চাকা ঘোরালেন রাণীমা। অত্যন্ত হাসি-খুশি মন নিয়ে রাণীমা সেদিন জামাই আর মেয়েদের নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। ঠিক এ ভাবে জামাই মেয়েদের এক সংগে কাছে পাবার সময় করতে পারেন না রাণীমা, সুতরাং ঘরে ঘরে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল!

মেয়েদের মধ্যে পদ্মমণি বরাবরই একটু আলাদা প্রকৃতির! সংসারের কোন কিছুতেই যেন তার শান্তি নেই। পদ্মমণির মন থেকে যদি পদ্মটি তুলে নেওয়া যায় তা হলে থাকে মণি। মণি ঐশ্বর্যের প্রতীক। যেখানে শুধুমাত্র ঐশ্বর্য, সেখানে অহঙ্কার। যেখানে অহঙ্কার—সেখানে অশান্তি। সেই অহঙ্কারের অশান্তি নিয়ে পদ্মমণি মাঝে মাঝে এই প্রাসাদের ভিতরটাকে তপ্ত করে তোলে। রাণীমা জানতেন পদ্মমণির মনটা আকাশে ওড়া ঘুড়ির মত। অস্থির-অশান্ত। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে কিছু সংযত করা যায়। কিন্তু সব ঘুড়ি সমান নয়। কেউ নিয়ন্ত্রণে স্থির হয়, কেউ একেবারে গোড়া থেকেই অস্থির। কোন নিয়ন্ত্রণই সে মানতে পারে না। পদ্মমণি তেমনি। বিবাহিতা কন্যা। বিলাসে প্রাচুর্যে মানুষ। সুতরাং এমন একটু আধটু অহেতুক অস্থিরতাকে শাসন দিয়েও রোধ করা যাবে না—ভাবতেন রাণী।

মা সবাইকে ডেকেছেন, সবাইকে নিজের কাছে বসিয়ে আজ মা অন্তরের যা কিছু বাসনা-পরিকল্পনা তা জানাবেন—সকলেই এক ডাকে ছুটে এলো। কিন্তু পদ্মমণি কোথায়? বড় জামাই রামচন্দ্রকে মা জিজ্ঞাসা করলেন, পদ্মমণি আসছে না কেন?

রামচন্দ্র বললেন, আপনার মেয়ের মনের কথা আমি বুঝি না—

পদ্মমণি এলো। অন্য বোনেদের মত পদ্মমণি নিজেকে প্রয়োজনে

সাজায় না, সে সর্বদা সেজে থাকতে ভালবাসে। প্রসাধনই তার একমাত্র বিলাস। সেই জন্য আসতে তার বিলম্ব ঘটেছে!

রাণীমা সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আমার শ্বশুরমশাই এবং কত্তা এ বাড়ির এবং দশের কল্যাণে যা যা করে গিয়েছিলেন — আমার ইচ্ছে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে আমি সেগুলি পালন করে যাই। বারো মাসে তেরো পার্বণের সব উৎসব এ বাড়িতে পালিত হতো। একটা উৎসবে যত মানুষ আসত তাদের কারও কারও মন ভরতো উৎসব দেখে, বেশির ভাগ মানুষ অবশ্য উৎসবের দিন এলে কিছু পাবে—এই বিশ্বাস নিয়ে আসত। আমার শ্বশুরমশাই এবং কত্তা চাইতেন সবাইকে আনন্দ-খুশিতে রাখতে! এতে লোকের কল্যাণ হতো!

জগদম্বা বলল, মা তোমার সাধ ছিল রথের—

রাণী মাথা নাড়লেন, বললেন, আমি রুপোর রথ গড়তে চাই। কথাটা শেষ করে মথুরামোহনের দিকে তাকালেন রাসমণি।

শাশুড়ির পরের কথাগুলি শোনার আগেই মথুর একটি প্রস্তাব দিলেন। বললেন, মা, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে হ্যামিলটন কোম্পানীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল হয়—রুপোর-কাজের রথ ওরাই ভাল করবে বলে মনে হয়—

রাণীমা বললেন, না বাবা, আমার মনে হয় আমাদের দেশের কারিগরেরাই যথেষ্ট ভাল পারবে, তুমি বরং ভাল কারিগরের সঙ্গে কথা বলো—

পদ্মমণি এতক্ষণে মুখ খুলল, হ্যামিলটন কোম্পানীর সাহেবদের দিয়ে করালে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো? আমাদের দেশের কারিগররা কাজের চাইতে অকাজ করবে বেশি, টাকাও বেশি খরচ হবে—

মেয়ের কথা শুনে রাণীমা একটু অখুশি হলেন। বললেন—পদ্ম, তোমরা কি চাও আমাদের নিজেদের বলতে কিছুই থাকবে না? যা কিছু করবে, যা কিছু ভাববে তা ইংরেজরাই! না, তা হবে না। আমাদের দেশের মানুষেরা কারও চাইতে কোন বিষয়ে খাটো নয়—কথাটা শেষ করে আবার মথুরামোহনের উদ্দেশে রাণীমা বললেন, মথুর, বাবা তুমি আর দেরী করো না। স্নানযাত্রার আর দেরী নেই, আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রার দিন আমি এই রথ প্রতিষ্ঠা করতে চাই।—সেটা ১৮৩৮ সাল। ১২৪৫ বঙ্গাব্দ।

রথ তৈরি তো নয় যেন রাজসূয় যজ্ঞ!

জানবাজারের বাড়িতে লোকের ঢল নামল। বালক-বালিকা, কিশোর-

কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউ বাদ গেল না। সকলেই যেন আসন্ন উৎসবের আনন্দের স্পর্শ পেয়েছে এখনই! সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা কথা, রাণীমার বাড়ি থেকে এবার রথ বেরুবে, কাঠের রথ নয়—একেবারে রুপো দিয়ে তৈরী রথ!

বিস্ময় আর বিস্ময়! ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা!

রথ নির্মিত হচ্ছে, তদারকিতে আছেন মথুরামোহন। একদিন রুপোর রথের নির্মাণ কুশলতা দেখার জন্য জানবাজারের বাড়িতে একে একে এলেন শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রাসাদ তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে অভ্যর্থনা জানাবার বাড়তি কাজ পড়ল মথুরামোহনের ওপর।

এলেন রাজচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয় মানুষেরা। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাসমণি তাঁদের আপ্যায়ন জানালেন। ঠিক রাণীর মতই তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন রাসমণি। সেই জ্যোতির্ময়ী রূপ দেখে শ্রদ্ধায় সকলেই আনত হলেন। প্রজারা আবার দু'চোখ ভরে দেখল তাদের 'মা'-কে!

সবার মনেই প্রশ্ন—খরচ কেমন পড়ল? মথুরামোহনই জানালেন সেকথা—এ পর্যন্ত এক লক্ষের মত খরচ হয়েছে, শেষ পর্যন্ত মোট খরচ হবে সওয়া লক্ষের মত।

তাই হয়েছিল। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল রথটি নির্মাণ করতে।

১২৪৫ সনের আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রা তিথিতে রাণী রাসমণির রুপোর রথ প্রতিষ্ঠিত হলো। পূজা-অর্চনার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলেন না রাণীমা। রথযাত্রার দিন রথে বসানো হলো রঘুনাথজীকে। যথা সময়ে ফুলে ফুলে সজ্জিত, নতুন বস্ত্রে ঢাকা অপরূপ সুন্দর সেই রথ নামল রাজপথে। রথের রশি ধরলেন রাণীর সব জামাই-মেয়েরা আর আত্মীয় স্বজন। রথের আগে ভাগে শতাধিক বাদ্যকার, শতাধিক গায়ক। বাদ্যযন্ত্রের অপরূপ সুর-মূর্চ্ছনা আর শতাধিক কণ্ঠের সুললিত রামনাম গানে মুখরিত হলো চারদিক, পথের দু'ধারে সহস্র দর্শনার্থীর ভিড়।

বিশেষতঃ শোভাযাত্রাটি ছিল দেখার মত। গোরুর গাড়িতে রোশন চৌকি যেত আগে আগে। এছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তো ছিলই। পিছনে যেত শতাধিক উড়িষ্যাবাসী সঙ্গীতজ্ঞ, বাউল, যাত্রার দল, বালক গায়কের দল, কীর্তনীয়া, পুতুল নাচ ও সং। তার পিছনে বাগবাজারের হাফ আখড়াই-এর নামকরা দোহারেরা। পিছনে গোয়ালটুলির মধুসূদন দাস ও

লোকনাথ হোড়ের সখের দল। রথের সম্মুখভাগে রাণীর গুরুদেব থাকতেন সোনার ছাতার নিচে আর তাঁকে ঘিরে চলতেন জামাতারা। এছাড়া কর্মচারীরা তো থাকতেনই। গোলাপ-জল ছড়ান হত। আনুষঙ্গিক নানা জিনিষের জন্য বহু গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি সারিবন্ধ ভাবে যেত। সব গাড়ির পাশেই থাকত সশস্ত্র প্রহরী।

আট দিন ধরে চলত এই মহোৎসব। রাণী এর জন্য ব্যয় করেছিলেন কমপক্ষেও আঠার হাজার টাকা। এই শোভাযাত্রার আয়তন ছিল অর্ধক্রোশ দীর্ঘ। প্রতি বছর আড়াই থেকে তিন মণ জুঁই ফুলের মালা কেনা হত এই সময়ে। আত্মীয়-কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগতেরা এই সময়ে সরগরম করে রাখতেন জানবাজারের বাড়ি!

রথ গেল। সামনেই মহাপুজো। আবার রাসমণি চঞ্চল হলেন। কোন কাজই তিনি ফেলে রাখতে চান না। আজ নয় কাল হবে—এই মনোভাবকে রাণীমা বরদাস্ত করতে পারতেন না। আশ্বিনে দুর্গাপুজো অথচ শ্রাবণের প্রথমেই রাণীমা অস্থির। মহাযজ্ঞের যে পরিমাণ আয়োজন সেই পরিমাণে দিন বেশী নয়। ডাক পড়ল মথুরামোহনের!

অন্য জামাই-মেয়েদের ডেকে নিজের কাছে বসাতে ভুল এবারেও হয়নি মায়ের। সংসারের-পরিবারের জন্য যা কিছু করেন তা নিয়ে মেয়ে জামাইদের সংগে আলোচনা না করে করেন না রাণীমা। এঁদের মধ্যে মথুরা-মোহনকেই একটু বেশী ভালবাসতেন বলে তাঁকে সংগে নিয়েই সব কাজ করতেন তিনি। এ ব্যাপারে অন্যদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ছিল বটে, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ ছিল না!

আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আসন্ন দুর্গাপুজো নিয়ে আলোচনায় একে একে সবাই জমায়েত হলেন রাণীমার ঘরে। রাণী বললেন, কত্তার আমল থেকে জানবাজারের এই বাড়িতে মায়ের পুজো হয়ে আসছে, আমি সেই পুজো এবার আরও বেশী জাঁকজমক করে করতে চাই—

সবাই শুনল, শুধু পদ্মমণি বলল, বাবার আমলে যেমন হতো তেমনি হলেই ক্ষতি কী ছিল, যত বেশী জাঁকজমক তত বেশী টাকা খরচ, আমি বলছিলাম কি, জাঁকজমক বাড়িয়ে কী লাভ মা?

পদ্মমণির এটাই চরিত্র। মা যা করেন, মা যা ভাবেন, তাতে পদ্মমণি প্রতিবাদ না করে পারে না। পদ্মমণির মনে হয় মা যদি খরচ বাড়ান তা হলে ভাঁড়ারও ফাঁকা হবে। ভাঁড়ার কমলে কপালে কষ্ট কেষ্ট রোধ করতে

পারবে না। পদ্মমণির স্বামী রামচন্দ্রও একবার বলেছিলেন, সত্যি পদ্ম, মায়ের সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি! উনি কি ভেবেছেন, উনি কোন দিন মারা যাবেন না? এভাবে খরচ করলে দেখছি ওঁর অবর্তমানে আমাদের কপালে জুটবে অষ্টরম্ভা!

পদ্মমণি বলেছিল, দেখি না এর শেষ কোথায়!

আজও স্বভাব অনুযায়ী পদ্মমণি প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু রাণীমার দৃষ্টি একটু বাঁকা হয়ে ওর ওপর পড়তে পদ্ম চুপ হয়ে গেল!

রাণীমা কী যেন ভাবলেন। তারপর মুহূর্তেই নিজেকে সহজ করে বললেন. জগদম্বা, এইমাত্র তোমার বোন যা বলেছে তুমি নিশ্চয়ই তা শুনেছ?

জগদম্বা বলল, শুনেছি মা—

মা বললেন, তা হলে তুমিই বল, তোমার বাবার আমলে দুর্গাপুজোতে যে জাঁকজমক হতো, যে খরচ হতো, আমি যদি তার বেশী খরচ করি তাহলে কি ভুল করবো?

জগদম্বা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারছিল না। আসলে সংকোচ বোধ করছিল। নিজের পক্ষ নিয়ে যা সত্য তা বললে পদ্ম অন্তত তাকে স্বার্থপর ভাববে। মায়ের পক্ষ নিয়েও যদি আসল উত্তর দেয় তাতেও পদ্ম খুশি হবে না। ভাববে বোন আর ভগ্নীপতি মায়ের সংগে জোট বেঁধেছে! ভীষণ খারাপ লাগছিল জগদম্বার। মা তাকে একটা বড় পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন!

জগদম্বা চুপ করে থেকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল! নিস্তব্ধ ঘরে দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামটা যেমন টক্ টক্ শব্দ করে নিজের অস্তিত্বের কথা জাহির করে এই নীরবতার মধ্যে জগদম্বার বুকের মধ্যেও তেমনি একটা পেণ্ডুলাম শুধু এদিক ওদিক করছিল। একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি!

মথুরামোহন প্রথম মুখ খুললেন। বললেন, জগদম্বা, মা যা জানতে চেয়েছেন. তোমার মনে যা আসে তাই বলে উত্তর দাও—এতে ভাববার কী আছে?

মেজজামাই প্যারীমোহন বললেন, হঁ্যা বলে ফেল—

জগদম্বা বলল, বাবার আমলে যা হতো আজ তার চাইতে অনেক বেশী জাঁকজমক করে তুমি কোন কাজ করলে তাতো ভালই হয়। বাবার আমলে আমাদের বাড়িতে রথ প্রতিষ্ঠা ছিল না, তুমি প্রতিষ্ঠা করেছ, বড়দিদি তাতে জাঁকজমক দেখেছেন, আমি দেখেছি অন্য কিছু। মা যত টাকা খরচ করে যাই

করেছেন সেই টাকা মানুষের কল্যাণে লেগেছে—যারা কাঠ-লোহা-রূপো বেচেছে তারা টাকা পেয়েছে, যাঁরা রথ তৈরী করেছেন তাঁরা থেকে আমাদের পুরোহিত মশাইও টাকা পেয়েছেন, গরীব দুঃখীরা দু'বেলা পেটপুরে খেয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরেছে এতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং আমাদের অনেক লাভ হয়েছে।

কথার মাঝে মথুর বললেন, বাঃ বাঃ জগদম্বার খাসা উত্তর! আসলে আমার কি মনে হয় জানেন মা, মনে হয় জগদম্বা বলতে চেয়েছে—পুণ্য কাজে ব্যয় করলে লোকসান হয় না, লাভই হয়।

কথাগুলি পদ্মমণির ভাল লাগেনি। রাসভারী মাকে উপেক্ষা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়, তাই একরাশ অভিমান নিয়ে পদ্মমণি চুপ করে থাকে!

রাণীমা এবার মথুরামোহনের উদ্দেশে বললেন, বাবা মথুর, তুমি একবার কুমারটুলিতে যাও, যাঁরা প্রতি বছর আমাদের প্রতিমা গড়েন তাঁদের যদি কাউকে পাও তো ভাল, তা না হলে তুমি যাঁকে সেরা মনে করবে তাঁর সঙ্গে কথা বলে দু'চার দিনের মধ্যে প্রতিমা গড়ার কাজে লাগিয়ে দাও। ডাকের সাজের প্রতিমা ঠিক ঠিক সাজাতে কমদিন লাগবে না—বারাণসীতে লোক পাঠাও, মায়ের জন্য, সরস্বতী-লক্ষ্মীর জন্য কার্তিক-গণেশ-অসুরের জন্য ওখান থেকে আসল জরির বেনারসী আর ধুতি আনার ব্যবস্থা কর! সেই সঙ্গে দেবী-পুজোয় বস্ত্র কতগুলি লাগবে আমাদের কুলপুরোহিতের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাও আনিও—

মথুরামোহন বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না মা, আমি এক্ষুণি সব ব্যবস্থা নিচ্ছি।

রাণীমা এবার প্যারীমোহনকে বললেন, তুমি একবার ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখ দেখি বাবা, আমাদের এখানে কারা পাঁচালি-টাচালি গাইছে—

প্যারীমোহনের মুখে কথা ফোটার আগে রাণীমার দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী একরাশ হাসিতে-খুশিতে ঝলমল করে উঠে বলল,—মা, দাশরথির পাঁচালী, নিধুবাবুর টপ্পা আর গোবিন্দ অধিকারীর পালাগান সেই সঙ্গে লোকা ধোপার আখড়াই যদি হয় না—ভীষণ ভাল হবে!

পদ্মমণি বড় বোন। বড়বোনের বড় মেজাজ নিয়েই এবার কুমারীর দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, বাড়ির বাইরে তো যাস্‌নে, কোথায় কে খেমটা নাচছে তার খবর রাখিস কেমন করে? দেখ মা, তোমার আস্কারা পেয়ে

কুমারীটা আজকাল ও সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, এটা মোটেই ভাল নয় বলে দিলুম—

প্যারীমোহন হলেন কুমারীর স্বামী। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের কথা হলে কার না লাগে। প্যারীমোহনেরও লেগেছিল। প্যারীমোহন বললেন,—এর মধ্যে আপনি খারাপটা কি দেখলেন? জানেন, প্রিন্স দ্বারকানাথ থেকে রাজা রাধাকান্ত পর্যন্ত চাইছেন এ সব গানের চাহিদা বাড়ুক। অতীত দিনের মত এখন তো আর ও সব গান শুনলে চরিত্র নষ্ট হবার ভয় নেই—

বলেই দাশরথি, নিধুবাবু, গোবিন্দ অধিকারীদের সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিবরণ দিলেন দিলেন প্যারীমোহন।

দাশরথি রায় যা তা লোক নয় বাংলা আর ইংরাজীতে লেখাপড়া জানা লোক। বর্ধমানের বাঁধমুড়ার রায় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। দাশরথির বাবার নাম দেবীপ্রসাদ রায়! এই দাশরথি ছেলেবেলায় বর্ধমানের সাকাই গ্রামের নীলকুঠিতে চাকরি করতেন। চাকরি করতে করতে পদ্য লিখতেন। তারপর সব ছেড়ে দাশরথি আকা বাঈয়ের (অক্ষয় কাটানী) কবির দলে ঢুকে পড়েন। তারপর নিজেই পাঁচালির আখড়া খোলেন।

অল্পদিনের মধ্যে এই দাশরথি রায়ের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর পাঁচালী গান শুনে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তো খুব খুশি। একদিন তাঁকে ডেকে পণ্ডিতরা তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু কি তাই, বর্ধমানের মহারাজা, শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এঁরা তো তাঁর পাঁচালী শুনে এমন খুশি হয়েছিলেন যে নতুন বস্ত্র আর অঢেল টাকাকড়ি দিয়েছিলেন পুরস্কার হিসেবে।

আরও শুনবেন মা? সেই দাশরথি রায় এখন শুধু পদ্য লেখেন না, পাঁচালী গান করে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে পালা গান লেখেন। তাঁর পাঁচালী শুনলে নাকি লোকশিক্ষা হয়। তাঁর পাঁচালীতে থাকে ধর্মের কথা! এ হেন দাশরথি রায়ের পাঁচালী যদি এবার দুর্গাপুজোয় আনা যায় লোকে ধন্যি ধন্যি করবে মা। নিমন্ত্রিত অতিথিরা খুশি হবেন।

দাশরথি রায়ের কথা শুনতে শুনতে রাণীমা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। এই জীবন-কথার মধ্যে রাণী রাসমণি সেদিন কোন সত্যের ছবি দেখেছিলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। জানেন বলেই নিজেকে সহজ করে নিয়ে রাণীমা বলেছিলেন, বাবা প্যারীমোহন, এই পাঁচালীকার আর পালা গাইয়ের কথা তুমি জানলে কেমন করে?

প্যারী বললেন, আমাদের গুণীজ্ঞানীরা ইদানীং এ সব নিয়ে খুবই ভাবছেন। আমি যে সেই ভাবনার অংশীদার মা!

রাণীমা বললেন, নিধুবাবুর নাম শুনেছি, তাঁর গান শুনিনি কখনও। তুমি এই নিধুবাবুর কথা কি কিছু জানো?

প্যারী বললেন, সবার সম্বন্ধে কিছুটা কিছুটা জানি মা। আমাদের জানতে হয়েছে। এই যে কুমারটুলি যেখান থেকে কুমোর এনে আমাদের দুর্গাপ্রতিমা গড়া হবে, সেই কুমারটুলির নামজাদা কবিরাজ ছিলেন হরিনারায়ণ গুপ্ত। লোকে জানত হরিনারায়ণ কবিরাজ বলে। তাঁর ছেলে এই নিধু-বাবু। আসল নাম হলো রামনিধি গুপ্ত। শুনেছি পাদ্রীর কাছে নিধু ইংরেজী শিখেছিলেন। কিছুদিন চাকরি করেছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে। সেখানে কাজ করতে করতে একবার চিরণছাপরায় যান। সেখানে একজন মুসলমান গাইয়ের কাছে শিখেছিলেন হিন্দুস্থানী টপ্পা। এরপর তিনি নিজেই টপ্পা লেখেন আর গান গেয়ে বড় হন। আখড়াই গাইয়ে শ্রীদাম-সুবলের বাবা কুলুইচন্দ্র সেনের আখড়াই গান সংশোধন করে নতুন আখড়াই চালু করেন। তিনিই প্রথম ইংরেজী জানা কবি গাইয়ে। তা ছাড়া আমাদের দেশে এই যে বিধবা বিয়ে, সহমরণ এ সবের পক্ষে-বিপক্ষে প্রথম গান গেয়েছিলেন। টপ্পা গান তো আপনি শোনেন নি। আহা কী সুন্দর সেই গান! এই টপ্পা গানের আমদানী নিধুই করেছেন। তবে বয়স তো অনেক হল! —এখন শুনেছি শরীর ভাল যাচ্ছে না।

রাণীমা আবার তারিফ করলেন। এঁদের কথা যত শুনছি ততই খুশি হচ্ছি বাবা। এঁরা সবাই কী পরিশ্রমটাই না করছেন। এঁদেরই জয়গান তো আবার মানুষই গাইছে। সব মানুষ যখন কোন একটি মানুষের জয়গান করে জানতে হবে সেই মানুষটি একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানের সন্তান! কথাগুলি বলে রাণীমা মনের ভিতরে কি যেন খুঁজতে থাকলেন।

কুমারী বলল, কী ভাবছ মা?

রাণীমা বললেন, প্যারী এই মাত্র কার নাম যেন করলে, যার বাবার আখড়াই গানকে সংশোধন করেছিলেন নিধু গাইয়ে—

প্যারী বললেন, ও হো, আপনি শ্রীদাম-সুবলের কথা বলছেন? আখড়াই গানে ওদের জুড়ি নেই মা—

রাণীমা বললেন, ঐ শ্রীদাম-সুবলের গানও যাতে এবার বসানো যায় তার চেষ্টাও করো বাবা। আর হ্যাঁ, গোবিন্দ অধিকারী আর ঐ কি যেন ধোপার কথা বললে, ওদের সম্বন্ধে যদি কিছু জানা থাকে তাও বলো শুনি—

প্যারীমোহন বললেন, লোকা ধোপার খুব নাম ডাক খেমটায়। গোবিন্দ অধিকারীর নাম ডাক পালাগানে।

কালীয়দমন পালা গানে দূতী সেজে নিজে গান গায়—কথাও বলে। কী মিষ্টি গলা! কীর্তন গানে এখন তার জুড়ি নেই। গোলকদাসের কীর্তনের দলে গোবিন্দ দোহারী। তারপর নিজে কীর্তনের দল খুলেছিল বটে কিন্তু বেশী জমাতে পারেনি বলে পরে পালাগানের দল করেছিল। গোবিন্দ লেখা-পড়া শেখেনি, কিন্তু অবাক কাণ্ড কি জানেন মা? গোবিন্দ নিজে পদ্য লিখতো। রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিয়ে যে পালা করে, যদি একবার দেখেন ভুলতে পারবেন না।

গোবিন্দ অধিকারীকে আনতে গেল হাওড়ায় যেতে হবে—হাওড়ার সালকেতে থাকে শুনেছি—

রাণী বললেন, তাই যেও—

এরপর রাণীমা বড় জামাই রামচন্দ্রকে ডেকে পূজাঅর্চনার যাবতীয় ব্যাপার দেখা শোনার দায়িত্ব দিলেন।

রাণীমার এখানেই মুন্সিয়ানা।

রাজ্য যেমন একা কেউ পরিচালনা করতে পারে না, তেমনি একটা বিশাল যৌথ পরিবার চালাতে সকলকে তার সুখদুঃখের অংশীদার করে নিতে হয়। যদিও এ বাড়ির আদি পুরুষ প্রীতিরাম মাড় একলাই ছিলেন সহস্রের শক্তিতে ভরপুর। তিনি একাধারে যেমন আয় বাড়িয়ে জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন তেমনি পরিবারের সকলের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল, মন ছিল। তখন অবশ্য এই পরিবারের শাখা-প্রশাখা বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি।

রাজচন্দ্র যখন সর্বময় কর্তা হলেন, রাণী রাসমণিকে নিজের স্ত্রী হিসেবে জানবাজারে নিয়ে এলেন, তখন থেকে জমিদারীর আয়-শ্রীর বৃদ্ধি ঘটতে থাকল। এ ক্ষেত্রে রাজচন্দ্র যদিও তাঁর বাবার মতই একেবারে গোড়া থেকেই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ছিলেন, তবুও অষ্টপ্রহর কী কর্মে কী ধর্মে রাণী রাসমণির মত বিচক্ষণ বিদুষী স্ত্রীরও সাহায্য নিয়েছিলেন।

এখন রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর সংসার এবং বিশাল জমিদারীর সব ভার ন্যস্ত হয়েছে রাণীমার ওপর। সংসারের শাখা-প্রশাখা যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে—সেখানে সকলের মতামত নিলেও বিশ্বস্ত একজনকে প্রয়োজন। তাঁকে সাহায্য করার মত একমাত্র মথুরামোহনেরই বিশেষ ভাবে অধিকার। আসলে মথুরামোহন অন্য জামাইদের তুলনায় অনেক বেশী বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। তাই এ ব্যাপারে জামাইদের মধ্যে অন্তত বাহ্যিক কোন বিরোধ

ছিল না। রাণীমার এই যে বিচার-শক্তি এর জন্য খরচ যাই পড়ুক জমিদারীর আয় বিন্দুমাত্র কমেনি!

কুমারটুলি থেকে এলেন মৃৎশিল্পী চারজনের একটা দল। আরো এলেন বেশকারী। গঙ্গার মাটি এলো একাধিক মুটের মাথায়। পিতলের কলসী করে সেই মুটেরাই প্রায় মিছিল করে নিয়ে এলো গঙ্গাজল। এলো কাঠ, দড়ি, বিচালি।



শুরু হয়ে গেল প্রতিমা গড়ার কাজ। পূজা মণ্ডপে যেদিন থেকে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হলো সে মুহূর্তেই শরতের মেঘমুক্ত আকাশ থেকে যেন ঝরতে থাকলো সোনা মাখা রোদ। কাশ ফুলের হাসি ছড়ালো। বাতাসে ছড়ালো মায়ের আগমনী সুর। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে মায়ের আগমনী গান গেয়ে গেয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলে তুলে রোজই চলে যায় একদল মানুষ। এ অঞ্চলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চোখের ঘুম ঘুচে গেল। দিনের পর সন্ধ্যা নামলেই সব শিশুদের অন্তরে একরাশ দুঃখ। রাত কেন এলো! সন্ধ্যা নামলেই রাসমণি-কুঠির ফটক বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর গড়া দেখা যায় না। সেই ভোর থেকে ঠাকুর গড়া দেখে ওরা। ক্লান্তিহীন, অপলক দৃষ্টিতে দেখা!

বড় জামাই রামচন্দ্রের পরিশ্রমের সীমা নেই। মায়ের পূজার দূর্বা, বিল্বপত্র, হরিতকি থেকে যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব শুধু নয় আরও অনেক দায়িত্ব আছে তাঁর ওপরে। পাঁচ থেকে সাত শত সধবার জন্য শাড়ি, শাঁখা, সিঁদুর, কুমারী মেয়েদের জন্য নববস্ত্র, বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ ছেলেদের জন্য ধুতি, উত্তরীয় সবই যোগাড় করে আনতে হবে, কিনে আনতে হবে দোকান থেকে, তাঁতিদের ঘর থেকে। একজন-পাঁচজন কুমারী নয়, মায়ের বাসনা

কমপক্ষে হাজার কুমারীর হাতে তুলে দেবেন নববস্ত্র! এ বাড়ির বৌ হয়ে আসার পর থেকে রাণীমা প্রতি দুর্গাপুজোয় সধবা আর কুমারীদের হাতে এ সব দিয়ে থাকেন, এবার তার মাত্রাও বেড়েছে অনেক। এ ছাড়া কর্মচারীদের প্রত্যেকের জন্য, পুজোরী ব্রাহ্মণদের জন্য, আত্মীয় পরিজন সবার জন্যই চাই নুতন বস্ত্র! তা ছাড়া পুজোর কম পক্ষে পাঁচদিন আগে থাকতে বসে ভিয়েন। সহস্র মানুষের পাত পড়ে এখানে।

প্রায় বারো-তেরো দিন ধরে এই যে অন্নছত্র এর আয়োজন থেকে পরিবেশন-তদারকের ভার থেকে প্যারীমোহনের ওপর। শুধু তাই নয়, রাসমণির জমিদারীর মধ্যে চেনা-জানা যত মানুষ আছে তাদের কাছে নিমন্ত্রণের বার্তা পেঁাছে দেবার দায়িত্ব তাঁর। রামচন্দ্রের সব কাজই হলো, নিমন্ত্রণের কাজও শেষ হলো প্যারীমোহনের।

ওদিকে মথুরামোহনের কাজও শেষ। এবার উৎসব লগ্ন এলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়।

এলো তাই। মা মহামায়ার আগমনের মুহূর্ত এসে গেল! ঝাড় লণ্ঠনের আলোয়-আলোয় ঝলমল করে উঠলো জানবাজারের প্রাসাদ, পুজা-মণ্ডপ, অতিথিশালা। পুরোহিত এবং কুলগুরুদেবের বিধান অনুসারে ষষ্ঠীর দিন অতি প্রত্যূষে নব পত্রিকা স্নান। দেবীর বোধন।

যথাসময়ে মহাষষ্ঠীর দিন প্রত্যূষে রাণীমা এলেন মন্দির প্রাঙ্গনে। মথুরামোহন এসে দাঁড়ালেন সামনে! রাণীমা বুঝলেন কী বলতে চান মথুর। রাসমণি শুধু বললেন, আমার কাছে নয়!

বিশ্বাসই বড় কথা।

আত্মবিশ্বাস আরও বড়। বিশাল কোন স্থাপত্যের দিকে দু'-চোখ আর এক মন ফেলে রেখে যদি বসে থাকা যায়, এর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় বৈকি! বড় বড় থামগুলোর কী আত্মবিশ্বাস! মাথায় করে বিশ্বাসকে ধরে রেখেছে। তেমনি সেই বিশ্বাসের ওপর নিত্য চলছে পার্থিব জীবন।

সেই পার্থিব জীবনের মধ্যে, সংসার নিকেতনের চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে রাণীমারও সেই মনের ভাব। বিশ্বাসের ফল,—এ সংসারের সবাই আপন। আত্মবিশ্বাসের থামগুলো মনের গভীরে। যে থামের ওপর বিশ্বাস দিয়ে রাণীমা গড়েছেন মন্দির। সেই মন্দিরে আছেন তিনি, যিনি সর্বভূতে নিত্য বিরাজমান। আত্মবিশ্বাসকেও কখন মানুষ হারিয়ে ফেলে। আসলে সেখানে দরকার নিত্য আত্মশক্তি ব্রত, বন্দনা। শক্তির মধ্যেই

মহাশক্তি! মহাশক্তির পুরুষরূপ শিব। প্রকৃতির রূপ হলেন যোগমায়া। যিনি যোগমায়া তিনিই কালী। যিনি কৃষ্ণ তিনিই শিব।

শিবের অষ্ট ঐশ্বর্য—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা। যোগেরও তাই।

শক্তির অষ্ট নায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী।

তেমনি কৃষ্ণের অষ্ট সখী। যুগে যুগে, পার্থিব সংসারে ভক্ত হৃদয়ে এই অষ্ট সখী রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন এক-এক নারী-অবয়বে।

গদাধর পণ্ডিতের—শ্রীরাধা। স্বরূপ গোস্বামীর—ললিতা। রায় রামানন্দের—বিশাখা। গোবিন্দ ঘোষের—রঙ্গদেবী। বাসু ঘোষের—সুদেবী। মাধব ঘোষের—তুঙ্গ। শিবানন্দের—সুচিত্রা। রামানন্দের—চম্পকলতা।

এই অষ্ট সখীর ভাব যাঁর মধ্যে, তিনিও তো মূল শক্তির অঙ্গীভূতা। সংসারে এঁদের শুধু কর্ম আর ধর্ম পালনের ভার। মানুষ যে অষ্টধর্মের বশ তারও আবার পরিচয় আছে। লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, প্রশংসা-নিন্দা, সুখ-দুঃখ। মনুষ্য দেহ ধারণ করলে এ ভাব থেকে সহজে মুক্তি নেই। রাণীমাও এ সব নিয়ে ভাবতেন বৈ কি!

সবের মূলে সেই এক। একই বহুধা বিভক্ত। পদকার বলেছেন:

"শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণু ভক্ত।
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি:—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী।"*

মাঝে মাঝে রাজচন্দ্র কাছারি বাড়ি থেকে যখন শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন, রাণীমা কাছে এসে বলতেন—নিশ্চয় দুঃখ পেয়েছ কিছুতে?

রাজচন্দ্র দুঃখ পেলেও বলতেন, না।

রাণীমা সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, বাবার মুখে শুনেছি মানুষের অষ্টধর্ম আছে। তার মধ্যে সুখ-দুঃখ একটা। এর একটাকে পালন যে করতে পারে সে তো মানুষের ধর্ম পালন করে—

অবাক হতেন রাজচন্দ্র। রাসমণি কত অসাধারণ!

সেই রাণীমা যখন সীমাহীন বিষয়-আশয় নিয়ে সংসারে অষ্টভুজার মত নিত্য কর্মে আত্মনিমগ্না, ঠিক তখন তাঁর মুক্তির প্রথম সূর্যোদয়। কামারপুকুরের মাটির ঘরের দেওয়ালে, খড়ের চালায়, নিকোনো মাটির দাওয়ায়,

---

* রামলাল দাস দত্ত

আম-জাম-কাঁঠালে বাগানের গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায় সেই মুক্তি-সূর্যের প্রথম আলোর স্নিগ্ধ দ্যুতি !

মানুষের মধ্যে ভাবের অন্ত নেই ! শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব। পদাবলী সাহিত্যে বৈষ্ণবরা যাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। শান্ত ও দাস্যভাবের উপলব্ধি যার আছে সে সখ্য বাৎসল্য রসের মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে। এ রসের জন্য সাধনা-উপাসনার দরকার। উপাসনায় উত্তীর্ণ হতে গেলে ত্যাগের দরকার। বিশেষ করে কামনা ও বাসনার ত্যাগ। সেই উপাসনাই করতেন রাণীমা।

বৈষ্ণবরা একে বলেছেন—তৃষ্ণাত্যাগ ! অথচ এই তৃষ্ণাত্যাগ তো দূরের কথা, আমরা যারা রক্ত মাংসের মানুষ, তারা তো বাস করছি কামনারই রাজ্যে। অথচ আমরা যেখানে জন্মেছি, আমরা যেখানে মরবো—সেই তো প্রভুর লীলাক্ষেত্র ! আনন্দ-বৃন্দাবন ! বৃন্দাবনে ছিলেন প্রেমপুরুষ কৃষ্ণ। মানুষের বিশ্বাসের দেবতা কৃষ্ণ। সেই আনন্দ-বৃন্দাবনের বাইরে ছিল কংস রাজার রাজত্ব। মানুষের চারপাশে অবিরত সেই কংসের অত্যাচার ! প্রতি মুহূর্তেই আমাদের ভয়। লোভ আর লালসার ফাঁদ পাতা চারিদিকে।

দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যখন কংস হত্যা করার জন্য প্রস্তুত, ঠিক তখনই এক অদৃশ্য মাতৃস্বর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিল—'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'—রাসমণির মুক্তি-সূর্য তেমনি গোকুলে উদিত হয়ে—প্রসন্ন প্রত্যূষকালকে এগিয়ে নিয়ে আসছিল।

মনের ভেতর কংসের কারাগারের অন্ধকার—সে আলোয় সব অন্ধকার ঘুচল। রাসমণির মুক্তিস্নান হল !

কংসের দুই পত্নী। অস্তি আর প্রাপ্তি। কংসের ছিল 'আমি' ভাব। আমার অস্তিত্বকে জন্ম জন্মান্তরের জন্য প্রতিষ্ঠা দিতে অর্থাৎ লোভী অস্তিত্বকে আপন করে পেতে, চির জাগ্রত রাখতে কংস যেমন ছিল নিত্য ব্যাকুল, তেমনি আমরা, সাধারণ মানুষরা বিষয়, বিলাস, প্রাচুর্যকে চাইছি নিত্য। আর তা চাইছি বলেই মুক্তির পথ রুদ্ধ ! রাণীমা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি সেই অস্তি আর প্রাপ্তি ত্যাগের ভিতর দিয়ে আনন্দ-নিকেতনে যাবার বাসনায় নিত্য যে পথ প্রদর্শকের দয়া আর করুণা কামনা করেছিলেন, কামারপুকুরের শান্ত, নিবিড় গ্রামের এক চালাঘরের অঙ্গনে সেই পথ প্রদর্শকের আবির্ভাব হলো ! তিনি গদাধর ! তিনি রামকৃষ্ণ ! তিনিই পরম পিতা !

রাণী রাসমণির বয়স যখন চল্লিশের কোটা পেরিয়ে গেছে, রাণীমা যখন মধ্যাহ্ন গগন থেকেও অনেকটা ঢলে পড়েছেন, ঠিক তখন শ্রীরামকৃষ্ণের

আবির্ভাব। মায়ের সঙ্গে ছেলের বয়সের যে দূরত্ব, রাণী রাসমণির বয়সের সঙ্গে ঠাকুরের ঠিক ততটাই, দূরত্ব!

রাণীমা জানবাজারের বাড়িতে থেকে যখন মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে সংসার-ধর্ম পালন করেছিলেন, যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পররাজ্য লোভ খর্ব করার জন্য একের পর এক যুদ্ধে নেমে আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদা দিয়ে শ্বশুর আর স্বামীর স্মৃতিকে অমলিন রাখার জন্য দুর্বার হয়ে উঠছিলেন, তখন কামারপুকুরের প্রতি ঘর—প্রতি মন বালক গদাধরের দুরন্তপনার এক ছন্দময়, এক শুচি-স্নিগ্ধ পরশে মুগ্ধ, আবার শঙ্কিতও।

কৃষ্ণ রয়েছেন বৃন্দাবনে। তিনি লীলাসুন্দর! তাই দেখালেন কত রঙ্গ, কত রূপ। গদাধর রয়েছেন কামারপুকুরে। রাসমণি জানবাজারে। পথের দূরত্ব কোন বাধা নয়। প্রার্থনা চাই। প্রার্থনার ফললাভ কেমন—সেটাই এখন দেখবার!



মথুর কী বলতে চান! রাণীমা বললেন, আমার কাছে নয়—ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়—

মথুরামোহন গেলেন পুরোহিতের কাছে। উপস্থিত পুরোহিতরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করে যেই অনুমতি দিলেন, চোখের ইশারায়—অমনি মথুরামোহনের নির্দেশে বেজে উঠল ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টা। জানবাজারের বাড়িতে পুজায় আমন্ত্রিত হয়ে আত্মীয়-পরিজন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে পুরুষেরা কলাবৌ স্নান-এর মিছিলে যোগ দিলেন, মেয়ে-বৌরা তুলে নিলেন শঙ্খ। ধীরে ধীরে প্রাসাদ থেকে পথে নামল মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে পুরোহিত চললেন কলাবৌ-কে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। তখনও রাতের অন্ধকার ফ্যাকাশে হয় নি। আকাশে তারার চাঁদোয়া। সেদিনকার কলকাতার মানুষ শেষ রাতের হালকা ঘুমে অচেতন। নগরীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে গঙ্গার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে থাকল মিছিল।

জানবাজারে ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য ব্যারাক। সেখানেও

সবাই ঘুমে অচেতন। পরাধীন ভারতবাসীকে যারা কোম্পানীর ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারত না সেই ইংরেজ সরকারের বেতনভুক পিশাচ গোরাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল মেদিনীকম্পিত ৫০টি ঢাকের মিলিত নিনাদে। রাগে, উত্তেজনায় অস্থির কর্নেল উঠে বসল বিছানায়। ঢাক যত বাজে, কাঁসর-ঘণ্টা যত সেই বাজনার সঙ্গে তাল রেখে বাজতে থাকে, ততই গোরা সৈন্যদের রক্ত তপ্ত হতে থাকে। ক্ষিপ্ত কর্নেল নির্দেশ জারী করে, এখুনি তোমরা ঐ মিছিলের গতি রোধ কর। বন্ধ করতে বল ন্যাস্টি সাউণ্ড—

নির্দেশ পাওয়া মাত্র কয়েকজন গোরা সৈন্য ক্ষিপ্র গতিতে বেরিয়ে এলো পথে। মিছিলের গতি রোধ করল তারা। পুরোহিতদের পাশে ছিলেন মথুরামোহন। তিনি সচকিত। বিস্মিত সকলে। বাজনা থামল না। পঞ্চাশজন ঢাকী, পঞ্চাশজন কাঁসর বাজিয়ে তখনও জানে না মিছিলের পুরোভাগে কি ঘটছে। নির্দেশ আছে মিছিল যাওয়া, আসা এবং কলাবৌ স্নান করানোর মধ্যে ঢাকের বাদ্য থামবে না কোন মতে। পথ চলা থেমেছে বলে থামতে হয়েছে সকলকে, তা বলে বাজনা থামে নি। গোরা সৈন্যরা অত্যন্ত তীক্ষ্ন স্বরে বলল—ডোণ্ট-প্রসিড! দিস ইজ ইললিগ্যাল প্রসেশান! এই প্রসেশান ভাঙ্গতে হবে, বন্ধ করতে হবে আনহোলি সাউণ্ড—

মথুরামোহন বললেন, শোন, এটা হিন্দুদের বড় ফেস্টিভ্যাল। দুর্গাপুজা। দুর্গা যাচ্ছেন গঙ্গায় স্নান করতে, তোমাদের কথায় এ মিছিল বা বাজনা কোনটাই থামবে না—কথাটা শেষ করে মথুরামোহন ইঙ্গিত করলেন এগিয়ে যেতে। তীব্র স্রোতের মুখে পড়লে সব শক্তি ম্লান হয়ে যায়, তেমনি মিছিলের স্রোত যত এগোতে থাকে, ততই দৈহিক শক্তিতে মিছিলের গতিরোধ করার চেষ্টা চালাতে চালাতে সৈন্যরা পিছু হটতে থাকল! মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্যারাক থেকে হিংস্র কুকুরের মত ছুটে এলো কর্নেল। চলমান মিছিলের সামনে কর্নেলও পিছু হটতে হটতে বলল, তোমরা যদি না থাম, না বাজনা থামাও তাহলে আমি বাধ্য হব গুলি করতে!

মথুরামোহন থামলেন। হাত তুলে বাজনা থামাবার নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে বন্দুকধারী জনাকতক রক্ষীর একজনকে কি যেন ইশারায় বললেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে বাজপাখীর মত ছুটে, বলা যেতে পারে প্রায় উড়েই একজন রক্ষী চলে গেল। মথুর তাকে পরিস্থিতির কিভাবে মোকাবিলা করা হবে সেই মতামত রাণীমার কাছ থেকে জানবার জন্য পাঠালেন। অল্প সময়ের মধ্যে রক্ষী ফিরে এলো। চাপা স্বরে কি যেন বলল মথুরবাবুর কানে। মথুর বললেন, তুমি কর্নেল?—শোন, তোমরা যদি রাণী রাসমণির

এই পূজায় ব্যাঘাত ঘটাও তাহলে আমরাও প্রস্তুত আছি তার উত্তর দিতে! যদি গুলি চালাবার ভয় দেখাও, আমরাও গুলি চালাব! বলে চিৎকার করে বললেন,—রাণীমার হুকুম. মিছিল থামালে চলবে না—তোমরা বাজাও—

আবার ঢাক বাজল। আকাশ বিদীর্ণ হতে থাকল পঞ্চাশটি ঢাকের মিলিত নিনাদে। রাতের অন্ধকার ততক্ষণে অনেকটাই ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। কর্নেল ব্ল্যাংক ফায়ার করল। রক্ষীরা তৎক্ষণাৎ বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরল গোরাদের বুক লক্ষ্য করে। মথুর বাধা দিলেন। বাঁধ ভাংগা স্রোতের মত এগিয়ে গেল মিছিল। একজন গোরা লুটিয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। মিছিলের গতি সেই গোরার লুটিয়ে পড়া দেহের উপর দিয়ে গেল এগিয়ে। কর্নেল মিছিলের সামনে থেকে সরে গেল সদলবলে। এই প্রসেশানে গুলি চালানো বোধ হয় ঠিক হবে না—সেই কথা ভেবে কর্নেল জনা দশেক গোরাকে নিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পরাজয়ের গ্লানিতে শুধু ফুঁসতে থাকল।

সব শুনলেন রাণীমা। কিছুক্ষণ নীরব থেকে অত্যন্ত রাসভারী স্বরে বললেন, মথুর. এই ঘটনার পর ওরা নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। আমাদের সঙ্গে ইণ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা সব সময় যে ব্যবহার করে আসছে, আমার শ্বশুরমশায়ের জীবদ্দশায় ওরা যে দুর্ব্যবহার করেছে তা আমি ভুলি নি। তেমনি এও জানি ওরা যে কোন দিন, যে কোন সময়ে আমাদের ওপর একটা বড় ধরনের আঘাত হানবে। দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়—

রাণীমা কথা বলছিলেন, এমন সময় রামচন্দ্র এসে বললেন.—মা, পাশের পুলিশ ব্যারাক থেকে কয়েকজন পুলিশ এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, সঙ্গে আছে কোম্পানীর পেয়াদা—

রাসমণি বললেন, মথুর, বাবা তুমি দেখ, শোন ওরা কি বলতে চায়,—আমি এই চিকের আড়াল থেকে সব শুনবো, প্রয়োজনে আমি তোমাকে সাহায্য করবো—

মথুরামোহন সোজা এসে দাঁড়ালেন তাদের সামনে। পুলিশ বলল, আমরা কোম্পানীর পুলিশ ব্যারাক থেকে এসেছি, আমাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই তোমাদের জানাতে এসেছি—

মথুর বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের ভণিতা শোনার সময় নেই, বল কি বলতে চাও—

পুলিশ বলল, ভবিষ্যতে এই রাস্তা যদি শান্তভাবে তোমরা ব্যবহার না

কর, যদি এই রাস্তা দিয়ে তোমরা শান্তিভংগ হতে পারে এমন কোন প্রসেশান বার কর, যদি তোমাদের লোকেরা ঢাকের বাদ্যি বাজায় তা হলে, সরকার বাহাদুরের নির্দেশ, এই রাস্তা যাতে তোমরা ইউজ করতে না পার, পুলিশ তার ব্যবস্থা নেবে—

মথুরামোহন বললেন, কোম্পানী যদি এই মর্মে আমাদের কোন চিঠি দিয়ে থাকে তা আমাদের হাতে দিন। নোটিশ লিখিতভাবে এসেছে তা আমি দেখতেই পাচ্ছি, অথচ মুখে নোটিশের সারমর্ম আপনারা বলে যাচ্ছেন—তার অর্থ হল 'সরকারের নির্দেশ পালন করছেন চোখ রাঙিয়ে—কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, নোটিশ দিন—আমরা লিখিতভাবে তার উত্তর দেব—

চলমান একটা কেন্নর গায়ে স্পর্শ করলেই যেমন সে মুহূর্তে কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়, তেমনি অবস্থা হল সাহেব পুলিশদের চোখ-মুখের। সরকারের পেয়াদা একটা কাগজ তুলে দিল মথুরবাবুর হাতে। মথুরামোহন দরজার সামনে দাঁড়িয়েই একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সরকারী নির্দেশনামার ওপর। তারপর সাহেব পুলিশদের চোখের সামনেই রাগে উত্তেজনায় মথুরবাবু সেই চিঠি ছিঁড়লেন টুকরো টুকরো করে! ইংরেজ সরকারের পুলিশদের আভিজাত্যবোধে খোঁচা লাগল। তারাও উত্তেজিত স্বরে বলল, আপনি আমাদের ইনসাল্ট করলেন—

মথুরবাবু বললেন, তাই যদি মনে করেন আমার আপত্তি নেই—যা এতে লেখা আছে, আপনারা মুখে তা বলেছেন বলে এই চিঠি ঘরে রাখার কোন যুক্তি দেখি না—আদালত খোলা আছে, যদি মনে করেন নালিশ করতে পারেন! কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে মথুরবাবু মুখ ঘুরিয়ে চলে এলেন। তাঁর এই ব্যবহারে ক্ষিপ্ত পুলিশ সাহেবরা আপন মনেই বলে গেল, উই উইল টিচ্ হিম্ এ গুড লেসন—

মাত্র ক'দিনের মধ্যে আদালত থেকে সমন বেরুল রাণী রাসমণির নামে। রাণীমা জানতেন দেশের আদালতই হল প্রকৃত দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। আদালতের আলাদা একটা ভাবমূর্তি আছে! কোন অবস্থাতেই আদালতের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার অর্থ ঘোরতর অপরাধ। তাই রাণীমা মথুরা-মোহনকে ডেকে বললেন, পিছিয়ে যাব না, আমি মামলায় লড়বো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই সব মুখেরা দেখে যাক মামলা কাকে বলে—আমার রাস্তায় আমি দুর্গাপুজোর কলাবৌ স্নান করাতে নিয়ে যেতে পারব না, রথ টানতে পারব না, তা হয় না। হতে পারে না—

মামলায় একটা সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। রাণীমার নির্দেশে মথুরামোহন এবং আইনজ্ঞরা এই রাস্তা যে রাণী রাসমণির রাস্তা, সেই বিষয়ের যাবতীয় কাগজ পত্র আদালতে দাখিল করলেন। রাণীমা নিজে আইনজ্ঞদের সামনে বেরিয়ে এসে যে দলিল মেলে ধরলেন, তা দেখে সবাই বিস্মিত হলেন! আনন্দ-খুশির হিল্লোল বয়ে গেল। রাজচন্দ্র মারা যাবার আগেই গ্যারিসন অফিসারের মঞ্জুর করা এই দলিল, রাণীমাকে দিয়ে বলেছিলেন—সব পাকা ক'রে এলাম—। সেই দলিলের জোরে মোকদ্দমায় রাণীর জয় হল। আদালত অবশ্য কোম্পানী বা সরকারের যাতে ভাবমূর্তি বিনষ্ট না হয় তার জন্য সামান্য ৫০ টাকা জরিমানা করলেন। রাণীমা বললেন, আদালতের নির্দেশ মাথা পেতে বহন করব, তাই এই ৫০ টাকা জরিমানা দাও, সেই সঙ্গে পরবর্তী কাজের ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাবনা-চিন্তা আছে—

মথুরামোহন সেই জরিমানা দিলেন।

এরপরেই শুধু কলকাতাবাসীরাই চমকে উঠলেন তা নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টলে উঠল! সরকারী বেসরকারী সমস্ত যানবাহন থেমে গেল পথে। জানবাজারের বাড়ি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তার মালিক হলেন রাসমণি। সুতরাং কয়েকশত মানুষ কাজে লেগে গেল। জানবাজারের বাড়ির সীমানা থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত বড় রাস্তার দুধারে মুহূর্তের মধ্যে মাটি খুঁড়ে বসানো হল গরান কাঠের খুঁটি। তারকাঁটা দিয়ে বেড়া দেওয়ার কাজও শেষ হল। জনজীবন স্তব্ধ। সরকারের সব কাজ নষ্ট। কেঁপে উঠলেন সরকার! সরকারের কড়া নির্দেশ এলো মুহূর্তে—এই নির্দেশ পাওয়া মাত্র বেড়া খুলে দাও —

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল রাণীর আভিজাত্যের কথা। গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করলেন রাণীর সঙ্গে। অনেকে অনুরোধ জানাতে এসে আসল রহস্য উদ্ঘাটন করে ফিরে গেলেন। ইংরেজ সরকারের অপমান রাণীকে শুধু আঘাত করে নি, শ্বশুরের প্রতি ইংরেজদের সেই দুর্ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। স্বামী রাজচন্দ্রের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ যে বাবু রোড, সেই রোড দিয়ে বাবু রাজচন্দ্র দাসের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা বা রথ যেতে পারবে না —এই নির্দেশ স্বামীর সম্মানহানি করেছে। ইংরেজ সরকারের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে এ দেশের সবাই তাদের গোলাম, সুতরাং সুযোগ যখন এসেছে তখন তার সদ্ব্যবহার চান রাণীমা।

রাণীমা ডেকে পাঠালেন মথুরামোহনকে। উত্তেজনায় অধীর রাণীমা

পায়চারী করতে করতে রাসভারী কণ্ঠস্বরে বললেন, এই মুহূর্তে সরকারকে জানিয়ে দাও, আমার রাস্তায় যদি সরকারের কোন কাজ থাকে, তাহলে সরকারকে উচিত মূল্য দিতে হবে। উচিত মূল্য, সেই উচিত মূল্য কতটা তা যেন আলোচনায় স্থির করে নেয়। উচিত মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত আমি সরকারকে এই রাস্তা ব্যবহার করতে দেব না—কথাগুলো বলতে বলতে রাণীমা কেমন যেন হয়ে গেলেন। অনেকটা শান্ত অথচ চাপা উত্তেজনা নিয়ে বললেন, জানো বাবা মথুর, আমি যখন এ বাড়ির বৌ হয়ে এলাম, তখন একবার এই ইংরেজ সরকারের অত্যাচারী রূপ দেখেছিলাম। বেলেঘাটার জমি ওরা দখল নিতে চেয়েছিল, আমার শ্বশুরমশাই তা দিতে চান নি। শ্বশুরমশাই চেয়েছিলেন খাল কাটতে। খাল কাটলে মানুষের উপকারে লাগবে। সেদিন বাবা ছিলেন খুবই অসুস্থ। সরকারের লোকেরা সেই অসুস্থ মানুষটাকে যখন ক্ষিপ্ত করছিল, আমি ছিলাম পাশে। আমি ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করেছিলাম। ইংরেজ সরকার আমাকে অপমান করেছিল, বলেছিল তোমার মত একজন গ্রাম্য মেয়েমানুষের সংগে আমরা কথা বলতে চাই না—। এ দেশের নারী সমাজের প্রতি পুরুষের যে ব্যবহার, নারীদের প্রতি যে অত্যাচার, তা আমার শ্বশুরমশাইকে বড় আঘাত করেছিল বলে তিনি আমাকে যে মন্ত্র দিয়ে গেছেন, আজ আমি সেই মন্ত্রে আমার মনের দেবতার পূজা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি দেখিয়ে দিতে চাই, এ দেশের নারীরা যেমন অবলা, মায়ের জাত, তেমনি প্রয়োজন হলে মা চণ্ডীর রূপও ধারণ করতে পারে। আমি যতদিন বাঁচব, নারী-অবমাননা কিছুতেই সহ্য করবো না—। তুমি সরকারের নির্দেশের উত্তরে বলবে—এই নির্দেশ রাণী রাসমণির—যাকে তোমরা একদিন গ্রাম্য মেয়েমানুষ বলেছিলে -

এই ঘটনার কথা ধীরে ধীরে শহর ছাড়িয়ে রটে গেল গ্রামে-গঞ্জে। সবার মুখে সেদিন ধ্বনিত হল 'জয়, রাণীমার জয়'! সেদিন ইংরেজ সরকার অবনত মস্তকে রাণীর সেই জরিমানার টাকা ফেরত শুধু দিলেন না, লিখিত অনুরোধ জানালেন রাস্তার বেড়া খুলে নিতে।

দেশের লোকেদের মুখ বন্ধ করে তেমন সাধ্য কার আছে? কারও নেই। সেই সাধারণ মানুষরাই রাণীমার এই জয়ে মুখে মুখে ছড়া বেঁধে গেয়ে বেড়াল পাড়ায় পাড়ায় —

"অষ্ট ঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি।
রাস্তা বন্ধ কর্ত্তে পাল্লে না কোম্পানী ॥"

সরকার অবশ্য চুপ করে থাকলেন না। একটা আইন করা দরকার।

তা না হলে দেশের শান্তি ভঙ্গ হতে পারে। চাই কি রাণী রাসমণির মত কোন নারী, কেউটের মত ফণা তুলে আবার ছোবল বসাতে পারে! সরকারের নতুন নির্দেশ জারী হল। মথুরামোহন সেই খবর নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মায়ের পাশে।—মা শুনেছেন, সরকার বাহাদুর নতুন প্রথা চালু করেছে! রাসমণি বললেন, কী প্রথা?

মথুর বললেন, কোন শোভাযাত্রা কলকাতার কোন রাস্তায় বেরুতে পারবে না সরকারের কাছ থেকে পাশ না নিলে—

রাসমণি বললেন, দেশের শাসনভার যাদের ওপর থাকবে তাদের মান্য করা দরকার, তা না হলে দেশের অবস্থা ভাল হবে কেমন করে? আমি যা করেছি তা ওদের অত্যাচারী চরিত্রকে খর্ব করতে, কিন্তু একটা পাকা পোক্ত শাসন না থাকলে সব লোকই তো কলকাতাকে আর কলকাতা থাকতে দেবে না—

হচ্ছিল মহাপুজোর কথা।

এই সব ডামাডোলে পুজো কিন্তু বন্ধ হয়নি। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল পূর্ব বাংলার রাণী ভবানীর পুজার পর এই এক পুজা দেখল তারা। রাসমণির পুজা!

দশমীর পর আটদিন ধরে চলল আমোদ আহ্লাদ। এ শুধু সেই বছরেই নয়। প্রতি বছর। যতদিন রাণী বেঁচে ছিলেন। দাশরথির গান হল, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাও হল। শুধু আনন্দ। শুধু উৎসব। রঙ্-তামাশাও বাদ গেল না।

পদ্মমণি একান্তে রামচন্দ্রের কাছে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁগো, মায়ের পুজোয় কত খরচ হল?

রামচন্দ্র মুখ টিপে হেসে বললেন,—তা হলো বই কি! নিয়মিত বার্ষিক দিতে হল প্রায় বার হাজার টাকা, কাপড়-চোপড় কিনতে বাইশ-তেইশ হাজার টাকা,—তারপর ধর, প্রতিমার পুজোয় হাজার পনের, আর খাওয়া দাওয়া পনের-কুড়ি হাজার টাকার কম নয়। তা হলে সর্ব সমেত হাজার সত্তর টাকা ব্যয়। অবশ্য আমোদ আহ্লাদের বিষয় আমি হিসেবে ধরি নি। সে খবরও রাখি না। ওসব তো আবার তোমার পছন্দ নয়।

পদ্মমণি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বললে—হুঁ!

এবার মথুরামোহনকে ডেকে রাসমণি বললেন, মথুর, বাবা এবার তোমায়

একটি কাজ করতে হবে।

মথুর সবিনয়ে বললেন, আজ্ঞা করুন মা।

রাণী বললেন - কলকাতার সম্ভ্রান্ত সাহেবদের তুমি নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এস যাঁরা তোমার শ্বশুরমশাই-এর বন্ধু স্থানীয় ছিলেন তাঁদেরও। আর এই উপলক্ষে একটি ভোজের ব্যবস্থা কর।

মথুর রাসমণির তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় অবাক হয়ে গেলেন। এখন সকলে রাণীকে চিনেছে। এখন আর কেউ বাবু রাজচন্দ্রের স্ত্রী বলে না, বলে জানবাজারের রাণী রাসমণি! এই তো উপযুক্ত সময় নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করার। বিশেষতঃ সেই দুর্গাপুজোর ঘটনার পর থেকে ইংরেজ সম্প্রদায় রাণীকে সম্ভ্রমের চোখে দেখছে! সমীহ করছে!

মথুর বললেন—যে আজ্ঞা!

সাজান হল জানবাজারের প্রাসাদ। ঝলমল করে উঠল সাত মহলা রাসমণি-কুঠি। মথুর নিজে সব ব্যবস্থা করলেন। অতিথি-অভ্যাগত সাহেব-মেম মুগ্ধ হলেন আপ্যায়ণে। বিস্মিত হলেন প্রাসাদ ঘুরে দেখে। বললেন সকলে একবাক্যে.—Our eyes never met such a gorgeous, pompous extraordinary occasion like this.

রঘুনাথের পায়ের কাছে বসে রাসমণির চোখে একবিন্দু অশ্রু টলমল করে উঠল। রাজচন্দ্রের উদ্দেশে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে শক্তি চাইলেন রাণী। অস্ফুটে বললেন, তোমার রাণী তোমার সুনাম রাখতে পেরেছে—তুমি আমায় আশীর্বাদ কর।

কেউ জানল না সেকথা! মথুরামোহনও নয়!



তর্কের শেষ নেই।

তর্ক হল ইঁটের পাজা। ইঁটের ওপর ইঁট সাজিয়েই ইমারৎ হয়। তেমনি কথার ওপর কথা চাপিয়ে, যুক্তির গায়ে যুক্তি লাগিয়ে, অবিশ্বাসে

আর বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে তর্ক হয়। নিজের নিজের বিশ্বাস আর বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তর্ক হয়। কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসী, কেউ নাস্তিক। যিনি ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করেন, তাঁকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসীরা মেনে নিতে পারে না। আর এই বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে নিত্য চলে ঈশ্বর সন্ধান। যাঁরা ঈশ্বর সন্ধান করেন না, দেবতার নাম গানের অমৃত রসসুধা পান করেন না, তাঁরা মন্দিরের বিগ্রহের পরিবর্তে গণদেবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেই ঈশ্বরপূজার স্বাদ নেন। এ এক তত্ত্ব। সর্ব তত্ত্বের সার বস্তু কিন্তু সর্ব মানুষের অন্তরে সযত্নে রক্ষিত, তা হল জিজ্ঞাসা!

গুরুদেব বলেছিলেন, একটা ব্যাপার আছে যাকে তুমি পরম সত্য জেন। দেখ রাণীমা, আসলে তুমি যাদের কাছ থেকে জগন্নাথদেব দর্শনে যাবার অনুমতি ভিক্ষা করছ তারা মানে আমরা কেউ না! আমরা কেউই বাসনা করলে, তীর্থে যেতে পারি না মা! তাঁর বাসনা হয়েছে তোমাকে দেখার তাই তিনি ডাক দিয়েছেন, সেই ডাকই তোমার অন্তরে বাসনা হিসেবে স্পষ্ট হয়েছে! এই ডাক না পেলে কেউ কোন তীর্থে যেতে পারে না। এই বাসনা তোমার মনে যুগিয়েছেন সেই অন্তর্যামী। তোমার শুভযাত্রার দিনক্ষণও তিনিই প্রস্তুত করে রেখেছেন। পথে আসা যাওয়ার মধ্যে যা কিছু শুভাশুভ তাও তিনি স্থির করেই রেখেছেন। তুমি তো যাবেই মা! তুমি পুণ্যবতী , অনন্ত সলিলা পবিত্র গঙ্গার গতি-ধারা যেমন মানুষের পক্ষে রোধ করা সম্ভব নয়, তেমনি তোমারও অন্তর সলিল থেকে যে বাসনার জন্ম তাকে রোধ করবে কে!—

পুরীধামে যাত্রার দিনক্ষণ স্থির করে, ও'রা চলে গেলেন। যাবার আগে রাণীমা গলায় আঁচল জড়িয়ে ও'দের পদযুগলে মাথা রেখে প্রণাম জানালেন। প্রণাম সেরে, দুটি পাত্রে রূপোর টাকা ভর্তি করে প্রণামী দিলেন রাণীমা। গুরুদেব আর পুরোহিত আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

১৮৫০ সাল। শুভদিনে-শুভক্ষণে আত্মীয়-কুটুম্ব, দাস-দাসী-দেহরক্ষী সকলকে নিয়ে, জামাই মথুরামোহনের পূর্ব আয়োজন মত, একাধিক সুসজ্জিত বজরায় রাণীমা নীলাচলে যাত্রা করলেন। এ প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সাঁতরা যে বিবরণ রেখে গেছেন এখানে তারই পুনরুল্লেখ করছি—

"...গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া সাগর সঙ্গমের মুখে আসিয়া উপনীত হইলে রাণী বলেন—'শীঘ্র শীঘ্র বাহিয়া যাও, সময় অল্প, বক্‌সিস পাইবে।' কর্ণধার উৎসাহে উৎসাহে যাইতে লাগিল। এমন সময় অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত; একে ত অনন্ত জলরাশির অনন্ত উচ্ছ্বাস, কুল-কিনারা

নাই, নিকটে আশ্রয় নাই, তাহার উপর এই দুর্যোগ। তীরে নৌকা লাগানো হইল. আরও ৩/৪ খানি নৌকা পশ্চাতে পড়িয়া আছে। মাত্র একটি দাসী আর দুইটি দ্বারবান সহিত রাণী একটু চিন্তিতা হইলেন। মনে মনে বলিলেন, —'মা জাহ্নবী, আমার অদৃষ্টে কি জগদীশ দর্শন হইবে না, তোমারই শান্ত কোলে কি আজ আমার স্থান হইবে?' ঝড়ের ভীষণ বেগে নৌকা মগ্নপ্রায় হইল, রাণী নৌকা হইতে নামিয়া আশ্রয় অন্বেষণে ব্যস্তমনে ইতস্ততঃ চাহিলেন। দূরে একটি কুটির দেখা গেল। রাণী দাসী সঙ্গে লইয়া উহাতেই আশ্রয় লইলেন। উহা এক ব্রাহ্মণ পরিবারের পর্ণকুটির মাত্র। পরিচয় গোপন করিয়া রাত্রে তথায় বাস করিলেন। দুর্যোগের কালরাত্রি তথায় শেষ হইল। রাণী ১০০্ টাকা ব্রাহ্মণ পরিবারকে প্রণামী দিয়া পুনশ্চ নৌকারোহণে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। সুবর্ণরেখার পর পারে যাইয়া দেখেন যে, পুরী গমনাগমনের ভাল রাস্তা নাই।…"

আবার থামলেন রাণীমা। প্রতিদিন চার ক্রোশ পথ যিনি নৌকা যোগে অতিক্রম করছিলেন তাঁর দেহমনে তখনও বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ নেই। কিন্তু নদী পথের পর যখন পায়ে চলা পথে যাবার সময় এলো তখনই রাণীমার মনে ভাবনার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি সদলবলে নৌকায় কিছু কাল কাটিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যত অর্থ লাগুক, যত লোক শক্তির প্রয়োজন হোক, এখান থেকে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তৈরী করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে একটি নৌকার মুখ ঘুরলো! রাণীমা দারোয়ান সঙ্গে দিয়ে একজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে দিলেন জানবাজারে। বললেন, দ্রুত যাবে, মথুরাবাবাজীবনকে বলবে এখান থেকে পুরী পর্যন্ত একটা প্রশস্ত পথ যেন সে তৈরী করে সর্বশক্তির বিনিময়ে। আরও বলবে, রাণীমা জলপথে যত বিপদই আসুক, সব কিছুকে উপেক্ষা করে রঘুনাথের করুণা নিয়ে পুরী যাচ্ছেন। ফিরবেন তাঁরই তৈরী নতুন পথ দিয়ে।—

রাণীমার আদেশ শিরোধার্য করে সংবাদ বাহক পৌঁছল জানবাজারে। আর রাণীমা জগন্নাথ দেবকে স্মরণ করে, মনে মনে রঘুনাথের কৃপা ভিক্ষা করে যাত্রা করলেন পুরীর পথে! নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে রাণীমা অবশেষে পৌঁছে গেলেন পুরীধামে।

পুরীধামে পৌঁছেই রাণীমা চাইলেন মনের বাসনাকে পূর্ণ করতে। পুরীর মন্দিরের কর্মকর্তা, পুরোহিত আর পাণ্ডাদের সঙ্গে আলোচনা করে অন্তরের পূজা অর্ঘ্য প্রদানের আয়োজন করলেন।—

সকলের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা, কী বাসনা পূর্ণ করতে চান রাণীমা?—

রাণীমার ইচ্ছা, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন দেব ও দেবীর মূর্তিতে পরাবেন স্বর্ণালংকার! অলংকার সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন রাণীমা। মণি-মুক্তা-হীরক খচিত তিনটি অতি মূল্যবান মুকুট গড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি! সেই তিনটি মুকুট সাড়ম্বরে পরানো হলো এক শুভক্ষণে। এই তিনটি মুকুটের মূল্য ছিল ষাট হাজার টাকা।

রাণীমার পরবর্তী বাসনা? বাসনা তো অনেক, কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ কি সব বাসনা মেটাতে পারে? পারে না। আর তা না পারার আলাদা একটা যন্ত্রণা থাকে। রাণীমার সেই যন্ত্রণা ছিল। তাঁর যতবারই একটি করে বাসনা পূর্ণ হয় ততবারই মনে হয় সব অপূরণ থেকে গেল। সঙ্গে যে আত্মীয়-কুটুম্বরা ছিল এমন কি দাস-দাসী, তাদের সবার কাছে রাণী ছুটে যান আর বলেন, এ আমার কী হলো বলতো? মনে হচ্ছে দেবতার পুজো আমি ষোলআনা করতে পারলাম না—, কেমন করে, কী দিয়ে পুজো করলে প্রকৃত পুজো হয় তাও জানি না—

সহসা রাণীমার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল প্রশান্তির রেখা। পথ হারাবার পর যদি কেউ পথের সন্ধান পায় তখন তার মনের অবস্থা যেমন দাঁড়ায় তেমনি। রাণীমা সকলকে ডেকে বললেন, দীন-দরিদ্রের মুখে আমি অন্ন তুলে দিতে চাই! যত রকম ভাল খাদ্য আছে প্রস্তুত করুন, আমি নরনারায়ণের পুজো করবো—

তাই হলো! নরনারায়ণকে খাওয়ানো তো নয়, যেন এ আর এক রাজসূয় যজ্ঞ!

ভাণ্ডারার পর রাণীমার গৃহপ্রত্যাবর্তন! শুভ যাত্রার আগে রাণীমা একদিন মিলিত হলেন মন্দিরের পাণ্ডাদের সঙ্গে। নগদ এক হাজার টাকা প্রণামী দিলেন সব পাণ্ডাদের উদ্দেশে। তীর্থযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটল, এবার ফেরার পালা।

শুভ যাত্রার আগের দিন খবর এলো রাণীমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে। সুবর্ণরেখার কাছ থেকে যত পথ চলার অযোগ্য ছিল, মায়ের আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে মথুরামোহন বহু লোক লাগিয়ে, বহু অর্থ ব্যয় করে, সেই পথ তৈরীর কাজ সমাপ্ত করেছেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন রাণীমা!

সেই বাঁধানো নতুন পথ দিয়ে, নিজের তৈরী পথ দিয়ে, রাণী রাসমণি ফিরে এলেন জানবাজারে।

*　　　*　　　*

সেদিন এক অভিনব পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন এ বাড়ির পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য।

বাড়ির মেয়েরা, বিশেষ করে রাণীমার মেয়ে আর নাতি-নাতনিরা উমাচরণকে মধ্যমণি করে নিজেরা ঘিরে বসলো চারদিকে।

এ যেন নৈবেদ্য সাজানো। পাঁচটি ছোট আর মাঝে মন্দিরের চূড়োর মত আতপ চালের সাজান নৈবেদ্য।

পুরোহিত মশায়ের ভাবনা গেল বেড়ে! এমনটি কোনদিন হয়নি এ বাড়িতে। রাণীমা যদিও জানতেন পুরোহিত উমাচরণের সঙ্গে তাঁর মেয়েদের মাঝে মাঝে এমনতর বৈঠক হয়। আসলে উমাচরণ একদিকে বৃদ্ধ, অন্যদিকে পুরোহিত হয়েও বড় রসিকজন। দাদুর সঙ্গে নাতি-নাতনিরা, মেয়ে-বৌরা গল্প করতে বসলে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছিল সেদিন!

উমাচরণ বললেন, আবর তোমরা আমাকে এমন করে বসাচ্ছ, ফল-মিষ্টান্ন দিয়ে সেবা করছ, নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।—তবে হ্যাঁ, এবার কিন্তু আমি একমাত্র ফল-মিষ্টান্ন সেবনের প্রয়োজনের জন্য যতটা মুখ খুলতে হয় ততটা খুলবো. তোমাদের কোন কথার উত্তর দেব না—

পদ্মমণি বলল, কেন, আমরা কী দোষ করেছি?

উমাচরণ বললেন, দোষ! তোমরা যে মায়ের মেয়ে তাতে দোষ কি তোমাদের দ্বারা হবে? হবে না। মানুষের একটি পাত্র, সেই পাত্রেই থাকে দোষ আর গুণ। কিন্তু রাণীমার পাত্রে শুধু গুণ আর গুণ! আসলে ভয়টা কোথায় জান? তোমরা সেবার বলেছিলে, ঠাকুর মশায়, মায়ের মনটা ক'দিন যাবৎ উচাটন দেখছি কেন? আমি বলেছিলাম, জানি, কিন্তু বলবো না। রাণীমার আদেশ! অনেক বছর আগে যখন কর্তামশাই বেঁচে ছিলেন. তখন একদিন কি যেন কি একটা কারণে আমি রাণীমা আর কর্তামশাইকে বলেছিলাম. মনবাসনা যা হবে তা সিদ্ধ করার জন্য সকল কর্ম করবেন. কিন্তু পূর্বে কোন ক্ষেত্রে জানান দেবেন না। মনের কথা জানান দিলে. জাহির করে বেড়ালে অনেক সময় কার্যসিদ্ধ হয় না। সেই আমিই আবার তোমাদের পীড়াপীড়িতে রাণীমা যে পুরীধামে তীর্থ করতে যাবেন—তা আগেভাগে বলে দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় এই বলে দেবার দরুন যাত্রাপথে নদীতে ঝড় উঠেছিল। রাণীমার পুরীধামে যাওয়া হতনা, যদি না উনি জগন্নাথ-দেবের ডাক পেতেন। উনি পুণ্যবতী নারী. তাই যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা হয়নি! একবার মনস্থির করেছিলাম কালীঘাটে

যাব, দশ বিশজনকে নিয়ে হাঁটাপথে যেতে হবে বলে গোটা পল্লীতে ছড়িয়ে বেড়িয়েছিলাম সে কথা ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হয়নি ! আজ তোমাদের মতলব আমি বুঝেছি, তোমরা জানতে চাও, রাণীমা এ বছরে আর কোথাও যাবার সংকল্প করেছেন কিনা, কিন্তু আমি জানলেও বলবো না ! এ বছরে একটা নয় একের অধিক জায়গায় যাবার সংকল্প নিয়েছেন. এইটুকু বলতে পারি ! প্রথমে এই আর দিন কতকের মধ্যে রাণীমা যাবেন গঙ্গাসাগর। ওখান থেকে ফিরে উনি সোজা চলে যাবেন ত্রিবেণী. ওখানে উত্তরায়ণে স্নান করার বাসনা হয়েছে,—

কথাগুলি বলছিলেন আর সবাই গোল হয়ে বসে ঠাকুর মশায়ের সেই বলার ভঙ্গিমা মুগ্ধ চিত্তে দেখছিল। মনে মনে উপভোগ করছিল।

পুরোহিত উমাচরণ মুখে যত বলেন কিছু বলবো না, ততই তিনি গড়গড় করে সব বলতে থাকেন। শ্রোতারা ভিতরে ভিতরে ভীষণ খুশি হচ্ছিল, সবার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠছিল, কিন্তু প্রকাশ করছিল না। উমাচরণ যখন নিজেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন জিভ কেটে লজ্জা প্রকাশ করলেন, অমনি সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল। যেন জানলা খুলতেই মুঠো মুঠো রোদ এসে আছড়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

ঠিক তখনই রাণীমার আবির্ভাব। এই অপরূপ দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি যতটা খুশি হলেন, তৃপ্তি পেলেন, ততটাই থাকলেন রাসভারী হয়ে। শুধু একবার পুরোহিত মশায়ের দিকে চোখ রেখে, অতি নম্র প্রশান্ত স্বরে বললেন, বেলা অনেক হলো—যদি কিছু মনে না করেন তা হলে একটা কথা নিবেদন করি, আপনার যাবার আয়োজন করা হয়েছে, ঠান্ডায় ঠান্ডায় ঘরে ফিরে যান। ঠাকুর মশায় বললেন, ওঃ বেলা গড়াল বুঝি ! বলেই একটু গম্ভীর স্বরে বললেন, রাণীমা বেলা যে গড়ালো তা জানি, তবুও মনটা কেন যেন সকাল বেলাতেই থেকে গেছে। বিশেষতঃ এদের পেলে—আশে পাশে বসে থাকা সকলকে দেখালেন তিনি। সেই সঙ্গে উমাচরণ একটা দীর্ঘ শুকনো নিশ্বাস ফেললেন ! ওঁর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল ভিতরের চাপা ব্যথার কিছু রেখা।

রাণীমা বুঝেছিলেন। রাণীমা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন ! আসলে নিঃসন্তান, অতিসাধারণ এই ব্রাহ্মণ মানুষটি সারাজীবন ধরে দেবতার জন্য নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর জন্য কোন নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখেননি ! রাণীমা বুঝেছিলেন, উমাচরণের মন চাইছে না, এই পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে। চলে গেলেই, এ বাড়ির বাইরে-এমন কি

তাঁর এক ফালি সংসারের সর্বত্রই শুধু একরাশ একাকিত্বের যন্ত্রণা।— রাসমণি বললেন, তবে বসুন আপনি। আমি যাই। রাণীমা প্রণাম করলেন। উমাচরণ আশীর্বাদ জানালেন।

১২৫৮ সন।

রাণীমা গেলেন গঙ্গাসাগর! তীর্থে যাওয়া তো নয় যেন যুদ্ধ যাত্রা। যুদ্ধে যাবার আগে রাজা-মহারাজাদের যেমন সাজ সাজ রব শোনা যায়, যেমন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, চোখে-মুখে-মনে যেমন হিংসা-প্রতিহিংসার প্রকাশ প্রকট হয়ে থাকে, রাণীমার তীর্থযাত্রায় তেমনি রাজকীয় শোভা থাকে, আর থাকে তীর্থদর্শনের আনন্দ। নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে যাবার, ঘর ছাড়ার খুশি!

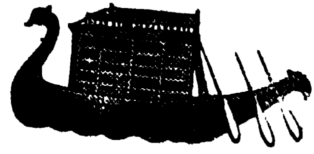
এবারও রাণীমা সঙ্গে নিলেন দাসদাসী, দেহরক্ষী, আর আত্মীয়-স্বজন! তখন বড় দুর্গম ছিল গঙ্গাসাগরের পথ। কথাতেই আছে—'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার।' নৌকাযোগে সরাসরি যেতে হত। পথে ছিল দুর্বৃত্তের ভয়! তাই এত প্রস্তুতি। এত রক্ষী বাহিনী। ঈশ্বর ইচ্ছায় রাণীকে কোন বিপদে পড়তে হল না।

যাঁরা সঙ্গে গিয়েছিলেন সাগরে স্নান করে পাপ খণ্ডন করতে, তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধারা ঘরে ফেরার সময় রাণীমার পায়ে হাত দিয়ে, পদধূলি নিতে গেলে রাণীমা পাপের ভয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আপনারা আমার পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? আমার পাপ হবে—

বৃদ্ধারা প্রায় মিলিত কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনি তো আমাদের মত না, আপনি হলেন দীন-আতুরের মা, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে না নিতেন ইহজীবনে আর গঙ্গাসাগরে যাওয়া হতো না! আপনি গরীবের মা-বাপ, আপনাকে পেন্নাম করলে গঙ্গাসাগরের পুণ্যি মরণের পর পর্যন্ত সঙ্গে যাবে

রাণীমা বলেছিলেন, এ সব কথা আপনাদের শেখালো কে? আমার সঙ্গে আপনাদের কোন প্রভেদ নেই। আমিও মানুষ, আপনারাও মানুষ।

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন রাসমণির মুখের দিকে। যাবার আগে শুধু তাঁরা বলেছিলেন—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন মা—।



'বিদ্যাভ্যাস, সুবিচার, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্য্য, জিতেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় উত্তম কর্ম্ম দ্বারা জীব দুঃখসাগর হতে উত্তীর্ণ হন, সেই সমস্ত কর্ম্মকে তীর্থ বলে।'* তীর্থে গেলাম, 'লোকে জানল—আহা, কতই না পুণ্য! নইলে তীর্থযাত্রার ভাগ্য হয়? কিন্তু সারা জীবনের পাপাচারের ক্লেদ, লোভের কালিমা, আসক্তির গ্লানি তীর্থযাত্রায়, দেবদর্শনে মোচন হয় না। মনের মুক্তি না হলে আনন্দের স্ফূর্তি আসে না। আর এই আনন্দ পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুতি নিতে হয়, তৈরি করতে হয়।

বাড়ি তৈরি করার আগে ভিতটাকে হতে হবে পাকাপোক্ত। ভিত যদি নিচু হয়—সে বাড়ি ভাল করে দাঁড়ায় না।

রাণীর মন অস্থির। সেখানে অনেক ভাবনা, অনেক চিন্তার ওঠাপড়া। জানবাজারের বিষয়কর্মে মন বসে না। কেবলই যেন মন ছুটে যেতে চায় এখানে-ওখানে। ভাল লাগে না কিছুই।

সেই ১৮৫১। গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে উত্তরায়ণে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করে রাণীমা এখন চলেছেন নবদ্বীপে।

এর আগেও নবদ্বীপে গেছেন রাণী কয়েকবারই। স্বামীর সঙ্গে এসে স্নান করেছেন! দেব-দর্শন করেছেন! বড় ভাল লাগে রাসমণির। বাংলার বৃন্দাবন—নবদ্বীপধাম।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন:

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই॥
নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে॥

বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—এই সব জ্ঞানী

* দয়ানন্দ সরস্বতী। ইনি ছিলেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা নবদ্বীপকে ভারতবর্ষে বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

বাসন্তী সন্ধ্যার এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এখানেই জন্ম হয়েছিল প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের। বৈষ্ণব ও তন্ত্র সাধনার এমন সহাবস্থান—নবদ্বীপধামের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ইতিহাস যাই বলুক, আজও এই স্থানের মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি।

সেই নবদ্বীপে আবার এলেন রাসমণি।

মন্দির দর্শন হলো। মন ভরে গেল রাণীমার।

সেই সময়ে চন্দ্রগ্রহণ। রাণীমা স্নান করলেন গঙ্গায়। তারপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ভোজন করালেন,— দান-দক্ষিণা দিলেন যথারীতি।

১২৫৭, ৩০ মাঘ ; ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫১। 'সংবাদ ভাস্করে' একটি পত্র প্রকাশিত হলো।

"…আমি কলিকাতার জানবাজার নিবাসী ৺বাবু রাজচন্দ্র রায়ের* গুণবতী ভার্য্যা সুশীলা শ্রীমতী রাসমণী দাসীকে তাঁহার বদান্যতার বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক বিপুল ধন্যবাদ দিয়া নিবেদন জানাইতেছি যে গত চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে প্রাগুক্তা শ্রীমতী নবদ্বীপে উপস্থিতা ছিলেন, গ্রহণকালীন ৺সুরধুনীতটে ৪০০০ চারি সহস্র তঙ্কা নগদ ও প্রায় পাঁচশত খানা রক্তবর্ণ বনাত উৎসর্গ করিয়া নবদ্বীপ নিবাসী ছোট বড় প্রত্যেক পণ্ডিতগণকে ঐ মুদ্রা ও বনাত বিতরণ করিয়াছেন ও প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীরাম শিরোমণি ও মাধব তর্ক সিদ্ধান্ত ও গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ও লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও কৃষ্ণচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতিকে ৫০ পঞ্চাশ পঞ্চাশ তঙ্কা নগদ ও একখান ২ বনাত প্রদান করিয়াছেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা ঐ দান বিশেষ সন্তুষ্টতার সহিত গ্রহণপূর্ব্বক পুণ্যবতী শ্রীমতী রাসমণী দাসীকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, কেবল ৺দেবী তর্কালঙ্কারের পৌত্র শ্রীযুত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীমতীর দান গ্রহণ করেন নাই।…

কস্যাচিন্নবদ্বীপনিবাসি অযাচক বিপ্রস্য।"

রাণীর জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছিল নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস। শুধু নবদ্বীপই বা কেন। বাংলার ঘরে ঘরে তখন তাঁর দান-ধর্মাচরণের প্রশস্তি!

সাতদিন ছিলেন রাসমণি নবদ্বীপে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছাড়াও ব্রাহ্মণদের বস্ত্রদান, পাঁচটি করে টাকা ও একটি নূতন কলসি দান করেন। এছাড়া

* 'রায়' উপাধি।

তাম্র-রৌপ্যমুদ্রা, পাঁচ'ছ হাজার টাকার চাল-ডাল, মিষ্টান্ন এসব বিতরণেও তাঁর কোন কার্পণ্য ছিল না। এ বাবদ অর্থ ব্যয় হয়েছিল প্রায় বিশ হাজার টাকা।

জানবাজারে ফিরছেন রাসমণি।

নবদ্বীপ থেকে অগ্রদীপ। সেখান থেকে কলকাতার পথ।

চতুর্দিকে ঘোর জঙ্গল। চন্দননগরের কাছে গৌরহাটির (গোরহাট) জঙ্গলের পাশে রাণীর নৌকার গতি রুদ্ধ হল। রাণীর সঙ্গে রক্ষী, সশস্ত্র। বন্দুকের শব্দ, কাতর আর্তনাদ—শুনে রাণী বাইরে এলেন। নিরস্ত্র করলেন নিজের রক্ষীদের।

সেই ঘোর অন্ধকারের দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন.—কে তোমরা? কি চাও?

ডাকাতদের একজন এগিয়ে এল সামনে। জানাল—তারা দস্যু। রক্ত দর্শনে তাদের কোন অনীহা নেই। কিন্তু সে জন্য তারা আসে নি। শুনেছে তারা রাণীমার কথা। টাকার প্রয়োজন—টাকাই চাই তাদের।

রাণী বললেন, তীর্থ করে ফিরছি। আমার কাছে তো নগদ টাকা নেই বাবারা। আমার গলায় একটি হার আর পুজোর এই রুপোর সামগ্রী আছে। এগুলো তোমরা নিতে পার। কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের অঙ্গস্পর্শ করবে না।

অল্পক্ষণ কি ভাবলেন রাণীমা। আবার প্রশ্ন করলেন, ক'জন আছ তোমরা?

উত্তর হলো বারজন।

রাণী বললেন, আগামীকাল আমি এই সময়ে তোমাদের বার হাজার টাকা পাঠিয়ে দিতে পারি—যদি তোমরা সম্মত হও, আর আমার কথা বিশ্বাস কর। একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের। আর কথা দিতে হবে নিরীহ লোকদের ওপর এ অত্যাচার তোমরা বন্ধ করবে!

পথ ছেড়ে দিল ডাকাতরা।

জানবাজারে ফিরেই রাসমণি এক হাজার করে বারটি তোড়া লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ডাকাতদের কাছে।

উত্তরকালে জয়রামবাটি থেকে সারদা-মা আসছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। স্বামীর কাছে।

পথে ডাকাতের হাতে পড়তে হয়েছিল তাঁকেও। মায়ের সান্নিধ্যে সে

আর দস্যুবৃত্তি করেনি—অন্য মানুষে রূপান্তরীত হয়েছিল।

কিসের জোরে? বিশ্বাস আর ভক্তির জোরে।

রাসমণির কথা বিশ্বাস করেছিল যে দস্যুরা তারাও কি পরিবর্তিত হয়েছিল দেহে-মনে? হিংসা ভুলে তারাও কি এই অমৃতময়ীর সান্নিধ্যে এসে নিজেদের ধন্য মনে করেনি?

হালিশহর, কাঞ্চনপল্লী, হাজিনগর, নৈহাটি, হুগলী, বংশবাটি, বন্দেল (ব্যাণ্ডেল), বালি এবং বহু জায়গা থেকে লোক এসেছে কোনায়। মাতৃদর্শনে।

মা এসেছেন যেন বাপের ঘরে বৎসরান্তে। কোনা-গাঁয়ের হরেকৃষ্ণ দাসের ভিটের বেদীমূলে আজ মাতৃদর্শন। রাসমণিকে দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়েছে।

শাশুড়ি যোগমায়া মারা যাবার পর রাসমণি পিসীমা ক্ষেমংকরীকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষেমংকরী রাজি হননি। জামাই-এর ঘর? হোক্ না সে রাজপ্রাসাদ। এ তো বাপের ভিটে তবু!

ক্ষেমংকরীও চলে গেছেন অমৃতলোকে। রামচন্দ্র আর গোবিন্দ দুই ভাইকেই নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন রাণী তারা থাকে জানবাজারে. কলকাতায়।

বছর বছর খাজনার টাকা পাঠান রাণী। জমিটুকুই আছে কেবল। ভিটের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

তাই ক'দিন আগেই লোক পাঠিয়েছিলেন রাসমণি। তারা এসে আগাছা সরিয়ে, মাটি কুপিয়ে অস্থায়ী ঘর বেঁধেছে রাণীর থাকার। আর সেই সঙ্গে গোটা গাঁ আর আশপাশের সবাই জেনেছে রাণীর আসার কথা।

রাণী এসেছেন। লোকের ঢল নেমেছে।

রাসমণির চোখে জল। মনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের স্মৃতি। মা-বাবার কথা, পিসিমার কথা, সবার কথাই মনে পড়ছে একে একে।

এই তো জীবনের ধর্ম। মায়া-মোহ, দুঃখ-সুখ মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এও ঈশ্বরের লীলা। তাই শচীমার জন্য সর্বত্যাগী চৈতন্যের চোখেও জল পড়ে। মথুরায় যেতে গোপসখা-সখীদের জন্য কেঁদে ওঠেন যশোদাদুলাল।

দেখা হল বহু পরিচিত মানুষের সঙ্গে। ছোটবেলার খেলার সাথী অনেকের সঙ্গেই। দূর থেকে দেখছিল যারা, রাণী কাছে টানলেন তাদের।

বিভেদ ঘ্ুচিয়ে দিলেন। অর্থ, কৌলিন্যের বিভেদ। রাণী আজ কত বড়! কত নাম-যশ তাঁর! কত প্রতিপত্তি! এই ছোট-বড় ভেদেই তো যত অনর্থ।

রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন "মানুষের ভিতর 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি' এই দুই রকম 'আমি' আছে। অহংকারী আমি কাঁচা আমি। এ আমি মহাশত্রু। ইহাকে সংহার করা চাই। মুক্তি হবে কবে, অহং যাবে যবে।..." রাসমণি সকলকে কাছে টানলেন, সকলের কথা শুনলেন। আহার্য দিলেন, অর্থ দিলেন, বস্ত্র দিলেন। দরিদ্রকে ঋণমুক্ত করলেন, বিবাহের যৌতুকের বন্দোবস্ত করলেন, যারা অক্ষম, অশক্ত তাদেরও অর্থ সাহায্য করলেন।

কয়েকজন প্রাচীন মানুষ এলেন রাণীর কাছে। অনুরোধ করলেন— গঙ্গার ঘাটটি জীর্ণ-একটা কিছু করা দরকার। রাণী পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন ঘাটের সংস্কারে আর ঘাটের ওপর প্রস্তর ফলকে মা 'রামপ্রিয়া'র নাম যাতে লেখা হয় সে ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করলেন।

সকলের অনুরোধে এই সময়েই হুগলী আর বাবুগঞ্জেও একটি করে স্নানঘাট তৈরির নির্দেশ দেন রাসমণি।

তিন রাত কোনা-গাঁয়ে কাটালেন রাসমণি।

ত্রি-রাত্রি না কাটালে নাকি তীর্থদর্শনের পুণ্য হয় না। জন্মভূমি মহাতীর্থ। সেই তীর্থের ধূলি মাথায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন রাসমণি।

পাকা ভিত প্রস্তুত হল। এবার শুধু গড়ে ওঠার অপেক্ষা!



রাণীমা কোথায়?

জানবাজারের বাড়ির সামনে জনতার ভীড়। একজন, দুজন বা দশ জন নয়, সংখ্যায় প্রায় শ'খানেক লোক! কারো বা নেংটী পরা-গায়ে গামছা, কারও বা লুঙ্গির সঙ্গে গেঞ্জি গায়ে। কারও হাতে মাছ ধরার জাল, কারও

হাতে লাঠি! রোদে পোড়া, জলে ভেজা কালো-কালো মানুষ। কারো মাথায় ন্যাকড়ার ফেটি বাঁধা, কারও আবার হাতে-পায়ে দগদগে ক্ষত! কারও চুলগুলো যেন কাকের বাসা, কারও চুল দুর্বা ঘাসের মত খাড়া। চোখগুলো ভিতরে ঢুকে আছে। মানুষ তো নয়, মানুষ নামের পোকা! জলের পোকাদের গায়ে ছেতলা পড়ে, এদের হাতে-পায়ে ধরেছে হাজা।

ওদের সবার চোখে-মুখে আতঙ্ক ছড়ানো! সর্বহারার আর্তি—রাণীমা কোথায়? আমরা রাণীমার কাছে যাব—আমাদের সর্বনাশ হয়েছে—

ওদের আর্তনাদ শুনলেন মথুরামোহন। ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। শত মানুষের কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট হলো। মথুরামোহন বুঝলেন, বাড়ির সামনে ভীড় জমেছে, আর সেই ভীড়ের ভিতর থেকে এ বাড়ির ভিতরে আছড়ে পড়ছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসা মানুষগুলোর অনুনয়, আকুতি—রাণীমাকে একবার বলো গঙ্গার জেলেরা দেখা করতে এয়েছে,—দেখা না পেলে আমরা ধনেপ্রাণে মারা যাব—. অনাহারে মরে যাব আমরা—

মথুরামোহন বুঝলেন, এরা বিশেষ কোন তালুকের প্রজা নয়, এরা জেলে! মথুরামোহন এবার ব্যস্ত সমস্তভাবে, দৃঢ় পদক্ষেপে দোতলার সিঁড়ি মাড়িয়ে প্রাসাদের ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দ্বাররক্ষীরা সরে দাঁড়াল।

মথুর কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, শান্ত হও—তোমরা শান্ত হও—, তোমাদের মধ্যে থেকে যে কোন একজন আমার কাছে এসে বলো, কী হয়েছে তোমাদের—

সব উত্তেজনা, সব অস্থিরতা মুহূর্তে থেমে গেল। একটা চাপা গুঞ্জনের ভিতরেই একজন বৃদ্ধ জেলে এগিয়ে এলো মথুরামোহনের সামনে: দু'খানা হাত জড়ো করে চাপা ব্যথায় প্রায় বন্ধ কণ্ঠস্বরকে সতেজ করতে করতে বলল.—গঙ্গার পানিতে আর আমরা মাছ ধরতে যেতে পারবো না, জামাই-কত্তা! সাহেবগুলান আমাদিগের জাল কেড়ে লিচ্ছে, পানিতে নামার হুকুম লাই.—আমরা মরে যাব, এক মুঠান ভাত না খেত্যে পেয়ে আমাদিগের মাগ্-বেটা বিটিরা মরে যাবে গো জামাইকত্তা—

মথুরামোহন বললেন,—তা তো বুঝলাম. কিন্তু তোমরা আমাদের কাছে কেন এলে, তোমরা যেখানে গঙ্গায় মাছ ধরো—সেখান থেকে তো এই জানবাজার অনেক দূর। এত পথ হেঁটে আমাদের বাড়িতে এসেছ, অথচ ওদিকে আছেন রাজা রাধাকান্ত দেব, আরও একটু ওধারে জোড়াসাঁকোয় আছেন বাবু দ্বারকানাথ। তাঁদের মত মানুষদের কাছে না গিয়ে, তোমরা এখানে

এলে কেন ?

বৃদ্ধ বলল, যেছি জামাইকত্তা, আমরা সবাই রাধাকান্ত রাজাবাবুর থানে যেছি, কত করে বলিছি, কত গোড় ধরিছি লাঠিয়াল বাবুদের—কথা কানে লেয় নাই গো !—কাঁদতে থাকে বৃদ্ধ জেলে।

এইবার সকলে আবার অনুরোধ জানাল মথুরামোহনকে—একবার তিনি যেন রাণীমার কাছে ওদের নিয়ে যান।

রাণীমার কানে গিয়েছিল ওদের চিৎকার—কান্নার আওয়াজ। সব কথাই শুনে ফেলেছিলেন তিনি ইতিমধ্যে। এবার এক দাসীকে পাঠালেন, মথুরামোহনের কাছে। বলে পাঠালেন, মথুরবাবু যেন ওদের ঘরে ফিরে যেতে বলেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন, জেলেদের যেন মথুরবাবু আরও বলেন, কিছুদিন অপেক্ষা করতে, অচিরেই রাণীমা এর বিহিত করবেন— !

দাসী রাণীমায়ের নির্দেশমত মথুরবাবুর কাছে গিয়ে সে কথাই বলেছিল। মথুরামোহন সব শুনে জেলেদের উদ্দেশে বললেন, মা তোমাদের সব কথা ভিতর থেকে শুনেছেন, তোমাদের কোন ভয় নেই, ঘরে ফিরে যাও। অচিরেই এর একটা ব্যবস্থা যাতে হয় মা তার চেষ্টা করবেন।

শুধু চেষ্টা করেননি রাণী রাসমণি, তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের চেতনার গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিলেন। পরের দিনই রাণীমা লোক পাঠিয়েছিলেন সরকারের দপ্তরে। রাণীমা জানতেন দেশের সরকার ব্যবসা ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অনেক কিছুই জমা দেয়। রাণীমা বললেন, বাবা মথুর, তুমি খোঁজ নাও ঘুসুড়ী থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গার অংশ সরকার কত টাকা পেলে জমায় দেবেন ; শুধু খোঁজই না, যত টাকাই লাগুক যাতে এই অংশ ইজারা নিতে পারি সে ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে এসো।

যোগ্য জামাতা তাই করেছিলেন। দশ হাজার টাকায় ঘুসুড়ী থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গা ইজারা নিয়ে পাকা কাগজপত্তর এনে রাণীমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

পাকা কাগজ আর টাকার রসিদ হাতে পড়তেই রাণী রাসমণির ভিতরকার বিদ্রোহী মনটা তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি সেই মুহূর্তে সব জামাইদের একত্রিত করে বলেছিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একদিন আমার দেবতাতুল্য শ্বশুরমশাই, আমার স্বামীর সঙ্গে যে ঘৃণ্য ব্যবহার করেছিল তা আমি ভুলিনি ! এ দেশের সাধারণ-অতি সাধারণ মানুষগুলোর ওপর ওরা যে

নিত্য শোষণ চালাচ্ছে, আমি এবার তার যোগ্য জবাব দেব !

মথুরামোহন একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিলেন, আর একবার আমাদের ভেবে দেখা দরকার, তাই বলছিলুম—

মথুরের মুখের কথা শেষ হতে না হতে রাণীমা বলেছিলেন, না মথুর, লালমুখো ইংরেজদের সঙ্গে যখন কোন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তখন বুদ্ধির অস্ত্রে ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। যখন মনস্থির করেছি— তখন এ যুদ্ধ চলবেই ! তোমরা শুধু আমার নির্দেশ মত কাজ কর।

মথুরবাবু বললেন, আজ্ঞা করুন, আমাদের কি করতে হবে—

রাণীমা বলেছিলেন, আমি চাই এদিকে ঘুসুড়ীর গঙ্গার ওপার থেকে এপার, ওদিকে মেটিয়াবুরুজের গঙ্গার এপার থেকে ওপার সরাসরি লোহার শিকল দিয়ে ঘিরে দিতে ! যত লোক আর যত অর্থ লাগে লাগুক, তুমি গঙ্গায় আমার ইজারা নেওয়া অংশকে বেঁধে ফেল। আমি দেখতে চাই কত শক্তি প্রয়োগ করে ইংরেজ সরকার আমার ইজারা নেওয়া অংশ দিয়ে বাণিজ্যের জাহাজ-নৌকা নিয়ে যেতে পারে !

মথুরামোহন এবার সব বুঝলেন। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি গঙ্গা বন্ধনের আয়োজন করলেন। রাণীমা বলেছিলেন, কাজটি রাতারাতি সেরে ফেলতে হবে ; তা' না হলে, আমার উদ্দেশ্যের কথা জানাজানি হয়ে গেলে কৃতকার্য হতে পারব না—

মথুরামোহনও এক রাতের মধ্যে এ প্রান্ত আর ওপ্রান্ত লোহার শিকল দিয়ে যাতায়াতের পথ রোধ করে দিলেন। জেলেদের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন, তারা যেন মনের খুশিতে এই অংশের মধ্যে মাছ ধরতে যায়—

টলে উঠল ইংরেজ সরকারের মসনদ। কোন বাণিজ্য জাহাজ, স্টিমার এমনকি একটা নৌকা পর্যন্ত না পারল মেটিয়াবুরুজ থেকে এদিকে আসতে, না পারল ঘুসুড়ী থেকে এগিয়ে যেতে। সরকারের পক্ষ থেকে রাণী রাসমণির কাছে এই মর্মে কৈফিয়ৎ তলব করা হলো, রাণী বলুন কী কারণে সরকারি ও বেসরকারি কোন জলযানকে যাতায়াত করতে দেওয়া হচ্ছে না ! কেন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মালপত্তর বোঝাই সব জলযান আটকে আছে গঙ্গাবক্ষে !

রাসমণিও তলব করলেন মথুরামোহনকে। গোটা শহর কলকাতা শুধু নয়, গোটা বঙ্গদেশে ততক্ষণে রটে গেছে রাণী রাসমণির এই বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করার দোর্দণ্ড ক্ষমতার কথা। মথুরামোহন নিজেও অনেকটা ভীত। তিনি মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন—বললেন, মা, আমার মনে হয় আমরা এবার

সরাসরি ভিমরুলের চাকে আঘাত করেছি। কোন ক্ষতি হবার আগে আপনি যদি এই যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন মনে হয় ভালই হবে—

যোগ্য জামাতার মুখে অযোগ্য পৌরুষের ধ্বনি! রাণীর মুখে এক টুকরো হাসির ঝলক। মথুরামোহন বুঝলেন ও হাসি নয়, প্রবল ঝঞ্ঝার পূর্ব মুহূর্তে অশনি সংকেত!

রাণীমা বিন্দুমাত্র উত্তেজনা দেখালেন না। চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, তুমি সরকারের নির্দেশ ও কৈফিয়ৎ তলবের উত্তরে, যা সত্য তাই জানিয়ে দাও। বলবে, জানবাজারের রাণী রাসমণিকে তোমরা দশ হাজার টাকার বিনিময়ে গঙ্গায় যে অংশ ইজারা দিয়েছ, রাণী রাসমণি সেই অংশের আপাতত মালিক, সুতরাং তাঁর জায়গায় তিনি যা খুশি করতে পারেন। সেখানে সরকারের কৈফিয়ৎ তলব করা অন্যায়—আরও বলবে, গভর্মেণ্টকে হেয় করার ইচ্ছে রাসমণির নেই। তিনি কৈফিয়ৎ যা দেবার তা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, গঙ্গাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে দেবার কারণ, তাঁর গরীব জেলে প্রজারা মাছ ধরতে পারছিল না, বাষ্পচালিত জাহাজ-স্টিমার যদি গঙ্গার ঐ ইজারা নেওয়া অংশে যাতায়াত করে তা হলে সব মাছই অন্যদিকে চলে যায়, তা যাতে না যেতে পারে, গরীব প্রজারা যাতে আনন্দে মাছ ধরে সংসার প্রতিপালন করতে পারে তাই এ কাজ তিনি করেছেন—সব শুনে মথুরামোহন শক্তি আর বিশ্বাস সঞ্চয় করে রাণীমার বক্তব্য অনুসারে সব কথাই সরকারের কাছে লিখিত পেশ করলেন।

শেষ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাণীমায়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। সরকারের পক্ষ থেকে জমা নেওয়া দশ হাজার টাকা রাণীকে ফেরত দেওয়া হলো। শুধু তাই নয় সরকারের পক্ষ থেকে লিখিত ভাবে জানানো হলো, ধীবরেরা গঙ্গায় মাছ ধরতে পারবে এবং তার জন্য কোন রকম কর দিতে হবে না—

এরপর রাণীমা গঙ্গার সেই বন্ধন মুক্ত করলেন। সারা বাংলা জুড়ে, প্রতি মানুষের মুখে রাণী রাসমণির জয়ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল! তাঁর নামে গান বাঁধা হলো! সেই গান ছড়িয়ে পড়ল ঘরে ঘরে—

"ধন্য রাণী রাসমণি রমণীর মণি।
বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি ॥
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী ॥

যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমণী।
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবস রজনী ”

বাগিচায় ফুল ফুটেছে অনেক!

ফুটেছে জবা, গোলাপ, রজনীগন্ধা কত কী! কিন্তু কে ফোটাল এই ফুল! কে দিল অমন রূপ, এসব প্রশ্ন ওদের কারও মনে জাগে নি কখনও। শুধু নিত্য বাক্ বিতণ্ডা। মনে মনে একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। যে জমিতে ফুল ফুটেছে সেই জমির মালিকের আত্মতৃপ্তি সেই জমিকে নিয়ে। আসলে এই জমির মালিক আমি। এই জমিতে যেমন খুশি আমি পারি ফুল ফোটাতে—কারণ জমি আমার, তেমনি আমি পারি এই জমিতে শস্য ফলাতে! কারণ আমার জমি! জমির মালিকের সেই অহঙ্কারের জবাবে আবার হয়তো মালি কিছু কথা বলতে চায়! তার ভিতরে ভিতরে জন্ম নেয় প্রতিবাদ। সে জমির মালিকের মুখের ওপর হয়তো স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না, ভিতরে ভিতরে বলে,—আমিই জন্মদাতা! এই ফুল আমি ফুটিয়েছি। আমি রোদে পুড়ে—জলে ভিজে এই জমির মাটি খুঁড়েছি, চারা পুঁতেছি, সার দিয়েছি, জল দিয়েছি। আমার পরিচর্যায় গাছে কুঁড়ি এসেছে, কুঁড়ি দিয়ে এসেছে ফুল। আমি না থাকলে কী ফুল ফুটতো জমিতে!

আবার সেই 'আমি'র কথা। কাঁচা আমি। এই যে 'আমি' আর 'আমার' প্রতিযোগিতা, এই 'অহং',—এই ভাবটি কাল তথা অনন্তকাল থেকে মানব-অন্তরে বাস করছে, অথচ অলক্ষে অনন্তকালের জন্য জেগে আছেন সেই এক অবিনশ্বর তিনি, যিনি জমিকে পরম ঔদার্যে প্রকৃতির কোলে সাজিয়ে দেন, ফুলের সর্বাঙ্গে ঢেলে দেন রূপ-রস-গন্ধের পূর্ণপাত্র! মালিক আর মালি উপলক্ষ মাত্র। মালিক চক্ষু মুদলে অস্তিত্বহীন, কিন্তু জমি—তার ক্ষয় নেই, নিশ্চিহ্ন হবার কোন সুযোগ নেই। এক মালির বদলে অন্য মালি আসে। আবার ফুল ফোটে কঠিন পাথরের বুকেও, প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির ইচ্ছায়! তাই অহংকার থেকে মুক্তি নিতে পারলেই মহামুক্তির আলোকরঞ্জিত মহাঅঙ্গনে পেঁছে যাওয়া যায়।

তাই গিয়েছিলেন রাণীমা। রাণীমা মানে এক অহংমুক্ত মা! মা মানে এক অনন্ত করুণা সাগর। তাই তো মানবী রাসমণি সাধারণ মানুষের কাছে অতি সহজে হয়ে উঠেছিলেন দেবী। দেবী অন্নপূর্ণা!

রাণীমা বলতেন, দোহাই তোমাদের! তোমরা আমাকে দেবী বলে প্রণাম করো না, তোমরা আমাকে তোমাদের 'মা' বলে ভেবো! বিশ্বাস

করো তোমরা, আমি কেউ না, আমার দ্বারা তোমরা কোনভাবেই কোন কিছু লাভ করনি। আমি যা করি, আমার ইষ্ট দেবতার নির্দেশ পালন করি মাত্র।



প্রবাদই তো আছে—হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ!

রাণী রাসমণি তাই করতেন! বারো মাসের মধ্যে তেরো পার্বণই পালন করতেন তিনি। বোধ হয় তার বেশি হবে, কম হবেনা! কিন্তু সাধারণেরা বলে অন্য কথা। টাকা থাকলে মানুষ করে না কী! টাকা থাকলে মানুষ বেড়ালের বিয়েতেও লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারে! রাসমণি শুধু নামে রাণী নন, তিনি সত্যিই তো ভাগ্যের দিক থেকেও রাণী! ভাগ্যবতী তিনি সত্যি, কিন্তু ভাগ্য নিয়ে বসে থাকলে রাণী সত্যি রাণী হতেন না। তিনি বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, মেধা, ব্যবহারে প্রাসাদ অভ্যন্তরে থেকেই জমিদারীর আয় বাড়িয়ে সত্যি সত্যি রাণী হয়েছেন! সুতরাং ভাগ্য-হীনেরা যাই বলুক, রাণীমার টাকা আছে বলেই বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করেননি কখনও। এ তাঁর মনের সদিচ্ছার প্রকাশ!

তিনি অনেকবারই তো বলেছেন, এ সবের অর্থ তোমরা তলিয়ে দেখ না কেন? যত বেশি পার্বণ করবে, তত বেশি মানুষের কল্যাণ হবে। জামাই মথুরামোহনের সঙ্গে একবার গল্প করতে করতে, অবশ্যই বৈষয়িক ব্যাপারে নানা গল্প, প্রসঙ্গত রাণীমা বলেছিলেন, মথুর বাবা, একটা কথার উত্তর পরিষ্কার করে বলো দিকিনি, এ বাড়িতে যিনি আমাদের রঘুনাথের পুজারী, যিনি পুজো করেন, যিনি আমার কুলগুরুদেব তাঁরাও তো মানুষ! আমরা তাঁদের সেবা বলো আর বেতন বলো—যা দিতাম বা দিয়ে থাকি তাতে কি তাঁদের সংসার চলে? চলতে পারে? মথুর বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, না। তা হয় না। তা হয়তো চলে না—

রাণীমা বললেন, তা হলে আমি যদি বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করি, তাতে ওঁদেরও কিছুটা বাঁচার ব্যাপার থাকে? তা ছাড়া একটা উৎসব, একটা পার্বণ হবে! শুনলে কত শত মানুষ খুশি হয়! উৎসবের প্রয়োজনে যার কাছ থেকে যা খরিদ করতে হয়—তারা কিছু লাভ করে,

বাইরে কত জিনিসের মেলা বসে, যার যতটুকু সামর্থ্য তাই নিয়ে দোকান সাজায়, কারো বা পাঁচ আনা আবার কারও বা ষোলআনা কেনা বেচা হয়, এতে মানুষের কল্যাণ হয় কি না বলো! যেমন ধর দোল আর রাস আসছে! আমি যদি তোমাদের অনেকের কথায় এ সব বন্ধ করে দিই, তা হলে মানুষের কল্যাণ তো হবেই না, উপরন্তু অর্থের আদান-প্রদানে দেশ ও দশের যে মঙ্গল, অর্থ সিন্দুকজাত করে রাখলে তার অনেক বেশি অমঙ্গল! তাই যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন জানবাজারে বারো মাসে তেরো পার্বণ হবে।

রাণীমা আসন্ন দোল-রাস উৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে একবার স্থির করলেন, আত্মীয়-স্বজন, চেনা-জানা-অচেনা-অজানা সবার মনে প্রেমের সুরভি ছড়িয়ে দেবেন সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে। এ দেশের সবাই আকণ্ঠ পান করুক সঙ্গীতসুধা। আর তাই অনেক অর্থ খরচ করে গোয়ালিয়ারের স্বনামধন্য গায়ক জোয়ালাপ্রসাদকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এলেন জানবাজারের প্রাসাদে। ভারতমাতার এক অমৃতপুত্র ছিলেন এই জোয়ালাপ্রসাদ। সঙ্গীতজ্ঞ জোয়ালাপ্রসাদের কাছে রাণীমার আর্জি ছিল, প্রতি-বছর দোল পূর্ণিমায় তাঁকে আসতে হবে, সন্ধ্যালগ্নে সকলকে তাঁর কণ্ঠের অমৃতসুধায় তৃপ্ত করতে হবে!

জোয়ালাপ্রসাদ রাণীর সেই আর্জি রক্ষা করেছিলেন কয়েক বছর। দোলের দিন, জানবাজারের ঠাকুর দালানে যাঁরা যেখান থেকেই আসুন, রাণীমার আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবেই যেন তাঁদের দেখা হয় এমন নির্দেশ জারি ছিল! সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতো। চিকের আড়ালে বসতেন রাণীমা, আর তাঁর চতুর্দিকে বসতেন অতিথি স্বরূপা পুরনারীরা। ঠাকুর দালান পূর্ণ থাকত পুরুষ শ্রোতায়। রঘুনাথ জীউ-এর পাদদেশে মনোরম আসরে বসে গান শোনাতেন গোয়ালিয়ারের জোয়ালাপ্রসাদ!

সেই দোল উৎসবের বর্ণনা দেওয়া যাক একটু—

দোলপূর্ণিমার দিন কতক আগে থেকে জানবাজারের প্রাসাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন চুনকাম আর নতুন রঙে রাঙানো হতো, তেমনি বিশাল ঠাকুর দালান, মণ্ডপও ঝলমল করে উঠতো সাদা রঙে। রঘুনাথের সিংহাসন ফুলে ফুলে আর হরেক রকমের পাতায় সাজানো হতো। আলোয়-আলোয় ঝলমল করে উঠতো চারিদিক। ঝাড়লণ্ঠনগুলো থেকে বিচ্ছুরিত হতো আলোক মঞ্জরি! দোলের দিন সূর্য উদয়ের আগেই রাণীমার জামাতারা সদলবলে যেতেন গঙ্গায়। গঙ্গায় স্নান সেরে মাথায় করে আনতেন পিতলের

ঘড়ায় গঙ্গার পবিত্র বারি। এরপর পট্ট বস্ত্র পরিধান করে জামাতারা গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে এগিয়ে যেতেন ঠাকুর মণ্ডপে।

জামাতাদের পিছনে পিছনে রঘুনাথ জীউ-এর মূর্তি বক্ষে ধারণ করে ধীর পদক্ষেপে আসতেন পুরোহিত! পুরোহিতের পিছনে দু'জন লোকও বিশালকায় তালপাতার পাখায় দেবতার অঙ্গ বাতাসে বাতাসে শীতল করে তুলতে তুলতে এগিয়ে আসত। রাণীমার মেয়েরা এবং অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে মেয়েরা শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে গোটা প্রাসাদকে ভরিয়ে তুলতেন!

পুরোহিত সেই নববস্ত্র পরিহিত, স্বর্ণালংকারে শোভিত অপরূপ রঘুনাথের শিলামূর্তি সিংহাসনে স্থাপন করতেন!

এরপর শুরু হতো দেবতার অভিষেক পর্ব সাড়ম্বর পূজো পর্ব শেষ হলে সকলে ভূমিতে মাথা রেখে রঘুনাথকে প্রণাম করতেন। তারপর একে একে প্রণাম করতেন পুরোহিত এবং পুরোহিতের সঙ্গে যে ক'জন ব্রাহ্মণ থাকেন তাঁদের। এরপর শুরু হত গুরুজনকে প্রণাম করার পালা।

বাঙালী তথা হিন্দুদের এই অপরূপ ভক্তিবিনম্র রূপটি আজ নিশ্চিহ্ন! আর এই রূপটিকে আরও অনেক বেশি অপরূপ করার তাগিদে, মানুষের এই মর্মটি চিরদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখার কামনায় রাণী রাসমণি এই উৎসব প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতেন না! এই প্রণাম পর্বের পরই স্বয়ং রাণীমা ঠাকুর মণ্ডপে রঘুনাথের পাশে এসে দাঁড়াতেন।

তাঁর পাশে দু'জন দুটি বিশাল পাত্রে রূপোর টাকা নিয়ে অপেক্ষা করতেন। রাণীমা নিজে সবার হাতে তুলে দিতেন দোলপার্বণী। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত এদেশের ঘরে ঘরে দোল, রথ আর দশমীর পার্বণী দেবার রেওয়াজ বেঁচে ছিল! আমাদের বড়রা বাড়ির ছোটদের ডেকে পার্বণী দিতেন, আমরা আনন্দে খুশিতে সেই পার্বণীর পয়সা নিয়ে যার যা খুশি তাই কিনতাম। যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে বিস্ময়কর বিবর্তন এসেছে। এর জন্যই আমাদের জীবনের অনেক মধুর মুহূর্ত, সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! ইদানীং এই পার্বণী দেওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই নেই বলা যায়।

রাণীমার দেওয়া পার্বণীর টাকা নিয়ে সবাই দোল খেলা করত!

দোলের আগে যেমন জানবাজারের বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে যেত তেমনি একটি নয়, দুটি অথবা পাঁচটি নয়, দশ থেকে বারোটি গরুর গাড়িতে রাণীমার ইচ্ছাপূরণের জন্য বাজার থেকে কিনে আনা হতো পিচকিরি, ফাগ, আবির, কুমকুম, আর চিনি দিয়ে তৈরী ছাঁচের হরেক রকম খেলনা। সবাই

সেই চিনির খেলনা নিয়ে খেলা করার পর খেয়ে আনন্দ পেত। সেই পিচকিরি, কুমকুম, ফাগ, আবির এই ঠাকুর দালানের পাশে রাখা হতো। পার্বণী নেবার পর একে একে সবাই যেত ভাঁড়ারে। যার যত খুশি তুলে নিত ফাগ, আবির, কুমকুম, আর একটা করে পিচকিরি। তারপর শুরু হতো হোলি খেলা। রং খেলা। মাটির বিশাল বিশাল গামলায় গোলাপজলে রং গোলা থাকত, সেই গোলাপজলে গোলা রং দিয়ে পিচকিরিতে দোল খেলত সবাই!

গোলাপজল আর কুমকুমের ভিতরকার আতরের গন্ধে জানবাজারের প্রাসাদতুল্য বাড়ি যেমন মেতে যেত তেমনি ঠাকুর দালান, দেওয়াল, বিশাল বিশাল থাম এমন কি এ বাড়ির বাইরের রাস্তা নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে যেত।

দোল উৎসব সেই বছরের মত শেষ হতো বটে কিন্তু জানবাজারের রাস্তা রক্তিম থাকত আরও এক মাস দেড়মাস। অন্দর মহলে, ঠাকুর দালানে দোল খেলার পর এত ফাগ-আবির পড়ে থাকত যে প্রায় দেড়-দু'সপ্তাহ ধরে সেই আবির মাড়িয়েই সবাইকে চলাফেরা করতে হতো।

রাণীমা চিকের আড়ালে বসে এই অপরূপ দৃশ্য দেখতেন দু'চোখ ভরে, আর এক রাশ তৃপ্তিতে তাঁর মন ভরে যেত। রাণীমার দু'খানি পা আবিরে আবিরে ঢাকা পড়ে যেত। সকলেই রাণীমার পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম জানিয়ে যেত। রাণীমা বলতেন, তোমরা বাড়ি গিয়ে গুরুজনদের পায়ে আবির দাও, ফাগ দাও, আমাকে নয়!

বয়স্করা যারা ধর্ম-জাত নিয়ে ভাবেনি কখনও, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ কাকে বলে এই পার্থক্য বোধ যাদের ছিল না, সমাজের সেই শ্রেণীর মানুষেরা পায়ে আবির দিতে এলে রাণীমা গ্রহণ করতেন না: বলতেন, আমাকে নয় আমার রঘুনাথের সিংহাসনে দাও—, যারা কোন নিষেধ মানতে চাইত না রাণীমা তাদের বলতেন, ঠিক আছে, যখন আমাকে ফাগ দিতে তোমার মন চাইছে তুমি বরং এই থামের গায়ে আমার নাম করে ফাগ লাগাও—তা হলেই আমাকে দেওয়া হবে—

কুলশ্রেষ্ঠরা আসতেন পিচকিরি নিতে, ফাগ-আবির নিতে। মেয়েরা আঁচলে ভরে নিয়ে যেতেন! পুরুষেরা নিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে আনা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোয়! রাণীমা চিকের আড়াল থেকে সেই কুলশ্রেষ্ঠদের দেখতেন আর মাঝে মাঝে তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠত!

ওঁরা সব নিতেন কিন্তু যাবার সময় রাসমণির সঙ্গে দেখা করে যেতেন না। একটা অহংকার ছিল তাঁদের! আমরা কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমরা সমাজের শিরোমণি—সুতরাং ছোট জাতের বাড়িতে এসে দোলের ফাগ-আবির

নিলে ছোটজাতের মেয়ের পুণ্যি হবে, কিন্তু যাবার সময় দেখা করে গেলে তাঁদের পাপ হবে। নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁরা অন্যপথে চলে যেতেন।

রাণীমার হৃদয় বিচলিত হতো। মনে মনে ব্যথা পেতেন খুবই। সামান্য সৌজন্য দর্শনে অব্রাহ্মণ মহিলার কাছে গেলে পাপ হবে—এই অশিক্ষায় এ দেশের মানুষ যে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই কেমন করে ডেকে আনছে তা দেখেই কষ্ট পেতেন রাণীমা।

প্রায় সাত দিন-সাত রাত জানবাজারের অঞ্চলের কারও চোখে ঘুম নামতে পারত না। ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে একশ্রেণীর মানুষ দিনরাত কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে গান করত। কেউ কেউ সঙ বার করত!

রাণীমা জামাইদের ডেকে একবার বলেছিলেন, আমরা সবাইকে ফাগ, আবির, পিচকিরি, পার্বণী দিই, ওরা আনন্দে নেচে ওঠে, সংসারের সব দুঃখকষ্ট ভুলে যায়। কিন্তু খেলা শেষে আবার যে কে সেই। আবার সেই দুঃখ আর দুঃখ। আমি সব মানুষের দুঃখ তো আর ঘোচাতে পারব না বাবা, তবুও তোমরা এমন একটা ব্যবস্থা কর যাতে, দোলের দিন রং খেলার পর সবাই পেটপুরে খেতে পারে—

সেই থেকে জানবাজারের বাড়িতে দোলের দিন সবাইকে পেটপুরে খাওয়ানো হতো। জানবাজারের রাস্তার দুধারে যারা নানা খেলনা, নানাবিধ খাবারের দোকান, নাচ-তামাশার তাঁবু ফেলত, রাণীমার লোকেরা, সেই রান্না-সামগ্রী পাতায় করে পৌঁছে দিত তাদেরও!

দোলের মত রাসপূর্ণিমার দিনেও বিশাল আয়োজন।

রাসের দিন সেই দোলের মতই সূর্যোদয়ের পূর্বেই রাণীমার জামাইরা গঙ্গায় স্নান করে, মাথায় করে ঘড়ায় আনা গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে রঘুনাথ জীউ-এর সিংহাসন পর্যন্ত যেতেন আর তাঁদের পিছন পিছন রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করে পুরোহিত গিয়ে সিংহাসনে সেই মূর্তি স্থাপন করতেন। পুষ্প-পত্রে, আলোকে,ধূপে শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ রচিত হতো। সিংহাসনের দুদিকে কদম গাছের ডাল বসিয়ে তৈরি হতো কদমগাছ। তাতে মোম দিয়ে তৈরি কদম-ফুল আর ফল ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। মনে হতো ফুল ও ফলন্ত সত্যি গাছ। সিংহাসনের পিছনে জাল টাঙ্গিয়ে তাতে বসান হতো সোলার পাখী। থামের গা লাল সালু দিয়ে মোড়া হতো। সালুর গায়ে আটকান হতো মখমলের কৃত্রিম পাতা, লোহার তার লাগান কাগজের ফুল-চুমকি বসান। ঝাড়লণ্ঠন, দেওয়াল গিরির আলোয় চুমকি জ্বলত জ্বলজ্বল করে। মনে হতো কদমবনে, গাছে

গাছে অজস্র জ্যোৎস্না পোকা মিটমিট করে আলো ছড়াচ্ছে।

ঠাকুর দালানে, দালানের তিন দিকের উঁচু বারান্দায়, এমন কি বাড়ির দোতলায়, নিচের মত তিন দিকের বারান্দায় অতিথি অভ্যাগতেরা বসতেন। রাণীমার লোকেরা জামাতাদের তত্ত্বাবধানে প্রথমে আতর আর গোলাপজল ছড়িয়ে দিত সবার গায়ে, তারপর বিশাল রূপোর থালায় তারা আনত বেল-জুঁই-এর মালা। অতিথিদের মাল্যবরণ করা হত। এরপর আসত দামী গন্ধযুক্ত তামাক। জরির তবক দেওয়া পান।

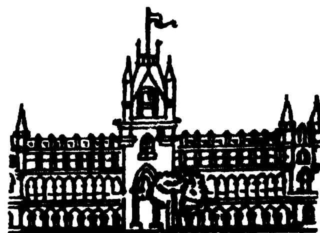
তারপর বসত গানের আসর। রাধাকৃষ্ণ মিলন, মানভঞ্জন, পূর্বরাগ পর্যায়ের কীর্তন-গানে সবার মন মেতে উঠত। দই, দুধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন, মিষ্টান্নের ঢালাও ব্যবস্থা থাকত সবার জন্য।

রাসপূর্ণিমায় আর একটি মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান হতো এই বাড়িতে। তখনকার দিনে রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠে যাঁরা খুবই পরিচিত ছিলেন তেমনি অনেক ব্রাহ্মণ কথকথা গাইয়েদের সাদর আমন্ত্রণ করে আনা হতো। এঁদের প্রত্যেকের জন্য থাকত আলাদাভাবে একটি করে আসন ও দীপাধার। সন্ধ্যালগ্ন থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এঁরা ঠাকুর দালানে বসে পাঠ করতেন। পাঠ শেষ হলে প্রত্যেককে আলাদাভাবে বৃহৎ মৃৎপাত্রে ফল-দই-ক্ষীর মিষ্টান্ন সাজিয়ে দেওয়া হতো। তিন দিন পাঠ হত। যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী দক্ষিণা দিতেন রাণীমা। দু'টাকা থেকে যোল টাকা পর্যন্ত ছিল প্রণামীর অঙ্ক।

আর একটি বিশেষ খেলার প্রচলন ছিল তখন। সেই বর্ণনা প্রবোধবাবুর লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি, "...শেষ দিন একটি খেলা হইত, একটি বাক্সে ১০্ ১২্ টাকা রাখিয়া প্রাঙ্গণে দুই দিকে দুই জন সচতুর লাঠীয়াল লাঠী খেলিতে খেলিতে কৌশলে অন্যের গতি রোধ করিয়া যে বাক্স লইতে পারিত তাহারই জয় হইত। জেতা ব্যক্তি বাক্স সমেত মুদ্রা পাইত ও পরাজিত ব্যক্তি মাত্র যাতায়াতের পাথেয় পাইত। ইহা দেখিতে না জানি কত লোকেরই সমাবেশ হইত। দূর দূর হইতে সানাই, বাঁশের বাঁশি শুনাইতে বহুলোক আসিত ও পুরস্কার পাইত। জন্মাষ্টমীর পর নন্দোৎসবের দিন দধিকর্দমের বিশেষ আমোদ হইত। বড় বড় পালোয়ান, খ্যাতনামা কুস্তিগীর আসিত ও বল পরীক্ষা হইত।

বাসন্তীপূজায়, লক্ষ্মী পূজায়, সরস্বতী পূজায়, কার্ত্তিক পূজায়, জগদ্ধাত্রী পূজায়, সকল সময়েই সমারোহ কাণ্ড ও বহু অর্থব্যয় হইত। এতদ্ব্যতীত বাটীতে উৎসব ত লাগিয়াই আছে, লোক জনের দাসদাসীর কল কল রবে, বালক বালিকাদের হাস্য ক্রন্দনের রোলে, কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য-

ব্যপদেশে গমনাগমনে দৌবারিকদিগের কথাবার্ত্তায় বাটী সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ সাগর তরঙ্গবৎ প্রতীয়মান হইত। আজ প্রীতিরাম বাবুর বাৎসরিক, কাল হরেকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের বাৎসরিক, পরশ্ব রাণীর শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বাৎসরিক, তৎপরদিবস রাণীর মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, কোন মাসে কোন কন্যার সাধভক্ষণ, কাহারও অন্নপ্রাশন, কাহারও নামকরণ, কোন বৈবাহিকের বাটী ভেট প্রেরণ, কোন দিন কোন সাহেবকে উপঢৌকন প্রদান, কোন দিন কোন তালুক হইতে দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ, কোন দিন রাণীর কোন তীর্থগমন ও তাহার উদ্যোগে বিরাট ব্যাপার। এইরূপে সর্ব্বদাই সকলে শশব্যস্ত থাকিত।"



শ্রীগীতায় ভগবান বলছেন—বিষয়চিন্তা করতে করতে মানুষের তাতে আসক্তি আসে। আসক্তি থেকে আসে কামনা অর্থাৎ বিষয় লাভ করার ইচ্ছা হয়, আবার সে ইচ্ছা পূরণ না হলে ক্রোধ জন্মায়। এইভাবে—

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥'

অর্থাৎ ক্রমে ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ হয়ে মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

রাসমণি বিষয়ের মধ্যে বাস করেও অর্থকে পরমার্থ ভাবেন নি। নিজে ব্রহ্মচারিণী থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে চেয়েছেন। তিনি যা ভাবতে চাননি অন্যে তাঁকে তা নিয়ে ভাবিয়েছে। রাসমণি কষ্ট পেয়েছেন।

পুত্রতুল্য জামাতাদের ঘিরে তাঁর অন্তরে যে সুখস্বপ্ন ছিল, নাতি-নাতনিদের নিয়ে যে পরিপূর্ণ নিটোল সংসার তিনি কল্পনা করেছিলেন—বারবার সেখানেই তাঁকে আঘাত পেতে হয়েছে।

আসলে তিনি কী চাইছেন—সেটা তাঁর মেয়েরাও বোঝার চেষ্টা করত না—অন্যের কথা নাই বা বললাম।

জামাতারা অধিকাংশ সময়ে জানবাজারে থাকতেন। রাণীমার কাছে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন সবাই। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন

মনে তাঁরা পরস্পরকে সন্দেহ করতেন, কালিমা লেপন করে নিজেদেরই ক্ষুদ্র রূপটিকে রাণীমার কাছে প্রকাশ করে ফেলতেন। আর রাসমণি আহত হতেন!

সংসারে কেউ তবে কারুর কথা ভাবে না. সবাই নিজেদের কথা ভাবে—এ চিন্তা তাঁকে ক্লেশ দিত! রাসমণি দৃঢ়চেতা ছিলেন। নিজেকে তৈরি করেছিলেন তিনি। অত সহজে হার মানার মত মানসিকতার কোন প্রশ্রয় ছিল না তাঁর কাছে। তাই আপনজনদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও তিনি স্থির ছিলেন! বটবৃক্ষের মত। ঝড়ের ঝাপটা দু'একটা পাতা খসিয়ে ফেললেও শিকড় উপড়াতে পারেনি।

কিসের শিকড়? বিশ্বাসের। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আস্থা আর বিশ্বাস ছিল রাসমণির। প্রয়োজনে, বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদে তাঁকে মাঝে মাঝে মায়ের ভূমিকা থেকে সরে যেতে হয়েছিল এই মাত্র।

রামচন্দ্র। প্যারীমোহন। মথুরামোহন।

তিন জামাতা নয়—তিন পুত্রের মতই স্নেহ করতেন রাসমণি তাঁদের। কিন্তু তবুও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্তি পেলেন না তিনি। বিশেষভাবে মথুরবাবু জড়িয়ে পড়লেন এর মধ্যে।

এ নিয়ে ১৮৫১ সালের ১১ ডিসেম্বর হাইকোর্টের নথিতে একটি মোক্তার-নামা (পাওয়ার অব এ্যাটর্নি) নজরে পড়ে। এটি বিবর্ণ ও স্থানে স্থানে লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে গেছে। চার টাকার স্ট্যাম্প কাগজে এটি লেখা হয়েছিল। টাকার অঙ্ক যথাক্রমে বাংলায় চারি টাকা ও উর্দুতে লেখা ছিল। জনৈক শ্রী দিননাথ দাস-এর সই যুক্ত মোক্তারনামার বয়ান এইরকম:

"লিখিতং শ্রী রাসমণি দাসী সাকীন জানবাজার সহর কলিকাতা মোক্তার-নামা···আপন···পূর্ব্বক আমার নামীয় কোম্পানীর কাগজ আমার কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ও দৌহিত্র শ্রীযুত ভূপাল চন্দ্র বিশ্বাসকে পূর্ব্বে লিখিয়া দিয়া···খরদহর গোপুর সাকীনের শ্রী পতিতপাবন সিংহ ও ২৪ পরগণা মকিমপুরের ইতিনা সাকীনের শ্রী শ্রীকণ্ঠ দত্তকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া··· এই মোক্তারনামা লিখিয়া দিতেছি।···১২৩৪০০ টাকার···ঐ কাগজ উহার দিগের নামে রিনু ও পাষ করিয়া দিতেছি"—ইত্যাদি।

১৮৫২ ১২ জুলাই, ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ৩০ আষাঢ় 'সংবাদ সাগর' পত্রিকায় বেশ রসালো একটি মন্তব্য চোখে পড়ল সকলের—

"রাসমণি দাসী ও মথুরামোহন বিশ্বাস এই দুই মান্য মহাশয়ের ছাড়াছাড়ি এবং টাকা ভাঙ্গাভাঙ্গি বিষয় প্রায় সকলেই সুবিদিত আছেন, তাহা

আমাদিগের লেখা বাহুল্য ; শ্রীমতী রাসমণির সুপাত্র দৌহিত্র শ্রীযুত বাবু যদুনাথ যে সুবিবেচনা ও সৎপরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক মথুরমোহনের প্রতি সুপ্রিমকোর্টে যে অভিযোগ করাইয়াছিলেন তাহা তত্রস্থ প্রাড্বিবাকগণ অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া রাসমণির পক্ষে ডিক্রী দিয়াছেন, মথুরবাবু এক্ষণে "পুনঃমুসিকাবৎ" হইলেন, দেখা যাউক পরে কি হয়, বাবুজি কি শ্রীমতীর পর থাকেন, কি পুনরায় আপনার হন, যদ্যপি পর থাকেন, তবেই পেঁচাপেঁচি, নতুবা আপনার হইতে পারিলে, "শঙ্কর চিলের ঘটিবাটী, গোদা চিলের মুখে নাথি।"

আসলে মানুষের চরিত্রই তো এই। ক'জন আর সংসারে নিস্পৃহ-নিরাসক্ত থাকতে পারে? পরনিন্দা-পরচর্চায় এক ধরনের আনন্দ আছে। তাই লোকমুখে রাণীমা আর তাঁর জামাইদের এই দ্বন্দ্ব, বিশেষতঃ মথুরবাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি নিয়ে নানাজন নানাকথা বলে বেড়াতে লাগল।

উপরের এই সংবাদটি পড়লে বোঝা যায় রাসমণি স্বইচ্ছায় কোন বিরোধের মধ্যে যাননি। দৌহিত্র যদুনাথ তাঁকে 'সুবিবেচনা ও সৎপরামর্শ' দিয়েছিলেন।

যদুনাথ চৌধুরী ছিলেন প্যারীমোহন ও কুমারীর পুত্র। রাণীর মেজো জামাই প্যারীমোহন। যদুনাথের নামেই ভবানীপুরে একটি বাজার আছে।* এখন যে অঞ্চলে বাজার—সেখানে ছিল একটি বাগানবাড়ি। এর মালিক ছিলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ রবার্ট চেম্বার্স। এই বাগানবাড়িটি রাসমণি কিনে নেন ও একটি বাজার বসিয়ে তাঁর দৌহিত্র যদুনাথকে দান করেন।

যদুনাথ বা তাঁর পিছনে প্যারীমোহন যিনিই থাকুন—এটা বোঝা গেল তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। সাময়িকভাবে হলেও মথুরবাবুর সঙ্গে রাসমণির একটা বিরোধ বেধেছিল।

১৮৫২ 'সংবাদ প্রভাকর'-এ একটি বিজ্ঞাপন ছিল। বঙ্গাব্দ ১২৫৯, ২ শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপন

কোম্পানির কাগজের ক্রয়-বিক্রয়কারিগণ এবং অন্যান্যদের প্রতি—

এই বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা অবগত করা যাইতেছে, যে বর্ত্তমান বৎসরের

* 'যদুবাবুর বাজার'। কিন্তু লোকে বলে জগুবাবুর বাজার।

জ্লাই মাসের সপ্তম দিবসে স্বে বাঙালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দ্গের্র অধীন স্প্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে চ্ড়ান্ত অন্মতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মান্সারে পশ্চাল্লিখিত কোম্পানির কাগজ সকল, যাহার মধ্যে প্রথম নয় খানা, যাহা প্বের্ব জগদম্বা দাসীর নামে ছিল ও এইক্ষণেও ঐ নামে আছে এবং ঐ নামে টাকা বাহির করনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু অবশিষ্ট কয়েকখানা কাগজ যাহা প্বের্ব ভূপালচন্দ্র বিশ্বাসের নামে ছিল ও এইক্ষণেও ঐ নামে আছে এবং ঐ নামে টাকা বাহির করনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তদ্বিষয়ে উক্ত কোর্টের বিচারে এমত সাব্যস্ত হইল যে মহানগর কলিকাতার জানবাজার নিবাসিনী ম্ত রাজচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিণী বিধবা শ্রীমতী রাসমণি দাসী ঐ সমস্ত কাগজের স্বত্বাধিকারিণী ও কর্ত্রী। এ কারণ উল্লিখিত কোর্ট হইতে এর্প আজ্ঞা দেওয়া হইল যে এইক্ষণে ঐ সম্দায় কাগজ অথবা তন্মধ্যে কোন কাগজ ক্রয় না করেন এবং বন্ধক না রাখেন।

রাসমণির পক্ষে উকিল ছিলেন জন নিউমার্চ। তিনি রাণীর কোম্পানীর কাগজের কতকগ্লি নম্বর উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেগ্লি এইরকম :

কোম্পানির কাগজের বিবরণ

কেতা	পারসেণ্ট	নম্বর		তারিখ	সিক্কা	টাকা
১	ফোর	৯২১১		১ মে	১৮৩২	৫০,০০০
১	ঐ	৩২৬৬		১ ফেব্র্ঃ	১৮৪৩কোং	২৫,০০০
১	ফাইভ	২৫৭০		১ নভেম্বর	১৮২৫	৫,০০০
১	ঐ	৪৮১৪ অফ	২৮৫৩	১০ ডিসেম্বর	১৮২৭	১০,০০০
১	ঐ	৫৩৬১ অফ	৯৮৫৪	১৬ নভেম্বর	১৮২৭	১৫,০০০
১	ঐ	৭৮৮ অফ	৩৭	১ জান্ঃ	১৮৩৫	৭০,০০০
১	ঐ	৩৫৮৯ অফ	২৬৩৩	২৬ এপ্রিল	১৮৩১	৬৫,০০০
১	ঐ	২৫৪৪ অফ	২৬৩৩	২৬ এপ্রিল	১৮৩১	৫,০০০
১	ফোর	৭৬৫৩ অফ	৩৩৬১	১ মে	১৮৩২	২০,০০০
১	ঐ	১০৭০০ অফ	১৮০৩৭	১ মে	১৮৩২	১,২৩,৪০০

১২ জুলাই, ১৮৫২

নিশানীকর। নম্বর ৩৫৮৯ অফ ২৬৩৩ সিক্কা ৬৫,০০০ টাকার যে এক কাগজ, ঐ কাগজ, একত্রীভূত কাগজ, অর্থাৎ ১৮৫২ সালের ৮ জুলাই দিবসের বিজ্ঞাপনের মধ্যে প্রকাশিত পশ্চাল্লিখিত দুইখানা কাগজে একত্র করা হইয়াছে, যথা, নম্বর ২৪৮১ অফ ২৬৩৩ সিক্কা ৫০,০০০ টাকা এবং নম্বর ২৫০০ অফ ২৬৩৩ সিক্কা ১৫,০০০ টাকা। অপিচ নম্বর ১০৭০০ অফ ১৮০৩৭ সিক্কা ১,২৩,৪০০ টাকার যে এক কাগজ, ঐ কাগজ একত্রীভূত কাগজ, অর্থাৎ পূর্বেকার বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত নিম্নলিখিত ছয়খানা কাগজে একত্র করা হইয়াছে, যথা, নম্বর ১৮০২৯ সিক্কা ২০,০০০ টাকা! নম্বর ১৮০৩০ সিক্কা ১৭,৬০০ টাকা। নম্বর ১৮০৩৫ সিক্কা ১৫,৬০০ টাকা। নম্বর ১৮০৩৭ সিক্কা ১৩,২০০ টাকা। নম্বর ৩৪৫২ অফ ১১১১৬ সিক্কা ১৫,০০০ টাকা। এবং নম্বর ৮২৫১ অফ ১০০৭৮ সিক্কা ৪২,০০০ টাকা। ইতি—

জান, নিউমার্চ
শ্রীমতী রাসমণি দাসীর উকীল।

*   *   *   *

যে মাটিতে আমাদের জন্ম, সেই মাটির কোলেই আমাদের লীন হয়ে যাওয়া। অমন মাটি-মা মাঝে মাঝে রুষ্ট হন বলেই তো প্রকৃতির খেয়ালীপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ থাকে না। কোন অনুযোগও না। রাণীমার বিরুদ্ধেও তেমনি কোন অভিযোগ বা অনুযোগ ছিল না কারও। এই সংসারে তাঁর ধরিত্রীরূপ। একদিন নয়, কতদিন সেই কারণেই রাণীমার রুদ্ররূপ প্রকাশিত হয়েছে। সবাই তো সেই কারণেই বলতেন, রাণী রাসমণি শুধুমাত্র নারী নন, মহাশক্তির আধার।

সেই রাণীমা একদিন সব চাইতে প্রিয়, সব চাইতে বিশ্বাসী জামাই মথুরামোহনকে ডেকে পাঠালেন। অসময়ে ডাক। মথুরবাবুর চোখে-মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। এমন অসময়ে মা তো ডাকেন না কোনদিন। ডাক শুনে মথুরবাবু গেলেন রাণীমার কাছে।

রাণীমা বললেন, গত দু'বছরে তুমি যে অর্থ ব্যয় করেছ বিভিন্ন কাজে—

মায়ের সব কথা শেষ করার আগেই মথুরবাবু বললেন, আপনি তার হিসাব চেয়েছিলেন, আমি সেই হিসাব আপনাকে দেব বলেছিলাম, কিন্তু আমার পক্ষে সেই হিসাব দাখিল করা সম্ভব নয়—

রাণীমা প্রশ্ন করলেন, প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করা যেমন দরকার, তেমনি

তার সঠিক হিসাব রাখা কি দরকার নয় ?

মথুরবাবু বললেন, দরকার—আর তার জন্য কাছারিবাড়িতে আপনি অনেক লোকই পুষছেন, আমি বুঝতে পারছি না তারা থাকতে আপনি আমার কাছে হিসাব তলব কেন করছেন ?

রাণীমা বললেন, মথুর, মনে কর তোমার একটা দোকান আছে। তোমার বাড়ির লোকেরা সংসার বা নিজের প্রয়োজনে যখনই যেটা দরকার সেই দোকানে ঢুকে সেটা নিয়ে যায়—এক্ষেত্রে তোমার কী করা দরকার ?

মথুরবাবু নিরুত্তর। রাণীমা আবার বললেন, চুপ করে থেকো না মথুর উত্তর দাও—

মথুরবাবু বললেন, বাড়ির লোকেরা বাড়ির প্রয়োজনে—সংসারের প্রয়োজনে দোকান থেকে সব কিছু নিতে পারে, এমন নির্দেশ দিয়ে রাখা দরকার—

রাণীমা উত্তর শুনে, মথুরবাবুর মত শিক্ষিত বিচক্ষণ মানুষের উপর ভিতরে ভিতরে তপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, বিচিত্র তোমার বিচার ! দোকান থেকে যার যা দরকার নিতে পারে বলে যেমন নির্দেশ দেবে, তেমনি তার হিসাব রাখবে না ! হিসাব না রাখলে কোন জিনিসটি ফুরিয়ে গেল, তা তুমি জানতে পারবে কেমন করে ? যখন তোমার প্রয়োজন, যখন দোকান রক্ষা করা প্রয়োজন, তখন যদি দেখ তোমার দোকানে প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই নেই, তখন কী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে ?

মথুর বললেন, মা—আপনি আমাকে বলুন, আসলে কী বলতে চান—, মথুরামোহনের গলায় উত্তেজনার প্রলেপ !

রাণীমা বললেন, তুমি তোমার দোকানকে তোমার নিজের দোষে ধ্বংস করতে পার, তা বলে আমি পারি না। এ আমার একদিকে শ্বশুর অন্যদিকে আমার স্বামীর তীর্থ, সেই তীর্থে এক মুঠো ধুলো অপ্রয়োজনে ফেলে দিতে পারি না, এমন কি বাতাস যদি বিনা কারণে এ তীর্থের এক মুঠো ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যেতে আসে,—আমি আমার জীবন দিয়ে সেই বাতাসকে রুখবো মথুর ! সংসার, প্রজা সবার প্রয়োজনে অর্থ নেবার অধিকার যেমন তোমাকে দিয়ে রেখেছি, তেমনি তার হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় তুমি আমাকে অথবা কাছারীতে নায়েবমশাইকে বুঝিয়ে দেবে, সেই নির্দেশও দিয়েছিলাম। কিন্তু বছরের পর বছর চলে গেছে তুমি তার হিসাব দাওনি। আমি মনে করছি হিসাব তুমি দিতে পারবে না—ইচ্ছাকৃতভাবে দিতে চাও না।—এখন তুমি

এস, আগামীকালের মধ্যে সব হিসাব একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবে—

মথুরবাবু এবার মায়ের এই কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, মা, আমি কোনদিন আপনার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কোনরকম প্রতিবাদ করিনি, উত্তেজনা দেখাইনি, কিন্তু আজ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন। তাছাড়া আমি আপনার জামাই সে কথাও আপনি মনে না রেখে গৃহভৃত্যের মত আমাকে দেখছেন। আমি আপনার নায়েবের মত হিসাব দিতে পারব না, আগামীকালই আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আপনা'র বাড়ি থেকে চলে যাব—কথাগুলো একটানা বলে মথুরবাবু অত্যন্ত উত্তেজনা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাণীমা বিন্দুমাত্র উত্তেজনা দেখালেন না! পরের দিনই মথুরবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জানবাজারের প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

মথুর গেলেন কোথায় ?

প্রথম দু'দিন কেটে যাবার পর রাণীমা নিজেকে কিছুটা সহজ করে নিলেন। এ দু'দিন বড় বিষন্ন হয়ে ছিল বাড়িটা। আসলে রাণীমার মনের সঙ্গে এই প্রাসাদের ইঁট-কাঠ-পাথরের মন যেন একই সুরে বাঁধা। মথুরবাবুর সঙ্গে মায়ের হিসাব-সংক্রান্ত ব্যাপারে চাপা মন কষাকষি থেকে এ পর্যন্ত, এ বাড়ির প্রতিটি মানুষ থেকে শুধু করে, দাঁড়ে-বসা কাকাতুয়াটির মন এতই ভারাক্রান্ত ছিল, যাতে সকলেরই ধারণা হয়েছিল কোথায় যেন কী একটা হারিয়ে গেছে। একান্ত প্রিয় কিছু বিয়োগ ব্যথার ছাপ! শুধু দু' এক জনের মুখে চাপা আনন্দের রেখা!

আজ সকাল থেকে সেই মেঘ একটু একটু করে আবার সরে যেতে থাকল। রাণীমা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে দেখা করলেন। কাছারি বাড়ি থেকে নায়েব মশাই এলেন! বৃদ্ধ নায়েব বললেন, মা আপনি যদি অনুমতি দেন, একটি খবর পেশ করতে পারি—

রাণীমা বললেন, বিষয়-আশয়, ধন-সম্পদের হিসাব বাদ দিয়ে যদি অন্য কোন খবর দিতে চান দিতে পারেন।—

বৃদ্ধ নায়েব বললেন, বলছিলাম কি, আপনি সেজবাবুর চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলুন ; খবর পেয়েছি সেজবাবু আছেন ফরাসডাঙ্গায়!—আপনি যদি বলেন তাহলে লোক পাঠিয়ে সেজবাবুকে যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারি—

রাণীমা হেসে বললেন, তার দরকার নেই!—আমি কি ভাবছি জানেন

নায়েব মশাই, মথুর তো আমার জামাই নয়, সে যে আমার একমাত্র পুত্র সন্তান। আমি তো কোনদিন তাকে জামাই হিসেবে দেখিনি, আমি তাকে আমার নিজের বড় প্রিয় পুত্রের মত দেখেছি। অথচ মা হয়ে যখন তাকে শাসন করলাম, যখন তাকে শুধরে দিতে চাইলাম, তখন সে আমাকে 'মা' বলে ভাবতে পারল না। তাই আমার কী মনে হয় জানেন, আমিই এ জন্যে দায়ী। আমি যত সহজে মথুরের সামনে 'মা'য়ের দাবী নিয়ে নিজেকে তুলে ধরেছি, তত সহজে নিশ্চয়ই তার প্রতি এমন কোন দৃষ্টান্ত রাখতে পারিনি যাতে সে আমাকে মায়ের মতই জেনেছে! তাই, আপনি আমার ফরাসডাঙ্গায় যাবার আয়োজন করুন। আমি নিজে গিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনব ছেলে যদি অবোধ হয়, অবুঝ হয়, মায়ের ওপর রাগ করে, অভিমান করে দূরে সরে থাকে, মা হয়ে আমার কি উচিত ছেলের ওপর রাগকে পুষে রাখা?—উচিত নয়। আমি নিজে যাব, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনব তাদের—

কথা শুনে বাড়ির সকলে অভিভূত হয়ে গেল! মায়ের প্রকৃত রূপ দেখে বৃদ্ধ নায়েব মশাই ভাষাহীন হয়ে গেলেন। শ্রদ্ধায় তাঁর মাথা নত হয়ে গেল। দু'হাত তুলে রাণীমায়ের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে নায়েব মশাই ফিরে যাবার সময় বললেন, আমি আপনার যাত্রার আয়োজন করি গে—

রাণীমার মনের আকাশে ভোরের সূর্য উদয় হলো!



রঘুনাথ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন আমার ভিতর দিয়ে, তোমরা আমার রঘুনাথের জয়ধ্বনি দাও, প্রণাম জানাও তাঁর পাদপদ্মে। নিজেকে সম্পূর্ণ করে নিবেদন কর তাঁর চরণে যাঁর সন্তান তোমরা!—

কথাটা সেদিন আর একবার বলেছিলেন রাসমণি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে! অনেক পথ হেঁটে আসা জীর্ণ বসন, শীর্ণ শরীর ব্রাহ্মণ যখন জানবাজারে প্রাসাদের ফটকের কাছে পোঁছে জ্ঞানহারা হয়েছিলেন, সেদিন ঠাকুর ঘরে বসে থাকতে থাকতে রাণীমার মনও বড় চঞ্চল হয়েছিল।

তিনি যেন দেখেছিলেন, দূর্বাদলে ভোরের শিশির বিন্দুর মত রঘুনাথজীর মূর্তির সর্বাঙ্গে জল বিন্দু! রাণীমার অন্তর কেঁপে উঠেছিল। দু'চোখে বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। যাঁকে রাসমণি সেই কিশোরী বয়স থেকে বুকে বুকে

রেখেছিলেন, যে রঘুবীরকে রাসমণি পুজো করছেন এত বছর ধরে দেবতা জ্ঞানে, তাঁর মূর্তিতে এই জল বিন্দু দেখে রাণীমার হৃদয় উদ্বেলিত হলো। এ সত্য না চোখের ভুল! মনের দুর্বলতা!

রাণীমার একবার মনে হলো. রুপোর থালায় রাখা ফুল তুলে রঘুনাথের অঙ্গ সাজাতে গিয়ে হয়ত পাত্রের জল লেগেছে মূর্তিতে! নিজের মনকে সংযত করে রাণীমা নব বস্ত্রের টুকরো দিয়ে শিলাখণ্ড মুছে দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! যত মোছেন ততই ঘামতে থাকে মূর্তির গা!

ঠিক তখনই ঠাকুর ঘরের দরজায় জামাই মথুর। মথুর কখনো পুজোর সময় আসেন না এখানে। পুজোর সময় রাণীমাকে বিরক্ত করে না এ বাড়ির কেউ। অথচ ঠাকুর ঘরের দরজায় মথুর। মথুর অনেকটা দ্বিধা নিয়ে ডাকলেন,—মা—

রাণীমা ফিরে তাকালেন মথুরের দিকে। মুখে কথা ফোটবার আগে মথুর বললেন. মা সর্বনাশ হয়েছে! একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের বাড়ির দরজায় মূর্চ্ছা গেছেন! সেই ব্রাহ্মণকে দরজা থেকে তুলে এনে ঠাকুর দালানে শুইয়ে দিয়ে, আমরা তাঁকে অনেকটা সুস্থ করেছি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর পরনের এক ফালি ময়লা ধুতির খোঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছছেন, আর রাণীমা-রাণীমা বলে চিৎকার করছেন—

রাণীমা নিরুত্তর। রাণীমা তাকালেন রঘুনাথের দিকে। সিক্ত রঘুনাথ। রাণীমার দু'চোখও সিক্ত হলো! প্রায় পাগলিনীর মত রাসমণি ছুটে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর ঘর থেকে। তারপর বেগবতী যমুনাধারার মত প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ঠাকুর দালানে অধীর, অস্থির বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সামনে দাঁড়ালেন। মা যেমন করে তাঁর সন্তানকে কোল দেন তেমনি করে রাণীমা সেই বৃদ্ধের সামনে বসে সযত্নে তাঁর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত শরীরে থানের খোঁট বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, বলুন বাবা, কে আপনি? কোথায় যাবেন?

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি রাণীমার কাছে যাব—দেবী রাসমণির কাছে আমাকে নিয়ে চল।

রাণীমা বললেন, দেবী বলবেন না বাবা, বলুন রাসমণি। আপনি যার কাছে এসেছেন আমিই সে। আমি রাসমণি!—

ব্রাহ্মণ রাণীমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, হ্যাঁ ঠিকইতো! চোখে ছানি পড়েছে, আমার মরার দিনও এসে গেছে। তাই তো চাঁদের কোলে মাথা রাখার সুযোগ পেয়েও চাঁদ চিনতে পারিনি মা। তুমি সুখে থাক, তুমি সুখী হও, আমি ব্রাহ্মণ মানুষ—আমার আশীর্বাদ মিথ্যে

হবে না মা—

রাণীমা বললেন, বলুন বাবা, আমি কি দিয়ে সেবা করবো আপনার ?

ব্রাহ্মণ ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমার দুটি বয়স্থা মেয়ে। বিয়ের বয়েস তাদের পার হয়ে যাচ্ছে, আমি বহু চেষ্টা করেও তাদের বিয়ে দিতে পারিনি। এবার পাত্র পেয়েছি মা, কিন্তু টাকা নেই, তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দাও— আমাকে বাঁচাও—, কন্যাদায় থেকে আমাকে মুক্ত কর মা, তোমার কল্যাণ হবে।

এক হাজার টাকা পেলে আপনার সব কাজ শেষ হবে তো ? বাবা ? বললেন রাণীমা।

—হ্যাঁ মা —, তুমি আমাকে বাঁচাও কথা বলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললেন। রাণী সান্ত্বনা দিলেন। নিজের হাতে ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেন তিনি, তারপর বিশ্বস্ত সরকার মশাইকে ডেকে বললেন,—আপনি হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে যান। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এঁর এই কন্যার বিবাহকর্ম ভালভাবে সমাধা করে ফিরবেন—

সরকার মশাই মাথা নত করে সেই নির্দেশ মেনে নিলেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন তিনি। যাবার সময় ব্রাহ্মণ আবার দু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

দু'দিন পর সরকার মশাই ফিরে এলেন। রাণীমা বললেন,—সব কাজ ভাল ভাবে মিটেছে তো ?

সরকার মশাই বললেন, হ্যাঁ, আমি দাঁড়িয়ে থেকে সব কাজ শুধু ভালমত মিটিয়েই আসিনি, বিয়েতে ব্রাহ্মণ বলেছিলেন হাজার খানেক টাকা খরচ হবে, শেষ পর্যন্ত খরচ হয়েছে এক হাজার দু'শ টাকা। আমি শ' তিনেক টাকা ফিরিয়ে এনেছি

কথাটা বলে সরকার মশাই যতখানি আত্মসুখ লাভ করলেন, যতখানি নিজের সততা প্রকাশ করলেন, রাণীমা ঠিক ততখানি ব্যথিত হলেন। আহত হলেন মনের দিক থেকে। বললেন, সরকার মশাই, আপনারা যদি সামান্যতম স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন তাতে আমাদের সকলের কল্যাণ হতো। আমি কি আপনাকে ঐ দেড় হাজার থেকে কিছু বাঁচিয়ে ফেরত আনতে পারেন কি না দেখবেন —এমন কোন নির্দেশ দিয়েছিলাম ? দিই নি, কিন্তু যদি তা দেবার প্রয়োজন থাকত, তা হলে সে ভুল আমি করতাম না তা আপনি ভাল করেই জানেন। অথচ আপনি টাকা বাঁচিয়ে কিছুটা ফেরত এনে আমার কাছে

সততা রক্ষা করছেন। আপনার স্বার্থ হলো আমার কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করা। একটা কথা মনে রাখবেন সরকার মশাই, তহবিলের অর্থ সঠিক ভাবে ব্যয় করতে না পারাটা যেমন অপরাধ, তেমনি সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে ব্যয় না করে ফেরত খাতে দেখানো বা চুরি করা একই কথা! আপনি চুরি করলেন না. আবার যে কাজ করতে রঘুনাথের নির্দেশ সেই কাজটিও ষোল আনা করলেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে কন্যা উদ্ধার করলেন, কিন্তু কন্যা পাত্রস্থ হবার পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে অন্ততঃ ক'দিন বাকি টাকায় দু'মুঠো খেতে পেতেন তা আপনি তলিয়ে ভাবলেন না। ভাবলেন টাকা ফেরত আনলে আমাকে খুশি করা যাবে—!

নীরব সরকার মশাই। রাণীমার এ কথার যথেষ্ট যুক্তি আছে. তাই নিজের অপরাধ বোধ সরকার মশাইকে অনুতপ্ত করল। তিনি কিছু বলতে চাইছিলেন। তাঁর মুখে ভাষা ফোটার আগেই রাসমণি বললেন,—আপনি আবার সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে যান, ঐ টাকার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে ব্রাহ্মণকে যতটা দিন পারেন একটু বাঁচিয়ে রাখার সুযোগ দিন—সরকার মশাই নীরবে চলে গিয়েছিলেন।

এরপরই রাসমণি তাঁর রঘুনাথকে বুকে আঁকড়ে ধরে তিন দিন, তিন রাত্রি নির্জলা উপবাস করে পড়েছিলেন ঠাকুর ঘরে। আর এই তিন দিন তিন রাত্রি জানবাজারের বাড়িতে কারও মুখে কোন কথা ছিল না। কথা ফুটল সেইদিন যেদিন রাণীমা ঠাকুর ঘরের বাইরে এসে মেয়ে জামাই-নাতিদের সঙ্গে বসে শ্বেত পাথরের গেলাসে সরবৎ খেলেন।

কিন্তু সকলেরই কৌতূহল জেগেছিল মনে! সকলের ভিতরটা ছটফট করেছিল একটা কারণে. তা হলো সেই বৃদ্ধের কন্যাদায়ের কাজ সমাধা করার পর থেকে কেন মা ছিলেন ঠাকুর ঘরে? কেন তিন দিন তিন রাত্রি তিনি জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন নি!

এই জিজ্ঞাসা কেউ মুখ ফুটে করতে পারেনি বটে, কিন্তু সকলের চোখে মুখে সেই জিজ্ঞাসা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাণীমা বুঝতে পেরে স্মিত হেসেছিলেন মাত্র।

রঘুনাথের সর্বাঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্লান্তির ঘাম ঝরার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন নি রাণীমা, তবে সেই ঘটনার ইতিবৃত্তের আবছা বর্ণনা দিয়েছিলেন।

কয়েক বছর পর সেই বৃদ্ধের এক স্মৃতিকে অনেক কাল ধরে বহন করেছিলেন তিনি। সেই স্মৃতি হলো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এক নাতি! ঘটনাটি একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার! একদিন একটি বালকের হাত ধরে জানবাজারের বাড়িতে এসেছিলেন একজন মহিলা! আসলে তা নয়, এক মলিন বসনা, শীর্ণকায়া মায়ের হাত ধরে এসেছিল এক বালক। রাণীমার সঙ্গে সেদিন অতি সহজে মা-বেটা দেখা করেছিল। রাণীমা বলেছিলেন, তোমরা কারা বাছা?—

ক্লান্ত-অবসন্ন, চক্ষু কোটরাগত সেই মা বলেছিলেন, আমার বাবা ছিলেন গরীব ব্রাহ্মণ। কন্যাদায়গ্রস্ত সেই ব্রাহ্মণকে টাকা দিয়ে আপনি যদি সেদিন না বাঁচাতেন, তা হলে এই ভাগ্যহীন ছেলের মা হওয়া আমার হতো না রাণীমা, আমি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কন্যা, ও আমার ছেলে!

তারপর বিস্তারিত বলা। ক্লান্ত মা তার হঠাৎ কপাল পোড়ার কাহিনী বলেছিলেন। স্বামী আমার থেকেও নেই। এক রত্তি ছেলেটাকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারি না। দোহাই আপনার, আপনি আমার এই একমাত্র ছেলেকে কোল দিন মা। ওকে আপনার কাছে রেখে যেতে চাই! ও আমাদের কাছে থাকলে অনাহারে আমার চোখের সামনে মরে যাবে! ও প্রাণে বাঁচলেও মানুষ হবে না মা। আপনার দু'খানা পায়ে পড়ি, আপনি ওকে আশ্রয় দিন।

রাণীমা, সেই মাতৃ প্রতিমাকে মাটি থেকে তুলে বুকে ধারণ করেছিলেন। আঁচল দিয়ে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার মতই এক দীন মহিলা। তোমরা আমার কাছে যারা এমন করে ছুটে আস, তারা সবাই আস তোমাদের রাণীমার কাছে! আমি টাকা-সোনা-দানার রাণী নই মা, যা কিছু সবাই দেখছে এ সব কিছুই রঘুনাথের। তাঁর যা কিছু কর্ম, আমার ভিতর দিয়ে তাই তিনি করাচ্ছেন। আমি বিশাল বাড়িতে আছি, তুমি আছ পথে। কিন্তু আমি বিশাল বাড়িতে তোমার মতই আছি! আমার ঐশ্বর্য-ঈশ্বরের পরীক্ষা। আমরা একই মাষ্টারের দুই ছাত্রী! ভয় নেই মা। তোমার ছেলেকে আমি নিলাম। ওকে দেখবেন ঈশ্বর। ও লেখাপড়া শিখে যাতে তোমার সব দুঃখ ঘোচাতে পারে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাই করবেন—

সেই থেকে সেই ব্রাহ্মণ-বংশের বংশধর এই জানবাজারের বাড়িতেই থেকে গেল।



এক সময় কলকাতার বুকে 'পক্ষীর দল' খুব নাম করেছিল। আসলে গানের দল। রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র ছিলেন উড়িষ্যাবাসী। জন্মেছিলেন কলকাতার মলঙ্গা লেনে ১৮১৪ সালে। কালক্রমে গানের দল খুলে 'পক্ষী' উপাধি নিয়ে মাতিয়ে দিলেন সবাইকে। রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, আশুতোষ দেব থেকে অনেকেই তাঁকে সমাদর করতেন। গান লিখেছিলেন তিনি —কলকাতার হালচাল দিয়ে। নামকরণ করেছিলেন—কলিকাতা বর্ণন। সিন্ধু কাফী রাগে গানটি গাইতেন তিনি ও তাঁর দোহাররা আসরে —। তাতে একটি অংশ ছিল এইরকম।

"...লালাবাবু, আশুতোষ, মতিলাল শীল,

কৃষ্ণ বোস, পুণ্যবান নির্দোষ,

অকুতো সাহস, স্বর্ণময়ী রাসমণি,

আছেন বহু দানী মানী গুণী জ্ঞানী শিরোমণি,

অধ্যাপক বিদ্যাসাগর।"

(কলকাতার গাছে পাতায় রত্ন গাঁথা কোথা লাগে রত্নাকর)।"

ঈশ্বরচন্দ্র তখন 'বিদ্যাসাগর' হয়ে গেছেন। ১৮৫১ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কাজ করছেন। সকলে এক ডাকে চেনে তাঁকে। অমন পণ্ডিত মানুষ —অথচ কি দয়া সাধারণের জন্য। এই ব্রাহ্মণ যুবকটি নারী-সমাজের দুঃখ মোচন করতে বদ্ধপরিকর, আবার বইও লেখেন। বিধবা নারীদের কষ্ট লাঘব করতে, নারী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। পিছনে-সমালোচনার ঝড় বইছে—তাতে কি? ভাল কাজ করতে গেলে অমন হয়।

ওদিকে প্যারীমোহন সেনের নাম তখন খুব কলকাতার ধনী মহলে। শিক্ষিত পরিবার। ছেলে কেশবচন্দ্র তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ডিরোজিওর প্রভাব তাঁর মধ্যেও। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভায়, আলোচনা কক্ষে তাঁকে দেখা যায়। দু'চোখে তাঁরও স্বপ্ন

সমাজকে কলুষমুক্ত করতে হবে। সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে হবে মানুষের মনকে। বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ সমর্থন করেন তিনি। ওজস্বিনী ভাষায় সে বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্র সমাজকে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন কেশব! বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে জনমত তৈরি করছেন। শহর উত্তাল।

রাসমণিও শুনছেন—বুঝতে পারছেন কোথাও একটা ভাঙন শুরু হয়েছে। আসছে বিরাট একটা পরিবর্তন। দ্রুত রূপবদল হচ্ছে সমাজের।

একটা সময় ছিল শুধুই আয়াসের, আনন্দের, আরামের!

কিন্তু নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল পড়লে যেমন তরঙ্গ ওঠে তেমনি ঢেউ-এর ওঠা-পড়া মানুষের মনে। কোম্পানীর অত্যাচার বাড়ছে আর ওদিকে নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেয়ে প্রতিবাদী মনগুলো সোচ্চার হয়ে উঠছে ক্রমশঃ

এ তো গেল শহর জীবনের কথা।

কিন্তু ১২৪২ সনের ৬ই ফাল্গুন, বুধবার রাত্রি অবসানে যে শিশুটি কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় আর চন্দ্রমণি দেবীর জীর্ণ কুটিরে জন্ম নিয়েছিল তার কথা এবার একটু বলা দরকার।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বহুদিন গত হয়েছেন। শিশু গদাধরও আর ছোটটি নেই। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স সাত বছর ছিল। এখন তিনি ১৭।১৬ বছরের যুবা।

কিন্তু কাহিনীর আগেও থাকে আরও কিছু কাহিনী। কৃষ্ণ বড় হচ্ছেন গোকুলে—একদিন জগতের অন্ধ-তামস রজনী দূর করে প্রভাতের সূর্যের পরশ আসবে তাঁরই হাতে। এ তো শুধু জন্ম নয়—এ আবির্ভাব। সত্যের প্রকাশ, ধর্মের প্রকাশ আর অসত্যের বিনাশ!

তাই একবার পিছু ফিরে তাকান যাক।

শরৎ গেল। হেমন্তও বিদায় নিল নিয়মের অনুশাসনে।

বসন্তের মৃদু সমীরণে মাটির ধরণীর বক্ষে আনে তৃপ্তি। ফাল্গুনের মাত্র পাঁচটি দিনের অবসানে ছ'দিনের দিন। দু'টি চোখ মেলে আকাশ দেখলেন চন্দ্রমণি। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করলেন অনেকেই। সবাই দু'চোখ ভরে দেখলেন আকাশ। দেখলেন স্বয়ং ক্ষুদিরাম। আকাশ দেখে, তারা দেখে, রুপো বর্ণ চাঁদ দেখে এক বুক নিশ্বাস ফেলে ক্ষুদিরাম গেলেন ঘরে। ক্ষুদিরাম চাটুজ্জ্যের ছেলে রামকুমার। রামকুমারের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল মাত্র কয়েকটি শব্দ।—বাবা দেখুন আকাশ, এমন নির্মল আকাশ আগে তো

কখনও দেখিনি—!

আজ সকাল থেকে এমনি করেই যেন নতুন করে দেখার পর্ব চলছে এ বাড়ির সবার। যেদিকে চোখ যায় সেদিকটাই যেন একেবারে নতুন। আমগাছে ভরা মঞ্জরী যেন হঠাৎ চোখে পড়া। বাড়ির উপর দিয়ে একবার নয়, আজ বার কতক টিয়ার ঝাঁক উড়ে গেছে আনন্দের আতিশয্যে। দূরে কোথাও দিন ভোর ডেকেছে কোকিল। প্রত্যূষে ক্ষুদিরাম প্রথম অবাক হয়েছিলেন বাড়ির জবা গাছটি দেখে। অবাক হবারই কথা, এক সঙ্গে সব কুঁড়ি ফুটে জবা ফুলে ভরা গাছ।

আনন্দ উৎসবে যেন মেতেছে চারদিক। স্ত্রী চন্দ্রমণির কথা ভেবে সারাদিনের সঞ্চিত আনন্দের ধারা ক্ষুদিরাম যেন সযত্নে লালন করেছেন মনের গভীরে। চন্দ্রমণি আবার মা হতে চলেছেন এর চাইতে বড় আনন্দের খবর ক্ষুদিরামের কাছে আর কীইবা থাকতে পারে? তবুও মাঝে মাঝে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে, বুঝেছেন, সে দেহ আর এক দেহ ধারণ করে অতীব ক্লান্ত। বড় বেশী অস্বস্তিতে অধীর! তাই এই সব খুশি আর আনন্দের অংশীদার হয়ে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি সারাদিন। রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ঢোকার আগে সেই মেঘমুক্ত আকাশ দেখে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন চন্দ্রমণি।

রামকুমার যদিও বড় ছেলে, তবুও কতই বা বয়স তাঁর! সেই রামকুমার কিন্তু আকাশ দেখে বুঝেছিলেন, আজ প্রকৃতি মেতেছে খুশিতে!

ধনী এসেছে অনেকক্ষণ। চন্দ্রমণির সঙ্গে আজ রাত্রে ধনী কামারনী থাকবে।

ধনী তাই ছিল। চন্দ্রমণির শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিতে দিতে বলেছিল,—আজ আকাশের ঐ চাঁদটা তোমার এই কুঁড়ে ঘরে কখন যে নেমে আসবে আমি শুধু তাই ভাবছি—

ধীরে ধীরে শুভ ফাল্গুনীর শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি এলো! রাত শেষ হতে আর মাত্র অর্ধদন্ড বাকী, এমন সময়ে চন্দ্রমণি অসহ্য প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হলেন!

চন্দ্রমণি যত যন্ত্রণায় অস্থির, ধনী ঠিক ততটাই সংযমী। তার শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা, আকাশের চাঁদ নামুক কুঁড়ে ঘরে।

ধনী বলল, আর দেরী নয়, চল ঢেঁকিশালে—

এই তো সেদিনের নিখুঁত ছবি! মাটিতে জন্ম নিয়ে মাটিতে লীন হওয়ার এই তো তত্ত্বসার।

বিলাস নয়, প্রাচুর্য নয়, ঐশ্বর্য আর অপার বৈভবের মধ্যে বিজ্ঞান সভ্যতার হাত ধরে নয়, ধনীদের মত মেয়েদের একান্ত ইচ্ছাশক্তি বলে, অনন্ত প্রেমধারায় নবজাতকের আবির্ভাব ঘটল ঢেঁকিশালে। কৃষ্ণ জন্মেছিলেন কারাগারে-নিবিড় অন্ধকারে, যীশু এসেছিলেন আস্তাবলে, রামকৃষ্ণ এলেন ঢেঁকিশালে। ঢেঁকিশালে তৈরী আঁতুর শয্যায় চন্দ্রমণি করলেন সন্তান প্রসব।

প্রসবান্তে ধনী যখন চন্দ্রমণিকে সেকালের প্রথা মত পরিচ্ছন্ন করে তুলতে ব্যস্ত তখন, রক্ত ক্লেদময় পিছল ভূমিতে কি জানি কেমন করে, পাশে ধান সেদ্ধ করার বৃহৎ উনুনের ভিতর সদ্যজাত সন্তান হলো পতিত।

ধনী বিস্মিত! নিদারুণ বিচলিত! কোথায় সদ্যজাত সন্তান। সহসা ধনী দেখে, উনুনের মধ্যে বিভূতি বিভূষিত সেই সদ্যজাত। অতি যত্নে ধনী তাকে তুলে আনে দু'হাতে। অতি দ্রুত তাকে পরিস্কার করে। দীপের আলোয় এবার সদ্যজাতকে দেখে ধনী বিস্ময়াভিভূত!

এ যেন সত্যি সেই আকাশের চাঁদ! আরও বিস্ময়, সদ্যজাত যেন ছ'মাসের শিশু। ধনী খুশিতে-আনন্দে দিশাহারা! সে পুত্র সন্তানের জন্ম বার্তা ঘোষণা করল।

ব্রাহ্মমুহূর্ত মুখরিত হলো শঙ্খনিনাদে।

পুরবাসীরা শঙ্খরব শুনে হাত জোড় করে আপন মনে অলক্ষ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন, আসলে মানবদেবতার প্রতি মানবের শ্রদ্ধাঞ্জলি হলো নিবেদিত।

কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান সকলেই।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শুধু নন তিনি, শাস্ত্রজ্ঞও বটে। শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম স্বয়ং তাঁর নবাগত সন্তানের জন্মলগ্ন নিরূপণ করলেন! ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শুক্লপক্ষ, বুধবার। ক্ষুদিরাম স্থির জানলেন এক শুভক্ষণে, শুভলগ্নে এই সংসারে নবাগতের আবির্ভাব। শুভ দ্বিতীয়া তিথি। আসলে এই সময়ে পূর্ব ভদ্রপদ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত!

ক্ষুদিরাম স্পষ্ট দেখলেন, নবজাতকের জন্ম লগ্নে রবি, চন্দ্র আর বুধ এক সঙ্গে মিলেছে, তুঙ্গস্থানে বিরাজমান শুক্র, মঙ্গল আর শনি। মানব জন্মে এমন ভাব বিরল!

আপন সন্তানের ললাট গণনায় ক্ষুদিরাম ষোল আনা সফল হওয়া সত্ত্বেও

যেন অতৃপ্ত। অবশেষে ক্ষুদিরাম তাঁর পরিচিত মহল্লের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদদের সাদর আহ্বান জানিয়ে নিয়ে এলেন বাড়িতে। সকলেই স্তম্ভিত! তাঁরা স্পষ্ট দেখলেন, এই নবজাতক এমনই উচ্চলগ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন যাতে নিতান্ত বালক বয়স থেকে দেহরক্ষার কাল পর্যন্ত শুধু নয়, সর্বকালের জন্য হবেন সর্বজনের পূজ্যপাদ। হবেন ধার্মিক. পুণ্যবান। সারাজীবন ধরে পুণ্যকর্মের মধ্যে বিরাজমান থাকবেন. সংসারে আসক্তি থাকবে না, বিবাহিত জীবনের বন্ধন স্বইচ্ছায় গ্রহণ করবেন অথচ কোন বন্ধনই তাঁকে আবন্ধ করবে না। বহু শিষ্য পরিবৃত এই মানব সন্তানের বাসগৃহ হবে কোন দেবালয়। আর আপন মনের মাধুর্য বিলিয়ে ইনি হবেন 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'! ..

সন্তানের নাম রাখলেন ক্ষুদিরাম—গদাধর!

দিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গদাধরের বয়স বাড়তে থাকে! বয়স যত বাড়ে শুধু ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণি বিস্ময়ে হন হতবাক! বিস্ময়কর মেধা আর স্মরণীয় প্রতিভার কল্পনাতীত বিকাশ! সকলের বাসনা, গদাধর পাঠশালায় যাবে! এই গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি অর্থাৎ জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ির সামনে নাটমন্দিরে মাস কয়েক হলো পাঠশালা বসেছে। গ্রামের বালকদের জন্য মনোরম বিদ্যামন্দির। ক্ষুদিরাম গেলেন পাঠশালায়। গদাধর এখানে পড়বে তার ব্যবস্থা পাকা করে এলেন তিনি।

গদাধরও নিত্য যায় পাঠশালায়! বাড়ির সকলে পরম তৃপ্ত! অকস্মাৎ একদিন ক্ষুদিরামের কানে এলো সব। গদাধর বড় দুরন্ত। সে পাঠশালায় আসে না, বন্ধু জুটিয়ে খেলা করে হাটে-মাঠে-বাটে!

একদিন ক্ষুদিরাম সস্নেহে বালক গদাধরকে ডেকে, নিজের প্রকাণ্ড বক্ষের মধ্যে তাকে আঁকড়ে ধরে বললেন,—গদাই. শুনছি তোর নাকি পাঠশালার পাঠে মন বসে না?

গদাধর বলল, মনটাতো জমিদার বাড়ির খাঁচায় বাঁধা পাখীর মত! তুমি যদি ঐ পাখীকে জিজ্ঞেস কর. তোমার মন কি বসেছে খাঁচায়?—পাখী বলবে, না। মনটা পাখীর মত, তাকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখতে কষ্ট হয় বাবা—গণিত আমার মনে থাকে না, ওখানে শুধু হিসেব নিকেশ!

এরপরেই দেহ দুলিয়ে, চোখ নাড়িয়ে, মুখ ঘুরিয়ে বালক গদাই শোনায় চৈতন্য চরিতামৃতের গান!

বিস্ময়ে হতবাক হন ক্ষুদিরাম। ঠিক এমন করে নেচে নেচে, অপরূপ ভঙ্গিমায় ঠিক এই অমৃতবাণীতে, ঠিক এই সুর মিশ্রিত গান কোথায় যেন

শুনেছেন তিনি ! মনে করার চেষ্টা করেন। মনটাকে নিয়ে যান এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। আসলে মনে মনে খুঁজে বেড়ান, এই চৈতন্যলীলার গান বা কথকথা কোথায় যেন শুনেছেন ! মনে পড়ে যায় সব। এই তো সেদিন অতি স্নেহের বোন রামশীলার শ্বশুর বাড়িতে সুন্দর এক অনুষ্ঠান ছিল। ভগবানের নাম-গানের অনুষ্ঠান। অষ্টপ্রহর শতনাম জপের আয়োজন। তারপর ভগবানের লীলাভিনয়। কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা। যিনি কৃষ্ণ তিনিই চৈতন্য। কাজেই সেই অপরূপ আসরে না যাওয়া কী সম্ভব ?

কামারপুকুর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে, পশ্চিম দিকে ছিলিমপুরের বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে ক্ষুদিরামের বোন রামশীলার বিয়ে হয়েছিল। বড় ধার্মিক পরিবার। এমন মিলন, এমন রাজজোটক মিল যদি ঈশ্বর চান —খণ্ডায় কে ?

ক্ষুদিরাম আর তাঁর পরিবারের সকলেই ধর্মভাবে আত্মহারা। সেই পরিবারের কন্যা যখন অন্য পরিবারের বধূ হয়ে যাবে তখন সব দিকটা ভাল করে দেখে, সব কিছু ভাল করে জেনে তবেই তো কন্যা সম্প্রদান ?

তাই হয়েছিল। যা চেয়েছিলেন কন্যাপক্ষের সকলে, কন্যা রামশীলার বিধিলিপিতে তাই ছিল লেখা। ক্ষুদিরাম একরাশ তৃপ্তি পেয়েছিলেন। অতি স্নেহের বোন যে ঘরে যাচ্ছে সে ঘরে যা যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজ করছে তা হলো ধর্মভাব ! আর একমাত্র সেই কারণটিকেই বড় করে দেখে রামশীলাকে তুলে দিয়েছিলেন ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। নামের সঙ্গেও অদ্ভুত মিল ছিল পরিবারের ধর্মচেতনার ঐতিহ্যের।

সেই ভাগবতের ঘরে যথা সময়ে দুটি সন্তানের আবির্ভাব। রামশীলা আর ভাগবতের দুটি সন্তান লাভ হয়েছিল। একটি কন্যা অন্যটি পুত্র পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল রামচাঁদ, কন্যার নাম হেমাঙ্গিনী !

এখানে বলে রাখা দরকার, হেমাঙ্গিনী ছিলেন ক্ষুদিরামের অতি স্নেহের নিজের কন্যাটিকে সবাই যতখানি স্নেহের সঙ্গে দেখেন ক্ষুদিরাম তার চাইতে কম দেখতেন না হেমাঙ্গিনীকে। তাই নিজের মনের মত পাত্রস্থ করেছিলেন হেমাঙ্গিনীকে। কামারপুকুরের প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিমে সিহড় গ্রামের অবস্থাপন্ন অথচ ধার্মিক পরিবারে স্নেহের এই ভাগ্নী হেমাঙ্গিনীর বিয়ে দিয়েছিলেন ! ভাগ্নী জামাইয়ের নামও বেশ ! এও যেন এই পরিবারের ঐতিহ্যর সঙ্গে মিলেমিশে একেবারে গোড়া থেকেই একাকার। ভাগ্নী-

জামাইয়ের নাম কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই দুটি পরিবারেই তিথি—নক্ষত্র অনুসারে নানা রকম ভক্তি রসাশ্রিত অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। থাক সে সব কথা!

ক্ষুদিরামের মনে পড়ল ভাগবতের কথা! ভাগবত স্বয়ং এসে সেই কৃষ্ণ-যাত্রা আর চৈতন্যলীলা শোনার নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। আব্দার ছিল গদাই যেন যায় সঙ্গে! গদাই গিয়েছিল। সেই নামগান সব মন উজাড় করে ঢেলে দিয়ে শুনেছিল। যেমনটি শুনেছিল হুবহু তেমনি করে গদাধর গেয়ে নেচে শোনাল। ক্ষুদিরাম নিশ্চিত জানলেন—এ ছেলে এক বিরল প্রতিভা। এমন শ্রুতিধর সংসারে বিরল। এ এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম!

শুধু তাই নয়। ক্ষুদিরাম তাঁর অতি স্নেহের এই ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন,—আমি তোমাকে যে স্তোত্র পাঠ করে শোনাই দেবদেবীর সেই স্তোত্র, রামায়ণ মহাভারতের যে গল্প তোমাকে শুনিয়েছি তার কিছু যদি মনে রাখতে খুশি হতাম। কই তাতো রাখনি! চৈতন্যলীলার নাচ-গান দেখছি মনে রেখেছ—

বালক গদাধর যেন জানত, তার বাবা এই কথাই বলবেন। এ কথা বললে কী উত্তর হবে তাও তার জিভের ডগায় অপেক্ষা করছিল। মুখে কিছু না বলে, নিজের ক্ষমতা দক্ষতার কথা মুখে আউড়ে অহং প্রকাশ না করে, বাবার কথা শেষ হতেই বালক গদাই তার সুললিত কণ্ঠে সে সব আবৃত্তি করে শোনাল!

মহাশক্তি আদ্যামায়ের স্তব গাথা আবৃত্তি করল গদাধর। আবৃত্তি করল, শ্রীকৃষ্ণের একশত নামাবলী। ক্ষুদিরামের আর কোন সংশয় রইল না। কোন দ্বিধাও রইল না। তিনি স্পষ্ট বুঝলেন, এ ছেলেকে পাঠশালার নিয়ম বাঁধা শিক্ষার গণ্ডিতে শত চেষ্টা করলেও বেঁধে রাখা যাবে না। তিনি এও বুঝলেন, বাঁধা ধরা শিক্ষার আবর্তে গদাইকে জোর করে ফেলে দিলে, ফেলাই হবে সার, আসলে তার মনের চাহিদাকে করা হবে বিপন্ন!—

বাবা বললেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। একদিন মাত্র যে স্তোত্র তোমাকে আমি শুনিয়েছি সেই স্তোত্র তুমি হুবহু মনে রেখে আমাকে শোনালে, তাই আজ আমি তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। এমন এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাব, যেখানে গেলে তোমার খুব ভাল লাগবে! যাবে তুমি?—

গদাধর বলল, মাণিক রাজার ধন, এক রাজা তার পাহারাদার

চমকে উঠলেন ক্ষুদিরাম! বিস্ময়ের আতিশয্যে চমকে উঠে বালকের দু'বাহু শক্ত করে ধরে আলতো ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, কি বললি

তুই ! বাবা গদাই, বল বাবা এ কথার অর্থ কি ? কেন বললি ঐ কথা, মাণিকরাজার ধন, এক রাজা তার পাহারাদার। বল বাবা, অর্থ কি এ কথার ?

বালক গদাধর নীরব। মুখে শব্দ নেই, দু'চোখের পাতায় কোন কম্পন নেই। সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে ! মানুষের বিস্মৃতি ঘটলে যেমন হয় তেমনি ।

বার বার বলা সত্ত্বেও গদাই কোন উত্তর দিল না। ভাবখানা এমন, যা সে বলেছে তা সে বলেনি ।

ক্ষুদিরাম প্রায় উন্মাদের মত ছুটে গেলেন স্ত্রীর কাছে ! গদাধরকে ফেলে রেখে, আনন্দ-খুশিতে-বিস্ময়ে একাকার ক্ষুদিরাম গিয়ে দাঁড়ালেন স্ত্রী চন্দ্রমণির সামনে। আর পায়ে পায়ে মন্থর গতিতে বাবাকে অনুসরণ করে গদাধর এসে দাঁড়াল—মায়ের ঘরের দরজায়। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে সব শুনতে থাকল সে ।

স্বামীকে এ ভাবে আসতে দেখে চন্দ্রমণিও চিন্তিত হলেন। ক্ষুদিরাম সব বললেন সবিস্তারে। গদাইয়ের স্তোত্রপাঠ, চৈতন্যলীলার নাচ-গান। তারপর বললেন মাণিকরাজার কথা ।

বললেন, বৌ, কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, আমি গদাইকে বললাম বেড়াতে নিয়ে যাব। এমন জায়গায় নিয়ে যাব সেখানে গেলে তার ভাল লাগবে—! গদাইকে যেই জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যাবে গদাই ? গদাই বলল কি জান ? —মাণিকরাজার ধন, এক রাজা তার পাহারাদার—, এ কথার অর্থ জানতে চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই আর মুখ খুলল না—

চন্দ্রমণিরও চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল চিন্তার রেখা। তিনি মুখ খোলার আগেই ক্ষুদিরাম বললেন,—তুমি তো বিলক্ষণ জানো ভূরসুবোর জমিদার মাণিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যেমন ভক্তি করেন, তেমনি শ্রদ্ধাও করেন যথেষ্ট,—

ক্ষুদিরামের মুখের কথা প্রায় টেনে নিয়ে চন্দ্রমণি বললেন, তোমার মুখে তাঁর কথা অনেক শুনেছি। তুমিই তো বলেছ সেই জমিদারবাবু নাকি আর পাঁচজন জমিদারের মত না। তিনি মানুষ হিসেবে খুবই ভাল, তিনি নাকি দান-ধ্যানও করেন—

—ভেবেছিলাম গদাইকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে যাব, কিন্তু যেই বলেছি, গদাই তোকে বেড়াতে নিয়ে যাব এক জায়গায়, অমনি গদাই বলল ওই কথা। কথাটার তাৎপর্য কি হতে পারে আমার মত মানুষেও বুঝতে পারল না—

গদাইয়ের মুখে হাসির রেখা। এক আকাশ ভীত টুকরো-টুকরো মেঘের

আড়াল থেকে চাঁদের উঁকি দেওয়া। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল গদাই, এবার সেই হাসি মাখানো মুখ নিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো বাবা-মায়ের সামনে। বায়না ধরল বেড়াতে যাবার! মাণিক রাজার বাড়িতে বেড়াতে যাবে।

মা বললেন, বাবা গদাই, ও কথার মানে কি বাবা?

গদাধর বলল, কী কথা মা?

মা বললেন, মাণিকরাজার ধন, এক রাজা তার পাহারাদার—

গদাই ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকের ওপর। এক রাশ দামাল ঢেউ যেমন তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আছড়ে পড়ে - ঠিক তেমনি। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, আমি বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাব মাণিকরাজার বাড়ি। মাণিকরাজা ভাল লোক। আমাদের পাঠশালার গুরুমশায়ের মত না। গুরুমশাই অনেক লেকা-পড়া জানা লোক, তাই কেমন যেন রাগী-রাগী! বড় মানুষ তাই বড় দেমাক। মাণিকরাজাও বড় মানুষ। কিন্তু দেমাক নেই। থাকবে কেন, তাঁর তো দেমাক দেখাবার যো নেই, কারণ তিনি তো রঘুনাথের পুজো করেন। মনটা তাঁর পড়ে থাকে সেখানে। রঘুনাথ যা করান. তিনি তাই করেন—, আমি বাবার সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যাব।

আবার বিস্ময়! এবার চন্দ্রমণি আর ক্ষুদিরাম যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন না! তাঁরা নিজেদের মনকে নিজেরাই বার বার প্রশ্ন করেন -কে এই বালক? কে! মাণিকরাজার বাড়িতে বেড়াতে যাবেন ক্ষুদিরাম সে কথাতো তাঁর মনের কথা, সেই গোপন কথা কেমন করে জানল গদাই? মাণিকরাজা যে রঘুনাথের উপাসক, তিনি যে ধার্মিক. তিনি ধনী হয়েও যে সর্বদা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, তিনি যে 'ঈশ্বর বিনে জীবন নয়' তত্ত্ব কথায় বিশ্বাসী. তিনি যে প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত এমন তথ্য একমাত্র ক্ষুদিরাম ছাড়া যেখানে আর কেউ জানতেন না, সেখানে বালক গদাধর কেমন করে জানল তার বাবার মনের কথা?—এই প্রশ্নগুলি বার বার ওঁদের মনকে আন্দোলিত করতে থাকল!

যেমন করে আজও পার্থিব জীবনে প্রায় সব মানুষের মনকে আলোড়িত-আন্দোলিত করছে নিরন্তর সেই একই প্রশ্ন! মানব জীবনে জন্ম জন্মান্তরের গভীর জিজ্ঞাসা ঐ গদাধরকে নিয়ে—, আসলে কে তুমি?

বেড়াতে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। ছ'বছরের বালক গদাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরই ভক্ত মাণিক রাজার বাড়িতে। সেখানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সবার মন এক রাশ খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল। একান্ত আপনজন

দীর্ঘকাল পর ঘরে ফিরে এলে সকলে যেমন ভাবে পুলকিত হন, ঠিক তেমনি করেই বালক গদাধরকে পেয়ে মাণিকরাজার বাড়ির সকলে হাসিতে-খুশিতে-তৃপ্তিতে ভরে গিয়েছিলেন। বালক গদাধরও তেমনি। সকলেরই মনে হয়েছিল গদাই যেন এ বাড়িরই একজন। সকলের সঙ্গে গদাই এমন করেই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন ছিল শিবরাত্রি।

শিবরাত্রিতে উপোস করা, শিব-শক্তির ব্রত পালন করা, বিনিদ্র রজনী অতিক্রান্ত করে অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্যে শিব-শক্তির বন্দনা করা অন্ততঃ হিন্দুদের একটি চিরাচরিত প্রথা। আর এই তিথিতে নানা অঞ্চলেই নানা আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন! আসলে চিত্ত বিনোদনের মধ্য দিয়ে রাত্রি জাগরণ। এ ব্যাপারে প্রতি বছরই সীতানাথ পাইনের আলাদা একটা মন ছিল। সীতানাথ ধনী. কিন্তু তিনিও ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তাঁর বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ! বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করা গরীবদের চোখে ধনীর বিলাসকেই স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু সীতানাথ পাইনের মধ্যে তেমন কোন ভাব ছিল না। সীতানাথ তাই মাঝে মাঝেই বলতেন, এ সব করি বলে নিজেকে আর পাঁচজন মানুষের মত মানুষ ভাবতে পারি। ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি-বিলাস এ সবের কোন অর্থ নেই। আমার সুখের-আমার শান্তির-আমার বিলাসের ভাগ যদি সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারি তা হলেই তো মানব-জনম সার্থক।

তাই শিবরাত্রিতে বাড়ির সামনে সীতানাথ পাইনদের যে শিবমন্দির সেখানে শিবপুজোর আয়োজন হয়। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা আসেন পুজো দিতে। শাস্ত্র মতে পুজো দেবার পর উপবাস অন্তে জলগ্রহণ করা প্রথা সম্মত, তাই পাইন বাড়িতে সকলের আমন্ত্রণ। যার যা ইচ্ছা, যত ইচ্ছা তত পরিমাণে ফলাহার করবেন পাইন বাড়িতে, রাত্রে শিবলীলা হবে প্রশস্ত অঙ্গনে —চাঁদোয়ার নীচে, সেই শিবলীলা যাত্রাগানে চিত্ত ভরাবেন সকলেই—এমন একটা প্রার্থনা সীতানাথের। তাই হতো! সেবারও তাই হয়েছিল।

শিবরাত্রে সীতানাথ পাইনের বাড়িতে বসেছিল শিবলীলার যাত্রার আসর। সারাদিন গোটা কামারপুকুরের সব মানুষের মনে বয়ে গিয়েছিল আনন্দের হিল্লোল। যাত্রাভিনয় দেখার আনন্দ। সন্ধ্যা কালে হঠাৎ জানা গেল. শিবলীলা দলের অধিকারীর বড় বিপদ! দলে যে বালক নিত্য শিব সাজে সে হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়েছে। তার পক্ষে শিব সাজা সম্ভব নয়।

সীতানাথ পাইন ডেকে পাঠালেন অধিকারীকে।—কী শুনছি অধিকারী মশাই? আর কিছুক্ষণের মধ্যে যেখানে পালাগান আরম্ভ হবার কথা, সেখানে শুনছি নাকি আপনি বলেছেন পালাগান হবে না? আমার মান-সম্মান যে এতে চলে যায়? যদিও বুঝতে পারছি যে বালকটি আপনার দলে শিব সাজে সে অসুস্থ হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তা হলে সারাদিন কেটে গেল, আমাকে বলেননি কেন? আমাদের গ্রামের কোবরেজ মশাইকে ডেকে একটা কিছু করা যেত. ছেলেটি সুস্থ হতো—

অধিকারী দুটি হাত জড় করে বলীর পাঁঠার মত কাঁপছেন। মুখে ভাষা নেই। নিতান্ত অপরাধীর মত তিনি সব কথা শোনার পর বললেন,—আমাদের দলের ছোকরারা মাঝে মাঝে এমন করে অসুস্থ হয় বাবু। যখন জানতে পেরেছিলাম, ও ছোকরার অসুখ হয়েছে, তখন মনে হয়েছিল—ও এমন কিছু নয়! সব ঠিক হয়ে যাবে। গণ্ডা দু'য়েক পয়সা বাড়তি দিলেই ছোকরাটার অসুখ থাকবে না। আসলে দু'এক গণ্ডা পয়সা আমার কানমুলে আদায় করতে পারবে না বলে যাত্রাদলের ছোকরারা অমন অসুখে পড়ে আদায় করে। আমি দু'গণ্ডা পয়সা বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম এই ছোকরাটির তেমন রোগ নয়—সত্যি সত্যি রোগ। তাই আমি বলছি কি জানেন, আপনাদের গেরামের যদি কোন বালক দিতে পারেন, তাকে শিব সাজিয়ে নিতে পারি।—তা না হলে শিবলীলা হবে না বাবু—

সীতানাথ চিন্তিত হলেন। সীতানাথের চারপাশের সবাই বললে এক'টি নাম, গদাধর। ক্ষুদিরাম চাটুজ্যের ছেলে, রাম চাটুজ্যের ভাই বালক গদাই, ইতিপূর্বে গ্রামের বন্ধুদের নিয়ে বার কতক শিব সেজে আম বাগানের নীচে, পাঠশালার দাওয়ায় অনেক শিবলীলা করেছে। একবার তাকে ডাকলে হয়। গদাধরই একমাত্র পারবে এ যাত্রা উদ্ধার করতে।

তাই হলো। স্বয়ং সীতানাথের অনুরোধে ক্ষুদিরাম কথাটা ছেলের কানে তুলতেই গদাই দু'বাহু ঊর্ধ্বে তুলে আনন্দে নৃত্য করল। যথা সময়ে সীতানাথ পাইনদের বিশাল গোয়াল ঘরের একদিকে যে সাজঘর হয়েছিল, সেখানে এসে শিব সাজল গদাই। শিবের বাহন ষাঁড়। এই গোয়ালে ষাঁড় না থাকলেও গরু ছিল অনেক। গরু স্বয়ং ভগবতী! সেই ভগবতীর ঘরে বসে, গোবর-চোনার গন্ধে দেহমনকে ভরিয়ে তুলে গদাই সাজল শিব!

ডাক এল আসর থেকে! শিব আসবেন মানব মন্দিরে!

জটাজুটধারী, বিভূতিমণ্ডিত দেহ, ভাবাবেগে আচ্ছন্ন বালক গদাধরকে ধরে কয়েকজন নিয়ে এলেন আসরের সামনে। ধীর মন্থর গতিতে শিববেশী

গদাধর এসে দাঁড়াল আসরের মধ্যে। মুখে ভাষা নেই। আঁখি পল্লবে কোন স্পন্দন নেই। অভূতপূর্ব ভাবাবেগে আচ্ছন্ন গদাধরের দু' চোখ দিয়ে শুধু নীরবে ঝরে পড়ে অশ্রু। অকস্মাৎ দশর্কদের মধ্যে প্রায় সকলেই সমস্বরে হরিধ্বনি দিলে! হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাপালা দেখতে আসা, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে উপবাসী রমণীরা দিলেন উলুধ্বনি। পাইন বাড়ি আর তার আশে পাশের বাড়ি থেকে কুলনারীরা বাজালেন শঙ্খ। মুখরিত হলো দশ দিক। কামার-পুকুরে এক অনিবর্চনীয় খুশির যেন বান ডেকে গেল। এই হরিধ্বনি, উলু আর চতুর্দিক বিদীর্ণ করা শঙ্খ ধ্বনিতেও বালক গদাধরের কণ্ঠে কোন শব্দ নেই, চোখের পাতা স্পন্দনহীন। এবার উপস্থিত প্রায় সকলেই বুঝলেন বালক গদাধরেরভাবসমাধি ঘটেছে! তিনি আসরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই সংজ্ঞাহীন। অবশেষে পাইনবাড়ির সকলে প্রায় কাঁধে তুলে গদাধরকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

তারপর একে একে বহু ঘটনার ভিতর দিয়ে বহু দিন আর বহু রাত্রির অবসান।

গদাধরের মন ভাল নয়। গদাধর ঝর্ণার মত উদ্দাম, ঢেউ-এর মত সদা উচ্ছল, পাখীর মত চঞ্চল সেই গদাই বাবাকে হারিয়ে বড় ভারাক্রান্ত। তেমনি ভারাক্রান্তা চন্দ্রমণি। অন্যদিকে বড় ছেলে রামকুমার একটু বেশীমাত্রায় বিব্রত। চন্দ্রমণি ভারাক্রান্তা চিরকালের সঙ্গী, চিরজন্মের আরাধ্য দেবতা যে স্বামী তাঁকে আকস্মিক ভাবে হারিয়ে ফেলে শুধু নয়, সংসারের অনটন নাবালক সন্তানদের মানুষ করা, বড় ছেলে রামকুমারের ভাগ্য বিপর্যয় তাঁকে বড় বেশী বিমর্ষ করেছিল। রামকুমারের উপর সংসারের অনেক দায়িত্ব। ছোট ভাই গদাধর আর ছোট বোন সর্বমঙ্গলার ভাবনায় একটু বেশী মাত্রায় বিব্রত রামকুমার।

রামকুমার অবশেষে সংসারের দায়িত্বভার পালন করার জন্য এলেন কলকাতায়। সেটা ১৮৫০ সাল। ঝামাপুকুরে খুললেন চতুষ্পাঠী। অন্য-দিকে চন্দ্রমণি ধরলেন সংসারের হাল। গদাধর এখন মায়ের সঙ্গে থেকে নানা কাজে সাহায্য করে। তার উপর দায়িত্ব ছিল রঘুবীরের পুজায় মাকে সাহায্য করা। সেই দায়িত্ব পালন করতে করতেই সদ্য যুবা গদাধর এক সময় বন্ধুদের নিয়ে খুললেন যাত্রাগানের দল! আসলে গ্রামের বন্ধুদের মিলিত আব্দারে গদাধর আবার আগের মত হুখে উঠল চঞ্চল! বন্ধুরা বলল, গদাই, চল আমরা পালাগানের দল খুলি—

গদাধর তো শুনেই রাজি।

গ্রামের ঠিক যেখানে পাঠশালা তার গা লাগোয়া আমগাছের তলায় তাল-

পাতার ডালের ঝাঁটা তৈরি করে ঝাঁট দিয়ে মনোরম মহড়া অঙ্গন প্রস্তুত হয়ে গেল। পরামর্শে স্থির হলো, এখানে রোজ যাত্রাপালার মহড়া হবে। বন্ধুরা স্থির করল গদাই হবে 'মাষ্টর'! গদাই গান গাইবে, পাঠ বলবে। বন্ধুরা হবে দোহার। গদাই স্থির করবে পালাগানের বিষয়। এ ব্যাপারেও তার জুড়ি নেই কামারপুকুরে! গদাধর লিখে ফেলল বেশ কয়েকটি পালা।

শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগান। আসলে রামনাম-কৃষ্ণনামের কথকথা।

দিনকতক আমবাগানের অঙ্গনে চলল মহড়া। তারপর শুরু হলো পালাগান।

ওদের প্রথম আসর বসবে কোথায়? গদাই বলল মাণিকরাজার বাগানে—

তাই হয়েছিল। মাণিকরাজার বাগানে গদাধর আর তার সম্প্রদায়ের সেই সংকীর্তন সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। একদিন-দু'দিন নয় ওরা প্রায় বছর তিনেক ধরে আজ এর বাড়ির উঠানে, কাল তার বাড়ির ঠাকুর দালানে, পরশু হয়তো কারও আমবাগানে কিংবা কোন ভগ্ন মন্দিরের দাওয়ায় বসাত ওদের পালাগানের আসর।

এবার অন্য পথ! অন্য মত!

রামকুমার কলকাতা থেকে বাড়ি এসেছেন। এসেছেন নিজের চাইতেও ছোটভাই গদাইয়ের ভাবনা ভেবে। গদাই লেখাপড়া করে না, সংসারে একমাত্র মায়ের পাশে পাশে থেকে পুজো-অর্চনায় যে সাহায্য করছিল, তাও নাকি পালাগানের টানে বন্ধ করেছে সে। এ ভাবে চললে গদাই হয়তো বয়ে যাবে, তা ছাড়াও বাড়ির সবাই লক্ষ্য করেছেন, ইদানিং গদাই মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গ করে।

গ্রামের কোথাও বা অন্য কোন গ্রামে, সে যত ক্রোশ দূরেই হোক যদি গদাধর শোনে কোন সাধু এসেছেন, ছুটে যায় সেখানে। গদাইকে নিয়ে তাই ভাবনার অন্ত নেই! রামকুমারের মনে হলো, গদাইকে কলকাতায় আনাই ভাল। চতুষ্পাঠীতে ছাত্র বেড়েছে, গদাই এলে সাহায্য হয় কিছুটা। তা ছাড়া একটা বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে থাকলে হয়তো তার মতি-গতি পাল্টাবে!

রামকুমার বাড়ি এসে মা আর মেজভাই রামেশ্বরের সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। বাড়ির সবাই তাই চান। চান গদাই-এর মতি-গতির পরিবর্তন ঘটুক!

ধ্যান করে গদাধর। ভোগসুখ, অর্থচিন্তা তার নেই। পণ্ডিত হয় কেন লোকে? পাণ্ডিত্য জাহির করতে হয়, নিজেকে প্রমাণ দিতে হয় আমি পণ্ডিত। তার ফল কী? না—খ্যাতি, যশ, অর্থ। শাস্ত্র পাঠের এই পরিণতি। আবার মন্ত্র, পুজোর আচার-আচরণ শিখে কী হয়? আচার-সর্বস্ব পুরোহিত? বাঁধা বুলি রপ্ত করে বিধান দেওয়া আর চাল-কলা বেঁধে ঘরে তোলা। এ জীবন পছন্দ নয় গদাধরের। এ কেমন ব্রাহ্মণ সব?

'শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্'

শম (মন সংযম), দম (ইন্দ্রিয় সংযম), তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (আত্মতত্ত্বানুভূতি) ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—এই নবধা গুণ ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

—কোথায় গেল এসব গুণ? পরবর্তী কালে ঠাকুর বলেছেন 'চাল-কলা বাঁধা বিদ্যে'—কিন্তু সে বিদ্যা তো গদাধরের জন্য নয়।

আবার সংসারে বাস করলেই তো সর্বদা নিজের মতে চলা যায় না। যেমন রামকুমার। পত্নী বিয়োগের শোকে আর অর্থকষ্টে, নিজের শিশু সন্তান, বৃদ্ধা মা, ছোট দুই ভাই রামেশ্বর আর গদাধরের কথা চিন্তা করে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন।

গদাই এলো বাড়ি। রামকুমার ভেবেছিলেন কথাটি পাড়লে হয়তো বিপরীত ধর্মী কিছু হতে পারে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তা হলো না। দাদাকে গদাই বরাবরই শ্রদ্ধা করত বেশী। গুরুজনকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে হয় এমন শিক্ষা এ বাড়ির কাউকে কোনদিনই দিতে হয়নি। জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের এই জ্ঞানটি প্রবল ছিল বরাবরই।

দাদার সব কথা শুনেই গদাধর রাজী। কলকাতায় গিয়ে দাদাকে সাহায্য করার ফাঁকে ফাঁকে শহর কলকাতাকে দেখার সুযোগ ছাড়ে কে। তা ছাড়া, কলকাতার তার জন্ম জন্মান্তরের গভীর বন্ধন পূর্ব নির্দিষ্ট বোধ করি গদাধরই জানত সে কথা···। কলকাতায় তার লীলাভূমি, কলকাতা তার পার্থিব জীবনের সমাধি তীর্থ!

কলকাতায় এলেন গদাধর।

চতুষ্পাঠীর যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে পুজো-আহ্নিক ছিল রামকুমারের নিত্য কর্ম। সেই নিত্য কর্মে সর্বদা সাহায্য করার কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখে আনন্দে-খুশিতেই ভরে ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে বড় দাদা সস্নেহে বলতেন,—

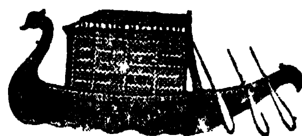
যদি পারিস ছাত্ররা যখন আমার কাছে পাঠ নিতে আসে—তুইও পাঠ নিস। বিদ্যাভ্যাস বড় প্রয়োজন, শাস্ত্র জ্ঞান বিশেষ কাজে লাগবে। আর আমার শরীরেও তেমনি জুত নেই, আগের মত আর সব দিক সামলাতে পারিনে! দেহটা এক টুকরো সাবানের মত। যত ঘসবি তত ক্ষয়। সেই ক্ষয় শুরু হয়েছে গদাই, তাই যত বাড়িতে পুজো করি-সেই যজমানদের কাছে তোর কথা পেড়েছি। কিছু বুঝে নে, তাতে সংসারের কল্যাণ হবে—

সংসারের কল্যাণ! বিশ্বসংসারের কল্যাণ! ঘরে ঘরে কল্যাণ কামনাই যাঁর ব্রত তাঁর খুশির যমুনায় অবগাহন তো স্বাভাবিক। গদাধর সেই খুশির যমুনায় অবগাহন করে নিত্য আরতি করে চললেন এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। যে ঘরে যান তিনি সেই ঘরই যেন তাঁর আপন ঘর। কামারপুকুরের পুরনারীরা যেমন করে বালক গদাধরের সঙ্গে মিশতেন, কলকাতার প্রতি যজমানের ঘরের মেয়েরা তেমনি করেই মিশতেন প্রথম যৌবনের দূত গদাধরের সঙ্গে। এভাবে যত দিন অতিবাহিত হয়, ততই গদাধরের সঙ্গে রামকুমারের একটা দূরত্ব রচনা হয়। আগে আগে চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের সঙ্গে বসে গদাধর পাঠ নিতেন, এখন আর তা হয় না। আর এই অনীহা থেকেই গদাধর তাঁর দাদার কাছে দু'দণ্ড কাটাতে পারেন না।

দাদা রামকুমারের এক সময় মনে হলো, ছোটভায়ের প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

একদিন অগ্রজের কর্তব্য অনুসারে বললেন, তোমার পাঠে মন নেই, এ রীতিমত অন্যায়।

কথাটা বেশ কিছুটা রাগের সঙ্গেই বলেছিলেন রামকুমার! গদাধর বলেছিলেন, চাল কলা বাঁধা বিদ্যে আমার দরকার নেই। আমি এমন বিদ্যে চাই—যাতে আমার জ্ঞানের ঘরে আলো জ্বলে, যে আলোর ছটায় মানুষের মনের ঘরের অন্ধকার ঘুচবে -



এদিকে জানবাজারে রাণীমার সামনে এখনও অনেক কাজ—অনেক সমস্যা।

এই সংসারে 'আমি' আর 'আমার' এ দুটি শব্দের মর্মার্থ বড় জটিল।

সংসার নিত্য কিন্তু অনিত্য এই 'আমি' আর 'আমার'। ওটা অহংকার, সেই অহংকার যিনি দেন তিনিই 'আমি' আর 'আমার' মধ্যে বিরাজমান। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই সংসারের মাটিতে সেই যে 'আমি' এসেছি তাও ঈশ্বরেরই কর্ম করার তাগিদে। যা করি তা ঈশ্বর করান। যা ঘটাই তাও সেই অনন্ত ঈশ্বরের নির্দেশ। যাকে 'আমার' বলি তা আমার নয়। 'আমার' নয় বলেই 'আমি' নই 'আমি' নশ্বর, ঈশ্বর অবিনশ্বর !

এ সব তত্ত্ব কথা তাদের ভাল লাগে না, যারা 'আমার আমি'কে ঘিরে স্বপ্ন দেখে এই স্বপ্নটিও দেখান তিনি। সেই তিনি, যিনি 'সৃষ্টি-স্থিতি-লয়'। পার্থিব জীবনে এই স্বপ্ন দেখা সৃষ্টির অনন্ত মহিমা। সেই স্বপ্ন দেখে আমীর-ওমরাহ থেকে কৃষ্ণকান্ত-সৌদামিনী। ওদের একজন এসেছে বড়লোকের পাকশালায়, অন্যজন এসেছে ঘর মুছতে।

নিতান্ত কিশোর বেলায় উড়িষ্যা নিবাসী এক দীন দরিদ্রের সন্তান কৃষ্ণকান্ত এসেছিল এই জানবাজারের বাড়িতে। রান্নাঘরে জোগাড়ের কাজ করত সে। তার কয়েক বছর পর এসেছিল কিশোরী সৌদামিনী। এ বাড়িতে ওরা থেকেছে, একসংগে বড় হয়েছে। একটু একটু করে ওরা নিজেদের যেমন চিনতে শিখেছে, তেমনি বুঝতে শিখেছে প্রকৃতির খেয়ালে। তারপর এক সময়ে ওদের দু'জনার মনের গভীরে ভালবাসার ফুল ফুটেছে।

ফরাসডাঙ্গা থেকে ফিরে আসার পর কথাটা কানে গেল রাণীমার। সব শুনলেন তিনি। কৃষ্ণকান্ত আর সৌদামিনী পরস্পর পরস্পরের প্রেমের বন্ধনে জড়িয়েছে শুনে রাণীমা বিন্দুমাত্র বিচলিত যেমন হলেন না, তেমনি ভিতরে ভিতরে খুশি হলেন। রাণীমা বুঝলেন, এ ব্যাপারে দ্রুত হস্তক্ষেপ না করলে এই দুটি তরতাজা সবুজ মন এক সময়ে নষ্ট হয়ে যাবে। ওরা লজ্জায় হোক বা সংকোচে হোক রাণীমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাহস করে সব কথা যেমন বলতে পারবে না, তেমনি এ বাড়ির রাঁধুনে ঠাকুর আর ঝি বলে ওরা সন্তানের দাবী নিয়ে কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য কোন কিছুই চাইতে পারবে না। না পারবে কৃষ্ণকান্ত ঐ সৌদামিনীর হাত ধরে এ বাড়ি ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধতে, না পারবে সংসার পাততে। না হবে ওদের ভালবাসা সার্থক, না পারবে ওরা আর সবার মত নারী আর পুরুষের চিরন্তন ধর্ম পালন করতে, একজন আর একজনের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে, লীন হয়ে গিয়ে আগামী দিনের নতুন সূর্য বরণ করার আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করতে। এমনি করে নিজেদের গোপন করে রাখার যে ব্যথা সেই ব্যথায় ব্যথায় ওরা নষ্ট হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে অন্ধকারে।

কথাগুলো যত ভাবেন রাণী রাসমণি ততই যেন তাঁর মাতৃ হৃদয় একরাশ বেদনায় টনটন করে ওঠে। অবশেষে একদিন নিতান্ত সংগোপনে কুল-পুরোহিতের কানে কথাটা তুললেন তিনি। আলোচনা করলেন। আসলে বিধান চাইলেন।

বিধান দিলেন ব্রাহ্মণ। বললেন, মা, তুমি শুধু আব পাঁচটি ঘরের পাঁচটি মায়ের মত নও; তুমি 'লোকমাতা'। তুমি দিন-আতুরের ভরসা। কৃষ্ণকান্ত আর সৌদামিনীর বিয়ে দিয়ে, ওদের সংসারে প্রতিষ্ঠা দেবার বাসনা তোমার, কাজেই আমার কাছ থেকে বিধান চাইবার কোন প্রয়োজনই তোমার ছিল না। তোমার মনের বিধানই শেষ কথা! তুমি একটা কথা সার জেন, লোককল্যাণ সাধন করাই তোমার ধর্ম, সুতরাং তুমি হাসি মুখে সেই ধর্ম পালন কর—

এরপরই শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিতে মুখরিত জানবাজারের প্রাসাদ! এই খবর কানে যেতে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার লোক এসেছিল বাড়িতে। মথুরা-মোহন তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলেছিলেন, আমাদের মা আপনাদের সবার কাছে ঋণী কৃতজ্ঞতা জানাবার শক্তি তাঁর নেই। আপনারা এ বাড়ির বহু খবরই প্রকাশ করেছেন, তাতে আমাদের মা লজ্জিতা হয়েছেন। তিনি বলেছেন এ দেশের সংবাদপত্রের কাছে তাঁর মত এক অতি সাধারণ রমণী চিরঋণী। তবে, আজকের এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সংবাদ যাতে আপনারা প্রকাশ না করেন তার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। বাড়ির দাস-দাসীর কল্যাণার্থে বাড়ির কর্তারা যদি কোন কাজ করেন তা কর্তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্যে পড়ে, কিন্তু ক্ষমতা আর অর্থের দাপটে সে কথা জাহির করার অর্থ হলো পাপ! সেই পাপের ভাগী মা হতে চান না—

আর কথা না বাড়িয়ে রাণী রাসমণির এই আবেদনকে মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেদিন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিনিধিরা চলে গিয়েছিলেন।

এবার কাশী যাত্রার সেই ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। রাণীমার শরীর দিনকতক হলো ভাল যাচ্ছিল না। যাঁর কর্মময় জীবন, জীবনে কর্ম করে যাওয়াই যাঁর একমাত্র ধর্ম, সেই রাণীমা দিনকতক হলো কোন কাজেই যেন মন বসাতে পারেন না।

কী হয়েছে মায়ের? কেমন আছেন রাণীমা? এই একই প্রশ্ন বৃত্তাকারে ঘুরছে সবার মনে। মেয়েরা উদ্বিগ্ন! জামাইরা বিচলিত। মথুরামোহন সবার সঙ্গে আলোচনা করলেন, মায়ের শরীর নিয়ে সবাই ভারাক্রান্ত।

রাণীমা বললেন, তোমরা আমাকে নিয়ে কেন এত বিচলিত হচ্ছ? শরীর

আমার ভালই আছে, শুধু এই মনটি স্থির রাখতে পারছি না! দিনকতক হলো, বার বার আমার মন কাশীধামে বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য বড় উতলা হয়ে উঠেছে। তোমরা আমার কাশী যাত্রার আয়োজন কর—

মায়ের ইচ্ছার কথা শুনে সকলেই এক অজানা আশংকায় চমকে উঠলেন!

কলকাতা থেকে কাশী, দূরে দূরান্তরের ব্যবধান! দুর্গম পথ যাত্রা! একমাত্র জল আর স্থলপথ ছাড়া কাশীধামে যাবার আর কোন পথ নেই। সেটা ১২৪২ সন। তখনও ভারতের মাটিতে না বসেছে রেলপথ, না আবিষ্কৃত হয়েছে অন্য কোন দ্রুতগতি যানবাহন। তাছাড়া জলপথ বা স্থলপথ, যে পথেই যাবার ব্যবস্থা হোক, উভয় পথেই প্রতি মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক। কখনও গভীর অরণ্য আবার কখনও দুর্গম প্রান্তর। তার ভিতরে ওত পেতে থাকা হিংস্র জন্তু আর দস্যু-তস্কর!

রাণীমা বললেন, ঈশ্বর দর্শন যখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তখন মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার মধ্যে আলাদা একটা আনন্দ আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি থাকে তা হলে তা খণ্ডন করবে কে?—

অবশেষে রাণীমা নির্দেশ দিলেন আমি জলপথে নৌকাযোগে যাব--, আমাদের আত্মীয়স্বজন, প্রজা এবং পরিচিত যতজন আছেন তাঁদের প্রত্যেককে জানিয়ে দাও মথুর, এই তীর্থযাত্রায় ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যে খুশি সে-ই যেতে পারে—

রাণীমার নির্দেশে কাশীযাত্রার আয়োজন শুরু হলো। কাশীযাত্রা তো নয় যেন রাজসূয় যজ্ঞ। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই মথুরামোহনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেকেই অতি দ্রুত সব আয়োজন করলেন। ৬ মাসের জন্য সব রকম দ্রব্য আর ২৫টি ছাউনি দেওয়া বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত হয়ে গেল!

যথা দিনে, যথা সময়ে জানবাজারের বাড়িতে আত্মীয়-অনাত্মীয়-কুটুম্ব এমন কি বহু প্রজারা এসে জমায়েত হলেন। এই তীর্থযাত্রার জন্যে যে ২৫টি নৌকা প্রস্তুত হয়েছিল তার একটি তালিকা এইরকম :—

চালের জন্য : ৪ খানা নৌকা।

তেল, লবণ ইত্যাদির জন্য : ৩ খানা!

রাণীমার জন্য : ১ খানা।

জামাইদের জন্য : ৩ খানা।

দারোয়ান আর লাঠিয়ালদের জন্য : ২ খানা।

দাস-দাসীদের জন্য : ২ খানা।

সহযাত্রীদের জন্য : ৪ খানা।

আমলাদের জন্য : ২ খানা।

ডাক্তার, কবিরাজ এবং ওষুধপত্রের জন্য : ১ খানা।

রজকদের জন্য : ১ খানা।

৪টি গাভীর জন্য : ১ খানা।

বিচালির জন্য : ১ খানা নৌকা নির্দিষ্ট হলো।

প্রায় জনা তিরিশ মজুর এই দ্রব্য সামগ্রী বজরায় তুলে দিল।

কুলপুরোহিত, নিত্যপুরোহিত এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁরা একত্রে বসে দিনক্ষণ, সময় বিচার ও পর্যালোচনা করে স্থির করলেন আগামীকাল রাত্রি শেষে, সূর্য উদয়ের পূর্ব লগ্নে শুরু হবে এই তীর্থযাত্রা।

সুসজ্জিত এবং দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ বজরা পাহারা দিতে লাগল কয়েকজন লেঠেল আর দারোয়ান। জনা কয়েক দাস-দাসীও বজরা পাহারার কাজে নিযুক্ত। বাবুঘাটের তীরে বসল একটা ছোটখাট গঙ্গাস্নানের মেলা। ছোট ছোট তাঁবু ফেলে আত্মীয়-কুটুম্ব অর্থাৎ রাণীমার সহযাত্রীরা অস্থায়ী সংসার বসালেন। আগামীকালের প্রভাতসূর্য উদয়ের পূর্ব লগ্ন পর্যন্ত থাকবে এই সংসার। আকাশে এক তারা থাকতে থাকতে জানবাজারের প্রাসাদ থেকে সুসজ্জিত পাল্কিতে রাণীমা আসবেন বজরায়। সেই পাল্কির দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে মিছিলের মত আসবেন রাণীমার জামাই আর অন্যেরা।

তার আগে আজ রাতে মায়ের পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। বাড়ির প্রবীণেরা এমন কি ডাক্তার-কবিরাজরাও বলেছেন, রাণীমা, নৌকাযোগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে আপনাকে অনেক ধকল সহ্য করতে হবে। উত্তাল গঙ্গাবক্ষে নৌকার যে দোলা তাতে আপনার নিদ্রা ব্যাহত হবে, তাই আমরা বলি কি, আজ আপনি নিশ্চিন্ত মনে একটু নিদ্রা দিন। ঘণ্টা চার-পাঁচ যদি বিশ্রাম নিতে পারেন, একটু নিদ্রা দিতে পারেন ভাল হয়

সবার সব কথা শুনে রাণীমা কোন উত্তর দেন না। তাঁর মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় হাসির রেখা। রাণীমাকে নীরব থাকতে দেখে একে একে সবাই ঘর ত্যাগ করলেন। রাণীমা এবার পালঙ্ক থেকে মেঝেয় পা রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে, ঠাকুর ঘরে যাবার জন্যে যে অলিন্দ ছিল, যে অলিন্দ দিয়ে একমাত্র রাণীমা ছাড়া আর কেউ ঠাকুরঘরে যেতে পারতেন না – সেই একান্ত পথে রাণীমা এলেন ঠাকুরঘরের সামনে।

তারপর রুদ্ধদ্বারে গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে রাণীমা থানের আঁচলটি বিছিয়ে দিলেন মেঝের ওপরে। সেই আঁচলের শয্যায় কুণ্ডলী

প্যাকিয়ে শুয়ে পড়লেন।

হালিশহরের কোনা গাঁয়ের মাটির ঘরের বালিকা রাণী, ধনাঢ্য প্রীতিরামের একরাশ প্রীতিতে বরণ করে আনা বধূমাতা রাসমণি, ধনী অথচ হৃদয়বান রাজচন্দ্রের জায়া জানবাজারের রাণী রাসমণি, প্রজাকুলের রাণীমা, জন্মলগ্ন থেকে বিধির তুলনাহীন বিধানে একটু একটু করে আচার-আচরণে, পোশাকে-পরিচ্ছদে পাল্টাতে পাল্টাতে আজ আপন আঁচল-শয্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

যাঁর দেওয়া 'আমি', যাঁর দেওয়া 'আমার'—তাঁর পাদপদ্মে সেই 'আমি' আর 'আমার' সবটুকু নিবেদন করে, উৎসর্গ করে রাণী আজ বেছে নিলেন একান্ত সত্যের শয্যা।

লজ্জাবতীলতা পত্র স্পর্শ মাত্র যেমন একরাশ লজ্জায় নিজেদের গুটিয়ে নেয়, যেমন নিজেদের সরিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি করে রাণীমার দু'চোখের পাতা, কোন সে কল্যাণস্পর্শে, মমতা মিশ্রিত অনুপম মন্ত্রে ধীরে ধীরে মুদিত হলো। রাণীমার দু'চোখে অতি সংগোপনে নেমে এলো তন্দ্রা!

রাণীমা যখন বিরামদায়িনী, চেতনাহারিণী, শোক সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রার কোলে মাথা রেখে গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন, ঠিক সেই সময় স্বপ্নলোকের আলোক-রঞ্জিত অঙ্গনে, কাঁসর-ঘণ্টার মধুর সুর-মঞ্জরী নিনাদে, শঙ্খধ্বনি আর প্রজ্জ্বলিত ধূপ সুবাসে চতুর্দিক হলো আমোদিত। কাশীধামের মন্দির অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিতা জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণার মর্মর মূর্তি থেকে ধীরে অথচ ছন্দমণ্ডিত পদনিক্ষেপে, নূপুর নিক্কণে সদা জাগ্রতা দেবী এলেন রাণী রাসমণির স্বপ্নময় সাম্রাজ্যের দেবালয়ের রুদ্ধদ্বারের সন্নিকটে। রাণীমা তখন রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের অভ্যন্তরে ধ্যানমগ্না। মা অন্নপূর্ণা সেই রুদ্ধদ্বার স্পর্শ করলেন। দ্বার উন্মুক্ত হলো। মা এলেন সুষুপ্তা সন্তানের পাশে। স্পর্শ করলেন চিবুক। দু'চোখের পাতা গেল খুলে। মা অন্নপূর্ণা বললেন—"কল্যাণী, দেশে এখন তোমার সন্তানতুল্য প্রজারা অন্নকষ্টে পীড়িত, এ সময়ে কাশীধামে যাবার জন্য তুমি তোমার মনকে স্থির করেছ, সেই মন-বাসনা তুমি ত্যাগ কর। যে কারণে তোমার কাশীধামে যাত্রা করার বাসনা, সেই বাসনা এখানে থেকেই পূর্ণ করতে পারবে। শোন, শিবশক্তির মূর্তি তুমি এখানেই স্থাপন কর। মনে রেখ, এ আমার আদেশ। আমার আদেশ লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করবে না, তা হলে আমাকে আঘাত করা হবে, আমি যে তোমার মা! জগতে সবার মা—"

মুহূর্তে সেই অপরূপা দেবী মূর্তি অন্তর্হিতা হলেন। রাণীমার

তন্দ্রা গেল টুটে……

রাণীমা বিদ্যুৎ ছটার মত উঠে বসলেন বিছানার উপর।

আনন্দ-খুশিতে, ভয়ে-শঙ্কায় প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঘরের বাইরে। অলিন্দে। দীর্ঘ অলিন্দের একদিকে কাঠের রেলিং, মাঝে একটি করে থাম। অন্য দিকে সারি বন্ধ কয়েকখানা ঘর। গভীর রাত। এক একটি ঘরে রাণীমার মেয়েরা, উত্তরাধিকারীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রুদ্ধ দুয়ার আকাশের চাঁদ শুধু হৃদয় ভরা আলোর গরিমা নিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে। এক রাশ জোৎস্না এসে পড়েছে অলিন্দে। রেলিং আর সারিবন্ধ থামের ছায়া ঈষৎ বাঁকা ভাবে লুটিয়ে আছে মেঝেয়। আলো-ছায়ার অপরূপ খেলা! রাণীমা ঘরের বাইরে এসেই প্রথম দর্শন করলেন সেই আলোক মঞ্জিল। পূর্ণিমা তিথির একান্ত উপমা চন্দ্রমা। দু'হাত জোড় করে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে, বিহ্বল চিত্তে বন্ধ দুয়ারে দুয়ারে আঘাত হেনে ঘুম ভাঙ্গালেন সবার।

মুহূর্তে গোটা প্রাসাদ জাগলো। আলো জ্বলল ঘরে ঘরে। সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত মন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মায়ের পাশে। সকলেরই মনের গভীরে একটা চাপা ভয় জমা হয়ে গিয়েছিল। সকলের ধারণা হয়েছিল মা হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রাত কাটলে তীর্থে যাত্রা। তীর্থযাত্রার জন্য মা কয়েকটা দিন ধরে যে ভাবে খেটেছেন, ভেবেছেন, হয়তো তারই জন্য মায়ের শরীর খারাপ হয়েছে। মায়ের কাছে এসে সবাই প্রায় এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, শরীরের খবর নিল।

মা বললেন,—জানি এই নিশুতি রাতে তোমাদের ডাকলে তোমরা আমার শরীরের কথা ভাববে। তোমরা খুবই বিচলিত হবে। কিন্তু না ডাকলে আমি যে কিছুতেই স্বস্তি পেতাম না। কথাগুলো শেষ করে মথুরামোহনের উদ্দেশে বললেন, বাবা মথুর, তুমি দু'জন দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে, এখুনি ঘাটে যাও—যারা নৌকোয় আছে তাদের খবর দাও যে কাশী যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। সকলে বিস্ময়ের আতিশয্যে চমকে উঠলেন।—সে কী মা!

সকলের মনে রাশি রাশি কৌতূহল! এত আয়োজনের পর হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন!

মা বললেন, তোমরা কৌতূহল দমন কর। শুধু এইটুকু তোমরা জেনে রাখ, যে উদ্দেশ্যে, যাঁর পূজোর জন্য—যাঁকে দর্শন করে নিজেকে ধন্য করার জন্য আমি কাশী যাত্রার আয়োজন করেছিলাম, হয়তো এ তাঁরই নির্দেশ—

মথুরামোহন অথবা বাড়ির অন্য কেউ আর এ প্রসঙ্গে কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। শুধু মায়ের নির্দেশ পালন করার জন্য মথুরামোহন রওনা দিলেন গঙ্গার ঘাটে।

মথুরামোহন বললেন, আপনার প্রতি যে স্বপ্নাদেশ হয়েছে আমাদেরও তার সার্থক রূপায়ণ ঘটুক! আমি আজ এই মুহূর্ত থেকে আপনার নির্দেশ মত গঙ্গার পশ্চিম কূলবর্তী একটি মনোজ্ঞ স্থানের সন্ধান করব। মায়ের ইচ্ছা যখন হয়েছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মনের মত স্থানটিও তিনি নির্বাচন করে রেখেছেন। সুতরাং আপনি ভাববেন না, আমরা অচিরেই একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বার করবো—

মথুরামোহন গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে মন্দির স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে শুধু নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন না, তিনি লোক পাঠালেন দিকে দিকে। বালী-উত্তরপাড়া-পাণিহাটি, সোদপুর—সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালেন জমি। কথাটা যত ছড়িয়ে পড়তে থাকল, লোক মুখে তত জমির ব্যাপারে খবর আসতে লাগল জানবাজারের বাড়িতে। খবর যত আসে মথুরামোহন ছুটে যান সেখানে, কিন্তু জমি পছন্দ হলে দেখা যায় গঙ্গার তীরবর্তী স্থান বলতে যা বোঝায় তা নয়। গঙ্গার উপকূলে জমির সন্ধান পেলে দেখা যায় মন্দিরের মত জমি নয়।

এর মধ্যে ছিল আর এক অন্তরায়। তা হলো রক্ত মাংসে গড়া কিছু মানুষের কদর্য মনোবৃত্তি। অর্থবান ব্যক্তিদের—বিত্তবান মানুষের হীনমন্যতা!

তখনকার দিনে, বালী-উত্তরপাড়া বা অন্য কোন অঞ্চলে যে সব জমি ছিল, সেই জমির কোন ব্যক্তি ছিলেন 'দশ আনি' আবার কোন ব্যক্তি ছিলেন 'ছ' আনি' অংশের মালিক। আসলে এক একজন এক একটি জমিদার। জমিদারের মনগুলো যেন ভেড়ি। শত বিঘা জমি জুড়ে জল শুধু জল! তীরে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় নদী নয়, দীঘি নয়, যেন সমুদ্র! সেই জলে নামো, এগিয়ে যাও—দেখ হাঁটু জল। জলের উপরে তরঙ্গ আছে, তবে তেজ নেই ভেড়িতে শুধু হরেক রকম মাছের কিল বিলে ভাব!

এই জমিদারগুলো তেমনি। অনেক জমি আছে. ধন আছে, দৌলত আছে —কিন্তু হৃদয় নামক বস্তুটি ভেড়ির মত। সেখানে কোন তরঙ্গ নেই। মন নামক বস্তুটি যেন এক তাল লোহা! অর্থের দাপটে ফণা তোলার তেজ আছে, কিন্তু বিষ নেই! মনের মধ্যে ভেড়ির মাছের মত হিংসা-ঈর্ষা-

পরশ্রীকাতরতা, লোভ পাপ আর পাপাচারের কিলবিলানী !

জমিদাররা শুনলো, জানবাজারের এক মেয়েমানুষ জমি কিনে মন্দির বানাবে ! একে মেয়েমানুষ তায় আবার মন্দির ! এ যেন গণিকাদের গঙ্গাস্নান !

সব জমিদার এককাট্টা হয়ে জমি না দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিশেষ করে বাদ সাধলেন নড়াইলের জমিদার রামরতন দত্তরায় আর সাতখিরার প্রাণনাথ চৌধুরী। মথুরামোহন নাকি তাঁদের জমি কেনার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন ! রামরতনবাবু তো বলেই পাঠিয়েছিলেন, স্ত্রীলোকের কেন এত বাড়াবাড়ি !

কথাটা রাণীমার কানে গিয়েছিল। ভিতরে ভিতরে তপ্ত হয়েছিলেন তিনি ! কিন্তু জমি যখন প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য এবং অনুপযুক্ত তখন ঝগড়াঝাটি করে লাভ নেই কারও সঙ্গে, এমন একটা মন যখন তৈরী করেছেন রাণীমা—তখনই খবর এলো জমির !

এই খবরের সূত্র ছিল সুপ্রিম কোর্টের এ্যাটর্নী মহলের। মথুরামোহন এ্যাটর্নী মহলের খুবই পরিচিত জন। কাজেই মথুরামোহন শুনলেন পূর্বদিকে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে গঙ্গার তীরে এমন এক বৃহৎ জমি আছে, মূলত সেই জমি সর্বধর্ম সমন্বয়ের যেন সাক্ষ্য বহন করছে !

অতি আশ্চর্য এক ভূমিখণ্ড !

এই জমির একদিকে ছিল সুপ্রিম কোর্টের এ্যাটর্নী হেস্টি সাহেবের কুঠিবাড়ি। আর অন্য অংশে ছিল গাজীপীরের আস্তানা। আর একাংশ হিন্দু জমিদারের বাগান। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ-খৃষ্টানের সহাবস্থান।

যত দেখেন তত চিত্ত তাঁর উদ্বেলিত হয়।

বর্ণনাতীত উদ্বেগ অথচ সারা মন জুড়ে রাশি রাশি তৃপ্তি ! ওরা কাজ করছে, একদল নারী পুরুষ একযোগে।, যেন মনের সঙ্গে মনের গাঁটছড়া বেঁধে রাজমিস্ত্রী থেকে জোগাড়ে সবার মুখে হাসি। কারও চোখে মুখে বিন্দুমাত্র ক্লান্তির ছাপ নেই। দেবতার ঘর বাঁধতে মানুষের যে কী আনন্দ রাণীমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যত দেখেন ততই বলেন,

—কী দেখছ বাবা মথুর—

—বিশাল কর্মযজ্ঞ, এই মন্দিরের ভিতর দিয়েই আপনি বেঁচে থাকবেন মা, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—

—আমি কী দেখছি জানো, আমি দেখছি ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের ! ঈশ্বরের, আমার মায়ের, দুনিয়ার সব মায়ের বাসনার কী আশ্চর্য প্রকাশ !

মা এখানে থাকবেন, ঘর চাই, সেই ঘর কেমন আপন হাতে তৈরি করে নিচ্ছেন মা! ওদের যাদের তুমি মিস্ত্রি ভাবছ, জোগাড়ে ভাবছ, আসলে ওরা এক একজন দেবতা। মানুষের দেহ ধারণ করে দেবতার ঘর বানাচ্ছে—, ওরাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি! ঈশ্বর ওদের কর্ম করতে পাঠিয়েছেন তাই ওরা দিবা-রাত্র কর্ম করে যাচ্ছে! যেমন আমি, যেমন তুমি—

হঠাৎ রাণীমা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। বললেন, মন্দির আর আশপাশে যা যা হবে, যেমন দ্বাদশ শিবমন্দির এ সব কতটা জায়গার মধ্যে হবে তা কি জরিপ হয়েছে বাবা মথুর?

মথুর বললেন, হ্যাঁ মা—

কথাটা এক রকম ছুঁড়ে দিয়েই মথুরামোহন আঙুল তুলে নানা দিকে নির্দেশ করে বলতে থাকলেন —মন্দিরের এই যে আঙিনা দেখছেন, এর দৈর্ঘ্য হলো ৪৪০ ফুট এবং প্রস্থ হয়েছে ২২০ ফুট। ঐ দিকটা অর্থাৎ গঙ্গার দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ সারিবদ্ধ ভাবে তৈরি হবে দ্বাদশ মন্দির। গঙ্গার ঘাটে যাবার জন্য সামনের দিকে ঐ যে ফাঁকা অংশ, ওটা হবে গঙ্গা থেকে স্নান-আহ্নিক সেরে মন্দির আঙিনায় প্রবেশ পথ। ওখানে একটি বিশ্রামাগার বা একটি প্রশস্ত ঘর তৈরি হবে, যেখানে দর্শনার্থী বা তীর্থযাত্রীরা স্নান সেরে এসে বসন পাল্টাতে পারেন। এই প্রবেশ পথের দু' ধারে ঐ যে উঁচু-লম্বা টানা বারান্দার মত তৈরী হয়েছে, ঐ বারান্দা দেখুন দু' ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বারান্দার ওপরে তৈরী হবে ছটি শিব মন্দির, অন্য ভাগেও ছটি। মন্দিরে যাবার জন্য তৈরি হবে বিস্তৃত সোপান। আর এই শিব মন্দিরের বিপরীতে, ঠিক মধ্যস্থলে মাতৃমন্দির। তার সামনের দিকে নাটমন্দির। পিছন দিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির।—

এরপর সিংহদুয়ার, নহবতখানা, অতিথিশালা, ভোগরন্ধনশালা, বলিপীঠ, দুধ পুকুরের সোপান, প্রধান ফটক ইত্যাদির সঠিক স্থান রাণীমার কাছে বর্ণনা করলেন মথুরামোহন!

মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ১২৫৪ সনে। মন্দিরের সব কাজই শেষ হয়েছিল ১২৬২ সনে। বিগত আট বছরের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, প্রতিটি মুহূর্ত ধরে বাংলাদেশের মাটিতে একদল মানুষের বক্ষ জুড়ে বিরাজমান স্বয়ং বিশ্বকর্মা যেন স্বতন্ত্র ভাব ও ভাবনায় গড়ে তুললেন এক জন্ম-জন্মান্তরের শিল্প মাধুর্য! ন' লক্ষেরও কিছু বেশী অর্থ ব্যয়ে নির্মিত এই দেবালয় চিরদিনের দেবভূমিতে হলো পরিণত!

বিশ্বকর্মার বিশাল কর্মযজ্ঞের যখন সূচনাকাল তখনই সেই কর্মযজ্ঞের

সার্থক রূপকারের আবির্ভাব।

সে তো অনেক পরের কথা।

এর মধ্যে রাসমণি আর একটি বড় কাজ সমাধা করে ফেললেন।

রাজচন্দ্র বলতেন,--রাণী, কখনও কোন কাজ করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে নেই। যেই কোন মানুষ তা করে অমনি তার পতনের কালও শুরু হয়। আমার বাবা যখন আমায় বিষয় কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, তখন এই কথা বলতেন বার বার। তিনি কত পরিশ্রম করে এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সে কথা শুনেছ তো?

রাণী বলেছিলেন, শুনেছি—

সে কথা সর্বদা মেনে চলতেন রাসমণি। সতর্ক থাকতেন।

১২৫৯ বঙ্গাব্দ, ৬ ফাল্গুন 'সংবাদ প্রভাকরে' একটি সংবাদ প্রকাশিত হলো:

"আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, জানবাজার নিবাসিনী সুশীলা পুণ্যশীলা সৎকীর্ত্তিকারিণী শ্রীমতি রাসমণি দাসী সংপ্রতি এক অতি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তচ্ছ্রবণে সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

উক্তা শ্রীমতীর বাটীর নিকট হইতে মৌলালির দর্গা পর্যন্ত জল প্রণালী না থাকাতে পথিক ও পল্লীসহ লোকদিগের বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তালতলা নিবাসী সুচিকিৎসক বিচক্ষণবর বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কষ্ট দূরীকরণার্থে এক জল প্রণালী নিস্মাণ নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করণে উদ্যত হইয়া ছিলেন। এ বিষয় শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং ২৫০০ টাকা দান পূর্বক একাকিনী তৎকার্য্য সম্পন্নকরণে সম্মতা হইয়াছেন। এই দান সাধারণ দান নহে—এবং এই কীর্ত্তি সামান্য কীর্ত্তিও নহে, ইহা পৃথ্বী মধ্যে বহুকাল ব্যাপিনী হইয়া জন সমূহের মহোপকার করত কীর্ত্তিকারিণীকে চিরস্মরণীয়া করিবেক।"

২ চৈত্র এই মর্মে আবার লেখা হলো:

"আমরা পরমানন্দে প্রকাশ করিতেছি, সুশীলা দানশীলা দয়াময়ী শ্রীমতী রাসমণি জানবাজার হইতে মৌলালির দর্গা পর্য্যন্ত জল প্রণালী নিম্মাণার্থ নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক দ্বিতীয়ভাগের কমিস্যনরের হস্তে ২১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আর বড় বিলম্ব হইবেক না। এ বিষয়ে শ্রীমতী সাতিশয় যশস্বিনী হইয়াছেন। অপিচ, ইনি বহুলোকের

উপকারার্থ হুগলির ঘোলঘাটের পার্শ্বে, বহু ব্যয় পূর্ব্বক যে এক নয়ন প্রফুল্লকর মনোহর ঘাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাদৃষ্টে দর্শক মাত্রেই সন্তোষ-সাগরে অভিষিক্ত হইয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আমরা শুনিতেছি উক্তা গুণযুক্তা শ্রীমতী আগামি বৈশাখীয় পূর্ণমাসি তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্ত্তি স্থাপিতা করিবেন, অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর সমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির, ও অন্যান্য দেবালয়, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন, এতৎ পবিত্র কর্ম্মোপলক্ষে কত অর্থ ব্যয় এবং কত ব্যক্তি উপকৃত হইবে তাহা অনিব্বর্চনীয়।"



প্রণাম সেরে উঠলেন রাণীমা।

গৃহদেবতা রঘুনাথের পদতলে ভক্তি-শ্রদ্ধায় দেবতার বন্দনায় আত্ম নিবেদিতা করজোড়ে, অস্ফুট স্বরে বললেন, তোমার কর্ম সাধনের যে ভার তুমি আমার ওপর ন্যস্ত করেছ, তোমারই ইচ্ছাশক্তি বলে সেই কর্ম সম্পাদন হয়েছে, এবার তুমি তোমার পরবর্তী নির্দেশ দাও সর্বশক্তিমান, আমার পরবর্তী কর্তব্য কি তার পথ দেখাও—

ইষ্টদেবতা হয়তো শুনলেন সব। সেই মত পরবর্তী কর্মধারাও নিরূপিত হলো!

রাণীমা ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ডেকে পাঠালেন মথুরামোহনকে। মথুরামোহন এলেন। রাণী বললেন,— বাবা মথুর, দক্ষিণেশ্বরের খবর বলো—

মথুর বললেন,—আপনি তো পূর্বেই শুনেছেন মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে, সেই সঙ্গে এখানে দেবীমূর্তি নির্মাণের কাজও সমাপ্ত প্রায়—, দেবী মূর্তির নেত্র অঙ্কনই বাকি—, কথাটা শেষ করেই মথুরামোহন আনলেন রাণী মায়ের শরীর প্রসঙ্গ। বেশ কিছু দ্বিধা জড়িত স্বরে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন,—মা, একটি ব্যাপারে আমরা সকলেই বিচলিত বোধ করছি! দেবীমূর্তি যে দিন, যে ক্ষণে, যে লগ্নে তৈরি হতে শুরু হয়েছিল—সেই দিন, সেই ক্ষণ, সেই লগ্ন থেকে শাস্ত্র অনুসারে আপনিও কঠোর তপস্যা শুরু করেছেন। এই ভাবে এত দিন ধরে আপনি যে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন খাওয়া,

পালঙ্ক ত্যাগ করে মেঝের ওপর শোওয়ার ব্যাপারে নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে নিয়েছেন, তার জন্য আপনার শরীর দিন দিন ক্ষীণ-দুর্বল হয়ে আসছে বলে আমরা খুবই বিচলিত হচ্ছি !—

রাণীমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ! তিনি বললেন, শরীর। সে আর মন্দ কৈ বাবা ? তা ছাড়া এই শরীরের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর জন্য যদি পাত হয় তো হবে, ও নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়—, তুমি শুধু খবর নাও আমার মায়ের মূর্তি গড়তে আর কতদিন বাকি ?

মথুর বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। দেবী মূর্তির নেত্র অঙ্কন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে খবর দেব—

রাণীমা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মথুরামোহন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর রাণীমা প্রতিদিনের মত মেঝের উপরে শয়ন করলেন। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। ধীরে ধীরে নিদ্রা গেলেন তিনি।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রাণীমার সমস্ত সত্তা জুড়ে যে আকাঙ্ক্ষা তারই প্রকাশ ঘটল স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। রাণীমার আকাঙ্ক্ষা, দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে যে দেবালয় সেই দেবালয়ে আপন আসনে অধিষ্ঠিতা হোন 'মা'। মায়ের পূজা করুন এমন কোন পূজারী যিনি মানব দেহে সাক্ষাত ঈশ্বরপুত্র। দক্ষিণেশ্বর এক মহাতীর্থে হোক রূপান্তরিত।

তাই হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর তীর্থে রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সাঁতরা তাঁর "রাণী রাসমণি" গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন—

"দক্ষিণেশ্বর অতি মনোরম স্থান ! ইহা একাধারে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদানে সমর্থ !

প্রথমত ঃ—ইহা ভক্ত জনের সাধনার প্রধান স্থল ; এমন শান্ত, নিস্তব্ধ, নিভৃত ভক্তি মিশ্রিত স্থান আর বাঙ্গালায় আছে কিনা সন্দেহ। এখানে প্রথম, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব—যাঁহার সিদ্ধির আরম্ভ ও শেষ এই স্থানেই হইয়াছে !

দ্বিতীয় ঃ—তোতাপুরী যিনি রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গুরুদেব, রামকৃষ্ণ সহবাসে গুরু হইয়াও অনেক দূর সাধন মার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তৃতীয় ঃ—ভৈরবী, যিনি কোথা হইতে অযাচিত ভাবে আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে মাতৃবৎ স্নেহে পালন করিয়াছিলেন ও রামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া নিজে বহুদূরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ ঃ—রাণী, যাঁহার আগমন হইবে জানিয়াই যে বহু পূর্ব্বে তাঁহার

পীঠস্হান স্বরূপে দক্ষিণেশ্বর নির্মাণ করাইয়া তাঁহার আসার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আগমনের পর মুক্তির পথে পথিক হইয়াই নশ্বর ধরায় অতুলনীয় কীর্তি রাখিয়াই মহাপ্রস্হান করিলেন।

পঞ্চম ঃ—রাণীর জামাতা মথুর বাবু, রাণী গত হইবার পর যাঁহাকে রামকৃষ্ণ রসদ্দার বলিতেন, রাম ও কৃষ্ণ এক সঙ্গে দুই ভাবে পাইয়া বহু উন্নত হইয়াছিলেন! দক্ষিণেশ্বর এই সকল মহাত্মার লীলাক্ষেত্র!"

এরপর মাত্র কয়েকটা দিন হলো অতিবাহিত।

দেবী মূর্তি রচনা সমাপ্ত! মায়ের নেত্র অঙ্কন শেষ হবার পরই খবর এলো রাণীমার কাছে। রাণীমা হলেন বিচলিত। মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে মন্দিরে দেবী মূর্তি বসাবার আগে। অথচ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ও ক্ষণ স্হির হলো না। সুতরাং মায়ের মূর্তি মন্দিরে বসালে যদি কোন ভাবে দেবী অঙ্গে আঘাত লাগে তা হলে ক্ষতি হবে চরম, হয়তো অকল্যাণও হতে পারে। অনেক ভেবে রাণীমা সকলকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, একটি বড় এবং মূল্যবান কাঠের বাক্‌স তৈরি করার। সেই বাক্‌সে দেবী মূর্তি রেখে দিতে হবে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত।

মুহূর্তে সেই নির্দেশ পালিত হলো। সুন্দর-মজবুত করে তৈরি হলো একটি কাঠের বাক্‌স। সেই বাক্‌সে সযত্নে রক্ষিত হলো মায়ের মর্মর-মূর্তি!

এরপর রাণীমা তাঁর আপনজনদের বিশেষ করে কুলগুরুদেব, কুল পুরোহিত এবং মথুরামোহনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ স্হির করার কাজ যখন চলছিল তখন একদিন রাণীমা আবার স্বপ্ন দেখলেন—বাক্‌স-বন্দী মাতৃমূর্তির সর্বাঙ্গে শিশির বিন্দুর মত জলকণিকা! মা বলছেন, আমার বড় কষ্ট, আর কতদিন তোরা আমাকে এভাবে আবদ্ধ রাখবি?—

মুহূর্তে ঘুম মুছে গেল। তড়িৎ বেগে রাণীমা উঠে বসলেন। প্রায় উন্মাদিনীর মত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সব বিষয় সকলের কাছে ব্যক্ত করলেন। রাণীমা স্বয়ং বাক্‌সের ডালা খুলে বিস্ময়ের আতিশয্যে চমকে উঠলেন। যা স্বপ্নে দেখেছেন বাস্তবে ঠিক তাই। দেবীর মর্মর মূর্তি ঘেমে গেছে।

ভীত সন্ত্রস্ত রাণীমাকে শান্ত করার জন্য সকলে মিলিত হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করলেন মুহূর্তে। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, পুণ্য স্নানযাত্রা ১২৬২ সনের এই তিথিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প দৃঢ় হয়ে গেল। রাণীমা নির্দেশ জারী করলেন, বাবা মথুর, তুমি ঢোল সহরৎ করে সারা দক্ষিণেশ্বরে পল্লীবাসীদের জানিয়ে দাও এই দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, আরও জানাবে

পল্লীবাসীরা যেন সকলেই এই শুভদিনে মন্দিরে আসেন—

রাণীমার আদেশ যথারীতি পালন করলেন মথুরামোহন। ঢোল সহরতের সঙ্গে সঙ্গে সারা দক্ষিণেশ্বর অঞ্চল শুধু নয়, সোদপুর, পেনেটী (পানিহাটি) অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধ বনিতার মন আনন্দে-খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে, মনে মনে ভক্তি ভাবের জোয়ার এলো। মা আসছেন, মা কালী মর্মরমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করে নেমে আসছেন অবোধ সন্তানকুলের কাছে!

সংসারের চার দেওয়ালের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর নিত্য সাক্ষী হয়ে, স্বার্থপরতার সীমাহীন আচরণ, মায়া-মোহ-লোভ এই সব নিত্য যন্ত্রণার ক্লেদময় পরিবেশে কাটিয়ে যখন রক্তমাংসের মানুষ ক্লিষ্ট হয়ে আসছিল, যখন দূরত্ব আর যানবাহনের সমস্যার জন্য মানুষ গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন অথবা জগন্নাথ ধামে গিয়ে তীর্থ পরিভ্রমণ বা দেবতা দর্শনের পুণ্য লাভ থেকে বঞ্চিত ছিলেন তখনই ঘরের দুয়ারে মহাতীর্থ বা দেবীধাম রচনার খবর পেয়ে সাধারণ মানুষের মন ভক্তি রসে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল!



১৮৫৫ সাল, ৩১ মে জ্যৈষ্ঠমাসের পৌর্ণমাসি তিথি। স্নানযাত্রার শুভদিন।

সকলেরই মুখে এক কথা, চল রাণীমার মন্দিরে—

এলো শুভক্ষণ! প্রভাতের প্রথম সূর্য স্পর্শ করল মন্দির চূড়া। আজ যেন বড় বেশী আহ্লাদিত মন্দির অঙ্গনের দূর্বাদল, বাগিচার ফুল-লতা-পাতা, স্রোতস্বিনী গঙ্গার তরঙ্গরাশি। অন্যদিনের তুলনায় আজ যেন পাখীরা বড় বেশী গাইছে গান! সূর্যোদয়ের আগে থেকেই পথে পথে মানুষের মিছিল! সকলে চলেছেন রাণীমায়ের মন্দিরে। আজ মন্দির প্রতিষ্ঠা, আজ দেবী হবেন অধিষ্ঠিতা!

রাণীমা গঙ্গায় স্নান সারলেন। আত্মীয়-স্বজন সকলেই গঙ্গায় স্নান সেরে নব বস্ত্রে হলেন সজ্জিত!

রাণীমাকে দেখে সবাই জয়ধ্বনি দিল। গঙ্গাবক্ষ বিভিন্ন নৌকা-পানসি-বজরায় ভরে গেছে। দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত মানুষ আসছে দক্ষিণেশ্বরে। মন্দির অঙ্গন বিপুল জনতায় পরিপূর্ণ। কোথাও বৈষ্ণবেরা দলগতভাবে সংকীর্তনে মত্ত, কোথাও মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত হরিনাম! কোন দল বোম্ বোম্ শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে, কেউ বা আকুল হৃদয়ে জয় মা জগদম্বা-জয় মা জগন্মাতা বলে চিৎকার করছে!

এরই মধ্যে আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো শঙ্খধ্বনিতে। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজে মেতে উঠল চতুর্দিক!

এ প্রসঙ্গে প্রবোধ সাঁতরার বর্ণনার প্রতি একটু মন ফেরানো যাক। তিনি এক জায়গায় লিখছেন

"বহু দেশ-বিদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, অনাহূত, অভ্যাগত আসিয়াছিলেন, বহু আত্মীয়-কুটুম্ব বহুদূর হইতে আসিয়াছিলেন। হুগলী কুলিহাস্তা হইতে লেখকের খুল্লপিতামহ, পিতামহী ও সাঁতরা বংশের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তালুক ও জমিদারী হইতে বহু দ্রব্য আনিত হইয়াছিল। নায়েব-গোমস্তা অনেকেই আসিয়া এক একটি কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। শালবাড়িয়া তালুক হইতে ২টি হস্তী আসিয়াছিল, ঐ হস্তী পৃষ্ঠে অতি উত্তম বিশুদ্ধ ঘৃত আনিত হইয়াছিল।"

কিন্তু রাণীমার মন ভাল নেই।

বেলা বাড়ছে অথচ মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য যে পুজো অর্চনা, যে তন্ত্রশাস্ত্র পাঠের আয়োজন ও বিপুল অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে, তার কোন কাজটি সুচারু পরিকল্পিত ভাবে সমাধা হতে বিলম্বের অন্ত নেই। রাণীমা বুঝতে পারছেন একটা বড় রকম গোলমাল এবং নানা সমস্যা দানা বেঁধে উঠছে। রাণীমা মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কোন কথা বলতে পারছেন না। বলা উচিত নয়!

মাঝে মাঝে মথুরামোহন আসছেন। তিনি যেমন বিচলিত তেমনি নানা কারণে বিব্রত! মথুরামোহনের মধ্যে আলাদা একটা প্রতাপও যে নেই তা নয়, তিনি কোন কাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা কেমন করে সমাধান করতে হয়, তার গুরুত্ব প্রসঙ্গে যত না ভাবেন, তার চাইতে অনেক বেশী সহজ

মনে করেন উত্তেজনা দেখিয়ে সকলকে বশীভূত করে কাজ শেষ করা !

তাই মাঝে মাঝে মথুর ছুটে আসেন আর অভিযোগ পেশ করেন। আত্মীয় স্বজনেরাও ঠিক তেমনি ! কারও মধ্যে ধৈর্য-স্থৈর্যের কোন লক্ষণই নেই ! কিন্তু যেহেতু রাণীমা আছেন মাথার উপরে সেই হেতু যত সমস্যাই থাক, মনের মধ্যে যত উত্তেজনাই দানা বাঁধুক, কেউই টু শব্দটি করতে পারেন না ! সবাই আসেন, অভিযোগ পেশ করেন, রাণীমা শুধু বলেন,—ধৈর্য ধর, যাঁর কাজ তিনিই দেখছেন। তাঁর ইচ্ছা হলেই দেখবে সব গোল মিটে গেছে ! যদি তা না মেটে তা হলে জেনো, এ আমার মায়েরই ইচ্ছা !

কথাগুলো রাণীমা বলেন বটে, কিন্তু চারদিকের পরিস্থিতি তাঁর অন্তরে গভীর দাগ কেটে দেয় !

খবরের পর খবর !

রাত্রি অবসানের অনেক আগে থেকেই একের পর এক খবর আসতে থাকে রাণীমার কাছে। উৎসাহ উদ্দীপনায় প্রতিটি মানুষের মন কানায় কানায় ভরা, তাই মানুষের মনের ইচ্ছা-বাসনার তাগিদে দূরত্ব আর দূরত্ব থাকে না। দক্ষিণেশ্বর আর জানবাজার, জানবাজার আর দক্ষিণেশ্বর যেন একে অন্যের দোসর হয়ে দাঁড়ায় পাশাপাশি ! জানবাজারের সরকার মশাইরা কেউ কেউ বা অবাক হন। দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় খবর এত দ্রুত আসছে কেমন করে ! কেমন করে সংবাদদাতারা এত দ্রুতলয়ে কাজ করছেন !

রাণীমা সব সংবাদই গ্রহণ করছেন মন দিয়ে। কোন চঞ্চলতা নেই, নেই কোন বিব্রত মানসিক অবস্থা বহিঃপ্রকাশ !

খবর আসে—পণ্ডিতবর্গ আসছেন কাতারে কাতারে। নাটমন্দিরে তাঁদের বিশ্রামের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।

খবর আসে—হোম যজ্ঞের সব আয়োজনই সম্পন্ন।

খবর আসে—মন্দির প্রাঙ্গনে আর গঙ্গার ঘাটে তিল ধরাবার জায়গা নেই, চারদিক থেকে আসছে মানুষ ! বড়লোক, গরীবলোক, অন্ধ-খঞ্জ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

খবর আসে - ঝামাপুকুর টোলের রামকুমার ভট্চাজের সঙ্গে এসেছে একটি ছেলে ! ছেলেটা বড় দুরন্ত, বড় চঞ্চল। শোনা যাচ্ছে, রামকুমার ভট্চাজের ভাই গদাধর। ছেলেটা পণ্ডিতদের কাছে যাচ্ছে আর তাদের জিজ্ঞাসা করছে নানা কথা।

গদাধর ! নামটা রাণী মায়ের কান দিয়ে প্রবেশ করে হৃদয় স্পর্শ করল। কেমন যেন এক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হলেন। বোধ করি অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ

করলেন ···গদাধর !

সেই ভাবাবেগ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে গেল। একটা খবরে প্রায় চমকে উঠলেন তিনি। খবর এলো,—গৌড়াদ্য-দ্রাবিড়-বৈদিক সব শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এক সঙ্গে দাবী তুলেছেন, মন্ত্রপাঠ আর মহাযজ্ঞ করতে হবে। অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরও সেই একই দাবী। মথুরবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করছেন সব সমস্যা সমাধানের। অথচ সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হলো !

যত সমস্যার খবর আসে, যত সমস্যার কথা রাণীমার কানে যায় ততই তাঁর অন্তর গভীর ব্যথায় টন টন করে ওঠে। ব্যথা ঝরে দু'চোখ দিয়ে। রাণীমার ব্যথা কোন উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে নয়, কোন শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণেরা কোন কর্ম সম্পাদন করবেন এ সব কথা তাঁর কাছে বড় নয়, মানুষের কথা ভেবেই রাণীমায়ের হৃদয় ব্যথিত !

রাণীমা বুঝলেন, যা কিছু সমস্যা তার মূলে জাত আর ধর্ম। নিজের জাত আর জাতিভেদের প্রশ্নে রাণীমার অনেক ভাবনা। সেই ভাবনা যেমন মিথ্যা হয়নি, তেমনি চোখের জলও মিথ্যা হয়নি। রাণী ভাবছিলেন, যে মানুষের জন্য এই ধরাধাম, সেই ধরাধামেই মানুষের মধ্যে কী বিচিত্র এবং সর্বনাশা শ্রেণী ভাগ। জাতের বিচার ! জাত আর কুজাত, উঁচু আর নীচু, কী ভয়ঙ্কর এই বর্ণ বৈষম্য !

রাণীমার সম্বিত ফিরল। সামনে দাঁড়িয়ে মথুর আর গুরুদেব ! তাঁদের চোখে মুখে ছড়ানো উৎকণ্ঠা ! উভয়েই যেন একটা চাপা উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে অস্থির।

রাণীমা ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে, নিজের পরনের থানের খোট দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করে, কুশাসন পেতে, ভক্তি বিনম্র চিত্তে গুরুদেবকে বসতে দিলেন। রাণীমার দু'চোখে জলের দাগ তাঁদের চোখ এড়াতে পারল না। ওঁদের মুখ খোলার আগেই রাণীমা মুখ খুললেন। ধীর স্বরে বললেন,—আমি জানি বাবা, আপনারা আমাকে কী কথা শোনাতে এসেছেন—, আমি এও জানি মন্দির প্রতিষ্ঠা আর মায়ের অন্নভোগ দেবার অন্তরায় দেখা দিয়েছে। আর সে অন্তরায় কী তাও আমি জানি—

কুলগুরুদেব রামসুন্দর চক্রবর্তীর কপালের চামড়ায় একটা তরঙ্গ উঠল। বললেন, তুমি জানো মা, অন্তরায় কোথায় ?

রাণীমা বললেন, জানি বাবা ! অন্তরায় আমার জাত। অন্তরায় আমার সামাজিক পরিবেশ। তাই বলছি বাবা, আপনারা সবাই যা বিধান দেবেন আমার মা জগদীশ্বরীর জন্য আমি সব বিধানই মেনে নেব—, আর এই

বিধানের ব্যাপারে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে। শুনলাম, রামকুমার ঠাকুর এসেছেন মন্দিরে তাঁর ভাই গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি কি কোন বিধানের কথা বলেছেন?

গুরুদেব বললেন, বলেছেন মা। সে এক মর্মান্তিক বিধান। রাম ভটচাজ্যি মশাই জানিয়েছেন, রাণী যদি এই সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ যদি মন্দির প্রতিষ্ঠা আর অন্নভোগের দায়িত্ব নেন তা হলেই সব কার্য সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু —প্রমাদ গুণলেন গুরুদেব।

রাণী আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, আপনারা ভাবছেন এই দীন-অবলা এক মেয়েমানুষের কথা। এ সব কিছু দান করে দিলে আমার বলতে কী থাকবে? কিন্তু এই বিধানই শ্রেষ্ঠ বিধান। এ তো মা জগদীশ্বরীর মনবাসনা। এই তো সত্য। আজ যা কিছু হয়েছে তাঁর জন্য, আমি নিমিত্তের ভাগী। আমি যদি শুধু মায়ের সেবাদাসী হয়ে বাকি দিনগুলো কাটাতে পারি তবেই জানবেন আপনাদের রাসমণি ভাগ্যবতী! আপনারা এখুনি যান, মন্দির প্রতিষ্ঠা আর মায়ের অন্নভোগের ব্যবস্থা নিন

একটু থামলেন রাণীমা। পরক্ষণেই অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে বললেন, এই সম্পত্তি আমি আমার গুরুবংশীয়দের দান করতে অভিলাষী। বংশানুক্রমে এখানে ঠাকুরের সেবার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে থাকবে আমার বংশের সকলে। আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। তারপরই মথুরামোহনকে ডেকে বললেন, বাবা মথুর, যত দ্রুত সম্ভব দানপত্র তৈরি করার ব্যবস্থা পাকা কর, আমি সই দেব।

রাণীমার নির্দেশ শিরোধার্য করে কুলগুরুদেব আর মথুরামোহন রওনা দিলেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে ততক্ষণে অন্য ভাব, অন্য প্রতিক্রিয়া।

উপস্থিত পণ্ডিতজনেরা যেন একযোগে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চেহারা। সকলের মুখে এক কথা, আমরা রাণী রাসমণির সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই—

মথুরামোহন অত্যন্ত শান্ত নম্র স্বরে মায়ের মনবাসনার কথা নিবেদন করলেন। বললেন, এবার আপনারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, আজ কোন কর্মভার আপনারা বহন করবেন, কোন কর্মভার ন্যস্ত করবেন অন্যদের ওপর —তাই হলো। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পণ্ডিতবর্গই স্থির করলেন গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পাঠের দায়িত্ব নেবেন, রামকুমার ভট্টাচার্য নেবেন হোম যজ্ঞের দায়িত্ব।

শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হল।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে যে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের তালিকা এই রকম—ঃ

১। পূর্বাহ্নিজলার ঃ লম্বোদর সার্বভৌম। ২। ডেঙ্গরগাছার ঃ রাঘব তর্কসিদ্ধান্ত। ৩। সুলতানপুরের ঃ গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। ৪। দেবীপুরের ঃ বদন বাচস্পতি আর দ্বিজবর বিদ্যারত্ন। ৫। তেঘরির ঃ ভাগবত বিদ্যালঙ্কার ও প্রতাপচন্দ্র হালদার। ৬। বাসুদেবপুরের ঃ নবকুমার চূড়ামণি, গুরুচরণ শিরোমণি এবং ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ৭। বলরাম-বাটীর ঃ ভোলানাথ সার্বভৌম, তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ আর ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি। ৮। শ্রীরামপুরের ঃ ঠাকুরদাস বিদ্যালঙ্কার। ৯। বাসুবাটীর ঃ রামচন্দ্র চূড়ামণি আর মনসাচরণ বিদ্যালঙ্কার। ১০। মাদড়ার ঃ মুক্তারাম বাচস্পতি ও রাঘবচন্দ্র তর্কালঙ্কার। ১১। ব্রাহ্মণপাড়ার ঃ ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ। ১২। বাগবাজারের ঃ রামসুন্দর চক্রবর্তী (রাণী রাসমণির গুরুদেব)। ১৩। বরাহনগরের ঃ উমাচরণ ভট্টাচার্য (রাণীমার কুলপুরোহিত)। ১৪। গোণ্ডলপাড়ার ঃ বিশ্বনাথ তর্ক পঞ্চানন, ঈশানচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, বৈকুণ্ঠ ন্যায়রত্ন, প্রেমচাঁদ বাচস্পতি, কৃত্তিবাস তর্করত্ন এবং রাইচরণ ভট্টাচার্য। ১৫। জগদ্বল্লভপুরের ঃ রামকুমার তর্কালঙ্কার, পীতাম্বর চূড়ামণি ও যদুনাথ সার্বভৌম। ১৬। কাঁশরার ঃ পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কার, নৃসিংহ বিদ্যারত্ন। ১৭। পাঁচারুলের ঃ দীননাথ বিদ্যালঙ্কার ও মধুসূদন চূড়ামণি। ১৮। গুসকরার ঃ মধুসূদন তর্কালঙ্কার। ১৯। বেলকুলীর ঃ মধুসূদন চূড়ামণি। ২০। খলসিনীর ঃ গোপাল শিরোমণি। ২১। ঝিখিরার ঃ ক্ষেত্রনাথ বিদ্যালঙ্কার। ২২। জগৎনগরের ঃ গোলকচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ২৩। অনন্তরামপুরের ঃ কার্তিকচন্দ্র ন্যায়রত্ন। ২৪। হাকিমপুরের ঃ মাধব শিরোমণি। ২৫। মেলের ঃ মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং সারদা বিদ্যাবাগীশ। ২৬। কাঁকড়াফুলির ঃ ঈশানচন্দ্র বিদ্যার্ণব ২৭। গোপালনগরের ঃ গণেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ। ২৮। ধামাইটিকার সাকিনের ঃ রণরাম ভট্টাচার্য। ২৯। দেওয়ানের ভেড়ী অঞ্চলের ঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ৩০ বাসুদেবপুরের ঃ নবকুমার চূড়ামণি। ৩১। মধুবাটীর ঃ পরাণচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ৩২। বাঁকীপুরের ঃ বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য। ৩৩। মির্জাপুরের ঃ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য এবং মনমোহন ভট্টাচার্য। ৩৪। চাণক মণিরামপুরের ঃ রামচন্দ্র চূড়ামণি। ৩৫। ভাদুড়ার ঃ ফকিরচাঁদ ভট্টাচার্য। ৩৬। নাটাগড় দিকড়ার ঃ রামমোহন তর্কালঙ্কার। ৩৭। পাতিহালের ঃ সীতারাম বিদ্যাভূষণ। ৩৮। সেয়াগড়ের ঃ সীতারাম ভট্টাচার্য। ৩৯। পাইকপাড়ার ঃ চণ্ডীচরণ বিদ্যাভূষণ। ৪০।

নয়াচকের : সার্থকরাম শিরোমণি। ৪১। সাচকের : বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন। ৪২। পানপুরের : কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য। ৪৩। কেশবনগরের : রামকমল ভট্টাচার্য। ৪৪। হরালের : কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন। ৪৫। আদান সাকিনের : মুক্তরাম ভট্টাচার্য ও উমাচরণ ভট্টাচার্য। ৪৬। ধান্যহানার : মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ৪৭। গড় ভবানীপুরের : কেশবচন্দ্র তর্কবাগীশ। ৪৮। বালীচকের : বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়রত্ন। ৪৯। কমলাপুরের : বৃন্দাবন ভট্টাচার্য। ৫০। মাসুদপুরের : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। ৫১। ভগবতীপুরের : কালীচরণ চূড়ামণি। ৫২। শশাবেড়িয়ার : কাশীনাথ ভাগবতভূষণ। ৫৩। উগ রদহের : শ্যামাচরণ তত্ত্বনিধি। ৫৪। ওয়াদিপুরের : বাণেশ্বর বিদ্যাভূষণ, চিন্তামণি বিদ্যাসাগর, বনমালী চূড়ামণি, নবকুমার শিরোমণি, ব্রজনাথ চক্রবর্তী, কালীপদ বিদ্যার্ণব এবং লালচাঁদ বিদ্যানিধি। ৫৫ পোল বাওয়াই-এর : দেবীচরণ তর্কালঙ্কার। ৫৬। বাজেপ্রতাপপুরের : রামধন ভট্টাচার্য। ৫৭। খোশালপুরের : আনন্দগোপাল চূড়ামণি। ৫৮। রঘুনাথপুরের : ভুবন মোহন ভট্টাচার্য।

এ ছাড়াও নবদ্বীপ, কাশী, ভট্টপল্লী, পুরী, বিক্রমপুর, পুণা, মাদ্রাজের অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনা হয়েছিল।

রাণীমা বলেছিলেন, শুধু মন্দির আর মন্দিরে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠাই শেষ কথা নয়, এই সঙ্গে মানুষের সেবা, মানুষ-দেবতার পুজো যদি যথাযোগ্য ভাবে মা জগদীশ্বরী আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন তবেই আমার মানব-জনম সার্থক হবে।



রাসমণি সেদিন মানব-পুজার আয়োজনে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখেননি।

সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এসেছিলেন,

রাণীমা নিজে তাঁদের হাতে দান আর দক্ষিণা তুলে দিয়ে, প্রণাম জানিয়ে নিজেকে ধন্য করে নিয়েছিলেন।

সারা দক্ষিণেশ্বর তো বটেই, উপরন্তু যতদূর পর্যন্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল, দূর-দূরান্ত থেকে যত দীন-দরিদ্র এসেছিল মন্দিরে, রাণীমা যেন সাক্ষাত অন্নপূর্ণা হয়ে তাদের অন্ন দানে নিজেকে তৃপ্ত করেছিলেন।

কয়েকশত মানুষের মুখে রাণীমা সেদিন তুলে দিয়েছিলেন ফল-মূল আর তৃষ্ণার জল।

এ প্রসঙ্গে প্রবোধ সাঁতরা তাঁর লেখায় যে বর্ণনা দিয়েছিলেন এখানে তার পুনরুল্লেখ করছি—

"দধি পুষ্করিণী, পায়স সমুদ্র, ক্ষীর হ্রদ, দুগ্ধ সাগর, তৈল সরোবর, ঘৃত কূপ, লুচি-পাহাড়, মিষ্টান্ন স্তূপ, কদলী পত্র রাশি, মৃণ্ময় পাত্রের পাহাড় প্রভৃতির অপূর্ব দৃশ্যে পুণ্যশীলা রাণীর সেই অন্নদান যজ্ঞ পরম শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল। অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন তেজোময়ী এই আর্যনারী যে প্রণালীতে সেই বৃহদানুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন অধুনা বাঙ্গালার তেমন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ব্যক্তিও সে সকল কার্য্য ও সৌষ্ঠব সহসা ধারণা করিতে পারিবেন না। তাঁহার এই দান-কার্য্যের তুলনা নাই। তাঁহার এই পুণ্যকার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়!...দানেই তাঁহার বীরত্ব। তাঁহার হৃদয়ের অনুপম গুণরাশির সুমিষ্টতম বিকাশ এই দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরে। এই তাঁহার প্রধান কীর্তি। এখানেই তাঁহার মহত্বের প্রতিষ্ঠা!..."

ব্রাহ্মণদের হাতে রেশমীবস্ত্র, উত্তরীয় ও একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলেন রাসমণি।

এবার দক্ষিণেশ্বরের কথা একটু বিস্তারিত বলা যাক।

শহর কলকাতা থেকে ৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার গা লাগোয়া এই 'দক্ষিণেশ্বর' নামটির সঙ্গে তখনকার দিনের মানুষের বিশেষ পরিচয় ছিল না। এটি ছিল একটি গণ্ড গ্রাম। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে ছিল গভীর জঙ্গল, ব্যক্তিগত মালিকানার কিছু বাগান, পুকুর। ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কবরস্থান। এ সবের ভিতর দিয়ে কিছু কিছু পথ ছিল, যে পথে চলত জমিদার আর ইংরেজদের ঘোড়ার গাড়ি। কলকারখানা বা আঞ্চলিক

ব্যবস্থা বলতে কিছু ছিল না। ছিল সরকারী বারুদ কারখানা, তার নাম ছিল "ম্যাগাজিন"। এই গ্রামে যত বাসিন্দা ছিল তাদের মধ্যে দু' এক ঘর বিত্তবান ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশই ছিল সাধারণ, অতি সাধারণ কিছু পরিবার। এদের মধ্যে মুসলমান পরিবারের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। কিছু কিছু ইংরেজদেরও বাসস্থান ছিল। তবে ইংরেজদের কোন গীর্জা ছিল না, ছিল বেশ কিছু ছড়ানো-ছিটানো ছোট ছোট মন্দির, মসজিদ আর 'দরগা'! বাংলার অগণিত অখ্যাত গ্রামের মত এটিও ছিল লোকের কৌতূহলের বাইরে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর প্রসঙ্গে কোন উল্লেখ-যোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠের মাহাত্ম্যে ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী আসন রচনা করে নিয়েছে এই স্থান।

বর্তমান দক্ষিণেশ্বর রেল স্টেশন থেকে পশ্চিমে দুটি পথের একটি বিবেকানন্দ ব্রীজে ওঠার পথ। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা দরকার, এই ব্রীজের পূর্বনাম ছিল বালীপুল।

আর একটি পথ ঈষৎ বাঁক নিয়ে চলে গেছে গঙ্গার দিকে। সেই প্রশস্ত পথের নাম হলো রাণী রাসমণি রোড! এই রাস্তা সোজা এসে প্রবেশ করেছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গনে, মাঝে বিশালতম তোরণদ্বার দিয়ে মন্দির অঙ্গনে—উদ্যানে বা গঙ্গার ঘাটে আসতে হয়।

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই তোরণদ্বার বন্ধ থাকে। রাতের অন্ধকার মুছে যাবার আগে, রাত ৩টে নাগাদ এই বিশাল তোরণদ্বার উন্মুক্ত করা হয়। উন্মুক্ত করার আগে রুদ্ধ দ্বারের সামনে নিত্য যে দৃশ্যের অবতারণা হয় সে এক অপরূপ দৃশ্য, এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি বিরাজ করে সেখানে! দৃষ্টি নন্দন, চিত্ত নন্দিত সেই দৃশ্য!

পুরবাসীদের মধ্যে জনাকতক মানুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতী প্রতিদিন খোল-করতাল বাজিয়ে সংকীর্তন করেন। "জয় মা-জয় মা-জয় মা-জয় মা-জয় মা-জয় মা- জয় মা জয়" — শব্দগুলি সংকীর্তনের সুরে গাইতে গাইতে তাঁরা হয়ে যান আত্মবিমোহিত। তোরণদ্বার উন্মুক্ত হলে সেই ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পিতপ্রাণের দল, শহরের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের দল একরাশ উন্মাদনা নিয়ে ছুটে যান মায়ের মন্দিরে। কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে ঘাটের পথে মন্দিরে প্রবেশ করেন, কেউ প্রধান তোরণ পেরিয়ে মন্দিরের প্রধান ফটকের ছোট্ট অংশ দিয়ে [এই ফটকের বিশাল দরজার চার ভাগের একটি ভাগ খোলা হয় তখন] মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে রীতিমত দৌড়ে যান মাতৃ মন্দিরের সোপান মাড়িয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে। বন্ধ

দুয়ারের সামনে দু'ধারে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে প্রভাতের পরম পুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় করজোড়ে প্রতীক্ষা করেন সবাই। চলতে থাকে সংকীর্তন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং মন্দিরের প্রথম দ্বারের তালা নিজে হাতে খুলে দেন। মাতৃ দর্শনার্থীরা এবার দ্বিতীয় দ্বারের কাছে এসে অপেক্ষা করেন। প্রতিটি মন তখন মাতৃ-মুখচান্দ্রমা দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। এরপর মূল মন্দিরের ভিতর থেকে স্বয়ং পুরোহিত যখন দ্বার উন্মুক্ত করে দেন তখন "মা-মাগো" রবে মুখর হয় চারদিক। মাতৃদর্শন করেন সকলে। চন্দন-পুষ্প আর ধূপ-দীপের এক অপরূপ ঘ্রাণ পার্থিব সংসারের সব মানুষের মনকে তৃপ্ত করে। তৃপ্তি পান বিশ্ব-জননী।

সংকীর্তন চলতে থাকে। নীরবে পুরোহিত হাত বাড়িয়ে দিলে স্থানীয় দর্শনার্থীরা এগিয়ে দেন পুষ্প-পাত্র। বাড়ির বাগানে যাঁর যে ফুল ফোটে সেই ফুল চয়ন করে আনেন মায়ের পায়ে অর্পণ করার বাসনায়। পুরোহিতও সেই ফুলের আরতিতে মায়ের ঘুম ভাঙ্গান!

মায়ের ঘুম ভাঙ্গাবার আরতি শেষ হলে আবার মন্দির দ্বার বন্ধ হয়।

পুরোহিত আসেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে। নাম তার বিষ্ণু মন্দির। দর্শনার্থীর দল ততক্ষণে জমায়েত হন সেখানে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরোহিত রাধা-গোবিন্দের মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন করেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভাবাবেগে আপ্লুত দর্শনার্থী গেয়ে চলেন—"জয় রাধে গোবিন্দ—জয় রাধে গোবিন্দ —জয় রাধে গোবিন্দ—জয় রে"—

পুরাতন নথিপত্র থেকে সত্য ইতিহাসের নজির হিসাবে বলা যায়, দক্ষিণেশ্বর মন্দির যে বিশালতম উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত সেই উদ্যানটির নাম ছিল 'সাহেবান বাগিচা'। এই বাগিচার অভ্যন্তরে ছিল সেকালের সুপ্রিমকোর্টের এ্যাটর্নী জেমস্ হেস্টির দোতলা 'কুঠি বাড়ি'। একদিকে মুসলমানদের কবরখানা, গাজী পীর সাহেবের স্থান। একাংশে ছিল পুকুর, যে পুকুরটি এখন দুধে পুকুর নামে পরিচিত। অন্য অংশে বিশাল আমবাগান। ভূমির একটি অংশ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি থাকায় শক্তি সাধনার উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল।

রাণীমা মোট সাড়ে চুয়ান্ন বিঘার এই বিশাল জমি কিনেছিলেন বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচ শত টাকায়। কিনেছিলেন হেস্টি সাহেবের সেই কুঠি বাড়ি সহ। এই কুঠি বাড়িটি আজও ঠিক তেমনি আকার নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে যদিও ইতিমধ্যে অনেকবারই সংস্কার করা হয়েছে। অক্ষত অবস্থায় আছে গাজী পীরের স্থানও।

১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাণী রাসমণি এই বিশাল জমি কিনেছিলেন "বিল অফ সেল"-এর মাধ্যমে। তবে তখন এই জমি রেজিস্ট্রী করা সম্ভব হয়নি, কারণ তখনও রেজিস্ট্রেশান আইন চালু হয়নি। বছর কয়েকের মধ্যে এই আইন বলবৎ হলে, আর একটি দেবোত্তর সম্পত্তির দলিলের মধ্যে ঐ "বিল অফ সেল"-এর কথা উল্লেখ করে আলিপুরের রেজিস্ট্রী অফিসে ১৮৬১ সালের ২৭ আগষ্ট রেজিস্ট্রী করা হয়!

এই রেজিস্ট্রেশন সম্পাদিত হয় রাণী রাসমণির মৃত্যুর ৬ মাস পর।

রাণীমা যখন জমি কেনেন তখন পূর্বদিকে ছিল কাশীনাথ চৌধুরীদের জমি। পশ্চিমে পুণ্য-সলিলা গঙ্গা। উত্তরে সরকারী বারুদখানা 'ম্যাগাজিন'। আর দক্ষিণে ছিল জেমস্ হেস্টির একটি কারখানা।

মূলতঃ রাণী রাসমণির এই জমি কেনার পর থেকেই এখানে জনবসতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে।

কালপ্রবাহে বিলুপ্ত হয়ে যায় অনেক কিছু। যেমন জেমস্ হেস্টির কারখানাটিকে কিনে নিয়েছিলেন যদুলাল মল্লিক। তাকে বলা হতো যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি। এখানেই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার গেছেন। এখানে তাঁর অনেক লীলার প্রকাশও ঘটেছিল। বর্তমানে সেই বাগানবাড়িও নেই, গড়ে উঠেছে "শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডল", প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠাকুরের মর্মরমূর্তি।

'ম্যাগাজিন' বারুদ কারখানাটি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেখানে গড়ে উঠেছে 'উইমকো'র বিখ্যাত দেশলাই কারখানা। প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখা দরকার, ইংরেজ সরকারের সঙ্গে রাণী রাসমণি অনেকবারই আইন যুদ্ধে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যে মোকদ্দমা যুদ্ধ সেটি হলো এই 'ম্যাগাজিন'-এর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে! এই মামলার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাণী রাসমণির এস্টেটের পক্ষে আইনজীবি হিসাবে একদিন মাইকেল মধুসূদন গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে সরেজমিন তদারকে। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও ঘটেছিল। রাণীমার বিশাল এই কর্মকাণ্ডের স্থপতি ছিলেন ম্যাকিনটস এ্যাণ্ড বারন কোম্পানী।

১৮৩৪ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩২ সালে এই বিখ্যাত কোম্পানীটি 'লিমিটেড ফাম" হিসাবে চিহ্নিত হয়। নাম হয় 'ম্যাকিনটস বারন লিমিটেড'। শহর কলকাতা নানাদিক থেকে যখন গড়ে উঠছিল, যখন ধীরে ধীরে কলকাতা সৌধ নগরী হয়ে উঠছিল

তখন এই ঠিকাদারী সংস্থার ভূমিকা ছিল অসামান্য। বহু স্থাপত্য নিদর্শন এই প্রতিষ্ঠান রেখেছে। প্রাচীনতম এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অফিসের ঠিকানা : ডি ১১ গিলেনডার হাউস (দ্বিতল)। নেতাজী সুভাষ রোড; কলিকাতা-৭০০০ ০১।

অখ্যাত একটি সংস্থা প্রথমে ঘাট, উদ্যান প্রভৃতি কাজ হাতে নিয়েও সফল হয়নি। গঙ্গার প্রবল বানের জলে বার বার কাজ বিঘ্নিত হয়। এরপর মথুরবাবু ম্যাকিনটস কোম্পানীকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার চুক্তিতে পোস্তা ও ঘাট তৈরির দায়িত্ব দেন। সুচারুভাবে সে কাজ করেছিল বলে কোম্পানী প্রাপ্য টাকা ছাড়াও আরো কয়েক হাজার টাকা পারিতোষিক পায় আর পায় মন্দির থেকে শুরু করে সকল কাজের দায়িত্ব।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নকশা, নহবতখানা, পুষ্করিণীর ঘাট, প্রাচীর, বিষ্ণুমন্দির সব কিছুই এই কোম্পানী তৈরি করার দায়িত্ব বহন করেছিল। এ ব্যাপারে সর্বমোট খরচ হয়েছিল ৯ লক্ষ টাকা। এই প্রাচীন কোম্পানীতে আছে এমন অনেক রেকর্ড, যার পাতার পর পাতা উল্টে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন ফাইলে আজও লেখা আছে :—

> "The Company has the unique distinction of constructing the Dakhineswar temple along with protection works against erosion."

ভিতরের চতুষ্কোণ টালি বাঁধান প্রাঙ্গনটি ৪৪০ ফুট লম্বা এবং ২২০ ফুট চওড়া। এখন সন্ধ্যার পর স্ত্রীলোকের প্রাঙ্গনে থাকা নিষিদ্ধ—এই সতর্কীকরণ লেখা আছে। এই মন্দির তৈরি সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছিল—৮ বছর!

এবার মন্দিরের কথা বলি।

প্রাঙ্গনের পূর্বদিকের ঠিক মাঝখানে আর বিষ্ণুমন্দিরের দক্ষিণ দিকে মায়ের মন্দির দক্ষিণমুখী। এই বিশাল, সুউচ্চ মন্দির নবচূড়া শোভিত! মন্দিরের মাথার দিকে প্রথম স্তরে চারটি, তার উপরে দ্বিতীয় স্তরে চারটি এবং তারও ওপরে অর্থাৎ একেবারে শীর্ষস্থানে একটি চূড়া, যাকে বলা হয় মূল চূড়া। মন্দিরের সর্বাঙ্গে যে স্থাপত্যশিল্পের অজস্র নিদর্শন তা মূলতঃ মৌলিক ভাবাদর্শকেই প্রকাশ করে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের চূড়াটি বর্তমানে দেখা যায় কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রয়েছে। এর কারণ, বছর কয়েক আগের প্রলয় দুর্যোগ। চূড়াটি আজও তেমনি অবস্থায় বিদ্যমান। বর্তমানে অবশ্য

বজ্রপাত রোখার জন্য শলাকা বসান হয়েছে চূড়ায়—যাতে মন্দিরের কোন ক্ষতি না হয়।

মন্দির অভ্যন্তর সাদা-কালো পাথরে বাঁধান। অভ্যন্তরে মায়ের যে বেদী আছে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সেই বেদীর পরিধি প্রায় তিন হাত।

বেদীর উপরে আসল রূপা, বেশ মোটা রূপার পাত দিয়ে ছোট-বড় পাপড়ি মিলিয়ে তৈরি শতদল। এই শতদলের ওপর শিব শয়ান আছেন। সেই শিব বক্ষের উপর অষ্টম-নবম বর্ষের বালিকারূপীনি 'মা' দণ্ডায়মানা। রাণী রাসমণি যেমন অপার ঐশ্বর্যশালিনী এই কন্যাও যেন তেমনি সর্ব আভরণে ভূষিতা কোন রাজনন্দিনী। শির, কর্ণ, কণ্ঠ, বক্ষ, কটি-দেশ, পাদপদ্ম স্বর্ণ ও রত্ন অলঙ্কারে মণ্ডিত। মায়ের পাশে আছে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের রামলালা (রামচন্দ্রের বিগ্রহ) ও বাণেশ্বর শিব। অন্য সিংহাসনে চণ্ডীর পুঁথি। সামনে মঙ্গল ঘট।

মায়ের নাম 'জগদীশ্বরী'। দেবোত্তরের দলিলেও তিনি এই নামেই আখ্যাতা। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সর্বত্র মা 'ভবতারিণী' নামে উল্লিখিতা।

বেদীর উত্তর-পূর্ব কোণে মায়ের রৌপ্য নির্মিত পালঙ্ক। পালঙ্কের ওপরে শয়নের যাবতীয় উপরকণ। একদিকে মায়ের সংসার, তৈজসপত্র। সেখানে রয়েছে রূপার কলস, হাঁড়ি, থালা-গ্লাস, বাটি, চামচ, পানের বাটা ইত্যাদি।

প্রতি প্রভাতে ৪টার সময় মায়ের জাগরণ আরতি। এই সময়ে মায়ের বাল্যভোগ—মাখন-মিছরি। এরপর মন্দির বন্ধ হয়, খোলে সকাল ৬টায়। তারপর মায়ের স্নান আরতি। সকাল ৯ টায় নৈবেদ্য ভোগ। বেলা ১২টায় অন্নভোগ। অন্নভোগে থাকে দুটি তরকারি, তিনরকম ভাজা, ডাল, চাটনি, পায়স এবং মাছ। এরপর মন্দির বন্ধ। খোলে সাড়ে ৩টায়। তখন ফল-ছানা সহযোগে বৈকালি দেওয়া হয়। রাত্রি ৮টায় শীতল ভোগ। এছাড়া প্রতি অমাবস্যা, ৺দুর্গাপুজার তিন দিন—বিশেষ করে কার্তিক অমাবস্যা, বাসন্তী পুজার দিন, জগদ্ধাত্রী পুজার দিন, সাবিত্রী চতুর্দশীর দিন, স্নানযাত্রা ও মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন, দীপান্বিতা কালীপুজার দিন আর রটন্তী কালীপুজার দিন মায়ের বিশেষ পুজো হয়। ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রাতেও মায়ের পুজো হয় ঘটা করে।

রাণী রাসমণির জন্মদিনে দুপুরে দৈ-মিষ্টি দিয়ে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। রাতেও বিশেষ ব্যবস্থা।

মায়ের জন্য আমিষ ভোগের ব্যবস্থা। কেবলমাত্র একজন সেবায়েতের পালায় নিরামিষ ভোগ দেবার রীতি।

শিবরাত্রি থেকে কালীপূজো এক নিয়মে রাত ৯টায় মন্দির বন্ধ হলেও বাকি দিনে ৮-৩০ মিঃ বন্ধ হয়। রবিবার, বিশেষ কোন পূজার দিনে বা অন্য ছুটির দিনে বিকেল ৩টায় মন্দির খোলা হয়, বন্ধ হয় রাত ৯-৩০ মিঃ।

মায়ের সামনে বলিদানের প্রথা আছে। দীপান্বিতা, ফলহারিণী, রটন্তী কালীপূজার দিন এখানে বলিদানের আয়োজন হয়। শুধুমাত্র ছাগ নয়—মেষ বা মহিষ বলিদানও হয়ে থাকে।

মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলে ঠিক পশ্চিমদিকে সারিবন্ধ বারোটি শিব মন্দির। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। প্রতিটি মন্দির পূর্ব মুখী। এই মন্দিরগুলির যে কোন একটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে মায়ের মন্দির, নাটমন্দির ইত্যাদি। প্রতিটি মন্দির অভ্যন্তরই সাদা কালো পাথরে মোড়া। সারিবন্ধ এই মন্দির দু'ভাগে বিভক্ত! বিভক্ত চাঁদনী দিয়ে। চাঁদনীর পরেই ঘাটের সিঁড়ি।

মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতা নানা নামে স্বয়ং শিব শম্ভু।

সেই নামগুলি হলো ঃ যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর ও নির্জরেশ্বর। এগুলি চাঁদনীর উত্তরে। চাঁদনীর দক্ষিণের ছয়টি মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবাদিদেবের নাম হলো ঃ যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর ও নরেশ্বর! প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কোন মন্দিরেই শিবের মূর্তি নেই। শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত।

সোপকরণ সমান নৈবেদ্য উপাচারে প্রতিটি শিবকেই প্রতিদিন পূজো করা হয়।

কেবলমাত্র স্নানযাত্রা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার দিনে লুচি ভোগ দেওয়া হয়।

তা ছাড়া শিবরাত্রি, নীলপূজা, চড়ক আর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন যথাযথ ভাবে শিবপূজা হয়ে থাকে।

মন্দির প্রাঙ্গনের পশ্চিমদিকে যেমন সারিবন্ধ শিবমন্দির, তেমনি উত্তর-পূর্ব দিকে বিষ্ণুমন্দির বা রাধাকান্তের মন্দির। এই মন্দিরের মেঝে মর্মর প্রস্তর মণ্ডিত। মন্দির পশ্চিমমুখী। এখানকার শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের নাম শ্রীনির্মলকুমার রায় শ্রীশ্রীজগমোহিনী রাধা ও শ্রীজগমোহন কৃষ্ণ বলেছেন। কিন্তু "শ্রীদক্ষিণেশ্বর" গ্রন্থে গ্রন্থকার কৃষ্ণ ও রাধারাণীর মূর্তির নাম যথাক্রমে রাধাকান্ত ও নিস্তারিণী বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানেও সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন কালী মন্দিরে আরতির ব্যবস্থা আছে, তেমনি মায়ের আরতির পরই এই বিগ্রহের আরতি হয়ে থাকে। এখানে নিত্য নিরামিষ ভোগ নিবেদনে পূজা হয়। রাত্রে শীতল ভোগ।

স্নানযাত্রা, মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস ইত্যাদি তিথিতে বিশেষ ভাবে পূজা হয়ে থাকে। এই মন্দিরের পাশের আর একটি ঘরে লোহার দণ্ডের ফাঁক দিয়ে যে কৃষ্ণ মূর্তিটি দেখা যায় সেইটি আদি মূর্তি। মূর্তিটি ভাঙ্গা! এই মূর্তি প্রসঙ্গে রাণী রাসমণির যে উক্তি একদিন স্পষ্ট হয়েছিল, এবং রাণীমার উক্তির প্রত্যুত্তরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিধান দিয়েছিলেন তা মানব-জীবনের বিশেষ চৈতন্য উদয়ের ক্ষেত্রে এক বর্ণানাতীত উদাহরণ।

সে কথা পরে বলবো। তবে এ ক্ষেত্রে যে তথ্যের অবতারণা প্রয়োজন তা হলো ঃ ১৯২৯ সালের এক শুভ দিনে দেবদেবীদের অঙ্গরাগের সময়ে যখন পুনরায় কৃষ্ণ মূর্তিটির পা ভেঙ্গে যায় তখন অর্থাৎ ১৯৩০ সালে দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তর এস্টেটের কর্তৃপক্ষ বর্তমান রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি বিষ্ণু মন্দিরে স্থাপন করেন এবং ভাঙ্গা মূর্তিটিকে পাশের আলাদা ঘরে স্থাপন করা হয়েছে!

কালীমন্দিরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে প্রশস্ত নাটমন্দির। মোট ষোলটি স্তম্ভ একে ধারণ করে আছে। এই মন্দিরে নামকীর্তন, ভজন, জপ-তপে মায়ের কৃপা প্রার্থী, একান্ত ভাবে আত্মমগ্ন ভক্তজনকে যেন আপন আসনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং মা নিত্য অবলোকন করেন। আরও দৃষ্টি প্রসারিত করে সেই একই আসন থেকেই নাটমন্দিরের অপর প্রান্তে যে বলিদান হয় তাও মা দেখেন। নাটমন্দিরের দক্ষিণদিকে ইঁট দিয়ে তৈরি বেদীতেই বলিদান মণ্ড। নাটমন্দিরের উপরে উত্তরমুখী মহাদেব, নন্দী আর ভৃঙ্গির মূর্তি স্থাপিত!

ঠাকুরের অনেক লীলায়, অনেক স্পর্শে এই নাটমন্দিরের প্রতিটি ইঁট-কাঠ-পাথর পবিত্র।

এই নাটমন্দিরেই এক বিশেষ ধর্মীয় সভায় রামকৃষ্ণদেবকে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত মত অবতার রূপে প্রমাণ করেছিলেন যোগেশ্বরী ভৈরবী। ১৮৬৩ সালে এখানেই মথুরামোহন ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে ধান্যমেরু উৎসব করেন। এক সময়ে এই নাটমন্দিরেই চণ্ডীগান, যাত্রাগান, হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসত। বর্তমানেও ভক্তদের বিশেষ আগ্রহে এখানে অধিকাংশ দিনেই কীর্তন-ভজন হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ধর্মানুষ্ঠানও হয়।

পূর্বদিকের সীমানায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একতলা দালান-বাড়িতে সান্নিবদ্ধ একাধিক ঘরের প্রথম ঘরটি ভাঁড়ার ঘর। তারপর রান্নাঘর, ভোগের ঘর, আহারের স্থান।

প্রাঙ্গনের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের সীমানায় একতলা ঘরগুলিতে থাকেন মন্দিরের

কর্মচারীরা। দক্ষিণ অংশের ঘরগুলিতে অফিস বসে, থাকেন সেবায়েতরা।

প্রাঙ্গনের উত্তর সীমানায় দেউড়ীর কাছে দু'পাশে বারান্দা। সেই বারান্দা সংলগ্ন কয়েকটি বড় ঘর। দেউড়ীর দু'পাশের ঘরে থাকে চৌকিদার বা দারোয়ান। দেউড়ীর বাঁ দিকে অর্থাৎ পূর্ব প্রান্তের ঘরে থাকেন মন্দিরের পুরোহিত।

মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম কোণে, শেষ শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে আর এক পরমতীর্থ হিসেবে রয়েছে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয়ন কক্ষ। জীবনের শেষ দিকের প্রায় ১৪ বছর এই ঘরেই ছিলেন ঠাকুর। বর্তমানে এ ঘরটি সকলের কাছে "শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর" বা "ঠাকুরের ঘর" হিসেবে পরিচিত। ঠাকুরের বারান্দাকে সবাই বলত 'আনন্দ নিকেতন'। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে মাতৃজ্ঞানে ষোড়শী পূজা, ত্যাগী সন্তানদের নিভৃতে শিক্ষাদান, কৃপাদান, জপ-ধ্যান-কীর্তন-ভজন সবই করেছেন ঠাকুর এই ঘরে। জীবনের শেষ দিকে বেশ ক' বছর এ ঘরে কেটেছে তাঁর। এই ঘরে সজ্জিত-রক্ষিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত তক্তাপোষ। সেই তক্তাপোষের উপর ঠাকুরের ব্যবহৃত শয্যায় ঢাকা দেওয়া আছে ঠাকুরের ব্যবহৃত শীতল পাটি, পাশের বালিশ, মাথার বালিশ।

ঘরটি কিভাবে সজ্জিত ছিল সেই প্রসঙ্গে 'শ্রীদক্ষিণেশ্বর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে—"পশ্চিমদ্বারের উপর পরমহংসদেবের চিত্রের দক্ষিণপার্শ্বে স্বামী বিবেকানন্দের ও উত্তর পার্শ্বে রামচন্দ্র দত্তের চিত্র। পশ্চিমদ্বারের উত্তর পার্শ্বে মহেন্দ্রনাথ পাল প্রদত্ত ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ চিত্র, দক্ষিণ পার্শ্বে যশোদা ও গোপাল, নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সংকীর্তন, কৃষ্ণকালী, ষোড়শী, রাজরাজেশ্বরী ও বীণাপাণির চিত্র এবং নেপাল রাজ-প্রতিনিধি কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রদত্ত মৃন্ময় গণপতি মূর্তি; দক্ষিণ দেয়ালে পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়নী প্রদত্ত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধদেব মূর্তি এবং প্রহ্লাদ, ধ্রুব, গুহকালয় ও কেশবচন্দ্র সেন প্রদত্ত যীশুখৃষ্টের চিত্র; উত্তর দেয়ালে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ছায়াচিত্র, পূর্বদক্ষিণ দ্বারের উপর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রদত্ত সর্বধর্মসমন্বয়ের চিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-অধ্যুষিত গৃহের প্রাচীর এই সকল মূর্তি ও চিত্রে শোভিত ছিল।...অন্যান্য চিত্রের মধ্যে নিমাইয়ের সন্ন্যাসের উদ্‌যোগ, স্বামী বিবেকানন্দের রঞ্জিত চিত্র, পরমহংসদেবের অষ্টাদশটি স্মরণীয় কথা, জগন্নাথ মন্দিরে গরুড়স্তম্ভাবলম্বনে শ্রীচৈতন্য ও প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী অঙ্কিত দেবালয়ের নক্সা উল্লেখযোগ্য।"

এখানেও নিত্য পূজা হয় ফল সহযোগে। শ্রীমার ঘরেও একই রকম

পূজার ব্যবস্থা। অন্নভোগে ঠাকুর ও শ্রীমার ঘরে পোলাও অন্নের ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে থাকে পাঁচ রকম ভাজা, ডাল, দু'রকম তরকারি, দু'রকম মাছ, চাটনি, পায়স। রাতে সন্দেশ, বাতাসা লুচি! ঠাকুরের জন্মতিথি, শ্রীমার জন্মতিথি ও ঠাকুরের 'কল্পতরু' উৎসব এখানে পালিত হয়। পূজা, হোম এবং অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা আছে।

এই ঘরের পশ্চিমে এবং উত্তরে অর্ধ মণ্ডলাকার বারান্দা আছে। পূর্বদিকের মধ্যবর্তী দেওয়াল দু'ভাগে ভাগ করেছে একে।

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে বসতেন, নামকীর্তন করতেন। উত্তরের বারান্দায় ভক্তরা ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে নামকীর্তন করতেন ও প্রসাদ পেতেন। এখানেই বহু যশস্বী মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। দক্ষিণের বারান্দায় বর্তমানে রয়েছে ঠাকুরের মেজদাদা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরের বই-এর দোকান।

রাজ্যপাল রাজা গোপালাচারীর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারীতে প্রথম ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। সেই থেকে প্রতি ইংরাজী বছরের প্রথম দিনটি 'কল্পতরু' উৎসব হিসাবে পালিত হয়

প্রধান তোরণ পেরিয়ে সামান্য কিছুটা এগিয়ে গেলে, কালী মন্দিরের পূর্বদিকের ২৬০ ফুট লম্বা ও ১২২ ফুট চওড়া পুকুরটির নাম "গাজীপুকুর"। এর উত্তর-পূর্ব কোণে "গাজীতলা"। এটি গাজী পীরের স্থান। এখানেই ঠাকুর ইসলাম ধর্ম সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

এই জায়গাটিতে একটি অশ্বত্থগাছ আছে, যা সুন্দর করে বাঁধানো আছে আজও। এবং একটি ফলকে লেখা আছে—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার স্থল। হিন্দুরা এখানে নিত্য প্রণাম যেমন করেন, মুসলমানেরাও এই স্থানটিতে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। গাজীপুকুরের পশ্চিমের ঘাটে মন্দিরের পূজার বাসনপত্র মাজা হয়।

মন্দিরের উত্তরদিকে, হেস্টি সাহেবের তৈরি দোতলা কুঠিবাড়ি। এখানে থাকতেন রাসমণি। মথুরবাবুও থাকতেন এখানে। অন্য জামাই ও মেয়েরাও এসে থাকতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রাণীমা দক্ষিণেশ্বরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। এসে থাকতেন প্রায়ই। এই কুঠিবাড়ির একতলার পশ্চিমদিকের একটি ঘরে প্রায় ১৬ বছর ছিলেন ঠাকুর। মথুরবাবু তাঁর এ বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। এখানে ঠাকুরের মা চন্দ্রমণি দেবীও ছিলেন অনেকদিন। এরপর ঠাকুরের বড় দাদা রামকুমারের একমাত্র ছেলে রামঅক্ষয় অনেকদিন ছিলেন এই বাড়িতে। এই কুঠিবাড়িতেই তাঁর মৃত্যু·

হয়। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কুঠিবাড়ি ছেড়ে মন্দির সংলগ্ন ঘরে চলে যান। ঠাকুর যখন কুঠিবাড়ি ছাড়েন তখনও চন্দ্রমণি দেবী ছিলেন ওখানে। গদাধর ঘর ছেড়েছেন সুতরাং চন্দ্রমণি দেবীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল নহবৎ বাড়িতে।

একটি নয়, দুটি নহবৎখানা আছে দক্ষিণেশ্বরে।

একটি দক্ষিণদিকের বাগানে, যেটি বন্ধ থাকে। অপরটি কুঠিবাড়ির পশ্চিমে। বছর কয়েক আগেও এখানে ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিয়মিত ছ'বার নহবৎ বাজানো হতো, কিন্তু বর্তমানে তা সম্পূর্ণ বন্ধ। একমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে অর্থাৎ স্নানযাত্রার দিনে এখানে সানাই বাজানো হয়। কিন্তু সেই সানাই নহবৎখানায় বসে না, বসে মন্দির প্রাঙ্গনে।

বর্তমানে ভোগ আরতির সময় এখানে ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজানো হয়। এই নহবৎখানায় অর্থাৎ কুঠিবাড়ির প্রায় গা লাগোয়া নহবৎখানায়, ঠাকুরের মা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাস করেছিলেন। স্ত্রী সারদা মাও এই নহবৎখানা বাড়ির একটি ঘরে দীর্ঘকাল বাস করেছেন।

এই সময় মাঝে মাঝে গোলাপ মা, যোগীন-মা, গৌরী মা, লক্ষ্মী দিদি স্ত্রীভক্তবৃন্দও এখানে এসে থাকতেন।

বর্তমানে এই ঘরে মায়ের প্রতিকৃতি নিত্য পূজিত হয়। এই ঘরই মায়ের ঘর নামে পরিচিত।

নহবৎখানার পরেই বকুলতলা আর বকুলতলার ঘাট।

এই বকুলতলার ঘাটেই প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের "মহিলা গুরু" ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব ঘটে। ইনিই ঠাকুরকে তন্ত্রমতে দীক্ষা দান করেছিলেন। এবং ইনিই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে, প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষের সামনে ঠাকুর "অবতার" তা প্রমাণ করেছিলেন।

এই বকুলতলার ঘাটেই চন্দ্রমণি দেবীর অন্তর্জলি হয়েছিল তাঁর দেহত্যাগের আগে।

বকুলতলার কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। ঠিক এখানে অনেক আগে একটা আমলকীর গাছ ছিল। তার পাশে ছিল খাদ। এই উঁচু জায়গাটিতে বসে সন্ধ্যার পর ঠাকুর ধ্যান করতেন। হাঁসপুকুরের সংস্কারের সময় এই জায়গাটি পরিষ্কার হয়। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এখানে রোপণ করেন অশ্বত্থ, বেল, অশোক আর বট। এই ভাবে তৈরি হয় পঞ্চবটী।

ঠাকুর একবার তীর্থ পরিভ্রমণে গিয়ে বৃন্দাবন থেকে এনে 'বৃন্দাবন রজঃ' ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এই পঞ্চবটীতে। চতুর্দিকে গোল করে তুলসীর বেড়া দিয়ে মাঝখানে বেদী নির্মাণ করিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে তপস্যা করতেন। এই

পঞ্চবটীর "সাধন কুটিরে" বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরীর সাহায্যে ঠাকুর বেদান্তমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চবটীতে সাধনার জন্য ঠাকুর যে 'সাধনকুটির' তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন তা পাকা কুটির ছিল না। পরে পাকা হয় এবং সেখানে 'বেদিকা' তৈরি হয়।

এই কুটিরে একটি শিবমূর্তি আছে যার নিত্য পূজা হয়। এখন এই কুটিরের নাম 'শান্তিকুটির'। সাধনকুটিরের উত্তর পশ্চিম কোণে বৃন্দাবন থেকে এনে মাধবীলতার গাছ পুঁতেছিলেন ঠাকুর।

পঞ্চবটীর উত্তরে ঝাউতলা। ঝাউতলার উত্তর পূর্বে বেলগাছের তলায় ভৈরবীর পঞ্চমুণ্ডির আসনে উপবেশন করে এক সময়ে ঠাকুর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সর্প-ভেক-শশ-শৃগাল ও নরমুণ্ড দিয়ে তৈরি এই পঞ্চমুণ্ডির আসন ভৈরবী মা নিজেই গঙ্গায় বিসর্জন দেন। এখন এ স্থান বাঁধিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। নিত্য পূজা হয়।

পঞ্চবটীর পূর্বদিকের পুকুরের নামই হাঁসপুকুর। এই হাঁসপুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল গোয়াল, আস্তাবল ইত্যাদি। সেখানে একাধিক গরু আর ঘোড়া ছিল। এখন আর তার চিহ্ন মাত্র নেই। এই হাঁসপুকুরের পূর্বদিকে আর একটি পুকুর আছে, যাকে বলা হয় "নিজপুকুর"। এই পুকুরের পূর্ব কোণ দিয়ে তখন দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মধ্যে যাওয়া যেত। এখন এই পথে যাওয়া যায় আদ্যাপীঠে। এর উত্তর দিকেই ছিল সরকারী বারুদ কারখানা, সেটি এখন দেশলাই কারখানা।



'রাসমণির ঠাকুর বাড়ি' বলেই লোকে জানত একে।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে রাণীমাকে বর্ণনাতীত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আগেই তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। কিন্তু সমস্যা সমাধানের মুহূর্ত থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে এই মন্দিরের পূজা ইত্যাদির ভার যাঁরা গ্রহণ করে আসছেন এখানে তার বিবরণ দেওয়া যাক।

মা জগদীশ্বরীর প্রথম পূজারী : রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবং

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ইনি রাণীমার কুল পুরোহিত।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম পূজারী: সিহড় নিবাসী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁর ছোট ভাই মহেশচন্দ্র ছিলেন রাণীর এস্‌টেটের কর্মচারী। মায়ের মন্দির ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের পূজারীরা রাঢ়ী শ্রেণীর (চট্টোপাধ্যায়) আর শিব মন্দিরের পূজকরা বৈদিক ব্রাহ্মণ। অদ্যাবধি সেই একই নিয়ম চলে আসছে।

মায়ের বেশকারী এবং প্রথম সর্বদিকের তত্ত্বাবধায়ক: রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে মায়ের বেশকারী: গদাধর ওরফে শ্রীরামকৃষ্ণ।

পূজারী রামকুমার এবং গদাধরের তত্ত্বাবধায়ক প্রথম: হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। এই হৃদয়রাম হলেন ঠাকুরের ভাগ্নে!

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্তি পূজারী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যাবার জন্য ক্ষেত্রনাথের কর্মচ্যুতি ঘটে। সুতরাং রাধাগোবিন্দজীর পূজারী নিযুক্ত হন গদাধর।

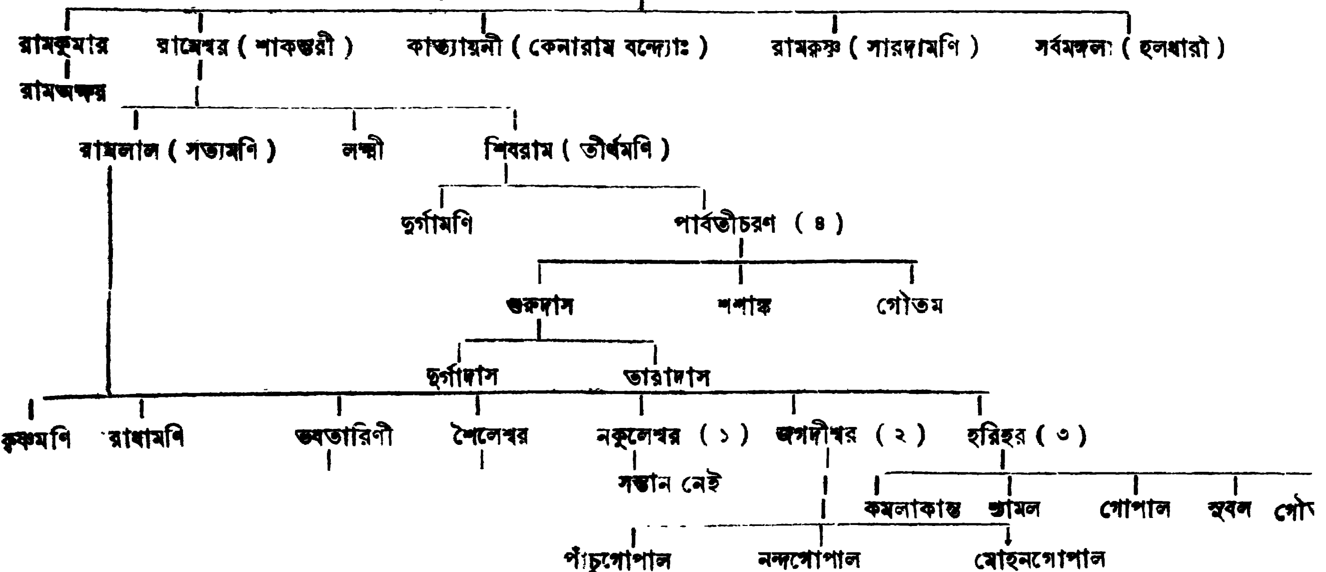
মা ভবতারিণীর ২য় বেশকারী: হৃদয়রাম।

রামকুমারের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি গদাধরকে মায়ের পূজার সব কাজ শেখালেন, কিন্তু গদাধর দীক্ষিত নন, সুতরাং মায়ের পূজারী হতে পারেন না। অল্প দিনের মধ্যে কলকাতার প্রবীণ তন্ত্র সাধক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছ থেকে গদাধর দীক্ষা নিয়ে মায়ের পূজারী হলেন, রামকুমার নিলেন রাধাগোবিন্দের পূজার ভার।

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধরই মায়ের পূজার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন বটে, কিন্তু দিনের পর দিন তাঁর ভাবের পরিবর্তন এবং মায়ের নামে উন্মাদনা বৃদ্ধি পেতে থাকায় মায়ের পূজার ভার পান গদাধরের খুড়তুতো ভাই রামতারক চট্টোপাধ্যায় আর ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়।

এরপর মায়ের পূজা করেছিলেন রামঅক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। রামলাল চট্টোপাধ্যায়। শিবরাম চট্টোপাধ্যায়। এঁরা হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে।

বর্তমানে এই বংশের ছেলেরাই মায়ের পূজার পবিত্র দায়িত্ব পালন করছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে মায়েরমন্দিরের পূজক হিসেবে এখনও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশধররাই প্রাধান্য পাচ্ছেন। রামকুমার মাত্র এক বছর মায়ের পূজা করেন। ১২৬৩ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। এইভাবে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যেতে পারে:



(১) এঁর মায়ের মন্দিরে পালা পৌষ ও মাঘ ২ মাস। (২) এঁদের পালা ১ ফাল্গুন থেকে চৈত্র ও বৈশাখের ১৫ তারিখ পর্যন্ত—আড়াই মাস

(৩) এঁদের পালা ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ ৪ মাস। (৪) এঁদের পালা বৈশাখের ১৬ তারিখ থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই সাড়ে তিন মাস

এই হলো বারোমাসের পালার ভাগ।

শিব মন্দিরে পূজারীদের দু'জন এস্টেটের বেতনভোগী। একজন পালাদার আসেন সেবায়েতের পক্ষ থেকে। এঁরা হলেন সুধীর চক্রবর্তী ও রেবতী চক্রবর্তী।

রামলালের বড় মেয়ে কৃষ্ণমণির বংশধর ৺সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে হারাধন চক্রবর্তী বর্তমানে এস্টেটের পুরোহিত। আর একজন পুরোহিতের নাম দীপক চক্রবর্তী। ইনি হচ্ছেন হারাধন চক্রবর্তীর ভাইপো।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজারী ছিলেন দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়। এঁর তিন পুত্র। অচিন্ত্য, অনিল ও অমিত। এঁদের মধ্যে দু'জন মৃত।

সারদা মা ও রাণীমায়ের মন্দিরের জন্য নিযুক্ত আছেন রাজেন চক্রবর্তী।

প্রায় ৬০-৬৫ জন কর্মী এখন নিযুক্ত আছেন দক্ষিণেশ্বরে। মায়ের মন্দির, রাধাগোবিন্দের মন্দির শিবমন্দির, ঠাকুরের ঘর ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে একজন করে টহলদার আছেন।

আদি টহলদার ছিলেন বাঁকুড়ার ভবতোষ দত্ত। পরে আসেন ডায়মণ্ড-হারবারের বঙ্কুবিহারী দলুই। এখন মালি ও টহলদার দুই কাজই করেন তারকচন্দ্র দিকপতি। ইনি মেদিনীপুরের লোক।

রন্ধনশালায় নিযুক্ত চারজন ব্রাহ্মণের মধ্যে সুশীল মুখার্জীর বয়স বর্তমানে আশির কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। ইনি পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডির যাবতীয় কাজ করেন, রান্নার ব্যাপারে উপদেশ দেন। এছাড়া আছেন শান্তিময় রায়, রাধাচরণ মুখার্জী ও নিরঞ্জন মিত্র।

মথুরামোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস তিনি আজীবন দক্ষিণেশ্বরের সেবায়েতের কাজ চালিয়ে গেছেন। প্রবোধ সাঁতরা এ প্রসঙ্গে 'নবভারত' পত্রিকা (৩০ ২য় ও ৩য় খণ্ড) থেকে কিছু কথা তুলে দিয়েছেন। গদাধর অমনোযোগী, কাজকর্মে শিথিল, এমন অনেক অভিযোগ আসত রাসমণি আর মথুরামোহনের কাছে। কিন্তু···'মথুরবাবু নিজে একজন সাধক লোক ছিলেন; রাণী রাসমণি বিশেষ চেতনা সম্পন্ন নারী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারিগণ আর করিবেন কি?···তাঁহাদের আশা ছিল রামকৃষ্ণের প্রভাবে দক্ষিণেশ্বর জাগ্রত হইয়া উঠিবে।···মাতা যেমন শিশুপুত্রের শৌচাশৌচ, দোষাদোষ দর্শন করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিও রামকৃষ্ণের প্রতি সেইরূপ হইল। তাঁহারা তাঁহার কার্য্যে ত্রৈলোক্যবাবুর ন্যায় কঠোর

কর্ম্মীর সমালোচনা চক্ষে দৃষ্টি করিতেন না।

…ত্রৈলোক্যবাবু পরমহংসের কার্য্য সমালোচনার চক্ষে দেখিতেন—সঙ্গেও কদাচ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি পরমহংসের ভক্তিজ্ঞান ও সমাধি প্রভৃতি গুণ দর্শন করিয়া অতীব ভক্তি করিতেন; কিন্তু অনুষ্ঠান অংশে তাঁহাকে বিশেষ সমালোচ্য মনে করিতেন। তাঁহার চক্ষে ''যাহাকে রামকৃষ্ণ বলে সে কোন কোন বিষয়ে খুবই ভাল ছিল''।

মথুরবাবুর মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য বরাদ্দ পাঁচটাকা ছাড়া বাকি সব খরচই তিনি বাতিল করেছেন। পরে সেই পাঁচ টাকাও ঠাকুর পুজো করতেন না বলে সারদামাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আরও পরে ঠাকুর দেহরক্ষা করলে সে টাকাও বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব তাঁর ভক্তরা ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরেই সাড়ম্বরে পালন করে এসেছিলেন। কিন্তু ১৮৯৮ সালে ত্রৈলোক্যনাথের কারণেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। বেলুড়ে দাঁ-দের রাসবাড়িতে এই উৎসবের আয়োজন হয়েছিল।

কারণটি হলো স্বামী বিবেকানন্দ তখন সদ্য বিলাত ঘুরে স্বদেশে ফিরেছেন, ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে অশুচি সেই মানুষটিকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলে মন্দির অপবিত্র হবে। এই কুসংস্কার ও অদ্ভুত যুক্তির অবতারণায় দক্ষিণেশ্বরে সাধু ভক্তরা আর সেখানে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করেন নি। এখন বেলুড় মঠে এই উৎসব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন তাঁরা

এখানে ১২৬৫ সনের (১৮৫৮ সাল) রাণী রাসমণির বরাদ্দের অংশ না দিয়ে থাকতে পারছি না। সেটি ছিল এইরকম ঃ

		কাপড়	
শ্রীশ্রীকালী—শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য্য	—৫৲	রামতারক—৩ জোড়া	৪৷৷৹
শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৫৲	রামকৃষ্ণ ৩ জোড়া	৪৷৷৹
		রাম চাটুজ্যে —৩ জোড়া	৪৷৷৹
পরিচারক*—শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় (ফুল তুলিতে হইবে)	৩৷৷৹	হৃদয় মুখুজ্জে—৩ জোড়া	৪৷৷৹

খোরাকী—সিদ্ধ চাউল ৴৷৷৹ সের, ডাল ৴৵৹ পো, পাতা—২ খান / তামাক ১ ছটাক, কাষ্ঠ ৴২৷৷৹

এখন ঠাকুরের ঘরের বাইরে উত্তরদিকে রাণী রাসমণির শ্বেত পাথরে তৈরি একটি মন্দির স্থাপিত হয়েছে। এখানেও নিত্য পুজো হয়। মাতৃ

* রামকৃষ্ণকেও চাকর বলে উল্লেখ আছে কোন কোন জায়গায়।

মন্দির প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৫৫ সালে দেবোত্তর এস্‌টেট এই মন্দিরটি তৈরি করেছেন।

মা ভবতারিণী নাট্যসমাজ ৪০ বছরের পুরাতন। এঁরা নাটক করেন। রামকৃষ্ণ ভজন সমিতি ভজন পরিবেশন করেন।



শেষ হল এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। রাসমণির অমর কীর্তি দক্ষিণেশ্বর। মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ থেকে সুদীর্ঘকাল তিনি তপশ্চারিণীর ব্রত ধারণ করেছিলেন। ভূমিশয্যা, আহারে সংযম,-পূজাদান-ধ্যান! এতো সেই আনন্দময়ীর আনন্দলীলা! জীবাত্মা সেই লীলার প্রকাশ ঘটায় তার কর্মে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

রাসমণির জীবনে সেই লীলার প্রকাশ। আর তার ধারক শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই অসার তত্ত্বালোচনার মোড়কের ভেতর থেকে তিনি মানুষের প্রাণের বীজটি তুলে রোপণ করলেন। সহজ আলো-বাতাসে প্রাণ পেয়ে সেই বৃক্ষটি বাঁচল আর ডালপালা ছড়াল। ছায়া দিল অনেক ক্লান্ত পথিককে।

খ্রীস্ট পূর্বাব্দ ৯০০ সালকে গীতার রচনাকাল ধরা হয়।

বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ পার হয়ে এসে ৮০০ খ্রীস্টাব্দে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হল। তিনি বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন, অদ্বৈত মায়াবাদ ও সন্ন্যাসবাদ প্রচার আর সেই অনুসারে বেদান্তের ব্যাখ্যা দিলেন।

১০০০ খ্রীস্টাব্দে রামানুজাচার্য মায়াবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে বাসুদেব ভক্তি ও বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করে তদনুযায়ী ধর্মীয় ব্যাখ্যা আরোপ করেন।

১১০০-১২০০ মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক—এঁরা মায়াবাদের প্রতিবাদ করে ভক্তিবাদ প্রচার করেন। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের যতটা প্রাবল্য ছিল তার মধ্যে, অন্তরের আকর্ষণ তত ছিল না।

১৫০০-১৬০০—এলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। ভক্তিবাদ প্রচার করলেন তিনি, গৌড়ীয় গোস্বামীরা বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন—প্রচার করলেন।

১৮০০ প্রথমার্ধ—শাক্ত ও ভক্তের বাদ বিসম্বাদে ধর্ম হয়ে গেল বদ্ধ জলার মত। প্রাণ রইল কিন্তু স্ফূর্তি রইল না। মূল গেল হারিয়ে শুধু টীকার চেয়ে ভাষ্য বড় হয়ে রইল। ততদিনে যুগ-সমাজ পাল্টাছে। মানুষ একটু বিশুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করছে।

ঠিক এই সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হলেন পরমহংস। তিনি প্রচার করলেন সমন্বয়বাদ। সহজ সত্যের আলোয় ঈশ্বরকে এনে দিলেন ভক্তের সামনে.—বসালেন মায়ের আসনে। রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয় পুণ্যভূমিতে রূপান্তরিত হল। ঠাকুর বোঝালেন, যত মত তত পথ। অতএব এস, ঈশ্বরকে ভালবাস—তিনিও তোমাকে ভালবাসবেন। সব ধর্মের মূলেই সেই তিনি। কোন ধর্ম ছোট কিংবা বড় নয়।

আরও একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই আছে রামকৃষ্ণের নাম ও পদবী নিয়ে। অনেকে বলেন গয়ায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে জন্ম হয় বলে ক্ষুদিরাম তাঁর নাম দিয়েছিলেন গদাধর। নাহলে বংশের ধারা অনুযায়ী তাঁর নাম রামকৃষ্ণই। অপর দুই ভাই-এর নাম যেমন রামকুমার, রামেশ্বর—তেমনই। তোতাপুরী শুধুমাত্র পরমহংস উপাধিটি দেন। আবার এ ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় যেমন অনেকের ভাল নাম ও ডাক নাম থাকে তেমন ঠাকুরেরও ছিল। গদাধর বলে সবাই ডাকতেন. ঠাকুর সইও করতেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

পদবী প্রসঙ্গে অনেকের মনেই প্রশ্ন—গদাধর ভট্টাচার্য তবে লেখা হয়েছে কেন? ভট্ট শব্দ ভট্ (কথনে) + অ (র্তৃ) বি অর্থাৎ বংশচরিত কীর্তন-কারী। বেদ যিনি কণ্ঠস্থ করেছেন এমন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পণ্ডিত বা অধ্যাপক। অভিধান বলছে ভট্ট (তুতাতভট্ট) + আচার্য (উদয়নাচার্য) = ভট্টাচার্য। তুতাতভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্যের ন্যায়শাস্ত্রে যে ব্রাহ্মণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি ভট্টাচার্য। কালক্রমে এর অর্থ সংকীর্ণ হয়ে আসে। বৃত্তি বা পেশাগত দিক থেকে যাঁরা পূজার্চনা করেন তেমন ব্রাহ্মণকেই ভট্টাচার্য বলা হয়। সেইজন্য রামকুমার চট্টোপাধ্যায় হওয়া সত্ত্বেও ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ বলেই আখ্যাত হয়েছেন। তাঁকে সবাই বড় ভট্টাচার্য ও রামকৃষ্ণকে ছোট ভট্টাচার্য বলে সম্বোধন করত। এমনকি রাণীমার দেবোত্তরের দলিলেও ভট্টাচার্যই লেখা হয়েছে।

রাসমণি চিরকালই কালীপদ অভিলাষিণী। রাজচন্দ্রের মনেও নাকি একটি মাতৃমন্দির গড়ার বাসনা ছিল। রাসমণি সে বাসনা পূর্ণ করতেই

নাকি মন্দির স্থাপন করেন।* স্বামীর মৃত্যুর পর বহু তীর্থে ভ্রমণ করেছিলেন রাণীমা। কাশী যাওয়ার সংকল্প করার পরই তিনি স্বপ্নাদেশ পান। এ বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি কাশী যাত্রা করে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের কাছাকাছি এসে মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। সেইমত সেখানে স্থান নির্বাচন হয়।

এ প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন—"রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন—রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন ; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় একশতখানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে স্বপ্নে ৺দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন—রাণী প্রথমে 'গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফল মনোরথ হয়েন। কারণ, 'দশআনি' 'ছয়আনি' খ্যাত ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, রাণী প্রভূত অর্থদানে স্বীকৃত হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে এই স্থানটি ক্রয় করেন।"

মা জগদীশ্বরী যে রাসমণিকে যথা দ্রুত সম্ভব অবরোধ মুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেন—সে কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন। এমনকি অন্নভোগ নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাও।

* দলিলে লেখা আছে "...late husband's desire."। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয় রাজচন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হিসেবে আইনের কাগজে-কলমে রাণীকে এই কথাটা বোঝাতে হয়েছিল। মা জগদীশ্বরীর স্বপ্নাদেশ, রাণীর জীবনের গতি-পরিবর্তন, তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের কথা বলে বোঝানর জায়গা দলিলের পৃষ্ঠা নয়। সাধারণ বুদ্ধিতে এসবের কোন ব্যাখ্যা নেই। তাঁর আত্মীয় পরিজনেরাও অনেকে বোঝেন নি উকিল-মোক্তার তো পরের কথা। কোন প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে তাই রাসমণি এইভাবে দলিলটি তৈরি করতে বলেছিলেন। রাজচন্দ্র ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও তিনি সেই যুগে রামমোহনের আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের কল্যাণ ও সংস্কারেই বেশী মনযোগী হয়েছিলেন। তিনি বিশাল কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেছেন, অর্থ দান করেছেন বা কোন স্থানে কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন কথা শোনা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর রাণী জানবাজারে দোল-দুর্গোৎসবের আড়ম্বর, তীর্থভ্রমণ, দান-ধ্যান শুরু করেন। অবশেষে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা।

মন্দিরের এই বিশাল ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্য রাসমণি ১৮৫৫ সালের ২৯ আগস্ট, বাংলার ১৪ ভাদ্র, দু' লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকায় দিনাজপুর জেলায় ঠাকুরগাঁ মহকুমার শালবাড়ি পরগণায় তিনটি তালুক কেনেন। এটি কিনেছিলেন তিনি ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। তালুকের আয় ছিল বার্ষিক ২৩ হাজার টাকা। তবুও অতিথি সেবা ও অন্যান্য ব্যয় ঐ টাকায় করা সম্ভব হতো না। এরপরই রাণীমা সম্পত্তি দেবোত্তর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই দলিল দাখিল করেছিলেন পরলোকগতা রাণীমার পক্ষে প্রসন্নচন্দ্র বসু। সাক্ষী ছিলেন দুর্গাদাস জানা ও গৌরাঙ্গ দাস। রেজিস্ট্রার ছিলেন তারকনাথ সেন।

দিনাজপুরের তালুক থেকে বর্তমানে কোন আয় নেই। দেশ বিভাগের পরে সবটাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এক্তিয়ারে চলে গেছে। এখন দোকান ঘরের ভাড়ায়, পুকুর ইজারা দিয়ে টাকায়, বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং থেকে আয় হয়। ভক্তবৃন্দ যা দেন দেবসেবায় কাজে লাগে।

বর্তমানে মোট সাতটি পালার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বাংলা সনে এক বছরের জন্য প্রতি পালা হয়। রাণীমার চার কন্যার পুত্ররা ও পরবর্তী বংশধররা এই পালার অধিকারী।

পদ্মমণির পুত্ররা গণেশ বলরাম/সীতানাথ → পরবর্তী বংশধর।

কুমারীর পুত্র যদুনাথ ——→ পরবর্তী বংশধর।

করুণাময়ীর পুত্র ভূপালচন্দ্র → কোন উত্তরাধিকারী নেই।

জগদম্বার পুত্র দ্বারিকানাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, ঠাকুরদাস → পরবর্তী বংশধর। পদ্মমণির দ্বিতীয় পুত্র বলরাম বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁর পালা চলাকালীন মায়ের আমিষ ভোগ বা বলিদান হয় না।

পদ্মমণি ১৮৭২ সালে তাঁর পুত্রদের নিয়ে নিজের অধিকার কায়েম করতে চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন।* ১৮৭৫ সালের ১৩ এপ্রিল তিনি ও তাঁর বংশধররা সেবায়েত অধিকার পান। ১৯০৫ সালে [illegible] সেম্বর ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী (সাহিত্যিক বীরবল) এস্টেটের রিসিভার নিযুক্ত হন। ১৯২৩

* এটি ছিল স্যুট নং ৩০৮-এর মোকদ্দমা। দিনাজপুরের সম্পত্তি ক্রয়ের উল্লেখও ছিল এতে। লেখা ছিল—"Plaint in High Court Suit No. 308 of 1[illegible]7 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of Endowment executed by Rani Rasmani—According to my late husband's desire * * * I on 18th Jaistha, 1262 B. S. (31st May, 1855) established and consecrated the Thakurs ...and for purpose of carrying on the Sheba purchased three lots of zemindaris in District Dinajpur on 14th Bhadra, 1262 B. S. (29th Aug. 1855) for Rs, 2,26,000."

সালে তিনি পদত্যাগ করায় রিসিভার হন কিরণচন্দ্র দত্ত। কিন্তু নানা অভিযোগ তোলা হয় তাঁর নামে ও ট্রাসটি বোর্ড গঠনের আবেদন জানান হয়। ১৯২৯ সালের ১৬ জুলাই থেকে সেবায়েতদের গঠিত বোর্ড অব ট্রাসটি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখনও সেই ব্যবস্থাই চালু আছে।

'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'—তাই শেখালেন ঠাকুর। মুসলমান ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, তন্ত্রসাধনা—কিছুই বাদ দিলেন না। দেখিয়ে দিলেন জ্ঞান-প্রেম ও কর্মের আনন্দের স্বরূপ।

আর সেই মহামানবের সান্নিধ্যে এলেন অগণিত মানুষ। জ্ঞানী-গুণী-ধনী-মানী-প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত-বহুজন। উপযুক্ত গুরুর সুযোগ্য শিষ্য —এলেন বিবেকানন্দ। হিন্দু ধর্মের জয়ধ্বজা তিনি তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর সামনে—জাতির চেতনাকে জাগ্রত করলেন। গভীর সুপ্তি ভেঙ্গে উঠে বসল বিংশ শতাব্দীর মানুষ।

রাসমণি এলেন, মন্দির করলেন। ভূমি তৈরি হল। তাঁর কাজ শেষ। এবার রামকৃষ্ণ সেখানে বীজ রোপন করলেন। সর্বোৎকৃষ্ট ফুলটি ফুটল গাছে। বিবেকানন্দ। তাকে তিনি তুলে দিলেন মানব পূজার অর্ঘ্য থালিতে। পূজা সমাপ্ত হল। ধন্য দক্ষিণেশ্বর, ধন্য রাণী রাসমণি!

১২৬২, ইং ১৮৫৫, ২২ জ্যৈষ্ঠ সংবাদ প্রভাকর লিখল:

"জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাণী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল. এই পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষ্যে রাণী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিব স্থাপনে রজতময় ষোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য পট্টবস্ত্র নগদ টাকা দিয়াছেন; তারামূর্ত্তি স্থাপনোপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক তত্তাবৎ বাহুল্যরূপে আয়োজন হইয়াছিল, আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাজার দূরে থাকুক, পাণিহাটি, বৈদ্যবাটী, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে. এমত জনরব যে ৫00 মোণ সন্দেশ হয়, নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমণীয়রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল. ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয়, বরাহনগর অবধি নাটমন্দির পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বান্ধা রোসনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোন প্রকার বৈলক্ষণ হয় নাই, পুণ্যবতীর পুণ্যকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে. গঙ্গার উপর পিনিস. বজরা, বোট. ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান কত গিয়াছিল, রাজপথে

গাড়ীই বা কত একত্রিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না, কাঙ্গালি লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা অর্দ্ধ মুদ্রা কেহ কেহ সিকি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছেন. গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি তাঁহাদিগের সকলের যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর টাকা দিয়াছেন, এই পুণ্য-কার্য্যে রাণী রাসমণির প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক. অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ প্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই, জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাণী রাসমণিকে যে প্রকার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সেই প্রকার মহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন. তিনি স্বীয় অতুল ধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্ত্তি সংস্থাপিত রহিল ॥''



''নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥''

গীতায় ভগবান বলেছেন এই কথা । তুমি নিয়ত কর্ম কর ; কর্মশূন্যতার চেয়ে কর্ম শ্রেষ্ঠ । কর্ম না করলে তোমার দেহযাত্রার নির্বাহ অসম্ভব । আর জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয়ে মানুষ হয় কর্মযোগী । কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে, ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে সব কিছু ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে কাজ করতে হবে । তবেই হবে তোমার বন্ধন মুক্তি ।

রাসমণি তাই কর্মের মধ্যে নিজেকে ব্যপৃত রাখতে চাইছেন ।

তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে—সময় বড় কম, অনেক কাজ বাকী পড়ে রইল—করা হলো না ।

১৮৩৬ সালের কথা । মৃত্যুর কয়েকমাস আগে রাজচন্দ্র একদিন উত্তেজিত ভাবে রাসমণির কাছে এসে বলেছিলেন, রাণী দেখ একবার জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় ২৩ এপ্রিলের সংখ্যায় কি প্রকাশিত হয়েছে ! সমাজে কুলীন বলে যারা এই সুযোগ নিচ্ছে তাদের চরম শাস্তি হওয়া উচিত ।

১২ বৈশাখ ১২৪৩-এ 'জ্ঞানান্বেষণ' কুলীনদের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে লিখে

জানিয়েছে — "...এতদ্দেশীয় কোন কোন সম্বাদপত্র সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের ফর্দ্দ ও তাঁহাদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।..."

এবার নিচে উল্লিখিত ২৭ জনের নামের তালিকার প্রথম ৬ জনকে দেখালেন রাজচন্দ্র। বললেন, এই দেখ রাণী, ময়াপাড়ার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২টি, জয়রামপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায় ৬০টি, আড়ুয়ার রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০টি, গালগ্রামের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ৫৩টি, নগরের খুদিরাম মুখোপাধ্যায় ৫৪টি আর বলুটীর দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫২টি বিবাহ করেছেন। এছাড়াও দেখ, কেউ ৪৭টি কেউ ৪০টি কমপক্ষে ৮টি। ছিঃ ছিঃ এরা কি মানুষ!

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন রাসমণি। ফুলের মত ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা— এরা ভাল করে বুঝতেও পারে না কে এদের স্বামী, কেন এদের তুলে দেওয়া হয়েছে ঐ লোভী, লালসা সর্বস্ব পুরুষদের হাতে। দেশের মানুষ আজও কেন বুঝতে পারছে না—এর কুফল কী?

যত দিন গেছে এরপর—বহু বিবাহ রোধ করার আন্দোলন ক্রমে জোরালো হয়েছে। রাজচন্দ্রের সেদিনকার উত্তেজনা বিস্মৃত হন নি রাসমণি। স্বামীর জন্য গর্ববোধ হয়েছিল তাঁর। ঔদার্যই তো প্রকৃত পুরুষের লক্ষণ।

বিদ্যাসাগর খুব চেষ্টা করছেন—শুনেছেন রাসমণি, বহু বিবাহ বন্ধ করতে হবে। চারদিকে একটা ঝড়ের পূর্বাভাস। কিন্তু তারও তো দেরী আছে তখনও। সে তো ১৮৭০-৭১ সালের কথা। বিদ্যাসাগরকেও বহু বিবাহ আন্দোলনে পিছিয়ে আসতে হল—সমাজপতিদের 'গেল-গেল' রবে। তবে বিধবা-বিবাহ আইন অনেকের অনেক বাধাদান সত্ত্বেও পাশ হয়েছে এই ১৮৫৬ সালেই। প্রয়াস সার্থক হয়েছে বিদ্যাসাগরের। এ বছরেই প্রথম বিধবার বিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এ নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনা সবই কানে এসেছে রাসমণির। বিদ্যাসাগরের জয়ে তিনি খুশি। পাঁচ-ছ বছরে বা কৈশোরে যে সব মেয়ের বিবাহ হয়, ভাগ্যদোষে স্বামীহারা হলে তাদের অদৃষ্টে যে কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা সে তো নিজের চোখেই কত দেখেছেন তিনি। তাই বিধান দেখে খুশি হয়েছেন। এবার শুরু হয়েছে বহু বিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা।

আর আমরা অবাক হই রাসমণির দূরদর্শিতা আর বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি সংবাদ সত্যিই সেদিন চমকে দেবার মত ছিল

১৮৫৬, ৩১ জুলাই, ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১৭ শ্রাবণ 'সংবাদ প্রভাকর' জানাল :

"কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণের জন্য কলিকাতা হইতে দুইখানা, শান্তিপুর হইতে একখানা এবং শ্রীমতী রাসমণি দাসী একখানা, এই কয়েকখানা আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সমাজে অর্পিত হইয়াছে. উক্ত সভার সভ্য শ্রীযুক্ত কালবিল সাহেব তাহা মুদ্রিতকরণের অনুমতি করিয়াছেন।"

এমনই ছিলেন রাণী। কর্তব্যে ও কর্মে অবিচল। লোকনিন্দা বা লোকস্তুতি সমভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। কারণ মনের দ্বারে বেড়া দিয়েছেন তিনি। সেখানে ঈশ্বরের ফুলের বাগান।

মথুর এলেন। হাতে তাঁর এক টুকরো কাগজ।

মথুরবাবুকে দেখে আজ বাড়ির সকলেরই চোখে মুখে অবাক হবার রেখা। মথুরবাবু আজ যেন বড় খুশি, উৎফুল্ল। তাঁর সেই খুশি ভাবে সবাই পুলকিত। মথুরামোহন কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন মায়ের কাছে। রাণীমা তখন রামায়ণের পাতায় আত্মনিমগ্ন। রোজ সন্ধ্যায় ঠিক এমন সময় রাণীমা তাঁর ঘরের মেঝেয় বসে রামায়ণ পড়েন. সেই ছোটবেলার অভ্যাস। সেই অভ্যাস আজও সযত্নে পালন করছেন রাণীমা।

রামায়ণ পড়ার সময় তিনি একলা থাকেন, এ কথা মথুরামোহনের অজানা নয়. তবুও আজকের খুশি তাঁকে কোন নিষেধের গন্ডীতে বাঁধতে পারেনি। রাণীমা ঘরের দরজায় জামাইকে দেখে চোখ তুললেন। বললেন, এস বাবা মথুর, আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি এমন কোন খবর এনেছ, যা আমাকে না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছ না—

মথুর বললেন, আজ্ঞে আপনি ঠিকই বুঝেছেন. এই দেখুন "যশোর রিপোর্ট" কি বেরিয়েছে -- কথাটা শেষ করে মথুরামোহন কাগজের টুকরোটা এগিয়ে ধরলেন। রাণীমা বললেন, ইদানীং দেখছি যশোর রিপোর্ট আমার সব খবরই ছাপছে, তা কী লিখেছে—তুমি বলো বাবা—

মথুরামোহন পড়লেন—"RANI RASHMONI Cut a Half mile KHAL to Join BANKANA (NABA GANGA) with the

Modhumati at TONA—" Jessore Report.

যশোর রিপোর্টের ইংরাজীতে ছাপা খাল খননের খবরটা বাংলায় তর্জমা করে দিলেন মথুর। রাণীমা বললেন,—দুঃখ কোথায় জান বাবা? আজ আমি যে কাজ করেছি তার খবর কাগজের লোকেরা ছেপেছে ঠিকই, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে তো আমি নেই, অথচ আমার মন বলছে একটা নয়, অনেক জায়গাতেই অনেক কিছু করার আছে। তার সন্ধানগুলো কাগজের লোকেরা দেয় না। তা যদি দিত তাহলে আমাদের দেশের চেহারা অনেকদিন আগেই পাল্টে যেতে পারত।

মাকিমপুর মহকুমায় নিরন্তর বয়ে যাচ্ছিল মধুমতী। এই মহকুমার ভিতর দিয়ে মধুমতী চলে গিয়েছিল আপন গরিমায়। অন্য কোন নদী বা খাল এসে মধুমতীতে মেশেনি তখনও। এর ফলে মাকিমপুর মহকুমার চারদিকে যত জমি, জলের অভাবে দিনের পর দিন ধরে ফসল দেবার ক্ষমতা ফেলেছিল হারিয়ে।

প্রজারা একদিন সমবেত হলেন। সকলেরই মনের বাসনা, রাণীমায়ের কাছে আবেদন জানাবার। মধুমতী থেকে খাল কেটে জল পাবার আর্জি। ওঁদের বিশ্বাস, রাণীমার কানে কথাটা তুলে দিলে মানুষের কল্যাণে কাজটা তিনি করে দেবেন।

তাই হলো। মাকিমপুরের প্রজারা আর্জি জানালেন। দল বেঁধে হাজির হলেন জানবাজারে। রাণীমা কেঁপে উঠলেন। কার জয়ধ্বনি! রাণীমা প্রাসাদ অভ্যন্তর থেকে দেখলেন সব! মথুরামোহনকে ডেকে বললেন, বাবা মথুর, তুমি একবার যাও। 'জয় রাণীমার জয়', 'মা রাণী রাসমণির জয়' বলে যারা আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছে আগে জেনে নাও তারা কারা? আমার প্রজা হোক বা না হোক, কি তাদের চাহিদা তুমি জান, তারপর ওঁদের অতিথিশালায় বিশ্রাম নিতে অনুরোধ কর। তুমি বলবে—আগে আপনারা বিশ্রাম নিন, তারপর আপনাদের সব কথা রাণীমাকে বলুন—

মথুরামোহন চলে গেলেন। বাইরে তখনও জয়ধ্বনি। মথুরবাবু প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াতে সব জয়ধ্বনি থেমে গেল।

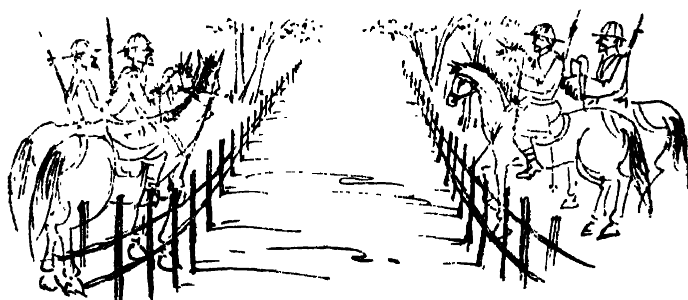
জনা দশেক মানুষ। মাটির মানুষ। গাঁয়ের মানুষ। ওঁদের দলের ভিতর থেকে একজন এগিয়ে এসে সবিনয়ে নিবেদন করলেন সব। চিকের আড়াল থেকে সব শুনলেন রাণীমা। তারপর চাপা স্বরে তিনি যা বলে গেলেন, মথুরবাবু তাই পুনরাবৃত্তি করে গেলেন সর্বসমক্ষে।

রাণীমা বললেন, বাবা মথুর, তুমি ওঁদের আজ বিশ্রাম নিতে বলো, ওঁরা এখানে আজ খাওয়া-দাওয়া করে থাকুন, আগামীকাল আমি জানাবো কতটা কি করতে পারি—

মথুরবাবু সেই কথাগুলো কলের পুতুলের মত উগরে গেলেন! স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সবাই। পরের দিনই রাসমণি জানিয়ে দিলেন মাকিমপুরের প্রজাদের জন্য যত তাড়াতাড়ি হয় মধুমতী থেকে খাল কাটা হবে।

যে কথা সেই কাজ। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে রাণীমা একজন ইঞ্জিনীয়ার আর একজন জমি-জরিপের আমিন পাঠালেন। সঙ্গে গেলেন মথুরামোহন। মথুরবাবুর হাতে নায়েবমশাইকে একটা চিঠি দিলেন রাণীমা। তিনি লিখলেন—"কোন স্থান দিয়া খাল খনন করিলে সাধারণ মানুষের কাজে লাগিবে, উপকারে আসিবে এবং খাল খনন করিতে গিয়া কাহারও কোন ক্ষতি হইবে কিনা জানাইলে আমি দ্রুত কাজ করিতে পারিব।" ইঞ্জিনীয়ার আর জামাইকে রাণীমা বললেন, এই খাল কাটতে কত টাকা লাগবে আপনারা আমাকে জানিয়ে দেবেন—

যথাসময়ে খরচের তালিকা এলো। মধুমতী থেকে নবগঙ্গা পর্যন্ত খাল কাটার খরচ পড়বে প্রায় ১ লক্ষ টাকা। রাণীমা বিলম্ব করলেন না। নায়েবমশাইকে নির্দেশ দিলেন টাকা দিতে—খাল কাটা হলো। আধ মাইল দীর্ঘ সে খালের নাম হলো টোনার খাল—



অস্থির হলেন রাণী রাসমণি।

লোহার খাঁচায় বন্দী বাঘিনী ভিতরে ভিতরে কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে যেমন করে পদচারণা করে, জানবাজারের প্রাসাদ অভ্যন্তরে রাণীর ঠিক সেই উত্তেজনায় অস্থির পদচারণা! প্রাসাদের বাইরে তখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল আগুন। অস্থির শুধু রাণী নন, অস্থির গোটা কলকাতার

অনেকেই। মথুরামোহন থেকে এ বাড়ির সবাই! বাইরের আগুনের নাম সিপাহী বিদ্রোহ!

১৮৫৭। মাত্র দু' বছর আগে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের সন্ত্রাস তখনও মানুষ ভোলেনি।

আবার এই সিপাহী বিদ্রোহ।

এই বছরের প্রথমে সৈন্যবিভাগে এক ধরনের নতুন বন্দুক প্রচলনের কথা ভেবেছিলেন ইংরাজ সরকার—যার টোটার উপরকার কাগজটি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে বন্দুকে ভরতে হত। দমদমের একটি কারখানায় এগুলি তৈরি হতো। হঠাৎই রটে যায় এই কাগজ গরু এবং শুয়োরের চর্বির প্রলেপ দিয়ে তৈরি। গরুর চর্বির তৈরি টোটা হিন্দুদের এবং শুয়োরের চর্বির তৈরি টোটা মুসলমান সৈনিকদের দেওয়া হবে। এইভাবে জাত মারা হবে তাদের।

তখন টোটা ব্যবহারও হয়নি। মুষ্টিমেয় অবাঙালী সিপাহী ব্যারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা করে। এরপর বহরমপুরে। লর্ড ক্যানিং তখন বিদ্রোহীদের চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিলেন। কর্মচ্যুত সিপাহীরা তখন স্বদেশে ফিরে রটনাকে আরও জোরদার করে তুলল। এমন কি—একথা জানাজানি হয়ে যাওয়ার ফলেই যে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে. করে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে—এমন কথাও বলল।

এরপরই সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠল। এই সময় মানুষ যুক্তি-অযুক্তি বিচার করে না। সম্ভব-অসম্ভবের কথাও খতিয়ে দেখে না। তারই ফলে মে মাসের ১০ তারিখে মিরাটে ঘটে গেল নারকীয় ঘটনা। ক'দিন আগে বেশ কিছু সৈন্য টোটা ব্যবহার করতে না চাওয়ায় তাদের কারারুদ্ধ করা হয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে তখন বিদ্রোহী সিপাহীরা জেলের বন্দী কয়েদিদের ছেড়ে দিল. রাজকোষ লুণ্ঠন করল, অস্ত্রাগার দখল করল। ইংরেজ নারী-পুরুষ-শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করল। এই হলো সূত্রপাত! এবার ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত ও ব্যাপক আকারে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল—বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে। মিরাটের মত কানপুরে ঘটল জঘন্য নারকীয় ঘটনা। নিরীহ নারী-শিশু হত্যার কলকংময় কাহিনী।

জুলাই মাসে উত্তাল হয়ে উঠেছিল কলকাতা।

জনরব মানুষকে বিভ্রান্ত করে। শোনা গেল, সিপাহীরা এবার কলকাতা আক্রমণ করে সমস্ত ইংরেজকে মেরে ফেলবে। ফোর্ট উইলিয়মের কেল্লায় আশ্রয় নিলেন অনেকে। চতুর্দিকে পাহারা বসল।

গড়ের মাঠ সশস্ত্র বাহিনী ঘিরে রাখল দিবারাত্র।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—বিদ্রোহীরা বাঙালী ছিল না। এই বিদ্রোহকে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় কোন সমর্থন জানান নি। বরং এই হুজুগে তাঁরা ইংরেজদের সপক্ষে ছিলেন।

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময় যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা প্রশংসা করার মত। তিনি ইংরেজদের দোষ যেমন দেখালেন আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের নির্বুদ্ধিতার বিরোধিতাও করলেন। দেশের প্রজারা যে এই বিক্ষোভের জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী নয়—সে কথাও বুঝিয়ে দিলেন শাসক সম্প্রদায়কে। শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন তাঁকে।

ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলালেন নেপালের জঙ্গ বাহাদুর স্বয়ং। সসৈন্যে এই বীর যোদ্ধা ইংরেজদের মদত দিতে গুর্খা সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রণক্ষেত্রে।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষা, সাম্রাজ্য রক্ষা—অতি সহজে সম্ভব, যদি ইংরেজ সরকারকে মদত দেওয়া যায়; এই ভাবনা থেকে শুধু নেপালই সক্রিয় অংশ নিল তা নয়, সাহায্য ও বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেন কলকাতার অনেক অর্থবান, জমিদার শ্রেণীর মানুষ। সে ব্যাপারে রাণী রাসমণির কাছেও ইংরেজ সরকার সাহায্য চাইল!

পরম হিতৈষী যাঁরা তাঁরা পরামর্শ দিলেন, 'কোম্পানীর কাগজ যা আছে সব এই সুযোগে বিক্রি করে দাও, কারণ ইংরেজ রাজত্বের অবসান আসন্ন'—

রাসমণি কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। মথুর এসে দৈনন্দিন সব খবরই জানাতেন রাণীমাকে। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকের প্রতি রাসমণির পূর্ণ সমর্থন ছিল। রাসমণি বললেন, মথুর, এ অন্যায়। এইভাবে যদি চলতে থাকে তবে ধর্মের নামে অধর্মের রাজত্ব কায়েম হবে।

মথুরামোহনও সমর্থন করলেন রাসমণিকে। বললেন, তাহলে এই পত্রের উত্তর পাঠাবার ব্যবস্থা করি। সমর্থন জানিয়ে চিঠি লিখে দিই সরকারকে?

বাঘিনীর মত অস্থির পদচারণার সঙ্গে রাসমণি ততক্ষণে স্থির করে ফেলেছেন তাঁর কর্তব্য। তিনি স্থির করলেন, ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবেন! রণক্ষেত্রে প্রয়োজনের সময়ে নানা দ্রব্য সামগ্রী সাহায্য পাঠাবেন।

রাণী ডেকে পাঠালেন সরকার মশাই, কর্মচারীদের আর জামাইদের।

বললেন, বাবা মথুর, আমি যা স্থির করেছি তোমরা সেই মত কাজ কর। আমি যে তালিকা দিচ্ছি, সেই তালিকা মত সব কিছু কানপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কাগজ আর কলম ধর মথুর, যা বলছি তা লিখে ফেল—

মথুরামোহন কলমদানী আনিয়ে বসলেন। রাণীমা বলে চললেন—লেখ—

২টি হাতী, ৪০টি ঘোড়া, ভেড়া ৬০টি, ছাগল ১০০টি, আটা ৫ মণ, ছোলা ৫ মণ, পাকা কলা ৫০ কাঁদি, চাল ১০ মণ, পাকা ভুট্টা ১০০০টি, বিস্কুট ১০ মণ, কম্বল ১০০ খানা, হাঁসের ডিম ১০০০টি, মুরগির ডিম ৫৯৮টি, লবণ ১০ সের, হাঁস ৫০টি, মুরগি ৫০টি।

তালিকা লেখার পরই কর্ম ব্যস্ততায় মুখর হয়ে গেল গোটা বাড়ি। মথুরামোহন হলেন কান্ডারী। সরকার মশাইরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। কেউ গেলেন হাতীশালায়, কেউ গেলেন আস্তাবলে। কেউ গেলেন বিভিন্ন গোমস্তার কাছে। যথা দিনে রাণী রাসমণির বিশাল সাহায্য গিয়ে পেঁছিলো কানপুরে! ইংরেজ সরকার খুশি হয়ে অভিনন্দন পত্র পাঠালেন রাণীর কাছে।

রাণী রাসমণিও চাইছিলেন জানবাজারের প্রাসাদের এবং পরিবারের সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাকা করতে। যদিও দুটি প্রাসাদেই রাণীমার বেতনভুক হিন্দুস্থানী দারোয়ান ছিল, তবুও রাণী চেয়েছিলেন সশস্ত্র গোরা সৈন্য। সরকারের কাছে আবেদন জানালে গোরা সৈন্য পাওয়া যাবে, একথা রাণী জানতেন বলে মথুরামোহনকে ডেকে তেমন আবেদন জানাতে বললেন মথুরামোহনও বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে আবেদন জানালেন! আবেদন দপ্তরে পেঁছনমাত্র এই দুটি বিশাল প্রাসাদের তোরণ দ্বারে পেঁছে গেল সশস্ত্র গোরা প্রহরী।

পরিবেশ তখনও অশান্ত। তবে কলকাতার মানুষ কিছুটা মনোবল ফিরে পেয়েছে। গোরা সিপাহী আর কুঠি-বাড়ি পাহারা দিচ্ছে না। তবে অন্য উৎপাত দেখা দিয়েছে।

সেই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল রামচন্দ্র আর প্যারীমোহনের মধ্যে। মাঝে মাঝেই তাঁদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের গোরাদের ছাউনিতে। ছাদ থেকে ছাউনিটা স্পষ্ট দেখা যায়।

এখন অবস্থা শান্ত। কিন্তু ছাউনিতে তখনও রয়েছে প্রায় দু'শ-আড়াই'শ অশিক্ষিত সৈন্য একজন অধিনায়কের অধীনে। হাতে কোন কাজ না থাকায়

তারা সারাদিন ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। নেশা করে। নিরীহ পথচারীদের আক্রমণ করে যা পায় তাই কেড়ে নেয়।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশের আলো তখনও মুছে যায়নি। ছাদে পায়চারি করতে করতে রাণীমার দুই জামাই সেই কথাই বলছিলেন।

হঠাৎ তাঁরা দেখলেন একটি নিতান্ত নিরীহ মানুষ ছাউনির পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে কুঠি-বাড়ির দিকেই। অপ্রত্যাশিত ভাবে চারজন মত্ত সৈনিক ঘিরে ধরল তাকে। কেড়ে নিল সব কিছু আর সেই সঙ্গে চলতে লাগল পরিহাস, প্রহার আর গালমন্দ।

প্যারীমোহন আর সহ্য করতে পারলেন না। সেখান থেকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন দারোয়ানদের। গলা মেলালেন রামচন্দ্রও।

তাঁদের হাঁকডাকে ছুটে এল দারোয়ান আর পাইক বরকন্দাজরা।

জামাইবাবুরা হুকুম দিলেন,—যেমন করে পার. লোকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এস। বাধা দিতে গেলে. তোমরাও লাঠি চালাবে।

বিপন্ন মানুষটি তখন রাসমণি কুঠির প্রবেশ পথের সামনে সাহায্যের জন্য আর্ত চিৎকার করে চলেছে। হুকুম শুনেই ছুটল দারোয়ানরা। মত্ত গোরাবা রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই পাইকরা লাঠি চালাল। আহত হল তারা।

পথচারী লোকটির অবস্থা তখন শোচনীয়। তাকে শোয়ান হল দালানে। বাড়ির দাস-দাসীরা ছুটে এল জল-পাখা নিয়ে। জামাইরাও নিচে এসেছেন ততক্ষণে।

প্যারীমোহন প্রশ্ন করলেন,—সেই অপদার্থগুলো গেল কোথায়? কে একজন উত্তর দিল,—ভয় পেয়ে ছাউনির ভেতর গিয়ে সেঁধিয়েছে। আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটল রামচন্দ্র আর প্যারীমোহনের মুখে।

মথুরামোহন বাড়ি নেই। সেরেস্তার কাজে বাইরে গেছেন। রাত হবে ফিরতে। এ বাড়িতে সমস্ত ঝক্কি ঝামেলার সিংহভাগই মথুরবাবু পোয়ান। আজ দেখান গেল, তাঁরাও কম ক্ষমতা রাখেন না। গোরা সৈন্যরা পালিয়েছে আর লোকটিও ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছে দেখে উভয়েই অন্দরে গেলেন।

কিন্তু সব শুনে চিন্তিত হলেন রাসমণি। প্রথমেই তাঁর মনে হলো মথুর বাড়ি নেই। পরবর্তী একটা বিপদের ছায়া পড়ল তাঁর মনের মধ্যে। এক রক্তপাত বহু রক্তস্রোত বইয়ে দেয়। ঘটনা এখানেই থামবে না আরও কিছু ঘটবে।

রাসমণি ঠিকই অনুমান করেছিলেন। রক্তপাতে গোরা সিপাহীরা ভয় পেয়েছিল ঠিকই—কিন্তু ছাউনিতে ফিরেই তারা সাহস ফিরে পেল। সত্য-মিথ্যা দিয়ে, রঙ চড়িয়ে তারা সব ঘটনা ব্যক্ত করল তাদের অধি-নায়কের কাছে।

রাগে দিশাহারা হয়ে গেল সে। আবারও সেই কুঠি-বাড়ির ঘটনা! একবার অনেক দিন আগে জব্দ হয়েছিল তারা মিছিল বন্ধ করার হুমকি দিয়ে। আজ আবার ঐ নেটিভগুলোর এত সাহস—গোরা সিপাহীদের ওপরে লাঠি চালায়!

খেপে গিয়ে হুকুম দিল সে—আক্রমণ কর। ভেঙে তছনছ করে দাও সব কিছু!

এখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত।

তাদের উন্মত্ত কলরোল জানবাজারের বাড়ি থেকে শোনা গেল স্পষ্ট। আর স্থির থাকতে পারলেন না রাণী। হুকুম দিলেন সিংহদ্বার বন্ধ করতে।

সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ পালন করা হলো।

রাসমণির কাছে খবর এল প্রায় শতাধিক উন্মত্ত সৈনিক খোলা তরবারি হাতে দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে।

রাসমণি প্রমাদ গণলেন। বাড়িতে তিন মেয়ে,—তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, আশ্রিত অনেক স্ত্রীলোক—এদের রক্ষা করে কে?

জামাইদের ডাকলেন তিনি। রামচন্দ্র আর প্যারীমোহনের শুষ্ক মুখ দেখে বুঝলেন এঁদেরও আর বিন্দুমাত্র সাহস অবশিষ্ট নেই।

মনস্থির করলেন রাণীমা। রাসমণি কুঠির পেছনেই মান্না বাবুদের বাড়ি। বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে সকলকে একে একে সে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন রাণী নীরবে। দুই জামাইও গেলেন। বাড়িতে রইলেন তিনি একা—কয়েকজন মাত্র দারোয়ান আর পাইকদের নিয়ে। সেই সময়ে মহালের কাজে, বিভিন্ন জমিদারীতে বহু পাইক বরকন্দাজ থাকায় এ বাড়িতে পাহারা দেওয়ার মত খুব বেশী লোক ছিল না।

এদিকে সেই উন্মত্ত সিপাহীরা ততক্ষণে বৃহৎ কপাট সংলগ্ন ছোট কপাটটি ভেঙে ফেলেছে। ক'জন সাহসী পাইক তাদের বাধা দিল, তারা প্রাণপণে লাঠি ঘোরাতে লাগল। কিন্তু তাদের রোধ করতে পারল না।

রাসমণি এবার উঠলেন।

জানবাজারের গৃহবধূ—প্রীতিরামের পুত্রবধূ—যাঁকে প্রীতিরাম সর্বদা

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলতেন, যাঁকে মনে করতেন মূর্তিমতী শক্তির আধার তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

দেওয়াল থেকে টেনে নিলেন একটি তরবারি। রাসমণি দেখলেন তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য গোবিন্দকে কয়েকজন মিলে মেরুদণ্ডে তরবারি দিয়ে আঘাত করল। গোবিন্দ পড়ে গেল মাটিতে।

রাণী উন্মুক্ত তরবারি হাতে প্রবেশ করলেন রঘুনাথজীউর মন্দিরে। ঘি-এর প্রদীপ জ্বলছিল। বাইরের উন্মত্ত কোলাহল রাণীমার কানে এসে আছড়ে পড়ছিল বার বার। সেই স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে রাণীমা তাঁর রঘুনাথকে প্রণাম করলেন। প্রার্থনা করলেন—সাহস দাও প্রভু, শক্তি দাও।

তিনি দুর্বল হলেন না, কাতর হলেন না। মন্দিরের দ্বারের কপাট একটি খোলা রেখে অপরটি বন্ধ করলেন বসন সংবৃত করে হাতে রাখলেন খোলা তরবারি। রুদ্র তেজে তাঁর আরক্তিম নয়ন থেকে আগুন ঝরতে লাগল। তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কার?

রাসমণির অন্তরের শক্তিরূপিনী দেবী জাগ্রতা হলেন। সৃষ্টিতে শক্তির অনন্ত বিকাশ—তাই মায়ের নানা রূপ, নানা মূর্তি!

'বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥'*

মা ভোগে ভবানী, সমরে সিংহবাহিনী দশ প্রহরণধারিণী দুর্গা, জগৎ-রক্ষায় জগদ্ধাত্রী, প্রলয়ে কালী করালিনী।

আর আজ সন্ধ্যায় জানবাজারের বাড়িতে একাকিনী উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে করে ঐ দাঁড়িয়ে—রাজেশ্বরী রাসমণি!

এইবার প্রবোধ সাঁতরার লেখা কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম। কেননা, তিনি লিখেছেন,…"…ছাদের উপর গ্রন্থকারের খুল্ল পিতামহ তাঁহার ১॥ বৎসর বয়স্ক ১ম পুত্রকে ক্রোড়দেশে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন…অবারিত দ্বার পাইয়া ক্রোধোন্মত্ত সৈনিকদল বাটিতে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিম্নে যুগ্ম ময়ূর-ময়ূরী ছিল তাহাদের উপর তরবারির আঘাত করিতে গেলে, তাহারা স্থানান্তরে উড়িয়া গেল। নিকটেই যুগ্ম হরিণ-হরিণী ছিল, তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিল।…উপরতলে আসিলেই দেখিল, সকল গৃহের দ্বার উন্মুক্ত; কি অন্দর মহলে কি সদরে সকল স্থানই জনমানব-শূন্য—অবারিত। উপরে বৈঠকখানায় ৫২ ডালির ঝাড় ছিল, অস্ত্রাঘাত করিতেই

* শ্রীশ্রী চণ্ডী।

ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে জগতের নশ্বরতা জ্ঞাপন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। গৃহ-প্রাচীরে বিলম্বিত মুকুর চূর্ণ করিয়া দিল। শয্যাবরণ তুলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, উপাধান নষ্ট করিল, সেজ, দেওয়াল গিরী, বর্ত্তিকাধার সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। একদিকে বাদ্যযন্ত্রগুলি সজ্জিত ছিল, তাহাও নষ্ট করিল। পুষ্পবৃক্ষ সকল ভ্রষ্টশ্রী করিয়া দিল। এইবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ; রাণীর গৃহের মুকুর, আলেখ্য চিত্রপট, শয্যাস্তরণ সকল নষ্ট করিল। এক ছড়া মুক্তার মালা ছিল, পাষণ্ডেরা তাহা পদদলিত করিল ; একগাছি স্বর্ণহার ছিল, ছিঁড়িয়া দিল। রাণীর প্রিয় পক্ষীগুলির কাহারও পক্ষচ্ছেদন, কাহারও পদচ্ছেদন, কাহারও দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিয়া দিল ও তাহারা দাঁড়েই ঝুলিতে লাগিল। রূপার তৈজস পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল।···সৌভাগ্যক্রমে রাণীর দিকে কেহই অগ্রসর হয় নাই। রঘুনাথ জীউ সে যাত্রা রক্ষা করিলেন।”

রাত দশটা পর্যন্ত এই তাণ্ডবলীলা চলল।

এর মধ্যে ফিরলেন মথুরামোহন। বাড়িতে ঢোকার আগেই পলাতক দারোয়ানরা ছুটে গিয়ে তাঁকে জানাল সব কথা।

স্তম্ভিত মথুরামোহন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সেই গাড়িতে উঠেই গেলেন কলিঙ্গা বাজারের থানায়। ইনস্‌পেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন সৈনিকদের ছাউনিতে।

এতবড় ঘটনা ঘটে গেছে অধিনায়কের তা জানাই ছিল না। ইনস্‌পেক্টরকে দেখে, সব শুনে চৈতন্যোদয় হল তার। অবশিষ্ট কিছু সৈন্য নিয়ে নিজে এল সে মথুরবাবুর সঙ্গে। বিউগল বাজালে সেনারা একত্রিত হতে বাধ্য—তাই করল সে।

কাজ হল দ্রুত। একে একে নেমে এল সবাই। ফিরে গেল ছাউনিতে।

মথুরবাবুর উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করলেন রাসমণি আর মায়ের সেই অপরূপ রূপ দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে মাথা নত করলেন মথুরামোহন।

সবাই ফিরলেন একে একে—মান্না বাবুদের বাড়ি থেকে। এবার মথুরকে ডাকলেন রাণী আর সেইসঙ্গে নায়েব মশাইকেও।

রাণী বললেন, মথুর তুমি নায়েবমশাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখ—ওরা কি কি জিনিষ নষ্ট করেছে। তারপর একটা তালিকা করে পাঠিয়ে দাও ক্ষতিপূরণ চেয়ে। ওদের জানিয়ে দাও, যদি ক্ষতিপূরণ না দেয় তবে আবার আমি আদালতে গিয়ে আইনের সাহায্যে ক্ষতিপূরণ

আদায় করে নেব।

মথুরবাবু তাই করলেন। সরকার অবশেষে বাধ্য হয়েছিলেন ক্ষতি-পূরণ দিতে। ভবিষ্যতে আর যাতে কোন গোলমাল না হয় তার জন্য বারো জন গোরা সৈন্য জানবাজারের বাড়ির দরজায় দিবারাত্র দু'বছর ধরে পাহারা দিতে লাগল।

'সংবাদ প্রভাকর' ৬ মে ১৮৫৮, ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ২৪ বৈশাখ লিখল :

"অবগতি হইল গত পরশ্ব সন্ধ্যার সময় ৪।৫ চারি পাঁচ জন সবল মদমত্ত গোরা নিবারণ না শুনিয়া জানবাজার নিবাসিনী ধনশালিনী শ্রীমত্যা রাসমণি দাসীর সিংহদ্বারে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছিল, ইতিমধ্যে কতিপয় দ্বারপাল একত্র মিলিত হইয়া তাহার দিগ্যে প্রহার করিয়া বিদায় করিয়া দেয়। পরে অনুমান রাত্রি দশ ঘটিকার সময় উক্ত প্রহারিত গোরারা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া আপনারদিগের দলস্থ অপর প্রায় একশত গোরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করত ঐ বাটীতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করেন, তাহাতে সমুদয় দ্বারপাল অতিশয় কোপান্বিত হইয়া প্রভুর ধনপ্রাণ সর্ব্বস্ব রক্ষা করণার্থে যত্নশীল হয়, কিন্তু তাহারা গৃহস্বামিনীর অনুমতি না পাওয়াতে পলায়ন-পরায়ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। গোরাগণ দুইজন দ্বারপালকে অসিদ্বারা হত্যা ও ৫।৬ পাঁচ ছয়জনকে সাংঘাতিকরূপে আহত করে, এবং বহু মূল্যের নানাবিধ সামগ্রী অপচয় করিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক পোলিস প্রহরি উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। নগরের মধ্যে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছি তাহা বাক্যাতীত।"

এর ঠিক ৪ মাস পরে ১২৬৫ ২৭ শ্রাবণ 'সংবাদ প্রভাকর'-এ আর একটি সংবাদ বেরিয়েছিল। জুন মাসের ২৫ তারিখে কসাইটোলার স্থানীয় কার্যালয়ে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ভারতবর্ষীয় সভার মাসিক সম্মেলন হয়। রামগোপাল ঘোষ বক্তৃতা দেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহকে সভার সদস্যভুক্ত করা হয়।

শহর কলকাতায় গোরা সৈন্যদের অত্যাচার প্রসঙ্গে সরকারকে বিস্তারিত জানাবার প্রস্তাব রাখা হয়।

এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখল :

"জানবাজার নিবাসিনী মান্যা ধনাঢ্যা শ্রীমতী রাসমণি দাসীর বাটীতে গোরা সেনারা প্রকাশ্যরূপে অত্যাচার করিয়াছিল, কেবল দুরাচারদিগের আকার নিরূপণ দুষ্কর হইয়াছিল, এই কারণ দণ্ড মুক্তি পাইয়াছে, অপর নূতনাগত গোরা সেনারদিগকে সতর্করণ যাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং

তাহারদিগের সর্ব্বদা রক্ষণ বিষয়ে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদের নিকট এ বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য সন্ধান করিয়াছেন কিনা, অদ্যাপিও তাহা প্রচার হয়নি।"

বেশ বোঝা যায় জানবাজারের ঘটনা নিয়ে কলকাতার শিক্ষিত মহলে আলোড়ন উঠেছিল। বিভিন্ন সভা-সমিতিতেও রাণী রাসমণির শৌর্য ও সাহস নিয়ে সকলে প্রশংসা করেছিলেন।



জানবাজারে এসেছেন কালীপ্রসন্ন।

সাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন মথুরামোহন। মাত্র আঠার বছরের তরুণ যুবা কালীপ্রসন্ন সিংহ। জোড়াসাঁকোর দেওয়ান নন্দদুলাল সিংহ-র ছেলে। মাত্র তের বছর বয়সে বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করে একটা ঝড় তুলেছেন বলা যায়। ১৮৫৫ সালে এই সভার নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে আর বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার-এ রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' নাটকে অভিনয় করে কালীপ্রসন্ন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছেন! নিজেও নাটক লেখেন। মথুরামোহন এই বালকের প্রতিভায় বিস্মিত, মুগ্ধ!

কালীপ্রসন্ন জানালেন তিনি এসেছেন রাণীমাকে তাঁর নমস্কার আর অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাতে। এমন মহিলাকে কি প্রণাম না জানালে চলে? রাণী দক্ষিণেশ্বরে মন্দির করেছেন—সেজন্য হিন্দুরা তাঁর দু'হাত তুলে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। কিন্তু তিনি আরও যে সব কাজ করেছেন—গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন, স্বদেশ-প্রেমী মানুষ তাঁকে চিরদিন মনে রাখবে। স্ত্রীলোক হয়ে তিনি যেমন সাহস দেখিয়েছেন তা একটি দৃষ্টান্ত।

রাণী খুশী হলেন খুব। এই তরুণটিকে ভাল লাগল তাঁর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জানলেন তিনি, শুনতে চাইলেন নীলকর পরিস্থিতি কোন দিকে চলেছে এখন!

পরিস্থিতি ঘোরতর—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বহুকাল থেকেই ইংরেজরা নীলের কোম্পানী খুলে বসেছিল যশোর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি অনেক জেলায়। তৈরি করেছিল কুঠি-বাড়ি। দপ্তরখানা। তাদের মুখ্য

উদ্দেশ্য ছিল অল্প পয়সা খরচ করে অনেক টাকা লাভ করা। এই লাভালাভের ব্যাপারটা বরাবরই তারা ভাল বুঝত। নানা উপায়ে দরিদ্র চাষীদের শ্রমের ফসল ঘরে তুলে নেওয়াটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। আর এর জন্য তারা দাদন দিতে শুরু করে। দাদন অর্থাৎ চাষীকে আগাম অর্থ দিয়ে দেওয়া। চাষীরা ভাবত এই দাদনের টাকায় তাদের অনেক সাশ্রয় হবে। কিন্তু নীলকর সাহেবরা জোর করে বাধ্য করত ভাল জমিতে নীল বুনতে। প্রকারান্তরে এরা ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করত চাষীদের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তাদের কথামত না চললে প্রথমে মারধোর করা হত। তাতেও কাজ না হলে কয়েদ করে অমানুষিক অত্যাচার করা হত চাষীদের ওপর। তাদের সপক্ষে কেউ দাঁড়ালে—তার ওপরেও। নীলকর সাহেবরা ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিত, গৃহস্থ বধূদের লাঞ্ছিত করত—বাঙলার কত গ্রাম এদের অত্যাচারে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম প্রথম মুখ বুজে সহ্য করলেও ক্রমশঃ প্রতিবাদী মানুষরা সংখ্যায় বাড়ছিল। নানা ঘটনা ঘটছিল সর্বত্র। সরকার নতুন আইন চালু করলেন—এই সমস্যার মোকাবিলায়। কিন্তু ফল কিছুই হলো না।

১৮৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ চাষী নীলচাষের ধর্মঘটে সামিল হলো। তারা একযোগে প্রতিবাদ জানাতে লাগল—তারা কিছুতেই দাদন নেবে না, নীল চাষ করবে না আর সাহেবদের অত্যাচার মানবে না। গ্রামের জমিদার যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকে প্রজাদের পক্ষ নিয়ে কথা বললেন। ফলে তাঁরাও পড়লেন নীলকর সাহেবদের কোপদৃষ্টিতে। আইন-আদালত করে কোন লাভ হত না। কেননা শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপারটাই প্রহসনে পরিণত হত। স্বজাতি প্রেম ইংরেজদের মধ্যে বড় বেশি!

১৮৬০ সালে সরকার বসালেন একটি কমিশন। ইতিহাস বিখ্যাত 'ইণ্ডিগো কমিশন'—যাঁর সভ্যরা গ্রামে-গ্রামে, জেলায়-জেলায় ঘুরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন। দেশের মানুষ ধিক্কার দিয়ে উঠল—এমনকি শিক্ষিত বাঙালী সমাজও পিছিয়ে রইল না। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় আবার এগিয়ে এলেন সর্বাগ্রে। নীল বিদ্রোহ বাঙালীকে সামাজিক দায়িত্ববোধের চেতনায় আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল!

—রাণীমা আমাদের বাঁচান! আমরা আর পারছি না মা! আমাদের রক্ষা করুন!—সমস্বরে যারা আবেদন জানাল ওরা কারা?

ওরা সবাই রাণীর প্রজা।

ব্যস্ত হলেন রাসমণি। মথুরামোহনকে ডেকে বললেন. শোন, ওরা কী বলতে চায় ?

ব্যস্ত হলেন মথুরামোহনও। প্রজারা মার সন্তান। মার কাছে তাদের কী বলার আছে—শুনতে হবে তাঁকেও।

এই সেই মাকিমপুর পরগণা। যে তালুকটি কিনেছিলেন প্রীতিরাম। যে তালুক বন্যার পর পলিমাটিতে হয়েছিল সুজলা-সুফলা।

সেখানেও শুরু হয়েছে নীলকর সাহেবের অত্যাচার। সাহেবের নাম ডোনাল্ড সাহেব।—জোর করে আমাদের নীল বুনতে বলছে মা। না শুনলে আগুন লাগাচ্ছে ঘরে, চাবুক মারছে ধরে ধরে। আদুর পিঠ দেখাল তারা মথুরামোহনকে। চাবুকের দাগ সেখানে স্পষ্ট। শিউরে উঠলেন তিনি !

ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে গেল রাণীমার মুখ। মথুরবাবুকে বললেন তিনি.—নায়েব মশাইকে ডাক মথুর। বাছাই করা পঞ্চাশজন পাইক আর লাঠিয়াল নিয়ে যেতে বল ওদের সঙ্গে। যেমন করেই হোক ঐ ডোনাল্ড সাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দেবে। আমার জমিদারীতে প্রজারা যেন নির্ভয়ে, নিরুপদ্রবে থাকতে পারে—সে ব্যবস্থা করতে বলবে।

প্রজারা শুনে জয়ধ্বনি দিল। সেই ব্যবস্থাই করলেন মথুরামোহন। নায়েবমশাইকে পাঠালেন পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল দিয়ে।

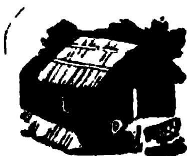
ডোনাল্ড সাহেব রাসমণিকে চিনত না। প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালানর ফল পেল সে যথারীতি—পিটিয়ে তাকে প্রায় আধমরা করে ফেলল রাণীর লেঠেলরা।

আদালতে মামলা করল সাহেব, রাণীর বিরুদ্ধে। কিন্তু ফল কিছু হল না—মামলা খারিজ হয়ে গেল।

মাকিমপুর পরগণাকে নীলচাষের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করলেন রাণী রাসমণি ! ডোনাল্ড বিতাড়িত হলেন।

কালীপ্রসন্নর কাছে রাসমণির নীল বিদ্রোহের সাম্প্রতিক খবর জানতে চাওয়ার সূত্র এখানেই। এমন ছেলেই এখন ঘরে ঘরে দরকার। ভাবলেন রাণীমা। অসি যুদ্ধ শুধু রক্ত ঝরায়, মসি যুদ্ধে মানুষের ভেতরকার চৈতন্য জাগে !

রাসমণি তাই অকুণ্ঠ চিত্তে কালীপ্রসন্নের কাজের প্রশংসা করলেন, প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বুক ভরা তৃপ্তি নিয়ে ফিরলেন কালীপ্রসন্ন সেদিন।



জগন্নাথপুর তালুক নিয়ে এবার ভাবনায় পড়েছেন রাণীমা। ভাবনা রামরতনকে নিয়ে।

যশোর জেলার নড়াইল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺কালীশঙ্কর দত্তরায়ের পৌত্র ও রামনারায়ণ দত্তরায়ের পুত্র রামরতন দত্তরায়। রাণীর জগন্নাথপুর তালুকের চতুর্দিকে বেড় দিয়ে আছে রামরতনের জমিদারী।

ছোটখাট গোলমাল যে একেবারে না হত তা নয় তবে কিছুকাল থেকেই খবর আসছিল নানাভাবে রাণীমার প্রজাদের উৎপীড়ন করছেন রামরতন।

এই সেই রামরতন—মন্দির প্রতিষ্ঠার জমি নিয়ে এঁর সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল রাসমণির। নিজেকে নিয়ে বড় অহঙ্কার রামরতনের। সামান্য এক বিধবা স্ত্রীলোকের এত দাপট তাঁর সহ্য হবে কেন?

মথুরামোহন, জগন্নাথপুরের নায়েব মশাই, গোমস্তারা সকলেই অপেক্ষা করছেন রাণীমা কি বলেন শোনার জন্য।

একদিকে নীলকর সাহেবের অত্যাচার অন্যদিকে এই উৎপাত! রাসমণি বললেন,—তাহলে এখন ওরা প্রজাদের সর্বস্ব লুঠ করেও ক্ষান্ত হচ্ছে না, মেরে ফেলছে তাদের?

নায়েবমশাই বললেন,—গুপ্ত হত্যা মা। মাঠ থেকে ফিরছে মানুষটা, ঘরে এল না আর। সকালে দেখা গেল পাঁকে পুঁতে ফেলেছে দেহটা। আর গত পরশু, রাতের বেলা আগুনে পঁচিশ ঘর মানুষের সর্বস্ব ছারখার হয়ে গেছে। কিছু নেই তাদের। আট-দশজন লোকের মধ্যে সবাই পালিয়ে গেছে, শুধু একটা ধরা পড়েছিল। সে ঐ বাবু রামরতনের লোক মা। চিনতে পেরেছে লোকে।

শিউরে উঠলেন রাসমণি। প্রজারা যে তাঁর সন্তানের মত। তারা তাঁকে বলে 'মা'। মা হয়ে মুখ বুজে থাকবেন তিনি! মথুরামোহনের দিকে তাকালেন রাণীমা, মথুরামোহন কি ভাবছেন—শোনার ইচ্ছে এবার রাসমণির।

—মহাবীরকে পাঠিয়ে দিই মা—, বললেন মথুর।

খুশি হলেন রাসমণি। মহাবীর তাঁর অতি বিশ্বস্ত। লেঠেলদের সর্দার সে।

দীর্ঘাকৃতি, পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারা। মায়ের নামে জীবন দিতেও প্রস্তুত সে। মনটা তার বড় সাদা, বড় সরল।

রাণীমা বলেছেন—আগু পিছু তাকান নয়, নিজের দলবল নিয়ে মহাবীর গেল জগন্নাথপুরে। মথুর নিশ্চিন্ত হলেন, মহাবীর যখন গেছে কোন অন্যায় সে হতে দেবে না।

খবর এল অবস্থা সামাল দেওয়া গেছে। ভয় পেয়েছে রামরতনের লেঠেলরা, ভয়ে এদিকে ঘেঁষছে না আর।

কিন্তু দু'দিন পরে যে খবর এল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মথুরামোহন। মহাবীর মারা গেছে! পিছন থেকে ছুরি মেরে কেউ তাকে মেরে ফেলেছে—।

মহাবীর সম্মুখ যুদ্ধে বিশ্বাসী। যে নিজে অন্যায় করে না, অন্যে কেউ তা করতে পারে—সে তা ভাবে না। মহাবীরও ভাবে নি। এ চক্রান্ত! এ গুপ্তহত্যা!

নায়েবমশাই এবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ২৪ পরগণা, বর্ধমান, হুগলী আর অন্যান্য জায়গা থেকে বাছাই করা লাঠিয়াল, পাইক আনালেন তিনি। তারা একত্রিত হল। প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, সড়কি, বল্লম, কুঠার, বর্শা, টাঙ্গী।

শোনা গেল রামরতনের লেঠেলরাও নাকি প্রস্তুত। তারা এগিয়ে আসছে এবার আক্রমণ করতে।

নায়েবমশাই সবাইকে একত্রিত করলেন। বললেন,—শোন তোমরা, এরা অন্যায় ভাবে আগুন জ্বালাছে। খেত-খামারের ফসল কাটছে, মানুষ হত্যা করছে। এ অন্যায়। আমাদের রাণীমা এ অন্যায় হতে দেবেন না। কেউ যেন এই জগন্নাথপুরের মাটি আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। তোমরা সকলে একবার একসঙ্গে জয়ধ্বনি দাও। বলো, 'জয় রাণীমায়ের জয়', 'রাণী রাসমণির জয়।'

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বজ্র নিনাদে সেই শতাধিক লাঠিয়াল চিৎকার করে উঠল—'জয় রাণীমার জয়'!

জগন্নাথপুরের নির্মল আকাশ ঝলমল করে বলল, 'রাণীমার জয়'!

সবুজ ধানের ক্ষেত মাথা দুলিয়ে বলে উঠল, 'জয় রাণীমার জয়'!

বাতাস হেসে উঠল, 'রাণী রাসমণির জয়'!

সেই জয়ধ্বনি শুনে থমকে দাঁড়াল ওরা।

যারা হিংস্র আক্রোশে ছুটে আসছিল। রামরতন দত্তরায়ের বেতনভুক লাঠিয়ালরা।

বিহ্বল হয়ে গেল তারা। একটা আতঙ্ক তাদের ঘিরে ধরল। নির্বিষ সাপের মত মাথা নিচু করে ফিরে গেল তারা গ্রামের সীমানা ছেড়ে।

নায়েবমশাই ততোধিক বিস্মিত হলেন। মায়ের এ কী করুণা! কোন মন্ত্রবলে এ অসাধ্য সাধন হলো?

খবর এল জানবাজারে।

মথুরামোহনকে বললেন রাসমণি,—বৃথা রক্তপাতে প্রয়োজন কি মথুর? যাঁর তালুক—তিনিই তা দেখবেন। লোকক্ষয়ে প্রয়োজন নেই। তবে অন্যায় স্বীকারও কোর না। আমাদের যতটুকু জমি রায়মশাই বেদখল করেছেন, তার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হও।

তাই হলো। দু'বছর ধরে মামলা চলল আদালতে। মামলায় জিতলেন রাণী।

১৮৬০। খবর পেলেন রাসমণি—রামরতন দত্তরায় ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। সব কলহ সব বিবাদের পালা চুকে গেছে তাঁর।

স্তব্ধ হয়ে রাসমণি ভাবলেন—এই তো মানুষের জীবন!



আবার ফিরে আসি মন্দিরে।

রাণীমার এখন বড় হাল্‌কা হাল্‌কা ভাব! কোথায় যেন ভার মুক্ত অনেকটা!

হতেই হবে এমন ভাব। জীবনে যা ভেবেছেন, যা করেছেন, যা করিয়েছেন তা যেন যাদু মন্ত্রে সার্থক হয়েছে, পূর্ণতা পেয়েছে! দূর দূরান্ত হয়েছে অতি নিকট। অতি নিকটে যা তা হাতের নাগালের মধ্যে এসেছে মুহূর্তে।

আসলে বিশ্বাসটাই বড় কথা ! যাঁরা বিলেতে গেছেন তাঁরা চোখের সামনে দেখেছেন বিলেত। যাঁরা বিলেতে যাননি তাঁরা বিলেতের গল্প শুনে, ছবি দেখে বিশ্বাস করেছেন বিলেত নামে একটা জায়গা আছে ! তেমনি বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে হয়। তিনি আছেন সর্ব কর্মে-সর্ব ভূতে ! আছেন শুধু না, তিনি রথী তাই দুনিয়া-রথ চলছে নিরন্তর। রাণীমা যা করছেন, আসলে যাঁর কাজ তিনি তা করিয়ে নিচ্ছেন। তাই হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে, মহা যজ্ঞে এ বাড়ি-ও বাড়ি নয়, এ পাড়া ও পাড়া নয়, দূরেদূরান্তর থেকে ভক্তি অর্ঘ্যে, বিনয় অর্ঘ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে পণ্ডিতবর্গকে আনতে হবে মন্দির অঙ্গনে, এ কী কম কথা ! অথচ সেই বর্ণনাতীত শ্রমের কর্ম সুসম্পাদিত ! রাণীমা যেমন ঈশ্বরের প্রতিনিধি তেমনি রাণীমার অনেক প্রতিনিধি ! এক একজনের ওপর এক এক গুরুভার। গুরুদায়িত্ব। এক একজন সেই দায়িত্ব পালন করে ফিরে আসছেন জানবাজারের বাড়িতে আর রাণীমার মন হচ্ছে হাল্‌কা ! যাঁরা ফিরছেন তাঁদেরও চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই ! বরং উল্টো ভাব ! সবাই বলছেন, রাণীমার দেওয়া সব কাজ যে এত তাড়াতাড়ি করতে পারবো তা ভাবতেই পারিনি—

এ কথা সেদিন রামধনের মুখেও উচ্চারিত হয়েছিল ! রামধন ঘোষ। রাণী মায়ের দেওয়ান ! রামধনও হুগলী জেলার লোক। কামারপুকুর থেকে সামান্য দূরে দেশড়া গ্রামের ছেলে রামধন। সেই রামধন একসময়ে এসেছিলেন রাণীমায়ের কাছে। এসেছিলেন কাজ চাইতে। কাজ পেয়েছিলেন রামধন ! পাবারই কথা। কথা-বার্তা, কাজ-কর্মে একটা খাঁটি লোক, তাই অল্পদিনের মধ্যেই রামধনের পদোন্নতি। সাধারণ পদ থেকে একেবারে দেওয়ান। সেই দেওয়ান রামধন যখন তলব পেয়ে রাণীমায়ের সামনে এসে হাজির, মথুরামোহন বলেছিলেন,—খবর শুভ তো ? কামারপুকুরের পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার ভট্‌চাজ মশাই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তো ?—পদধূলি দেবেন বলেছেন ?—

রামধন বললেন,—আসবেন বলেছেন। তবে—, আরও কিছু বলতে গিয়ে থামলেন রামধন ! একটা কী যেন সত্য গোপন করার চেষ্টা—

মথুরামোহন বললেন,—ব্যাপার কী বলুনদিকি, মনে হচ্ছে কিছু একটা গোপন করছেন আপনি—

রামধন এবার নিজেকে সহজ করে নিলেন। দেওয়ালেরও কান আছে, সুতরাং সেই দেওয়ালও যাতে শুনতে না পায় তেমনি চাপা স্বরে বললেন,—রাম ভট্‌চাজের সঙ্গে আমার পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতা তো কম নয়, তাই আমার

কাছ থেকে নেমন্তন্ন পেয়ে, প্রথমটা খুশি হয়েছিলেন। তারপরেই আবার বললেন,—আমি জানবাজারে রাসমণির বাড়িতে গিয়ে তোমার সংগে দেখা করে আর একটু পরিষ্কার ভাবে সব জেনে তবেই আমার মত দেব—। আমি বলেছিলাম,—কেন? এতে কিন্তু ভাব কেন ? রাম ভট্চাজ বলেছিলেন,—আমি শুনেছি তোমাদের রাণীমা জাতিতে মাহিষ্য। কৈবর্ত-তনয়া। তাঁর নেমতন্ন নেওয়া বা দান নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, নিলেই আমরা এক ঘরে হবো - ; কথা শুনে আমারও মনটা দমে গিয়েছিল. তাই ভট্চাজ মশাইকে খাতা দেখিয়ে বলেছিলাম, এই দেখুন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের তালিকা, সবাই নেমতন্ন গ্রহণ করেছেন, কাজেই আর অমত করবেন না—। সব দেখে অবশেষে নেমতন্ন নিয়েছেন, সিধেও নেবেন—

কিন্তু দাদা যতবার বলেন,—গদাই, চল দক্ষিণেশ্বরে যাই!—

গদাই বলে,—আমার টোল ভাল, ও মঠ মন্দিরে আমার মন যায় না।

রামকুমার বলেছিলেন, জানবাজারের রাসমণি কী কাণ্ডটাই না করেছেন, সারা জীবন কত মন্দিরই তো দেখলাম, কিন্তু এমনটি দেখিনি! শুনিওনি! তুই আমার সংগে দেখবি চল—

মহেশ বলেছিল, হ্যাঁ ছোট্ঠাকুর—তুমিও চল। কী কাণ্ড যে হচ্ছে ওখানে, না গেলে বোঝা যাবে না। মহেশ রাণীমার এস্টেটের কর্মচারী। রামকুমারকে নিয়ে যেতে তাকে পাঠিয়েছেন রাণীমা। রামকুমারের সংগে পরিচয় আছে তারও। এবার রামকুমারের দিকে ফিরল মহেশ,—আর দেরি করা বোধহয় ঠিক হবে না ভট্চাজমশাই। ওদিকে বেলাবেলি না পেঁছিলে রাণীমার চিন্তা বাড়বে। কালকে সকালের সব জিনিষপত্র তো আজ গুছিয়ে না রাখলে চলবে না। আপনার ওপর নির্ভর করে আছেন সবাই। না গেলে—

—না না, রামধনকে কথা দিয়েছি আমি। যাব তো নিশ্চয়ই!

কথা রেখেছিলেন রামকুমার। প্রতিষ্ঠার আগের দিন ছোট ভাই গদাধরকে সংগে নিয়ে ঝামাপুকুরের টোল থেকে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। একবার দেখেই আসা যাক, কী হচ্ছে সেখানে—এমন একটা মন নিয়েই এসেছিলেন রামকুমার।

তারপর চার চোখে বিস্ময় আর বিস্ময়! রামকুমারের দু'চোখ আর গদাধরের দু'চোখে যেন পলক পড়তে চায় না!

যে দিকে চোখ ফেরান ও'রা সেদিকেই প্রাচুর্য আর প্রাচুর্যের রোশনাই!

দু'কদম ডাইনে গেলে যাত্রার আসর। পাঁচ কদম বাঁয়ে গেলে কালী-কীর্ত্তন! ওদিকে চোখ ফেরালে ভাগবত পাঠ, এদিকে রামায়ণ কথা! আকাশে-বাতাসে, গাছের পাতায়-লতায় নানা সুর আর নানা ব্যঞ্জনা! চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ, যেন আনন্দ-খুশির ঝর্ণা ধারায় মন্দির চত্বর প্লাবিত! আলোক রঞ্জিত অঞ্চল। রাত্রে যেন দিনমান। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—ঐ সময় দেবালয় দেখে মনে হয়েছিল রাণী যেন 'রজতগিরি' তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছেন!

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে হৃদয় দিয়ে বোঝার চেষ্টা! গদাধর সে চেষ্টা করেছিল কিনা তা আর রামকুমারের জানা হয়নি। শুধু দেখেছিলেন গদাধর সিধে না নিয়ে টোলে ফেরার জন্য বড় বেশী উদ্‌গ্রীব! ওর যেন মন বসে না এখানে! মন বসাবার চেষ্টাও নেই। অবশেষে সব রোশনাইকে পিছনে রেখে গদাধরের পদযাত্রা!

মন যেখানেই যাক—গতি ঝামাপুকুরের দিকে।

রাসমণিও সে কথা বিস্মৃত হননি।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে মথুরামোহন, প্যারীমোহন থেকে অনেকেরই চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল বিরক্তির ছাপ!

— গদাই খাবিনে?

—না, ও আমি খাব না।

—সেকি-এ তো মায়ের প্রসাদ! মাকে নিবেদন করলে তার আবার অন্য রকম কিছু থাকে নাকি? আমিও তো খাব!

—না, এদের অন্ন আমি খাব না।

ছোট ভট্‌চাজ খাবে না। কেন খাবে না? যেখানে এত ছড়া ফেলা, যেখানে এত প্রাচুর্য, যেখানে এত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রসাদ গ্রহণ করতে আগ্রহী, যেখানে রামকুমার স্বয়ং মা-এর অন্নভোগ দিয়েছেন সেখানে গদাধর খাবে না কেন? তাই বিরক্ত সবাই।

—সিধে নে তবে?

—না।—কেউ বলল ক্ষ্যাপা, কেউ বলল পাগল। কেউ বলল,—রাজভোগ কি আর সবার কপালে জোটে? অমন বেয়াড়াপনা জন্মে দেখিনি বাপু! বড়ভাই এত করে বললে—শুনল না গা?

ভারাক্রান্ত হয়েছেন রামকুমার। আজ দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার এই শুভ দিনে, হাজার হাজার মানুষ যেখানে ছুটে আসছে, সেখানে বার বার বলা সত্ত্বেও কেন গদাই খেলো না এই ভাবনা রামকুমারের সারা মন জুড়ে!

অনেক কাজ, সুতরাং ও ভাবনায় মনকে ডোবালে চলবে না। প্রতিষ্ঠা পর্বের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে, টোলে ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে গদাধরের সঙ্গে পরিষ্কার কথা বলে নেওয়া দরকার। অগত্যা ভায়ের কথা রেখে মহাপূজার কাজে মন দিয়েছিলেন রামকুমার।

পূজা অন্তে, রাণীর অনুরোধ পেলেন রামকুমার।

রাণীমা অনুরোধ করেছেন, রামকুমারকেই চিরকালের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজার ভার গ্রহণ করতে হবে! রাণীমার এই অনুরোধ এড়ানো রামকুমারের পক্ষে সম্ভব হয়নি! তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি মায়ের পূজক হয়ে থাকবেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁরই বংশধরেরা হবেন মায়ের পূজক, সেবক।...এই সম্মতি দানের জন্যই সব পরিকল্পনা, ভাবনার গতি পরিবর্তিত হলো! রামকুমার বহুদিন ঝামাপুকুরের টোলে যেতে পারলেন না। ভেবেছিলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠার পরের দিনই ফিরবেন সেখানে! অথচ ফেরা হলো না! মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক!

পরের দিন গদাধর আবার সেই দক্ষিণেশ্বরে।

এসেছিস! রামকুমার খুশী।—থাক তবে আজ। এখানে আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। এখন ঝামাপুকুরে ফেরা হবে না আমার।

গদাধর এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখে। তারপর আবার হাঁটা দেয় ঝামাপুকুরে।

—ছোট ভটচাজ যে চলে গেল গো?—রামকুমারের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একে নিয়ে কি করবেন তিনি। কোন কিছুতেই মন নেই এ ছেলের। এক এক সময়ে এক এক ভাব! আর ভাবতে পারেন না রামকুমার। মায়ের মুখের দিকে তাকান। সব ভাবনা মায়ের পায়ে ছেড়ে দিলাম,—তিনি যা করবেন তাই হবে—মনে মনে ভাবলেন রামকুমার।

গদাধরের ভাবনা সেখানেই!

অনেকদিন দাদা ঘরে আসেননি। ঝামাপুকুরের ঘরে। কথা ছিল, মন্দির প্রতিষ্ঠার পরের দিনই দাদা আসবেন! অথচ দিন গেল, এক নয় একাধিক দিন। গদাধর এ সব নিয়ে ভাবে না! মনে মায়া, অথচ মায়ায় কোন পার্থিব বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা নেই। তবুও দিনান্তে দাদার পাশে বসে কথা বলা, পূজা-অর্চনা-শাস্ত্র-মন্ত্র নিয়ে কথার পৃষ্ঠে কথা সাজানো আর হয় না তার! ব্যাপারটা ভাল লাগে না গদাধরের।

এবার আর একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। রক্তের চাইতে বিবেকের, মানব-

ধর্মের কর্তব্য মানুষের ভাল মন্দের খবর নেওয়া !

'দাদা' সম্পর্কের চাইতে মানুষ সম্পর্কটাই বড় কথা। সেই মানুষ, যিনি অনেকদিন আছেন দক্ষিণেশ্বরে। মন্দির প্রতিষ্ঠা সমাপনে তাঁর প্রত্যাবর্তন করার কথা ! অথচ সেই মানুষ ফিরছেন না !

গদাধর আবার গেল দক্ষিণেশ্বর।

দাদা জানালেন, সব কথা। কিন্তু গদাধর খুশি নয়। এর পর স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ" গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে এখানে শ্রদ্ধা চিত্তে তার পুনরুল্লেখ করি—

"...কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন না, তখন মনে নানা প্রকার তোলা পাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধ তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্র-যাজিত্বের এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তি সহকারে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে ধর্মপত্রানুষ্ঠানরূপ* সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ধর্মপত্রে উঠিয়াছিল— "রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"—

অতএব ঝামাপুকুরের পাট চুকল। গদাধর রয়ে গেল দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু গোঁ ছাড়ল না।

—ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ নিবি না তবে? গদাধর নিরুত্তর।—মন্দির স্থান, গঙ্গাজলে রান্না আবার মায়ের প্রসাদ—এতে তো কোন দোষ নেই ! কেন এমন করছিস গদাই ? গদাধরকে বোঝাতে হার মানল সবাই। রামকুমার বললেন,—তবে যা, সিধে নিয়ে গঙ্গাতীরে বসে স্বপাকে খা !

তো তাই হল। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কূলে বসে স্বপাকে রাঁধল গদাই। ভোজন করল আনন্দে।

* ধর্মপত্রানুষ্ঠান : আমরা মাঝে মাঝে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য টুকরো টুকরো কাগজে মনবাসনা পূর্ণ হবে কি হবে না, জানার জন্য 'হ্যাঁ' কি 'না' লিখে লটারী করি ! পল্লীবাসীরা এক সময়ে কোন বিষয় যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করতে না পেরে, ঐ পদ্ধতিতে কাগজের টুকরোতে লিখে দেবতার নামে ছড়িয়ে দিতেন। সেই টুকরো কুড়িয়ে যা পাওয়া যেত তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যেত। স্বামী সারদানন্দ এই 'ধর্মপত্র' প্রসঙ্গে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ" গ্রন্থে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন—"…রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল…"! ক্রমে ভাবের পরিবর্তন হলো গদাধরের।

সারদানন্দজী আরও বলেছেন ঠাকুরের "আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে" এই নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন ছিল। নিষ্ঠা দিয়েই তিনি "সত্যের উদারতা"য় পৌঁছেছিলেন। নিষ্ঠার বাড়াবাড়ি তাঁকে দিয়ে এই সব কাজগুলি করিয়েছিল।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

গদাধরের আচরণ তো সে কথা বলে না! চন্দ্রমণি ব্যাকুল হয়েছেন—গদাই কোথায়? কোথায় আবার? লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে সাধুদের সঙ্গে বসে আছে সে। প্রায়দিন রাতে বাড়ি ফিরে খেতে চায় না গদাই। মা জিজ্ঞেস করে শুনলেন সেখানে কত রকমের কত সাধু, ব্রহ্মচারী, গদাধরকে তাঁরা না খাইয়ে ছাড়েন না। তাঁরা কোন্ দেশের, কোন্ জাতের লোক গদাই এ সব নিয়ে একবারও ভাবে নি।

স্যাঙাত গয়াবিষ্ণুকে* নিয়ে গ্রামের অনেক বাড়িতেই খেত গদাই। বামুনের ছেলে বলে ভাবত না নিজেকে। ভালবাসা তো দূরে ঠেলে না—কাছে টানে! কৃষ্ণ গোপবালাদের ননী-ক্ষীর খেয়েছেন পরম তৃপ্তিতে।

আর তারপর যে গদাধর ধনী কামারনীকে 'মা' বলে ডেকে উপনয়নের দিন তাঁর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেছিল—সে তো কিশোরের প্রলাপোক্তি ছিল না, সে ছিল তার অন্তরের বিশ্বাস। রামকুমার বরং আপত্তি জানিয়েছিলেন এমন প্রথা বিরুদ্ধ কাজের জন্য। কিন্তু নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে অব্রাহ্মণীয় কাজ করতে চায় নি গদাধর। তাহলে আর উপবীত নিয়ে কি হবে—যদি সে মিথ্যাবাদীই হয়! ধনী কামারনীকে যে সে কথা দিয়েছে!

আরও অনেক পরে গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে যিনি বলছেন,—"টাকা মাটি-মাটি টাকা।"—যাঁর কাছে শাস্ত্রীয় অনুশাসন, আচার-অনুষ্ঠান বাহুল্য মাত্র, হিন্দু মুসলমান-খৃষ্টানে কোন ভেদাভেদ নেই, যাঁর কাছে সব ধর্ম এক—সবার মূলেই সেই 'তিনি'—সকলের মধ্যেই যে দেবতার আসন পাতা,—সেই নর-নারায়ণের সেবায় যিনি উদ্‌গ্রীব—তাঁর মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের

* ক্ষুদিরামের বন্ধু ধর্মদাস লাহার ছেলে গয়াবিষ্ণু

মন্দির প্রসঙ্গে ঐকান্তিক নিষ্ঠার এত বাড়াবাড়ি কল্পনা করা যায় না।

তাহলে—কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে—ছিলও।

মন্দির তো নয়—'রজতগিরি'। মানুষ তো নয় আত্ম অহমিকার ধ্বজাধারী। 'মায়ে'র জয়—না রাণীর জয়? জয় রাণী রাসমণির জয়! পাইক-পেয়াদা, নায়েব-গোমস্তা, সরকার-দেওয়ান থেকে রাণীর যত আত্মীয়-পরিজন, মেয়ে-জামাই সকলেরই মুখে একটা অহঙ্কারের প্রতিচ্ছবি। সাজে-সজ্জায়, দানে-দক্ষিণায়—শুধু আড়ম্বর—শুধু সমারোহ।

গদাধর দেখেছেন 'আসল' ছেড়ে 'নকল' নিয়ে এঁদের বেশী মাতামাতি। ভাল লাগেনি তাঁর।

গদাধরের তো সাজান মন নয়। অনেক পরে যখন মথুরামোহন ঠাকুরকে অর্থ, জমিদারী দিতে চেয়েছেন, রূপার হুঁকো এগিয়ে দিয়েছেন, বারবার নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন—ঠাকুর শিউরে উঠেছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন। শয্যায় টাকার কলুষ স্পর্শে তাঁর দেহ-মনে জ্বালা উপস্থিত হয়েছিল। চিরকালই ঐশ্বর্যের প্রতি অনীহা তাঁর। আশৈশব যিনি পরম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ছুটে বেড়াচ্ছেন—তাঁর কাছে এ সব কিছুই অর্থহীন। স্তুতি কিংবা প্রশংসা কার না ভাল লাগে? সাধারণ মন এ সব কিছুর বশ। রাসমণির আত্ম-সন্তুষ্টি তাঁর অহঙ্কার।

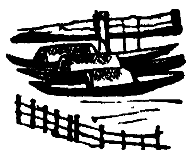
"মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কার। প্রকৃতির পরিণামে মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হইলেও উহা একবস্তুসারই থাকে। যে গুণের প্রভাবে একবস্তুপরতা ভাঙিয়া বহু বস্তুপরতা উৎপন্ন হয়, তাহাই অহঙ্কার। 'অহঙ্কার' অর্থ 'আমি আমি করা' অর্থাৎ আমি পৃথক, তুমি পৃথক, এই ভাব। অন্য হইতে পৃথক্ থাকিবার ভাব-প্রবণতা বা অভিমানকেই অহঙ্কার বলে।"*

এই হলো বেড়া। বেড়া না ভাঙ্গলে 'তাঁর' কাছে যাওয়া যায় না। তাই রাসমণির জীবনে এ এক মহা সন্ধিক্ষণ। তাঁর সব ছিল। বিনয় ছিল, দয়া ছিল, সংযম ছিল, বিষয়-তৃষ্ণা ছিল না, কিন্তু অহঙ্কারও ছিল। রাণীর অহঙ্কার—স্বকৃত কর্মের অহঙ্কার—এবার তা ভাঙ্গার পালা।

গদাধর পালিয়ে যেতে গিয়েও থেকে গেল—রাণীকে পথ চেনাবে কে? আর রাজার জামাই—পেয়াদা তো নয়, রসদদার। কিন্তু ঐ অভিমানটা ভাঙ্গতে হবে!

আর তাই দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন ঠাকুর!

* গীতারহস্য: লোকমান্য তিলক/শ্রীমদ্ভাগবত গীতা: / গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ।



হাতের মধ্যে ভাতের দলা!

সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে ছেলে খেলা করে, আর মা ভাতের দলা হাতে নিয়ে ছেলের পিছন পিছন ছুটে ফেরেন। ছেলের ক্লান্তি নেই ছোটাছুটিতে, ভাতের দলা হাতে নিয়ে, খাবি আয়—খেয়ে নে বাবা—বলে ছেলের পিছন পিছন ছুটে বেড়াতে মায়েরও ক্লান্তি নেই।

এ যেন লুকোচুরির খেলা!

মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের আর ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এই অন্তহীন লুকোচুরির খেলার সমাপ্তি নেই। থাকবেও না। আমরা রক্তমাংসের মানুষ, নিত্য খুঁজি পরমানন্দ! খুঁজি কর্ম, অর্থ, কাম-মোহ, বিষয়-আশয়, খ্যাতি, লাভ আর লোভনীয় ঐশ্বর্য! আর সেই খোঁজার তাগিদে নিত্য ছুটে মরি দিকে—দিকে! পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় এ সবের মধ্যে কোনটি আমার দ্বারা সংঘটিত তা ভাববার অবকাশ পাইনে। আর আমাদের চতুর্দিকে পাশাপাশি পূর্ণপাত্রে সাজানো সব। ভাতের দলার মত, পাপ-পুণ্যের দলা নিয়ে মা নিত্য থাকেন পাশাপাশি! কেউ পাপ ভক্ষণ করি, কেউ করি পুণ্য ভক্ষণ!

দক্ষিণেশ্বর মন্দির, সে তো মায়ের বাসনা মেটাবার, সংকল্প সম্পাদনের, দায়িত্ব পালনের লীলাভূমি!

মা চেয়েছেন আসন, রাণীমা নিমিত্তের ভাগী হয়ে সেই আসন দিয়েছেন পেতে! স্বামী রাজচন্দ্রের অভিপ্রায় অথবা জায়া রাসমণির কর্তব্য, যাই হোক না কেন, মায়ের আসন পাতা বড় কথা। সেই আসন মা পেতে নিয়েছেন অন্যের ভিতর দিয়ে। আসলে মায়ের বিধানে সন্তানের কর্তব্য পালন! তারপর কাজ ফুরলে ডাক! স্বামীর কাজ শেষ হয়েছিল বলেই ডাক এসেছিল অনন্তলোকের! রাজচন্দ্র চলে গেলে সেখানে রাসমণি আসবেন! রাসমণির পর অন্য কোন উত্তরসূরী। যেমন মায়ের পর সন্তান, সন্তানের পর তার উত্তরপুরুষ! সেই উত্তরপুরুষের কামনা থাকে সবার। কামনা থাকে বলেই ভাতের দলা হাতে মা ঘোরেন সন্তানের পিছন পিছন। সন্তান পালনের কর্তব্যের পিছনে উত্তরপুরুষের প্রত্যাশা। এই ভাবেই তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিত্য চলবে মায়ের পূজা!

রাণীমার ক্ষেত্রে অন্য মত, অন্য পথ।

দক্ষিণেশ্বর তো রাণীমার ব্যক্তি সম্পত্তি নয়, সুতরাং সেখানে সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য উত্তরপুরুষ সন্ধানের কোন তাগিদ নেই। তবু গদাধর নামটি কেন বার বার রাণীমার মনকে করে উচাটন! কেন রাণীমা সদাই উদ্বেলিত!

কেন তাঁর ভিতরকার মা শুধু খুঁজে ফেরে উত্তরপুরুষ!

রাণীমা বললেন, —বাবা মথুর, এবার যদি মরি পরম তৃপ্তি নিয়েই মরবো! আমার বাসনা পূর্ণ কর বাবা। শুনেছি বালক গদাধর নাকি পঞ্চবটীতে থাকেন, নিজের হাতে যা পারেন তাই নাকি রান্না করে খান। গদাধর যা করেন হয়তো ভাল বোঝেন তাই করেন, কিন্তু আমি যে বড় কষ্ট পাই বাবা! আহা এক রত্তি ছেলে, কতই না কষ্ট তাঁর—, তুমি বরং রামঠাকুর মশাইকে গিয়ে বলো, আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন তাঁর ভাইকে মন্দিরে মায়ের সেবা কাজের জন্য সঙ্গে রাখেন—

তাই হলো। রাণীমার অনুরোধ পৌঁছে গেল রামকুমারের কাছে। রামকুমার আর মথুরবাবু দু'জনেই বোঝালেন গদাধরকে। গদাধর নিরুত্তর। তাঁর ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা! একদিকে অগ্রজ অন্যদিকে বড়লোকের বড়লোক জামাই, দু'য়ে মিলে একাকার। অহংকারের সর্বাঙ্গে আগুন! আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে 'আমিত্ব'। অহং না পুড়লে চলবে কেন! হোমযজ্ঞের কাঠগুলো যদি না পোড়ে তা হলে মন্ত্রের দাম কোথায়! তেমনি হোমের কাঠের মত "অহং" পুড়ছে দেখে গদাধরের হাসি আর ধরে না। এ হাসির অর্থ জানেন না মথুরবাবু। জানেন না রামকুমারও। রামকুমার তাই ভয় পান। মথুরবাবুর মন ভাবে, একরত্তি ছেলের ঐ অহেতুক হাসির অর্থ উপহাস।

গদাধর বলেন,—যতই রাগ কর বাপু, আমি জানি দাদার সঙ্গে মন্দিরে যখনই ঢুকবো তখনই 'আমি-আমি' ভাবের যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও পুড়ে যাবে।—

মথুরামোহন সে কথার অর্থ বুঝলেন না!

রাণীমা সব শুনে কিন্তু এক বুক তৃপ্তি নিয়ে রোজের মত মাটিতে থানের খোঁট বিছিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন! স্বস্তির আবেশ নামল চোখে!

আর এক খবর পেয়ে রাণীমা খুশি।

এক এক করে যদি মনের ভার কমতে থাকে তা হলে মন্দ কী! যত ভার কমবে তত মুক্তির আনন্দ। রাণীমা যত বেশী মুক্তির আনন্দ আহরণ করতে চান তত বেশী যেন এই খবরগুলো রাণীমাকে ভারমুক্ত করে।

খবর এলো দক্ষিণেশ্বরে রামঠাকুরের ভাগ্নে এসেছে। ভাগ্নের নাম হৃদয়। হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। রামকুমার আর রামকৃষ্ণ অর্থাৎ গদাধরের পিসতুতো বোন হেমাঙ্গিনীর ছেলে। এবার এই হৃদয়রামের কথা একটু বলি—

হৃদয়রামের বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। গদাধর আর হৃদয়রাম প্রায় সমবয়সী। গদাধর দাদার ইচ্ছাপূরণের জন্য এসেছিলেন কলকাতায়, তারপর দক্ষিণেশ্বরে। হৃদয়রাম তার বিপরীত! হৃদয় গ্রামের চেনা-জানা সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে যখন একটা কাজ জোগাড় করতে পারেনি, তখন একদিন 'জয় মা' বলে ভাগ্যের তরী ভাসিয়ে দিয়েছিল অনিশ্চিতের নদীতে। তারপর ভাসতে ভাসতে এসেছিল বর্ধমানে। বর্ধমানে পেঁছেই জানতে পেরেছিল মামারা সব আছেন জানবাজারের রাসমণির তৈরি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। কথাটা শোনা মাত্র আর বিলম্ব করেনি হৃদয়। যেতে হবে দক্ষিণেশ্বর! তারপর পথ চলা শুরু! অবশেষে মন্দির!

হৃদয়কে পেয়ে গদাধরের আনন্দের সীমা ছিল না। ভাবখানা এমন, তুমি আসবে আমি জানতাম, আমার জন্যেই তো তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন এখানে!

রামকুমারও যেন অনেকটা স্বস্তি পেলেন। যা কিছু ঘটে তা যেন ঘটিয়ে রাখেন তিনি। রামকুমার হয়তো কিছুদিন ধরে ভাবছিলেন বয়সের কথা। বয়স তো কম হলো না! আর এই বয়সে কত ঝড়ই না সইতে হলো তাঁকে! এবার ছুটি চাই! চিরকালের বিশ্রাম। অথচ সেই ছুটি নেবার অন্তরায় অনেক। একদিকে বড় অন্তরায় গদাধর! গদাইটা কোন বিষয়েই যেন মন দিতে চায় না। আসলে যে পথেই ভাইকে চালিত করতে চান, সেই পথেই নাকি বিষয়-বিষ! বন্ধন! ইদানিং রাণীমায়ের অনুরোধেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, অনেক বোঝাবার পর কাজে মন বসেছে তার। গদাই মায়ের জন্য মাঝে মাঝে ফুল তোলে বাগান থেকে। যখন মন চায় না তখন আর তা করে না সে। সুতরাং মায়ের নিত্যপূজার দায়িত্ব পালন করেন রামকুমার। গদাধর যেমন মুক্ত, তেমনি মুক্ত!

অন্তরায় স্বয়ং রাণীমা। রাণীমা আসেন মন্দিরে, মুখে কোন শব্দও উচ্চারণ করেন না। মন্দিরের দ্বারে নিশ্চল—নিশ্চুপ শুধু বসে থাকেন। দিনের শেষে আবার ফিরে যান জানবাজারে। কোন কোন দিনে ঘরে ফেরার মন থাকে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্দিরের দুয়ার থেকে উঠে আসেন কুঠি বাড়িতে। সেই রাণীমা পরম তৃপ্ত রামকুমারের পূজা-অর্চনায়! শরীর যতই ভাঙুক, অবসর নেবার বাসনা যতই আসুক, উপযুক্ত উত্তরাধিকার পূজক না এলে অবসর নেওয়া যাবে না।

সুতরাং বড় প্রয়োজন ছিল এমন একজনকে যে রামকুমারের পাশাপাশি, কর্মে-ধর্মে এক হয়ে মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে!

হৃদয় আসায় রামকুমার তাই খুশি। সেই থেকে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে! আর একটি ব্যাপারেও রামকুমার নিশ্চিন্ত, তা হলো গদাধরকে চোখে চোখে রাখা বড় দরকার। হৃদয় পেয়েছিল সেই কাজ। গদাধর যেখানে হৃদয়ও সেখানে। আসলে হৃদয়ে হৃদয় বন্ধন। গদাধরকে দু'দণ্ড চোখের আড়ালে রাখেনি হৃদয়। দু'দণ্ড চোখের আড়ালে গেলেই হৃদয় কেমন যেন অস্থির হয়ে যেত। এ যেন ভক্তগুণে ভক্তিভাব!

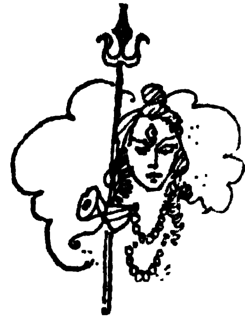
রামকুমার বললেন,—দুপুরে পঞ্চবটী বনে নিজে হাতে সিধে রান্না করে খাওয়াটা কেন যে গদাই ছাড়ছে না তা জানিনে, তুই জানলি কিছু?

হৃদয় বলল,—গদাই মামা রাতে কালী মায়ের প্রসাদী লুচি খায়!

সেই হৃদয়রামের কথা শুনে রাণীমা হলেন নিশ্চিন্ত। মথুরামোহন বললেন,—হৃদয় আসার পর থেকে রামঠাকুরের ভাই ঐ গদাধরের পাগলামো অনেকটা কমেছে মনে হয়। তবে, পাগল-ভাব পুরোপুরি কাটে নি। তাই আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না মা, আপনি কেন নিশ্চিন্ত!

রাণীমা বললেন,—বাবা মথুর, তুমি যখন তোমার পুত্রের মুখের দিকে তাকাও তখন তোমার মনে যেমন নিশ্চিন্ত ভাবের উদয় হয়, তোমরা যখন আমার পাশে থাক তখন আমার যেমন কোন ভাবনা থাকে না, তেমনি বালক গদাধর তার ভাগ্নেকে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমি কেন নিশ্চিন্ত হয়েছি তা ঠিক বোঝাতে প্যারব না—

বোঝাবার দরকার কী! যে লীলাময় নিজের লীলাক্ষেত্র নিজেই রচনা করেন, সেই লীলাময়ই আবার লীলাক্ষেত্রে লীলাসঙ্গী নির্বাচনও করেন। রাণীমার সেখানেই স্বস্তি। লীলাময়ের স্ব নির্বাচিত লীলাসঙ্গীর সঙ্গে—স্বয়ং লীলাময় দক্ষিণেশ্বরের লীলাক্ষেত্রের দুয়ার যেন উন্মুক্ত করে দিয়ে আনন্দ-বিহ্বল!



এই বইছে দখিনে আবার এই বইছে উত্তরে। বাতাসের এমনতর খেয়ালী-পনার অন্ত নেই!

এই দেখ গাছের পাতাগুলোতে কোন স্পন্দন নেই আবার পরমুহূর্তে দেখ ঝড়ের তাণ্ডবে গাছগুলো সব নুইয়ে পড়ছে!

এই দেখছি আকাশে তারার হাসি, পরক্ষণে ফ্যাকাশে-বিবর্ণ আকাশে তারারা নিরুদ্দেশ!

এ হলো খেয়ালীপনা। বাতাসের আর আকাশের খেয়ালীপনা নয়, প্রকৃতির খেয়ালীপনা। প্রকৃতির তাই প্রকৃতি জানা দায়! তাই বোধ করি মথুরামোহনের ভাবনার অন্ত নেই! ভাবনা রাম ভট্চাজের ভাই গদাধরকে নিয়ে। ইদানিং তার সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে আসে মথুরামোহনের! কেউ বলে, একটা পাগল জুটেছে মন্দিরে! কখনো গঙ্গার তীরে আবার কখনো গাজী পীরের থানে গদাধর আপন মনে হাসছে আবার আপন মনে কাঁদছে। কখনো গঙ্গার মাটি তুলে আপন মনে প্রতিমা গড়ছে, গড়া শেষ হলে আবার ভাসিয়ে দিচ্ছে গঙ্গাজলে!

কখনো হৃদয়কে শ্রোতা করে সামনে বসিয়ে গান শোনাচ্ছে আবার কখনো ছুটে গিয়ে মা জগদীশ্বরীর মন্দিরের সোপানে বসেই কেমন যেন হয়ে পড়ছে নিথর-নিস্তব্ধ! কখনো জ্ঞান-কখনো অজ্ঞান!

বড় ভাল গানের গলা গদাধরের! গান গায় মাঝে মাঝে। মায়ের গান। মায়ের নাম।

এ সব কথা যত শোনেন মথুরামোহন, তত বেশী যেন মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে! নিজের কাছে নিজেই হয়তো প্রশ্ন করেন বড়লোকের জামাই, কেন এই ব্যাকুলতা! মাঝে মাঝে গদাধরকে কাছে ডেকে নিয়ে ইচ্ছা করে জানতে, কে তুমি? তবুও নিজেকে সংযত রাখতে হয় তাঁকে!

মথুরামোহনের মনের ভেতর একটা তোলপাড় হচ্ছে। কিসের জন্য

বুঝতে পারছেন না। বিষয়-কর্ম ছাড়া, কর্তব্য করা ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না তিনি। সেই বিশাল মানুষটি যখন এক অতি সাধারণ গ্রাম্য যুবকের সামনে এসে দাঁড়ান তখনই তাঁর মনের ভেতরে একটা মন কেমন যেন ছটফট করে ওঠে!

সেদিনও তাই হল। দূর থেকে দেখেছিলেন মথুর—গদাধর গঙ্গাতীরে কি যেন করছে। হৃদয় দাঁড়িয়ে দেখছে তাই।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন তিনি। সচকিত হলো হৃদয়। মামাকে ডাকতে যাচ্ছিল—ইশারায় বারণ করলেন মথুরামোহন। গদাধরের দৃষ্টি নেই কোনদিকে। আপন ভাবে বিভোর হয়ে শিবমূর্তি গড়ছে সে। গঙ্গা থেকে তুলে এনেছে মাটি।

মথুর স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগলেন। অনায়াস ভঙ্গীতে রূপদান করছে গদাধর। এ এক অন্য রূপ। সেই তন্ময় ভাব দেখে মনে হয়—

"চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠ কর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্‌কৃতে সুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥"

অর্থাৎ যাঁর শিরদেশ চন্দ্রকলায় উদ্ভাসিত, যিনি কামদেবকে ভস্ম করেছেন, যাঁর মস্তকে গঙ্গা বিরাজমানা, যিনি সকলের মঙ্গল করেন, যাঁর কণ্ঠদেশ ও কর্ণ সর্প-বিভূষিত, যাঁর নয়নযুগল অগ্নি বর্ষণ করে, যিনি গজচর্মের বস্ত্র পরিধান করে আছেন ও যিনি ত্রিলোকের একমাত্র সারবস্তু—মোক্ষাভিলাষী হয়ে সেই মহান ঈশ্বরের চরণে অচঞ্চলভাবে চিত্ত সমর্পণ কর, অন্য কর্মের প্রয়োজন কী?*

মূর্তি গড়া শেষ হলো। গঙ্গাজলে পুজো করল গদাধর। তারপর তুলে নিল সেই মূর্তি—ভাসিয়ে দেবে গঙ্গায়।

এইবার হৃদয় চিৎকার করে উঠল,—মামা, ও মামা—দেখনা চেয়ে, কে এয়েছেন দেখনা।

গদাধরের চোখ পড়ল এতক্ষণে মথুরামোহনের ওপর। দীর্ঘদেহ, বিশাল বক্ষ, রাজোচিত গাম্ভীর্যে ভরা মুখ। কিন্তু দু'চোখের দৃষ্টি কেমন যেন আকুলতায় ভরা।

—কি গো সেজবাবু?—ভাবখানা এমন, পথভুলে হঠাৎ এখানে কেন?

* শিবাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্।

—তুমি গড়লে এমন ঠাকুর ? আমাকে একবার দেখতে দেবে ?

কৌতুকের হাসি ঝলকে উঠল গদাধরের চোখে। শিব-শিব—উচ্চারণ করল মুখে। শিবই মুক্তির দেবতা। মথুরের হাতে তুলে দিল গদাধর সেই শিবমূর্তি।

মুগ্ধ হয়ে গেলেন মথুরবাবু। কুমোরপাড়ার অনেক শিল্পীর হাতের কাজ সামনে বসে দেখেছেন তিনি। কত আয়োজন তার। কাঠামো-দড়ি-বাঁশ-মাপজোকের এলাহি ব্যাপার। কিন্তু এই মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত। মুখে ক্ষমাসুন্দর হাসি ঝরছে যেন।

হাসছে গদাধরও। মথুরবাবু বললেন, দেবে এ মূর্তি আমাকে ?

হৃদয় বললে,—ও মামা, শুনতে পাচ্ছো না, সেজবাবু কি বলছেন ? মথুরের দিকে ফিরে হৃদয় বলে,—মামা দেবে। অমন মূর্তি কত গড়ে রোজ—ভাসিয়ে দেয় জলে পুজো করে। মামা ভাঙ্গা মূর্তি জোড়া দিয়ে এমন করে দেবে—ধরতেই পারবে না কেউ—কোথাও ভেঙ্গেছে বলে! কি সুন্দর রঙও তৈরি করে!

বিস্মিত মথুর! আবার বলেন,—এ মূর্তি ভাসিও না জলে. আমাকে দাও।

ভাঙ্গছে বেড়া! আহ্লাদে আটখানা গদাধর,—রাজার জামাই তুমি, মাটির মূর্তি নিয়ে কি করবে গো ?

—রাখব নিজের কাছে। কোথায় গেল অহমিকা, আভিজাত্য ? এত কাতর অনুরোধ শুধু ছোট্ট একটা মাটির মূর্তির জন্যে ? এভাবেই হয়—মনটাও তো বিষয়ের পাথরে চাপা পড়ে এতদিন শুকনো ছিল, এবার পাথর সরিয়ে গদাধর তাতে জল সিঞ্চন করল।

মাটি নরম হবে। গদাধর আর এক মূর্তি গড়বে তখন। জমিদার মথুরামোহন নয়—মানুষ মথুরামোহনের মূর্তি। রাণীর জামাই—না রসদদার!

রাসমণিকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন মথুর।

ছোট ভট্‌চাজ গড়েছেন এমন মূর্তি!

রাণীমার চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা। আহা কি সুন্দর! এমন যার সৃষ্টি তাকে লোকে 'পাগল' বলে ?

সাধে কি বলে ? হৃদয়ও বুঝতে পারে না ছোট মামার এ পাগলামির অর্থ কী ? বড় মামার কাছে সেজবাবু বলেছেন, আপনার ভাইকে এবার

পুজোর কাজে সঙ্গে নিন, ভট্টাচার্য মশাই। ওর নিষ্ঠা আছে, এমন মূর্তি যে গড়ে সে মায়ের পুজোও করবে নিষ্ঠাভরে।

শুনে শিউরে উঠেছে গদাধর। পুজোর কাজ—মানে রাণীর কাছে চাকরি? মনিব-চাকরের সম্পর্ক। সে হবে না বাপু। আর সেই থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় গদাধর। মথুরামোহনের ধারে কাছেও ঘেঁষে না। মথুরবাবু ডাকলেও যায় না।

হৃদয় রাগ করে—তোমার কি হয়েছে বলত? বড় মামা আর কতদিক সামলাবে? বয়েস হচ্ছে, আর পারে নাকি? সেজবাবু ডাকলে যাও না কেন?

—ও বাবা! গদাধর বলে,—গেলেই আমায় চাকরি করতে বলবে। থাকতে বলবে এখানে।

—দোষ কি তাতে? এমন জায়গায় থাকা তো ভাগ্যের কথা।

—কিন্তু আমার যে কোথাও কোন বাঁধনের মধ্যে থাকতে মন চায়না রে হৃদে!

—বাঁধন কিসের? করবে তো মায়ের পুজো।

—মায়ের গায়ে কত গয়না। হারিয়ে গেলে তো ধরবে আমাকেই।

হৃদয় হাসে। বলে,—মামা, পাগলের মত কথা বলছ কেন? হারাবেই বা কেন, আর তোমায় দোষ দেবেই বা কে?

—দেবে না? তুই থাকবি তবে আমার সঙ্গে? তুই যদি পুজোর কাজে থাকিস তবে আমিও মন্দিরের কাজ করব। শিখে নেব সব।

—তাই হল। বেশকারী হলেন ঠাকুর। আর হৃদয় সাহায্য করতে লাগল বড় মামাকে।

দিন কয়েক পরেই ঘটে গেল সেই অঘটন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর সেটা ভাদ্র মাস। জন্মাষ্টমীর পরের দিন।

সেদিন নন্দোৎসব। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে অন্নভোগ দিয়ে, পুজো সেরে প্রথমে রাধারাণীকে শয়ন করালেন ক্ষেত্রনাথ। তারপর নিয়ে চললেন শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাতে। কিন্তু কেমন করে যেন নিয়ে যেতে গিয়ে বিগ্রহ সমেত পড়ে গেলেন তিনি। ভেঙ্গে গেল দেব-বিগ্রহের একটি পা!

হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন ক্ষেত্রনাথ। নিজের দেহের যন্ত্রণায় নয়,—অমঙ্গলের আশঙ্কায়। ছুটে এল সবাই। সকলের মুখ শুকিয়ে গেল।

খবর এল জানবাজারে। মথুরবাবু শুনলেন, রাসমণিও শুনলেন।

কী হবে এবার তবে? ক্ষেত্রনাথের চাকরি গেল। তা যাক—ভাঙ্গা বিগ্রহের কী হবে? এ বিগ্রহ পুজো হবে না।

রাসমণি ডাকলেন মথুরামোহনকে। বললেন,—মথুর গুরুদেবের কাছে যাও, ডাক পণ্ডিতদের, দেখ তাঁরা কি বলেন।

রাণীমার মন চঞ্চল হয়েছে। এরকম হলো কেন? এমন তো হবার কথা নয়! কিসের ইংগিত এসব? শ্যামসুন্দরের এ কি লীলাখেলা?

বিধান এল। সকলের একই মত, এ মূর্তি পুজো করা চলবে না। ভগ্ন-বিগ্রহে পুজো অশাস্ত্রীয় আচরণ। সব শুনে নতুন ঠাকুর গড়তে দিয়ে এসেছেন মথুরবাবু। রাণীমাকে সেই কথাই শোনালেন তিনি।

কিন্তু কই, মন তো স্থির হলো না? এই তিনটে মাস যখনই রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে গেছেন, রাধাকান্তের মন্দিরে শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছে—আহা, কত করুণা, কত ক্ষমা ঐ দু'-চোখে। রঘুনাথ আর শ্যামসুন্দর এক হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছেন যেন। ঐ হাসিমুখে কত না রহস্য লুকোন - ভেবেছেন রাণী! আজ বার বার সেই মুখটিই ভেসে উঠছে যে চোখের সামনে। সেই—

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মুরুছা পায়॥'*

এখন কী করবেন রাণী? বুক যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে তাঁর।

মথুরবাবু যেন বুঝলেন তাঁর মনের কথা।

—ভট্চাজ মশাই কি বললেন মথুর?

মথুর মাথা নাড়লেন—না, এ প্রসঙ্গে রামকুমার কোন মতামত দেন নি।

—আর ছোট ভট্চাজ? আমাদের গদাধর? রাণীর ব্যাকুলতা নজর এড়াল না মথুরের।

থমকে গেলেন মথুর। ছোট ভট্চাজকে জিজ্ঞেস করেনি কেউ কিছু। কে করবে? সে পাগল মানুষ—আপন ভাবেই বিভোর। কিন্তু কেন জানিনা মথুরের মনে হলো তাকেই সবার আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

হৃদয় বুঝতেই পারে না ছোট মামাকে নিয়ে সে কী করবে। এই জ্ঞান-

* গোবিন্দ দাস

আবার এই অজ্ঞান। কেমন যেন একটা ঘোর ঘোর ভাব। সময়ে স্নান নেই, খাওয়া নেই—লোক নিন্দায় ভ্রূক্ষেপ নেই। মন্দিরে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কত কী বলে যায় আপন মনে। এই হাসে, এই কাঁদে। হৃদয়ের হয়েছে জ্বালা!

এখনও তেমনি। গদাধর আছে ভাবের ঘোরে। মথুরবাবু যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সে খেয়াল নেই তার।

মথুরবাবু ডাকলেন—ছোট ঠাকুর!

যেন অনেক দূর থেকে ডাক শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল গদাধর।

সেই চোখের দৃষ্টি মথুরবাবুর অন্তরকে যেন কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। অজানিতেই চোখে জল এল তাঁর।

—কী উপায় হবে ছোট ঠাকুর,—বিগ্রহের পা যে ভেঙ্গে গেছে। মা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন তোমার কাছে।

হাসল গদাধর—কী আবার হবে? খেলতে গিয়ে অমন কত পা ভাঙ্গে ছোট ছেলের।

মথুর স্তম্ভিত।—কিন্তু পণ্ডিতরা বিধান দিয়েছে নতুন মূর্তি এনে বসাতে হবে মন্দিরে। তার কী?

—ভালবাসায় আবার বিধি-বিধেন কী গো? হাসছে গদাধর।—রাখালরা এঁটো ফল খাওয়াত কৃষ্ণকে। কেন জান—না ফলটা টক না মিষ্টি—নিজে খেয়ে দেখে নিত তারা। টক ফল তাদের ভালবাসার জনকে দেবে কি করে? আবার সুদামা—কেমন একমুঠো চিঁড়ে-খুদ বেঁধে এনেছিল কোঁচড়ে? সেও তার ভালবাসার জনকে, প্রিয়জনকে দেবার জন্য। এর দাম রাজার ঐশ্বর্যের চেয়ে অনেক বেশী! আসল হল মনের টান। ভালবাসার টান।

মথুর তবু কিন্তু কিন্তু করেন। গদাধর তখন বললে,—এই যে রাণীর জামাই তুমি সেজবাবু, যদি কিছু হয় তোমার, ধর পা-ই যদি ভাঙ্গে। তখন রাণী কি করবে তোমায়—বদ্যি-কবরেজ ডাকবে না জামাইকে বাতিল করে দেবে?

হৃদয়ের বুক ধুকপুক করে। মামা বলে কী? সেজোবাবু মনিব—মনিবের সঙ্গে এমনধারা কথা?

কিন্তু উত্তর পেয়ে গেছেন মথুরবাবু। বুকের আবেগের বাঁধ ভেঙ্গে জল উপছে পড়ছে চোখে—বিশ্বাসই বড় কথা। বড় কথা ঈশ্বরকে ভালবাসা।

কে পা সারাবে বিগ্রহের? কেন গদাধরই তো রয়েছে সেজন্য। অমন শিবমূর্তি যে গড়তে পারে—সে তো পারেই মূর্তির অঙ্গ জুড়ে দিতে। চোখের

সামনের জিনিষ দেখতে পান নি মথুরবাবু—হাতড়ে ফিরেছেন এদিক-সেদিক।

তাই হলো। মূর্তি জুড়ে দেবেন গদাধর।—আর এবার থেকে গোবিন্দের পুজোর ভার তোমাকেই নিতে হবে ঠাকুর—না বললে শুনবো না।

হৃদয়ের মুখে হাসি ফুটল এতক্ষণে।

আর সব কথা শুনে—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রাসমণির অন্তরের পাষাণের মত ভারটা নেমে গেল। মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি। আর মনে মনে প্রার্থনা করলেন, আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর। শুধু বাইরে থেকেই দেখেছি তোমায়—অন্তরে তাই তোমার আসন পাতা হয়নি এখনো। এবার এসো নবরূপে, সব বন্ধন থেকে মুক্তি দাও আমায়।



রামকুমার চলে গেছেন এ সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে। বন্ধন আর কী? কর্তব্যের বোঝা তুলে নিয়েছিলেন হাতে—কর্তব্য ফুরিয়েছে। গদাধরকে নিয়ে চিন্তা গেছে তাঁর। হৃদয়কে দেখে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তেমনি বৈঠকখানা বাজারের কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে গদাধরকে দীক্ষা দিতে পেরেও মনের অশান্তি গেছে রামকুমারের। দীক্ষিত না হলে যে 'মা'য়ের পুজো হয় না। হাতে ধরে শিখিয়েছেন—সব কিছু, খুঁটিনাটি। গদাধরকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা গেছেন রামকুমার। মহানিদ্রা! কাজ তাঁরও ফুরিয়েছে। গদাধরকে পাকাপাকি ভাবে দক্ষিণেশ্বরে বসানর কাজ। একজনের শুরু। আরেকজনের সারা। দুনিয়ার এই তো নিয়ম।

শ্যামনগর-মুলাজোড়ে রামকুমার গিয়েছিলেন একটা কাজে। আর ফিরে এলেন না। দাদা ছিলেন মাথার ওপর—বাবার অভাব ভুলেছিল গদাধর। এবার দাদা যেতে গদাধর যেন একেবারে স্বাধীন। অনিত্য সংসার—অসার মায়া।

তবে সার কী? বৈরাগ্য। আর কী? শুধু ব্যাকুল হয়ে 'মা'কে

ডাকা। শুধু সাধনা। নিজেকে পাশমুক্ত করার চেষ্টা!

হৃদয়কে বলেন ঠাকুর—তুই কী জানিস? এই রকম পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। হৃদয় বলে,—তা বলে ঐ রকম অন্ধকার রাতে, ঐ জঙ্গলের মধ্যে নগ্ন হয়ে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জন্ম থেকে মানুষের মনে ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, মান ভয়, জাত আর অভিমান এই অষ্ট পাশ। বেঁধে ফেলেছে পাকে পাকে। এই তো পৈতেগাছা দেখ—এটা একটা অভিমান। কী—না আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়। মাকে যখন ডাকি, তখন ঐ সব পাশগুলো খুলে ফেলি। নইলে মার ধ্যান করব কি করে?

অবাক হৃদয়রাম। এমন কথা সে কখনও শোনেনি!

* * *

মন্দিরে মায়ের সামনে কাঁদছেন ঠাকুর মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস. আমাকে কেন দিবি না! আমি ধন, জন, ভোগসুখ চাই না—আমায় তুই দেখা দে।

—ও মামা, পুজোর বেলা বয়ে যায়, পুজো করবে না?

—না, আমি এখন গান শোনাব মাকে। গান শুরু করেন গদাধর।

পুজোর সময় সে ভারি বিপদ।—মায়ের আরতি করলে না মামা?

—চুপ্. মাকে খেতে দিয়েছি, যতক্ষণ না খাবে কথাটি ক'বি নে। কেটে গেল বহুক্ষণ।

—মামা, বেলা যায় এখনও সাজান হল না তোমার?

উত্তর নেই। মন্দিরে উঁকি মেরে দেখে হৃদয়, মামা বসে আছে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে, দু'চোখ বেয়ে ঝরছে জলের ধারা। দেহ নিস্পন্দ। দু'ঘণ্টা পরে এসেও দেখে একই অবস্থা।

* * *

গদাধর ছুটে বেড়াচ্ছেন। সারা গায়ে জ্বালা ধরেছে যেন।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে সকলে। এ কেমন পুজো, এমন কাণ্ড চললে আসবে কেউ মন্দিরে? মায়ের পুজো কি একে বলে!

—হৃদে, আমি মাকে দেখেছি! মা আমার মাটি-পাথরে গড়া নয় রে! মা আমায় দেখে হাসে, কথা কয়! উঃ কী আলো, কী জ্যোতি! সব হারিয়ে গেল। সমুদ্দুরের বড় বড় ঢেউ-এর মত আমায় যেন ডুবিয়ে দিলে, আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম—তারপর আর কিছু মনে নেই। এ আমার কী হল মা? আমার কী হল আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

*　　　　*　　　　*

হৃদয় সামলাতে পারে না। এই তো সেদিন মন্দিরে ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে চিৎকার শুনে ছুটে গেল হৃদয়। মামা বলছেন, - রোস্‌ রোস্‌—আগে মন্ত্রটা বলি, তারপর খাস্‌। বলেই পুজো সম্পূর্ণ না করেই আগেই নৈবেদ্য দিয়ে বসলেন। কী কাণ্ড! রাণীমা আর সেজবাবু জানতে পারলে কী হবে? ভয়ে বুক কাঁপে হৃদয়রামের।

জানলেন মথুরামোহন। জানানর তো লোকের অভাব নেই। উপযাচক হয়ে জানিয়ে এল তারা। অনাচার কাণ্ড-কারখানা চলছে দক্ষিণেশ্বরে। মায়ের পুজো না ছেলেখেলা!

নিজের পায়ে ফুল ছুঁইয়ে মাকে নিবেদন করছেন গদাধর।

মাতালের মত টলে টলে মূর্তির হাত ধরে নেচে নেচে গাইছেন, রঙ্গ পরিহাস করছেন।

আমি না খেলে তুই খাবি না—বলে নিজে ভোগের থালা থেকে খেয়ে বাকিটা মার মুখে গুঁজে দিয়ে বলছেন, — এবার তুই খা।

এমনকি একটা বেড়াল মন্দিরে ঢুকে পড়ে ডাকছিল দেখে গদাধর তাকে খাবি মা, খাবি মা করে মায়ের ভোগ খাইয়ে দিয়েছেন।

রাতে মাকে শয়ান দিয়ে,—আমায় এখানে শুতে বলছিস?—বলে মার রুপোর খাটে উঠে শুয়ে থেকেছেন অনেকদিন।

গভীর রাতে আমলকী বনে ধ্যান করতে গিয়ে—ছিঃ, ছিঃ,—

এসব কথা চাপা থাকে কী করে? হৃদয় যতই লুকোতে চাক, সবাই জেনেছে এবং দেখেছে সব। যুক্তি করেছে তারা, অনুগত কর্মচারী হিসেবে রাণীমা আর মথুরবাবুকে সব কথা তাদের জানান দরকার। তাই জানিয়েছে তারা। জানিয়ে ফিরে গেছে খোস মেজাজে।

এবার কি হয়? ছোট ভট্‌চাজ এবার গেল বলে। বড় তো আগেই গেছে—এবার এই আপদটা বিদেয় হলে বাঁচা যায়। এত অনাচার কি দেবতা সইবেন। ঘাড় ধরে সেজবাবু এবার বার করে দেবেন মন্দির থেকে।

রাণীমাও শুনেছেন। শুনে হৃদয় তাঁর ব্যাকুল হয়েছে। সত্যি কী পাগল? কেমন পাগল সে? প্রশ্নের জট পাকায় মন থেকে মনে।

রাণীমার ভাব বুঝে মথুরামোহন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কাউকে কিছু না জানিয়ে। চুপি চুপি।

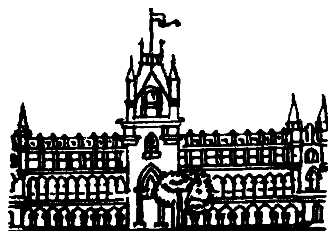
দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কী হয়। কী দেখলেন—না

অকপট ভক্তি, বিশ্বাস আর ভালবাসা! বাইরে কে আছে, কী ঘটছে কোন দিকে দৃষ্টি নেই গদাধরের। বাহ্যজ্ঞানশূন্য সেই তন্ময়তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন মথুরামোহন।

মায়ের মূর্তি যেন হাসছেন। মা আনন্দে হাসছেন তাঁর ছেলের ক্ষ্যাপামি দেখে। নীরবে ফিরে এলেন জানবাজারে।

রাসমণি উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। মথুরামোহন বললেন,—মা এতদিন পর আপনার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক হলো, এতদিন পর জগজ্জননী সত্যিই এসেছেন মন্দিরে, ছোট ভট্‌চাজের পুজো নিচ্ছেন। এতদিনে মায়ের পুজো হচ্ছে ঠিকমত।

রাসমণির বুকের ভার নামল। নিশ্চিন্ত আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। ভাবের পাগলকে বুঝতে তবে তাঁর ভুল হয়নি!



মন কি একসঙ্গে ঈশ্বরে আর বিষয়ে থাকতে পারে?

পারে। কেমন করে পারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তা ভক্তদের। অভ্যাসই হলো আসল কথা। বলতেন তিনি—সেই যেমন চিড়ে কোটার সময় মেয়েরা ডান হাত দিয়ে চিড়ে উল্টিয়ে দেয় আবার বাঁ হাতে ভাজনাখোলার চাল উল্টোয়। যদি দেখে উনুন নিভে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি তুষ ঠেলে দেয় উনুনে। সে সময় ছেলে কাঁদলে তাকেও বুকের দুধ দেয়। কিন্তু মনের বার আনাই থাকে ডান হাতে! সেই রকম সব অভ্যাস করতে হয়। যখন দেবতার মন্দিরে গিয়ে দেব-দর্শন করবে, তখন তাঁকেই দেখবে। দেখবে না কি দিয়ে ভোগ দেওয়া হল দেবতাকে—পরমান্ন না চিনি-বাতাসা। মনকে গুটিয়ে ছোট করে আনতে হবে একটা বিন্দুতে। সেই একে।

তা এসব কথা তখন তো গদাধর বলতেন না। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই তো হেসেই অস্থির। মন্দিরে মায়ের পুজোর নামে ছেলেখেলা। খাজাঞ্চি, গোমস্তার দল মুখ বাঁকায়। সেজবাবু, রাণীমা কেউ কিছু না বলায় আরও রাগ তাদের।

মথুরবাবুর খুব পছন্দ ছোট ঠাকুরকে। ছোট ঠাকুরের সব ভাল তাঁর কাছে তাঁর গান ভাল, মূর্তি গড়া ভাল, ভাবের আবেগে যা করেন গদাধর, সবই ভাল। আড়ালে মুখ বাঁকায় ওরা। সেজবাবুর বাড়াবাড়ি।

কিছুদিন ধরে রাণীমার মন ভাল নেই।

ভাল লাগে না আর সংসারের বন্ধন। কেবলই মনে হয়—অনেক তো হলো। আর কেন?

এবার তাঁর ছুটি নেওয়ার পালা।

কিন্তু সংসার তাঁকে ছুটি দেয় না। বিষয় অতি বিষম বস্তু! নানান ফাঁদে আটকে ফেলে তাঁকে।

ইদানিং সুযোগ পেলেই দক্ষিণেশ্বরে যেতে মন চাইত। সেদিনও রাণীমা তাই ছুটে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দু'দণ্ড নিরিবিলিতে কাটাবেন। গঙ্গাস্নান হবে, মাতৃদর্শন করে, গদাধরের গান শুনে কাটাবেন কিছুক্ষণ।

মন্দিরে গদাধর সাজাচ্ছেন মাকে। রামপ্রসাদী গান গাইছেন গুণ গুণ করে—

'···মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো—

আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে—'

রাসমণি বসলেন এসে। অবাক চোখ তাঁর গদাধরের দিকে। ইনি কে। কেন এমন হয়—এঁর দিকে তাকালে তাঁর রঘুবীরের কথা মনে পড়ে কেন?

গান শোনাও আমায়—গান শুনতেই এসেছি। গদাধরকে বললেন রাসমণি।

—গান শুনবে? গদাধর গান ধরেন। দ্বিধা নেই। সঙ্কোচ নেই। উদাত্ত গলায় গান শোনান তিনি রাণীকে।

চোখ বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু মন? স্থির হয়েও হয় না। মন তো পাখীর মত। কেবলই ডানা ঝাপটাচ্ছে। রাণীর মনও তেমনি।

সহসা সবেগে একটি চড় এসে পড়ে রাণীর গালে।—এখানেও ঐ চিন্তা!

রাণী চমকে ওঠেন। হাঁ—হাঁ করে ওঠে সকলে। রাণীমা নিরস্ত করেন সবাইকে। ধীর পদে নেমে আসেন মন্দির থেকে। গদাধর নির্বিকার। পাগল মায়ের পাগল ছেলে!

কথাটা কানে গেল মথুরামোহনের। অবাক তিনিও। কর্মচারীরা

একযোগে বলল,—এবার জব্দ হবে দেখবে। রাণীমার গায়ে হাত তোলা! পাষণ্ড কোথাকার!

রাসমণি ডাকলেন মথুরকে।

রঘুনাথের পূজার ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন রাসমণি। মথুরকে দেখে বললেন, ছোট ঠাকুরকে তোমরা কেউ কিছু বলো না। দেখ, কেউ যেন তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে।

—কিন্তু—কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন মথুরামোহন।

—দোষ আমারই বাবা। দেহটাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, মনটাকে তো নয়। মন আমার পড়েছিল বিষয় চিন্তায়। মার পায়ে সব কিছু নিবেদন করতে তো পারিনি। তাই ছোট ঠাকুর আমার চেতনা ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঠিক কাজই করেছেন তিনি।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মথুরামোহন। মনের ভার নেমে গেল তাঁর।

কিন্তু অন্যায় স্বীকার করে নিতে তো পারে না সবাই। জোর গলায় বলতে পারে না—হ্যাঁ আমিই দোষী। আমাকে শাস্তি দাও। উল্টোটাই ঘটে বরং।

যেমন রামচন্দ্র-পদ্মমণি।

মন্দিরে বসেও রাণীমার মন পড়েছিল তাঁর বড়মেয়ে আর জামাই-এর কাছে।

একদিন বড় জামাই রামচন্দ্রকে ডেকে রাসমণি বললেন, তোমার বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ আছে। জমিদারী দেখাশুনা করতে গিয়ে তোমার হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে অনেক গরমিল দেখা যাচ্ছে। আমাকে সব টাকার হিসেব তুমি বুঝিয়ে দাও এখনি।

রামচন্দ্রের মানে লাগল। পদ্মমণিকে গিয়ে সব কথা বললেন তিনি।

রামচন্দ্রের উক্তি হলো—খাতাপত্র সব মা-র কাছেই আছে। আমার আর নতুন করে হিসেব দেওয়ার কিছু নেই। আমি কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে পারব না—জানিয়ে দাও একথা তোমার মাকে।

পদ্মমণি সে কথাই গিয়ে বললেন রাসমণিকে।

রাসমণি আবারও বোঝালেন। সে সময় ব্যবসাপত্র-সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব রামচন্দ্রের হাতে দিয়ে তাঁকে ম্যানেজার পদে বহাল করেছিলেন রাণী। কিন্তু হিসেবপত্র বোঝাতে রাজী হলেন না রামচন্দ্র।

এবার হনকে ম্যানেজার করলেন রাসমণি। সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে।

কিন্তু হিসেবের গরমিলের কী হবে? তাঁর টাকা নয় প্রজাদের টাকা। খাজনার টাকা জমিদারী দেখাশোনায় ব্যয় হয়। এ টাকার তাঁর কী অধিকার?

রাসমণি মামলা করলেন সুপ্রিম কোর্টে। অন্যান্য অভিযোগ ছাড়াও হিসেবের খাতায় তখন ঘাটতি—সাতষট্টি হাজার সাতশো সাতানব্বই টাকা চোদ্দ আনা ছ' পাই।

এ মামলা আদালতে উঠেছিল ১৮৫৫ সালের ১৭ জানুয়ারী। রাসমণির আরও অভিযোগ ছিল—রামচন্দ্র হিসেবে কারচুপি করে অনেক টাকা নিজের নামে রেখে দিয়েছেন। এ ছাড়া মধুসূদন সান্যালের কাছে পাওয়া নদীয়া জেলা আদালতে জমা পড়া তিন হাজার দুশো টাকা তুলে নেওয়ার পর আর রাসমণিকে ফেরত দেন নি। হিসেবের খাতায় আরও দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে রামচন্দ্র রাসমণির কাছ থেকে চোদ্দ হাজার টাকা নিয়ে বেলেঘাটায় একটি কমিশন এজেন্সীর ব্যবসা খুলেছিলেন। সেই ব্যবসায়ে রামচন্দ্রের প্রচুর লাভ হয় ও সব টাকা তিনি নিজে ভোগ করেন।

আর একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল, রামচন্দ্র রাসমণির তহবিল থেকে তাঁর এক আত্মীয় শ্যামাচরণ দাসকে বিনা জামানতে ছ' হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। সে টাকা আর আদায় হয়নি।

এ ছাড়া আরও ছিল। রাজচন্দ্র যখন বেঁচে ছিলেন নাবালক নাতিদের নামে কোম্পানীর কাগজ কেনেন। গণেশচন্দ্র দাস, যদুনাথ চৌধুরী আর ভূপালচন্দ্র বিশ্বাসের নামে এগুলি কেনা হয়েছিল। তিন মেয়ে পদ্মমণি, কুমারী আর করুণাময়ীর ছেলে এরা। সব কাগজই রামচন্দ্রের কাছে গচ্ছিত ছিল। ছেলেরা বড় হওয়ার পর রামচন্দ্র সাদা কাগজে তাদের সবার সই নেন। তিনি বলেছিলেন, পাওনা সুদ আদায়ের জন্য সই দরকার। কিন্তু পরে দেখা গেল সেগুলো ভাঙিয়ে আসল ও সুদের সব টাকা রামচন্দ্র আত্মসাৎ করেছেন।

জামাইকে বিশ্বাস করে রাসমণি কতকগুলি গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিও রাখতে দেন। সেগুলির মোট দাম প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। সেই টাকা দিয়ে রামচন্দ্র পদ্মমণির নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঋণপত্র কিনেছিলেন।

রাসমণি দেখেছিলেন লগ্নী করা টাকার সুদ আদায় করার জন্য রাণীমার সই লাগবে বলে রামচন্দ্র অনেক সাদা কাগজে তাঁর সই নিয়ে গেছেন।

রাসমণির অবিশ্বাস করতে মন চায়নি। সই করে দিয়েছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল সেই সই মূলধন করে রামচন্দ্র প্রায় লক্ষাধিক তুলে নিয়েছেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরির সময় দেখাশোনার যতটুকু দায়িত্ব রামচন্দ্রের ওপর ছিল—দেখা গেছে ততটুকু করতেই রাসমণির বহু টাকার ক্ষতি তিনি করেছেন।

রাসমণি আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন—এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। যদি রাসমণির পাওনা কিছু থাকে তা তাঁকে ফেরত দেওয়া হোক। সম্পত্তি কেনা হলে তাও রাসমণির, কেননা রামচন্দ্র উপার্জনশীল নন। তিনি কোথাও চাকরি বা ব্যবসা করেন না। বরং মেয়ে এবং জামাই উভয়েই রাসমণির ওপর নির্ভরশীল।

রাসমণির পক্ষে এই মামলায় অ্যাটর্নি ছিলেন ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের উইলিয়ম টমাস ডেনম্যান।

রাসমণির নোটিশ পেয়ে রামচন্দ্র উত্তর দিলেন। তিনি জানালেন—কস্মিন কালেও তিনি রাসমণির জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন না। এ বিষয়ে লিখিত নিয়োগ-পত্র নেই। থাকলে রাণীমা তা দেখান।

কোন বড় ব্যাপারেই তাঁর ওপর নির্ভর করেন না তাঁর শাশুড়ি। সে সব কাজের দায়িত্ব মথুরবাবুর ওপর। রাণীর সেজ জামাই মথুরামোহন। তাঁর ওপর ভার ছিল শুধু গৃহস্থালীর কাজকর্ম দেখাশোনা করা, আর কাছারি ও কালেকটরীতে সময় বিশেষে রাসমণির বাংলা ভাষায় সই করা দলিল বা আবেদনপত্র প্রত্যায়িত করা। এ ছাড়া রাসমণির জমিদারীতে দেওয়ান, মোহরার, খাজাঞ্চী আর সরকারের তো অভাব নেই—যে রামচন্দ্রকে এসব কাজের ভার দেওয়া হবে। টাকা পয়সার কোন লেনদেনই তাঁর হাত দিয়ে হয়নি। বেলেঘাটায় কমিশন এজেন্সির ব্যবসা তিনি রাসমণির হয়ে যেমন পরিচালনা করেছিলেন, হিসেবও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাথে সাথে।

সেই হিসেব রাখার ভার ছিল দেবীপ্রসাদ ঘোষ আর রামমোহন পাল নামে দু'জন লোকের ওপর। তাই রামচন্দ্র তহবিল তছরূপ করেন নি।

আদালতে বিবৃতি দাখিল হল। রাসমণি সব জানলেন, সব শুনলেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘুরে এসে মথুরামোহনকে ডেকে মামলা খারিজ করার কথা বললেন রাসমণি। ১৮৫৯ সালের ১৩ জানুয়ারী রাসমণি সুপ্রিম কোর্টে মামলা তুলে নেবার আবেদন করলেন। একটি সোলেনামায় দু'পক্ষ সই করল।

খারিজ হয়ে গেল মামলা।

কিন্তু চার বছর ধরে এত বাদানুবাদ, এত প্রস্তুতি হঠাৎ কেন মিটিয়ে ফেলতে চাইলেন রাণীমা? জামাই রামচন্দ্র বা মেয়ে পদ্মমণির মুখ চেয়ে?

না কি, চেতনার চৈতন্য তাঁকে সজাগ করে দিল! আর কেন? এবার গুটিয়ে ফেল মনটাকে। সময় হয়ে গেছে প্রায়। আর তার জন্য ঠাকুরের একটি চপেটাঘাতই যথেষ্ট!

রাসমণি জামাইকে বললেন,—ছোট ঠাকুর যখন চেয়েছেন, তুমি সব ব্যবস্থা এখনি করে দাও মথুর।

মথুরামোহন বললেন, আমি ব্যবস্থা তখনি নিতাম। কিন্তু—

হাসলেন রাণীমা,—তুমি এখনও সেই আগেকার কথা ভাবছ! ভাবছ, যে রামরতন দত্ত রায়ের কাছে এত অপমানিত হয়েছি—সেখানে কিছু করার আগে মাকে জিজ্ঞেস করে নেবে—তাই না?

—কিন্তু বাবা, মান-অপমান সবই তো মিথ্যে অহমিকা মাত্র। এই তো নিজের মান নিয়ে এত জাঁক ছিল দত্ত রায় মশাই-এর। আজ তো সব কিছু ফেলে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে বাবা। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা—.

রাসমণির দৃষ্টিতে বিষণ্ণ সন্ধ্যার ছায়া।

উদ্বিগ্ন মথুরামোহন প্রশ্ন করলেন,—কি কথা মা?

রাসমণি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন. তারপর বললেন,—বরানগরের কুঠিঘাটায় দশমহাবিদ্যার মূর্তি কত ঘটা করেই না প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রায় মশাই। তাঁর মৃত্যুর পর আজ শুনছি—এই অবস্থা। তাই যদি হয়—তবে আমার দক্ষিণেশ্বরের কি হবে মথুর? আমি চলে গেলে—

একটা কান্নার দলা যেন রাসমণির কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিল! আর কথা বলতে পারলেন না তিনি।

মথুরামোহন স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন,—মা, আমি কথা দিচ্ছি, আমি বা আপনার মেয়ে জীবিত থাকতে এ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণে কোন ত্রুটি হবে না। আমরা মায়ের সেবা করব, আমাদের বংশধররাও করবে। আর ছোট ঠাকুরকে দিয়ে কিছু কাজ নিশ্চয়ই করাবেন মা জগদীশ্বরী। লোকে যাই বলুক তাঁর ভাব দেখে আমার অন্য কথা মনে হয়।

—গদাধর সাধারণ মানুষ নয়, বাবা মথুর। বহুদিন দেখেছি, লোকের জন্য তার প্রাণে কত দয়া, কত মায়া। আর ওই রকম ভক্তি—অমনটি তুমি কোথাও দেখেছ কি? মায়ের কাছে যখন গান গায়—যখন কান্নায় ভেঙে

পড়ে, তখন বোঝা যায় কোনটা আসল আর কোনটা নকল। দু'পাতা শাস্ত্র পড়লে আর মন্তর আওড়ালেই তো এমন ভক্তি আসে না মথুর।

স্বীকার করলেন মথুর সে কথা। ঘটনাটা ছিল এইরকম : হৃদয়কে নিয়ে বরানগরের কুঠিঘাটায় নড়াইলের জমিদার রামরতনের প্রতিষ্ঠা করা মন্দিরে গিয়েছিলেন গদাধর। সেখানকার দীন-হীন অবস্থা দেখে কষ্ট হয়েছিল মনে। মথুরবাবুকে জানিয়েছিলেন সেকথা। নিজের চোখে গদাধরের সঙ্গে সেখানে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখেছেন মথুরবাবুও। ভোগ হয় না—নিয়মিত কোন কিছুরই ব্যবস্থা নেই। তাই মায়ের দরবারে এই আর্জি।

রাসমণির সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে এসে মথুরামোহন দশমহাবিদ্যা মন্দিরের জন্য প্রতি মাসে দু'মণ করে চাল আর দুটি করে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।



শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চয় প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি বঙ্গ সমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল..."*

১৮৫৯ সাল। ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল খুলেছেন বিদ্যাসাগর (এটিই পরে হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুল, আরও পরে কলেজ এবং বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ)। বই লেখার কাজও থেমে থাকেনি। আপোসহীন সংগ্রামী মনোভাবের জন্য সকলের সমীহ তিনি আদায় করে নিয়েছেন।

এদিকে ১৮৫৯-এই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র আর সত্যেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে সিংহলে গেছেন। সেখান থেকে ফিরেই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ১৮৬০-এ প্রকাশ করেছেন 'Young Bengal this is for you' নামে পত্রিকা। এছাড়া স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন তিনি। নাম দিলেন "Indian Mirror"।

* 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'।

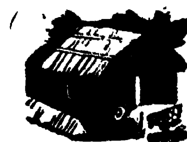
১৮৬২ সালে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি পেয়েছিলেন কেশবচন্দ্র, ১৮৬১ তারই প্রস্তুতি লগ্ন।

এদিকে ১৮৬০ সালের শেষভাগে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হল ঢাকা থেকে। ইংরাজীতে অনুবাদ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বইটি ছাপালেন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ তাঁর নিজের নামে। খেপে গেল সাহেবরা। মামলা উঠল আদালতে। লঙ্ সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা আর এক মাসের কারাদণ্ড হল। জরিমানার টাকা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। শিক্ষিত সমাজ প্রশংসা করলেন। এও সেই ১৮৬১। রাধাকান্ত দেবও অভিনন্দন জানালেন লঙ্ সাহেবকে।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ'। পত্রিকার ইতিহাসে এ যাবৎ কালের মধ্যে এমন কাগজ কেউ দেখেনি। 'সংবাদ-পত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গ সাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল।'—লিখেছেন শিবনাথ।

ওদিকে ১৮৫৭ কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। ১৮৫৮-তে বি. এ. পরীক্ষা চালু হল প্রথম। প্রথম তেরজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দু'জন বঙ্কিমচন্দ্র আর যদুনাথ বসু পাশ করেছেন দ্বিতীয় বিভাগে। সদ্য যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটছে তখন। সমাজের বুকে জোয়ার এসেছে, পালে লেগেছে নতুন হাওয়া।

অন্য দিকে হিন্দুদের ধর্মীয় চেতনার বিকাশ লগ্নও উপস্থিত। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির গৃহ সেই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। এমন একজনের আবির্ভাব হয়েছে সেখানে যিনি অন্ধকারের বুক চিরে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোর রেখা। এখন অপেক্ষা সেই প্রসন্ন প্রত্যূষের। ভগীরথ এনেছিলেন গঙ্গাকে—কলুষনাশিনী সেই ভাগিরথী। রাসমণি এনেছেন গদাধরকে। এবার সব মালিন্য ঘুচিয়ে দেবেন রামকৃষ্ণ! বাঙালীর এটাই চরম প্রাপ্তি!



১২৬০ সন। ৮ই পৌষ। কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি।

শীতের রাত হলেও বাঁকুড়ার জয়রামবাটী গ্রামের একটি বাড়িতে তখন খুশির হাট বসেছে। মেয়ে হয়েছে শ্যামাসুন্দরীর। মায়ের পাশে শুয়ে

খেলা করছে যেন একটুকরো আলো! দেখে আনন্দ আর ধরে না রামচন্দ্রের।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেয়ের নাম রাখলেন সারদা!

এর আগেই শ্যামাসুন্দরী বলেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বাপের বাড়ি শিওড়ে উত্তরপাড়ায় গত বছর ঘটেছিল সেই অদ্ভুত ঘটনা। বাড়ির পাশে এল্লাপুকুর। হাত মুখ ধুয়ে ফিরছিলেন একা। পথের ধারে বেলগাছে দেখেছিলেন এক পাঁচ-ছ বছরের পরমা সুন্দরী মেয়ে। গাছের ডালে বসে আছে!

পাশেই কুমোরদের গোয়াল ঘর। শ্যামাসুন্দরীর মনে হয়েছিল তিনি আসতেই যেন একটা নূপুরের দ্রুত আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। আর মেয়েটি মৃদু হেসে নেমে এল গাছ থেকে। জড়িয়ে ধরল শ্যামাসুন্দরীকে। যেন তাঁর দেহেই মিলিয়ে গেল। অপূর্ব এক আবেশে জ্ঞান হারালেন শ্যামাসুন্দরী।

তারপরই সারদার জন্ম।

আবার বাপের বাড়ি এসেছেন শ্যামাসুন্দরী। দু'বছরের মেয়ে কোলে। কথকথার আসর বসেছে সেখানে।

সারদা মার কোলে বসে গান শুনছে মন দিয়ে। গ্রামের মেয়ে-বৌরা ভিড় করেছে সেখানে। আত্মীয় পরিজন সবাই রয়েছেন।

সারদার ভাব দেখে হাসছে সবাই। একজন আত্মীয়া রঙ্গ করে বললেন,—হ্যাঁরে মেয়ে, বিয়ে করবি?

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল শিশু সারদা।

হাসির রোল উঠল। এবার সেই আত্মীয়া হেসে জিজ্ঞেস করলেন,—করবি-তো। কিন্তু কাকে বিয়ে করবি তুই?

গম্ভীর মুখ তুলে তাকাল সারদা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল একজনকে!

সবার নজর ঘুরল সেদিকে! তন্ময় হয়ে বসে গান শুনছে এক কিশোর। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের ছেলে সে।

নাম তার গদাধর।

এসব তো সেই কলকাতায় আসার ঠিক আগের ঘটনা। তারপর জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

এখন তাঁর সত্যি দিব্যোন্মাদ অবস্থা। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে মুখ ঘষছেন গদাধর আর ডাকছেন মাকে।—দেখা দে মা! দেখা দে মা!

দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাসও ভারী হয়ে উঠছে সে কান্নায়। মথুরবাবুও দেখলেন সে অবস্থা। এমন মানুষ কি নিয়ম মেনে আনুষ্ঠানিক ভাবে পুজো করতে পারে?

ঠাকুরের দেহ ঠাণ্ডা হবে তাই নিত্য মিছরির সরবতের বন্দোবস্ত করলেন মথুরামোহন। এও বাড়াবাড়ি ঠেকল কর্মচারীদের চোখে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না কেউ কিছু।

রাসমণি ব্যস্ত হলেন। তবে কোব্‌রেজ ডেকে এবার একবার দেখাও মথুর।

মা কি থাকতে পারেন ছেলের অসুখ হলে? গদাধরের অবস্থা দেখে কাতর হয়ে পড়লেন রাণীমা।

তখনকার দিনের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন। আদি বাড়ি ঢাকা জেলার উত্তরপাড়-কমরপুর গ্রামে। কলকাতায় কুমারটুলীতে থাকেন তিনি। লোকে বলে তিনি ধন্বন্তরী। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রমুখের সঙ্গে তাঁর নিত্য যোগাযোগ। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নাকি তাঁর হাতে কথা কয়!

মথুরামোহন নিয়ে এলেন তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে।

চিকিৎসা চলল।

কী দেখলেন গঙ্গাপ্রসাদ? এ কে? এ ব্যাধি কেমন ব্যাধি?

ব্যাধি ঈশ্বরে অনুরাগ। অসুস্থ মানুষটি ছাই চাপা আগুন—জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার! আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। তার তাপে পুড়ে যাচ্ছে অষ্ট পাশ—আচার বিচার। অতএব এর চিকিৎসা করে ফল কী হবে!

শুনলেন সব মথুরামোহন। রাসমণিকে জানালেন সব কথা। চিন্তিত হয়ে রাণীমা বললেন,—এখন উপায় কী হবে? কে করবে মায়ের পুজো!

পুজোর ভাবনা কী?

যাঁর ভাবনা তিনিই তা ভেবে রেখেছেন।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছোটভাই রামকানাই। তাঁর বড় ছেলে রামতারক এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ইনিই হলধারী। নিষ্ঠাবান পণ্ডিত মানুষ। বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তবুও মথুরামোহন তাঁকে মায়ের নিত্যপুজো

করার অনুরোধ জানালেন।

ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে টানলেন মা।—আয় আর তোকে কোন কাজ করতে হবে না। এখানে থাক্ বসে।

গদাধরের কাজের ভার নামল! কিন্তু শরীরের কোন উন্নতি দেখা গেল না।



আলোর বৃত্তটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে।

ছড়ান আলো এসে দাঁড়িয়েছে একটা বিন্দুতে। রাসমণির জীবন। রাজ রাজেশ্বরী রাসমণি। এই বিশাল বৈভব আর প্রাচুর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি নিঃসঙ্গ। একা!

মথুর এসেছেন। একমাত্র এই একজনই তাঁর মনের খবর রাখেন। পুত্রের অভাব ঘুচেছে তাঁর।

মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের গোপ বালক নয়, ননীচোরা রঙ্গলাল নয়। রাজার রূপ অন্য।

কারও কারও জীবনে নাম সার্থক হয়ে দেখা দেয়। তেমনি দেখা দিয়েছিল মথুরামোহনের ক্ষেত্রেও। নামে-কাজে-মেজাজে তিনি সত্যিই রাজা। রাণীর যোগ্য উত্তরসূরী।

রাণীমার স্বস্তি,—শুধুমাত্র এই এক জায়গায়। মথুর আছেন—তিনিই চালাবেন সব। ভার নেবেন দক্ষিণেশ্বরের। জগদীশ্বরীর সেবার।

মথুরের সঙ্গে এখন একজনের কথাই ঘুরে ফিরে হয় রাসমণির, তিনি গদাধর।

গদাধর এখন কামারপুকুরে। অবস্থার খুব বাড়াবাড়ি হওয়ায় ঠাকুরকে আপনজনেরা বাড়ি নিয়ে গেছেন! বছরখানেকের ওপর কালীমন্দির এখন শূন্য।

বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে রাসমণির। কী যেন নেই। কে যেন একটা শূন্যতার গহ্বর মেলে ধরেছে সেখানে। ভাল লাগে না। কবে আসবেন ঠাকুর? সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন রাসমণি মথুরবাবুর কাছে।

গদাধরের বিয়ে হয়েছে।

মা-ভাই মিলে বিয়ের পাত্রী খুঁজে খুঁজে হয়রান। গদাধর নাকি বলেছেন,—কেন মিথ্যে ঘুরে মরা! জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়ে রয়েছে তার জন্য, 'কুটো বাঁধা'!*

থাকবেই তো। সারদা সরস্বতী। তাঁর মুখের কথা মিথ্যে হবার নয়। লক্ষ্মীর আসন পাতা আছে বৈকুণ্ঠে—একমাত্র লক্ষ্মীই জানেন তা।

হোক না পাঁচ-ছ' বছরের মেয়ে। গদাধরের কথা মত সেখানেই বিয়ে হল। ছেলের পক্ষ থেকে পণ লাগল তিনশ' টাকা। সেটা ১২৬৬ সন। বৈশাখ মাস।

রাসমণি শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

আজ সেই কথাই বলছিলেন রাসমণি মথুরকে,—ওদের এবার আসতে বল বাবা মথুর। দু'জনেই আসুক জোড়ে। দেখে নয়ন সার্থক করি।

মথুর বোঝেন মার মনের কথা। গদাধরের কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগে। অবশ্য বলতে ভাল লাগে তাঁরও। মথুর ভাবেন মাঝে মাঝে—তিনি নাস্তিক নন, আবার অন্ধ আবেগেরও বশ নন। লেখাপড়া শিখেছেন—ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে তিনিও একজন। যে যা বোঝাল,—অমনি তিনি বুঝে গেলেন—সেটা তাঁর কাছে হবার নয়।

কিন্তু গদাধর তাঁর সব কিছু এলোমেলো করে দিলেন।

একবার বলেছিলেন মথুর,—ঈশ্বরও আইন মেনে চলেন। নিয়মের বাইরে যাবার অধিকার তাঁরও নেই। তাই একই নিয়মে দিন-রাত্রি হয়, গাছে ফুল ফোটে, মানুষ জন্মায় মরে।

গদাধর শুনে বলেছিলেন,—যার আইন সে তা রদ করে ইচ্ছে করলেই একটা নতুন আইন করতে পারে। সেখানে তাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

মথুর হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, ছোট ঠাকুর, এই আমাকে যা বল্লে, তা বল্লে। লাল ফুল গাছে লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না।

গদাধর বলেছিলেন,—মার ইচ্ছে হলেই হয়।

অহঙ্কারের বেড়া ভাঙ্গার কাজ গদাধরের। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার! পরদিনই ঝাউতলার পাশের জবা গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে মথুরামোহনকে দেখিয়েছিলেন ঠাকুর। একই ডালে দুটি বোঁটায় দুটি ফুল—একটি লাল, একটি সাদা।

---

* দেবতার ভোগের জন্ত পল্লীগ্রামে প্রথা ছিল গাছের প্রথম তে একটি কুটো (খড়) বেঁধে চিহ্ন দিয়ে রাখা। যাতে কেউ সেটি তুলে না নেয় বা খেয়ে না ফেলে

যে দেখেছিল সেই অবাক হয়েছিল! মথুরামোহন স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছিলেন। হার স্বীকার করেছিলেন তিনি!

আর একদিন কুঠি বাড়ির বারান্দা থেকে আনমনে দেখেছিলেন মথুরামোহন—গদাধর তাঁর ঘরের সামনে পূব-পশ্চিমমুখী বারান্দায় পায়চারি করছেন আপন মনে। কুঠি বাড়ির দিকে এগিয়ে এলে মথুর দেখলেন স্বয়ং মা জগদীশ্বরী! আর পিছনমুখো হয়ে হাঁটা দিলে দেখলেন মহেশ্বর!

চোখের ভ্রম! কিন্তু ভ্রম তো একবারই হয়। বার বার নয়।

নিজেকে সেদিন আর সামলাতে পারেননি মথুর। ছুটে এসে ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে কেঁদে ফেলেছিলেন ঝরঝর করে।

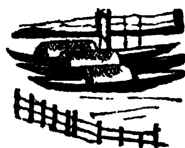
গদাধর শশব্যস্তে বাধা দিয়েছিলেন.—একি করছ! রাণীর জামাই তুমি। লোকে বলবে কী?

সে কথা কে শোনে তখন। লোকলজ্জা-মানের বেড়া ভেঙ্গে গেছে। সেখানে কে রাণী কে বা রাজা!

মথুর রাসমণির কাছে আজ এতদিন পর সে সব কথা বললেন।

রাসমণি সব শুনে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, ধন্য তুমি মথুর। ঠাকুর কৃপা করেছেন তোমায়। বিশ্বাস করেছেন।

যে যাই বলুক—এ বিশ্বাস ভেঙ্গো না কোনদিন। বিশ্বাসের মর্যাদা দিও। আমি জানি তা তুমি পারবে।



১২৬৭ শেষ হতে চলল।

শীতের ছোঁয়া লেগেছে প্রকৃতিতে।

সাত বছর বয়েসে রীতি অনুযায়ী গদাধর বাপের ঘর থেকে স্ত্রী সারদাকে নিয়ে জোড়ে এসেছিলেন কামারপুকুরে।

সে সব নিয়ম-কানুনের পালা শেষ। সারদা ফিরে গেছেন বাপের বাড়ি। চন্দ্রমণি ক'দিন ধরেই দেখছেন গদাধরের অন্য ভাব।

কেমন যেন আনমনা, উদাসীন।

ছেলেকে একা পেয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন,—হ্যাঁরে গদাই, কি হয়েছে রে তোর?

গদাধর নিরুত্তর।

—সারদার জন্য মন খারাপ ? মেয়েটা সত্যিই বড় লক্ষ্মী রে।

গদাধরের মুখে হাসি ফোটে। বলেন,—ঘরে বসে লক্ষ্মীর ধ্যান করলে আর যে চলে না মা।

বুক কেঁপে উঠল চন্দ্রমণির।

গদাধর বলছেন একথা ! সংসারে অভাব তো তাঁর আছেই। নিত্য অনটন লেগে আছে। এত বড় একটা অসুখ সামলে উঠেছেন সবে। আবার চোখের আড়াল করতে মন চায় না তাঁর এই ছেলেকে।

—আমি দক্ষিণেশ্বর যাব।

চমকে উঠলেন চন্দ্রমণি। আশঙ্কা সত্যি হলো তাঁর। ক'দিন আগে রামেশ্বরকেও নাকি এই একই কথা বলেছেন গদাধর।

—তোর শরীর ভাল নয় বাবা।

—আমি এখন ভাল আছি মা। আমায় এবার যেতে দাও। আকুতি ঝরল গদাধরের গলায়।

কারুর অনুরোধ উপরোধই টিকল না শেষ পর্যন্ত। গদাধর রওনা দিলেন দক্ষিণেশ্বরে।

গদাধরের মন ব্যাকুল হয়েছে।

ব্যাকুল হয়েছে রাণীমার জন্য।

যিনি জন্ম দেন তিনি মা। যিনি পালন-পোষণ করেন তিনিও মা। সে মা লোকমাতা। আর সকলকে এক সুতোয় বেঁধে যিনি চালান তিনিও মা। সে মা জগন্মাতা। আছেন ঐ মন্দিরে।

এক মা রইলেন দেশে কামারপুকুরে। আরেক মায়ের কাছে চলেছে ছেলে বিদেশ থেকে। কিন্তু সে মা এখন কালীতীর্থ কালীঘাটে।

গদাধর শুনলেন, রাসমণির বড় অসুখ।

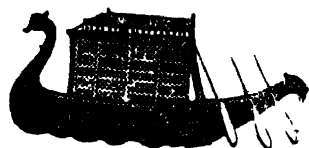
রাণীমা পড়ে গিয়েছিলেন একদিন আচ্ছন্ন হয়ে।

তারপরই অসুখের বৃদ্ধি।

ফিরে এসেই জগন্মাতার মন্দিরে গেলেন ঠাকুর। মা জগদীশ্বরীর মুখে হাসির আলো ঝরল।

—মা গো, রাণীমার কী হবে ? সেও তো আমায় তার ছেলে বলতো গো ? কী হবে এবার ?

—কী আবার হবে ? আমার জিনিষ আমি ফিরিয়ে নেব। ও নিয়ে তুই কিছু ভাবিসনি। তুই যেমন আছিস তেমনি থাক !



গঙ্গার পূর্বদিকে কলকাতার চৌরঙ্গীর ভেতর দিয়ে সোজা পথ চলে গেছে কালীঘাটে। পশ্চিমে বড়িশা বেহালা থেকে আর একটি পথ এসেছে মন্দিরে। খেয়াঘাটে নৌকায় আসছে পুণ্যার্থীরা। বড়িশার কাছে সরশুনায় থাকেন সাবর্ণ চৌধুরীরা। রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধররা। এঁরাই কালীঘাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। পথ জঙ্গালাকীর্ণ। চোর-ডাকাতের উপদ্রবও কম নয়। বন্যজন্তুদের ঘোরাফেরাই বা কে আটকায়? তবু কালীঘাট মহাতীর্থ।

এ পাশে ও পাশে গ্রাম থাকলেও মন্দির ঘিরে বাজার জমজমাট বহুকাল থেকেই। কালীঘাটে পটুয়াদের বাজার। তাছাড়া বারোমাস উৎসব লেগেই আছে। পুজা-অর্চনা তো আছেই. 'মানসিক' করতেন যাঁরা তাঁরাও আসতেন বছর ভোর। এমনকি নিজের আঙ্গুল, জিভ কেটে ফেলেও তাঁরা তাঁদের মানত রক্ষা করতেন। আর ছিল অন্তর্জলি। এটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছিল। মায়ের সামনে, গঙ্গার কূলে মুমূর্ষু মানুষেরা শেষ নিশ্বাস ফেলতে আসতেন পুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়।

১৭৬৮ সালে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব নাকি এক লক্ষ টাকা খরচ করে মায়ের পুজো দিয়েছিলেন। আর ১৮২২ সালে গোপীমোহন দেব যখন পুজো দিতে আসেন তখন চারদিকে পুলিশ পাহারা বসাতে হয়েছিল—এত ভিড় হয়েছিল। ১৮২২-২৩ সালে অবশ্য কালীঘাটের ব্রীজও তৈরি হয়ে গেছে।

মা-কালীর প্রতি ভক্তি কিন্তু ইংরেজদের বরাবরই। ফিরিঙ্গি কালীর মন্দির তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালীঘাটে বহু সাহেব-মেম মনবাসনা পূর্ণ হওয়ায় হাজার হাজার টাকা খরচ করে পুজো দিয়েছেন, এমন বহু নজীর আছে। তাই জুড়িগাড়ী, পালকির আমদানি অপর্যাপ্ত ছিল।

দূর দূরান্ত থেকে, এই কালীঘাটে আসতেন রাণীমার বহু আত্মীয় পরিজন. এমন কি গ্রামের চেনা-পরিচিত জনেরাও বাদ যেতেন না।

কালীঘাটে রাসমণির অনুরোধে রাজচন্দ্র একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্য যাত্রায় কালীঘাটের কথা উল্লেখ করেছেন।—

"বালিঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা।"

এ কথাগুলি যেন রাসমণির জীবনে রূপক হয়ে দেখা দিল.

সন্ধ্যা নামছে। দিনের শেষ। জীবনেরও শেষ। রাসমণির ইচ্ছায় তাঁকে আনা হয়েছে কালীঘাটের বাড়িতে। মায়ের আর এক মন্দিরে। জীবনের ডিঙ্গি এসে ভিড়েছে আর এক ঘাটে! দক্ষিণেশ্বরের 'বালিঘাট' পেরিয়ে মেয়ে এসেছে মাকে শেষ প্রণাম জানাতে কালীঘাটে।

—জগদম্বা, মা কেমন আছেন আজ? মথুরামোহন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন সন্তর্পণে।

—ভাল না। কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল হয়ে আছে জগদম্বার। কোবরেজ মশাই আবার আসবেন সন্ধেয়। ডাক্তার আছেন মায়ের ঘরে।

মথুরামোহন ব্যস্ত হয়ে গেলেন সেখানে।

রাসমণি শুয়ে আছেন শয্যায়। ঘরের স্বল্পালোকে বিশাল পালঙ্কে শায়িতা রাসমণিকে দেখে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হলো মথুরামোহনের। এ কী চেহারা হয়েছে মার! যেন সকালের শুভ্র যুঁইফুল শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে সাঁঝবেলাতেই। দু'চোখের পাতা বন্ধ।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। নীচে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন মথুরবাবু।

নতুন করে শোনার আর আছেই বা কী? প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে। নিভে আসছে জীবন-প্রদীপ। দ্রুত অবনতি হচ্ছে শরীরের।

মথুর শয্যার পাশে বসলেন। ডাকলেন,—মা!

রাসমণি চোখ মেললেন অতি ধীরে। মথুরামোহনের দিকে চেয়ে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন,—মথুর, বাবা এবার সময় তো হয়ে এল!

অনেক কষ্টে আবেগকে সংযত করলেন মথুরবাবু।

রাসমণি ডাকলেন.—মথুর! জগদম্বাকে কাঁদতে বারণ কর। দেহ জীর্ণ হয়েছে, যাবার সময় হয়েছে। যেতে আমায় হবেই। কেউ থাকে না —সবাইকেই যেতে হয়।

মথুরামোহন নীরব। এর কি উত্তর দেবেন তিনি?

রাসমণি ইংগিত করলেন। দাসী ছুটে এসে মাথার দিকের বালিশটা একটু তুলে দিল। রাসমণির আচ্ছন্ন চেতনা [illegible]

দৃষ্টি প্রখর হল। মুখে ফুটল দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ।

মথুরামোহন বিস্মিত হলেন।

রাসমণি বললেন, একটা কাজ এখনও করা হয়নি আমার মথুর। বাবা, সে কাজটা কালই তোমায় করে ফেলতে হবে। নইলে মরণেও আমার শান্তি নেই।

একটু থেমে রাণীমা বললেন, —হাতের পাঁচটি আঙ্গুল সমান নয় যেমন—আমার আপন জনরাও তো সবাই এক রকম নয়। ভয় আমার সেখানেই। করুণাকে আগে হারিয়েছি—কুমারীও চলে গেছে তারপর। এখন পদ্ম আর জগদম্বা।

—জগদম্বার জন্য আমার কোন ভাবনা নেই—, একটু থামলেন রাণীমা। চিন্তা পদ্মকে নিয়ে, অন্য জামাইদের নিয়ে, তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। বিষয়ের যা হয় হোক্, কিন্তু দক্ষিণেশ্বর? মায়ের মন্দিরের কোন ক্ষতি আমার সইবে না মথুর।

মথুরামোহন বললেন, মন্দিরের খরচ-খরচার টাকা দিনাজপুরের তালুক থেকেই তো আসছে মা। অবশ্য কিছু ব্যয় আছে—জমিদারীর অন্য আয় থেকে সে সব চলে যায়—

—না।—রাণীর স্বরে দৃঢ়তা ফুটল। মন্দিরের দানপত্র লিখেছি আমি। কিন্তু এবার দেবোত্তর করতে চাই! তা না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। তুমি কালই তার ব্যবস্থা করো। দেরী কোর না —

মথুর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন নীরবে।

মাথা নত করে আর একবার রাণীমাকে প্রণাম জানালেন তিনি মনে মনে।

এমন না হলে রাণী। রাণীমার অবর্তমানে বিশাল এই সম্পত্তির যাতে অযথা অপব্যয় না হয় তার পথ বন্ধ করতে চান রাসমণি। দেবত্র সম্পত্তি ব্যক্তিগত ভোগে লাগে না।

১৮৬১। ১৮ ফেব্রুয়ারী।

রাসমণি সই করলেন দানপত্রে। 'কালিপদ অভিলাষিনী রাসমণি দাসী।' এত নম্রতা! এত নিরভিমান আত্মনিবেদন!

জগদম্বা সই দিল। স্বীকার করে নিল মায়ের মনবাসনা। কিন্তু পদ্মমণি!

সই দিল না পদ্ম। বলে পাঠাল—মরণকালে মায়ের মতিভ্রম হয়েছে!

নইলে বিশাল এই আয়ের পথ কেউ দেবোত্তর করে বন্ধ করে ! সই দেব না আমি।

কথাটা তীরের মত বিঁধল এসে রাসমণির বুকে। মতিভ্রম ! তা যদি হয় তো তাই।

মনকে গুটিয়ে ছোট কর। আর চেও না কোনদিকে।

আশেপাশে নয়, পিছনে নয়। সামনে দাঁড়িয়ে ঐ আলোক-সুন্দর রঘুনাথ. পাশে মা জগদীশ্বরী।

একই অঙ্গ—দুই রূপ। সামনে দাঁড়িয়ে ওঁরা হাসছেন।

—তুই তো আমাদেরই একজন। ভয় কী তোর ?

ভয় নয়, দ্বিধা নয়। রাসমণি সই দিলেন।* সলিসিটার হিসেবে সই করলেন জে. এফ. ওয়াটকিনস্।

নাম কর, নাম কর।

কিন্তু কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সবার।

অন্তর্জলির জন্য ঘাটে আনা হয়েছে রাণীমাকে।

১৯ ফেব্রুয়ারী। রাত্রি গভীর। হিমেল বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে সবাইকে।

মশাল হাতে দাঁড়িয়ে অনুচরেরা। অদূরে নায়েব—গোমস্তা—দাস-দাসী।

জগদম্বা কাঁদছে আকুল হয়ে।

আদি গঙ্গার জলে ঢেউ দিচ্ছে। ফাল্গুনী আকাশের বুকে তিরতির করে কাঁপছে তারার আলো।

মথুরামোহন চেয়ে আছেন সেদিকে।

রাসমণি হঠাৎ চোখ মেললেন। মথুরামোহন এগিয়ে এলেন সামনে। রাণীর দৃষ্টি স্বচ্ছ। আচ্ছন্নতার চিহ্ন নেই কোথাও। সামনে মথুরামোহন, —কিন্তু দেখছেন না তিনি। পাশে জগদম্বা, সেদিকেও দৃষ্টি নেই তাঁর !

---

* যে দক্ষিণেশ্বর মন্দির রাসমণি দেবত্র করেছিলেন পরবর্তীকালে রাসমণির নাতিরা তা নিয়ে প্রচুর মামলা মোকদ্দমা করেছিলেন। আদালতের কাগজপত্রে দেখা গেছে ঐসব মোকদ্দমায় এত টাকা ব্যয় হয়েছে যে দেবোত্তর সম্পত্তিও ঋণগ্রস্থ হয়ে বাঁধা পড়েছে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন—"কে বলিবে রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্তি ঐ বিবাদের ফলে নামমাত্রে পর্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কিনা!"

এ বিষয়ে দলিলের অংশও তিনি উল্লেখ করেছেন—"Debt due on mortgage by the Estate is Rs 50,000 ; interest payable quarterly is Rs. 876-0-0 ; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000, as yet untaxed."

রাসমণির ঠোঁট নড়ে উঠল।

—এত আলো জ্বালিয়ে রেখেছিস কেন তোরা? সরিয়ে দে, সরিয়ে দে। ও সব রোশনাই আর ভাল লাগছে না। আমার মা আসছেন এখন, মা জগদীশ্বরী। ঐ যে তাঁর অঙ্গ থেকে আলো ঝরে পড়ছে। সব দিক আলো হয়ে উঠেছে!

সচকিত হলেন মথুর। আপনা থেকে দুটি হাত জোড় করে হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পড়লেন মাটিতে। নায়েব মশাই সরিয়ে দিলেন মশালচিদের।

—মা, এলে মা? এবার চল যাই। কিন্তু পদ্ম যে সই দিলে না মা? কী হবে তবে?

রাসমণির বুক চিরে আকুল করা এই প্রশ্ন যেন চতুর্দিকের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে দিল। পদ্ম সই দেয় নি। লজ্জায় তারারা ঢেকে নিল নিজেদের হালকা কুয়াশার চাদরে! বাতাসও বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য!

নিস্পন্দ শরীর পড়ে রইল। জীর্ণ বস্ত্রের মত তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন রাণীমা।

মথুরামোহনের দু'চোখ ছাপিয়ে জলের ফোঁটা বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ল মাটিতে। দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হলেন তিনি।



হৃদয় দেখছে গদাধরের আবার পূর্বাবস্থা। উদাসী মন তাঁর।

ঘুম নেই চোখে—সারারাত ছটফট করেন মন্দিরে।

সে রাতেও একই অবস্থা। অগত্যা হৃদয় জেগে বসেছিল। সে তো পাহারাদার। পাহারা দিচ্ছিল মামাকে।

রাত্রি গভীর হল।

মন্দিরের চাতালে হঠাৎ শিউরে উঠলেন ঠাকুর। চোখ মেলে তাকালেন আকাশের দিকে! তারপর উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন।

ভোরের আলো ফোটেনি তখনও।

রাত্রি শেষের সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে গদাধর এসে দাঁড়ালেন মন্দির প্রাঙ্গনে। হৃদয় জেগে বসে আছে ঠায়।

গদাধর বললেন,—চলে গেল রে হৃদে,—অষ্ট সখীর এক সখী এসেছিল মায়ের কাজ করতে। কাজ মিটে গেছে,—মা এসে নিয়ে গেল তাকে সঙ্গে করে!

তবে থাকল কী?

থাকলেন মা জগদীশ্বরী আর রাসমণির সাধন পথের শ্রেষ্ঠ পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ!

* * * *

রাসমণি ব্রহ্মলীন হয়েছেন!

আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্ম সত্য—জগত মিথ্যা।

যে সব পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সূক্ষ্ম সেই পদার্থই ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ। যে সব পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গোচর, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তাও ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ। এই সৃষ্টিকালেও ব্রহ্ম পূর্ণরূপে রয়েছেন। অবিদ্যার ভ্রান্তি দূর হলে, সেই পূর্ণ পুরুষই অবশিষ্ট থাকেন। জ্বলন্ত প্রদীপের সামনে একটি দর্পণ রাখলে যেমন তাতে একটি প্রদীপের ছায়াই পড়ে, আবার দর্পণ সরিয়ে নিলে যেমন সেই একটিমাত্র প্রদীপই অবশিষ্ট থাকে, সেই রকম ভ্রান্ত জ্ঞান দূর হলে, সেই অজ্ঞান সংসার ভ্রান্তিও দূর হয় এবং অবশিষ্ট থাকেন এক এবং একমাত্র ব্রহ্মই। অতএব চাই শুধু প্রার্থনা। প্রার্থনা সেই মঙ্গলময়ের চরণে—আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ [(১) আধ্যাত্মিক—ব্যাধিজনিত শারীরিক ও প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা, কলঙ্ক ও ধন নাশের জন্য মানসিক ক্লেশ। (২) আধিদৈবিক—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত দুঃখ। (৩) আধি-ভৌতিক—পঞ্চভূত বা জন্তু থেকে উৎপন্ন উপদ্রবের জন্য ভয় বা দুঃখ।] সমস্ত সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

আরও কিছু কথা ●

আইন ও আইনজ্ঞ :

রাণী রাসমণি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যতগুলি কেস নিয়ে আইনের যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গঙ্গায় জেলেদের বিনা করদানে মাছ ধরা।

এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন চেতলার উকিল কাশীশ্বর ঘটক। ইনি জন্মেছিলেন যশোর জেলার অন্তর্গত ঝিকরগাছার কাছে, কপোতাক্ষের তীরে ঝাঁপা মশ্বিনগরে। অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে কাশীশ্বর। শৈশবে গৃহত্যাগ করে, অনিশ্চিতের হাত ধরে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিলেন চেতলায়। এই চেতলার পীতাম্বর ঘটক ছিলেন আলিপুর কোর্টের ডাকসাইটে মোক্তার। পিতাম্বর বাবুই কাশীশ্বরকে আশ্রয় দেন এবং গড়ে তোলেন। তখন থেকেই কাশীশ্বর ঘটক নামে তাঁর পরিচিতি। পীতাম্বরের মুহুরী ছিলেন তিনি।

পরবর্তী সময়ে তিনি রাণী রাসমণির আরও কয়েকটি মামলা নিয়ে কাজ করেছিলেন।

"ইতিহাসের বনগ্রাম" গবেষণা গ্রন্থের লেখক, শ্রদ্ধেয় নির্মল মুখোপাধ্যায়ের মাতামহের বাবা ছিলেন কাশীশ্বর। এ তথ্য তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া।

মন্দিরের পালা বিবরণ :

এই গ্রন্থের ২৮৫ পৃষ্ঠায় যে ক'জন পালা নিয়ন্ত্রকের কথা উল্লেখ করেছি, অনিচ্ছাকৃতভাবে সেখানে কিঞ্চিৎ ত্রুটি থেকে গেছে। সুতরাং বিষয়টির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

শিবরামের বংশধর ৺পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের তিন ছেলে। যাঁদের বর্তমানে (অগ্রহায়ণ : ১৩৯৫) পালা চলছে। মনে রাখতে হবে যখন যাঁদের পালা পড়ে, তাঁদেরই একজন হ'ন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, সুতরাং বর্তমানে পালা নিয়ন্ত্রক পার্বতীচরণের পুত্রত্রয় শশাঙ্ক, গৌতম ও ধর্মদাস চট্টোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে শশাঙ্কবাবুই প্রধান পুরোহিত। প্রতি ১লা ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ এই ৪ মাস এঁদের ওপর পালা-ভার ন্যস্ত থাকে।

এরপর প্রতি পৌষ-মাঘ এই দু'মাসের পালা পড়বে রামলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী রাধারাণী দেবীর উপর। ইঁনি নিঃসন্তান। রামলালের মধ্যম পুত্র ৺জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্ররা যথাক্রমে পাঁচুগোপাল,

নন্দগোপাল ও মোহনগোপাল,—এঁদের পালা পড়বে প্রতি ফাল্গুন থেকে বৈশাখের ১৫ তারিখ পর্যন্ত।

রামলালের কনিষ্ঠ পুত্র ৺হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রেরা—শংকর, শ্যামল, গোপাল, সুবল ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়, এঁদের ওপর পালার ভার থাকবে প্রতি বৈশাখের ১৬ তারিখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত।

মন্দিরের পূজক :

দ্বাদশ শিবমন্দিরের দু'জন পূজারীর মধ্যে সুধীর চক্রবর্তীর স্থলে ভট্টাচার্য পড়তে হবে।

রামকৃষ্ণদেবের ঘরের যাবতীয় পূজো অর্চনার দায়িত্বভার অর্পিত আছে, চার পুরুষ ধরে রামেশ্বরের বংশধরদের ওপর।

রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজারী হলেন প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

গাজী পীরের থান :

রাণী রাসমণি এই গাজী পীরের থান সহ মন্দিরের জমি কেনেন। পরবর্তী সময়ে শ্রীঠাকুরের পীর সাধন স্থল নামে এ স্থান আখ্যায়িত।

অতীতে এই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ে পূজো-অর্চনার দায়িত্বভার ব্যক্তিগতভাবেই পালন করতেন আলিঙ্গির চিস্তি নামে একজন আরবী পীর। এখানেই তাঁর সমাধি, যে জন্য এই স্থানটিকে 'মাজার' বলে। তারপর মহম্মদ খাঁ নামে একজন ব্যক্তিগতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

এরও কিছুদিন পর পতিতপাবন বেরা স্বেচ্ছায় এই পীরস্থানের যাবতীয় কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নেন। তিনি বহুকাল ছিলেন এখানে। তাঁর দেহরক্ষার পর নদীয়ার চাকদহ নিবাসী সুধীরকুমার রায় এখানে তেইশ বছর ধরে দেখাশোনা করছেন।

পূজো-অর্চনায় ট্রাস্টি বা এস্টেটের পক্ষ থেকে কোন খরচই বহন করা হয় না। প্রণামী ও দানের উপর নির্ভর করে নিত্য পূজো হয়।

জীবন নিয়ে মঞ্চ ও চিত্ররূপ :

রাণী রাসমণিকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে একটি নাটক, চলচ্চিত্রে দুটি ছবি এবং যাত্রায় একটি পালা হয়েছে। পালাটি দুটি দল অভিনয় করেছিল।

নাটক প্রসঙ্গে শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' বইটিতে (পৃঃ ১৮৮) যা লিখেছেন, তা এইরকম :

"ইংরেজী ১৯৪৮।

সরস্বতী পুজোর দিন বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের পুজো করে তাঁর প্রতিকৃতির চরণ স্পর্শ নিয়ে একটি নতুন নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা হলো। নাটকের নাম -নাট্যকার, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলিকাতার 'কালিকা থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী রাম চৌধুরী (বর্তমানে লোকান্তরিত) নাটক প্রযোজনা করবেন। নাটকটি রচনার সময় দফায় দফায় রামবাবু বেলুড়মঠে গিয়ে সন্ন্যাসীদের শুনিয়ে এসেছেন, তাঁদের সমর্থন পেয়েছেন—আশীর্বাদ লাভ করেছেন। নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে—এবার অভিনয় শুরু হতে চলেছে।

কিন্তু আপত্তি এলো বেলুড় মঠ থেকেই—। তখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। রাম চৌধুরী প্রমাদ গণলেন। আপত্তির কারণ কি?

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী—স্বনামে তাঁকে মঞ্চে আনা হবে—নাটকে আছেন, সারদা দেবী, রাণী রাসমণি, নরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, কেশব সেন। এ সব চরিত্রে অভিনয় করবেন সাধারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা—সাধারণ ভক্তদের এতে প্রবল আপত্তি। সে আপত্তির ঢেউ উঠলো সংবাদ পত্রেও। রাম চৌধুরীর কিন্তু প্রবল জিদ—শুধু জিদ নয়, এক অদ্ভুত শক্তি যেন তাঁকে ভর করেছে। তিনিও গোঁ ধরলেন 'এ নাটকের অভিনয় হবেই।'

ব্যাপারটা গড়ালো অনেকদূর পর্যন্ত। কিরণশঙ্কর রায় তখন বাংলার (পশ্চিম বাংলা) স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী। তাঁর কাছেও নালিশ গেল। থিয়েটারের দরজায় পুলিশ বসলো। রামবাবুর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই:

"আমি মশাই পুলিশের দারোগা—লাঠিবাজিতে কুখ্যাত। আমিই বা ছাড়ব কেন, যখন স্বয়ং ভবতারিণীর আদেশ পেয়েছি।"

রামবাবু বেলুড় মঠে গিয়ে সন্ন্যাসীদের বললেন, "আপনারা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করুন যেন আমি হঠাৎ accident-এ মারা যাই। যতক্ষণ বেঁচে আছি, নিবৃত্ত হব না কিছুতেই।"

রামবাবুর কৌঁশুলী গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। বললেন—

"যে বই censor থেকে pass হয়েছে, সরকার থেকে তা' বন্ধ করার চেষ্টা করলে আইনের আশ্রয় নেব।" পুলিশ কমিশনার রাম চৌধুরীকে; (তখনও রামবাবু পুলিশের কাজে নিযুক্ত) শাসালেন "আপনার চাকরি যাবে।" ওঁরও তৎক্ষণাৎ উত্তর "এখনই Resignation নিয়ে নিন।"

দফায় দফায় বেলুড় মঠে আলোচনা চললো। ভক্তদের ক্ষোভকে তাঁরা কি করে অগ্রাহ্য করবেন! অবশেষে একটা সমাধান সূত্র পাওয়া গেল। রূপক নাটক হতে পারে। ঘটনাগুলো অবিকৃত রেখে শুধু নামগুলো পালটে দিলেই হবে।

নাটকের নাম হলো 'যুগাবতার'—শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানন্দ, রাণী রাসমণি-নারায়ণী, মথুরবাবু বৃন্দাবন—গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ, কেশব সকলেই রইলেন—তবে স্বনামে নয়।

তাতেও নিস্তার নেই। অভিনয়ের উদ্বোধন হলো। প্রবল উৎসাহ দর্শকদের মধ্যে। কাতারে কাতারে লোক টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। এমনি সময়, আবার প্রতিবাদ এলো, আবার আইনের হুমকি। এবার রাণী রাসমণির উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে। সাতখানা Injunction-এর চিঠি এলো। রামবাবু স্বয়ং গেলেন তাঁদের কাছে, প্রার্থনা : 'একবার আপনারা নিজেরা দেখে যান, কোথাও তাঁদের আমরা অসম্মান করেছি কি না! তারপর যা করবার করবেন।' তাঁরা এলেন, দেখলেন, ফিরে গেলেন প্রসন্ন মনে।

নেপথ্য কাহিনী আরও আছে। সচ্চিদানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করবেন কে? এ নাটক অভিনয়ে সব চেয়ে যাঁর উৎসাহ সেই বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু তো এক কথায় হাত জোড় করে সরে দাঁড়ালেন। নীতীশ মুখোপাধ্যায় রাজী নন। জোর করে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেওয়া হলো ভূমিকাটি—আর সেই থেকেই গুরুদাস একাত্ম হয়ে গেলেন চরিত্রটির সঙ্গে। রাণী নারায়ণীর (রাসমণি) ভূমিকায় নামার কথা মলিনা দেবীর—তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, যদি কেউ আপত্তি করে, কটাক্ষ করে তাঁর সম্পর্কে!

মলিনা দেবী বললেন "রাণী রাসমণির বাড়ির সঙ্গে আমার স্বামীর (জলু বড়াল) যোগাযোগ ছিল। উনি গিয়ে তাঁদের বললেন—মান্নাদের বাড়ি, বিশ্বাসদের বাড়ি সব বলাতে তাঁরা রাজি হলেন।" আশ্বাস পেয়ে মলিনা দেবী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। নারায়ণীর নামে হলেও উনি ঠিকই জানতেন যে রাসমণির ভূমিকাতেই উনি অভিনয় করছেন।

দর্শকদেরও বলে বোঝাতে হলো না—তারা প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ, রাসমণি, নরেন্দ্রনাথকেই মঞ্চে পেয়ে গেল। প্রায় ৫০০ রাত ধরে শহর কলকাতার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটক অভিনয় হয়েছে। কলকাতাকে অতিক্রম করে বাংলাদেশ জুড়ে নাটকের খ্যাতি। অবাঙালী দর্শকরাও এসে মুগ্ধ চিত্তে নাটক দেখেছে। একদিনের কথা, শ্রীরাম চৌধুরী কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারেন না। সেদিন আনন্দময়ী মা আসছেন 'যুগাবতার' দেখতে। 'হলে' একটিও আসন খালি নেই কিন্তু প্রধানশিল্পী গুরুদাস অনুপস্থিত। সদ্যপিতৃহীন নীতীশ মুখোপাধ্যায় এসেছেন—রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি গোঁফ। তাঁকে দেখে রামবাবুর মনে হলো—হ্যাঁ ইনিই আজ পারবেন সচ্চিদানন্দের ভূমিকায় নামতে। সেদিন তাঁর অনুরোধে নীতীশ অভিনয় করেছিলেন—সে অভিনয় নাকি অবিস্মরণীয়।

'যুগাবতার' যখন শুরু হয় তখন বাংলা থিয়েটারে আকাল চলেছে। কোনো নাটক দীর্ঘদিন চলে না —নতুন ভালো নাটক নেই—পুরোনো নাটক দিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাত্র। এমনি সময়ে 'যুগাবতার' হঠাৎ যেন ঝড় তুললো। এতদিনের একঘেয়েমির পর নতুন স্বাদের আনন্দ। সে আনন্দ লাভ করে দর্শক তৃপ্তি পেয়েছে। মাত্র একদিন অভিনয় দেখে অনেকের আশা মেটে নি।—এমনি একজন কিশোর দর্শকের কাহিনী রামবাবু শোনালেন :

বার-তের বছরের স্কুলের ছেলে। রামবাবুর চোখে পড়ল,—'হলে'র বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেটি কাঁদছে। থমকে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন ?'

কান্না-ভেজা গলায় ছেলেটি উত্তর দিল 'আমি স্কুলে পড়ি। পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে প'য়ত্রিশবার 'যুগাবতার' দেখেছি—আমার আর পয়সা নেই। কিন্তু এখনো দেখতে ইচ্ছে করে।'

রামবাবু তাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন—তার ছত্রিশবার দেখার আকাঙ্ক্ষা মিটল তাঁর সহায়তায়।"

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে :

যুগদেবতা ॥ (কালিদাস প্রোডাকসন্স) ॥

প্রযোজনা : রাম চৌধুরী।
পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য ॥
রামকৃষ্ণ : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসমণি : মলিনা দেবী
মুক্তি—১৫ সেপ্টেম্বর-১৯৫০।

রাণী রাসমণি ॥ (চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান) ॥

পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ ॥
সুর : অনিল বাগচী ॥
রামকৃষ্ণ : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসমণি : মলিনা দেবী
মুক্তি—১১ ফেব্রুয়ারী-১৯৫৫।

যাত্রা পালা :

রাণী রাসমণি ॥ প্রযোজক : কল্যাণী অপেরা ॥

রচনা : গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ
রাসমণি : রুবি দত্ত (১৯৭৯)

রাণী রাসমণি। প্রযোজনা : নবরঞ্জন অপেরার পক্ষে
শম্ভুনাথ ঘোষ॥
রচনা : গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ
রাসমণি : রুবি দত্ত॥ (১৯৮০)

৺রঘুনাথ জীউ :

রাণী রাসমণির ৺রঘুনাথ জীউ-এর (শালগ্রাম শিলা) সজ্জা ছিল এইরকম :

১। রুপার তৈরি হনুমান জীউ। ২। স্বর্ণ সিংহাসন : মুক্তার ঝুরি দেওয়া ছাতা সমেত। ৩। অলংকার : স্বর্ণ উপবীত, চূড়া (চূড়ায় একটি মুক্তা), সোনার তারা হার (পান্নার লকেট সহ), সোনার চেন হার-(দুই বহর), সোনার মটরমালা (চুনী-মুক্তা বসান লকেট সহ : বর্তমানে একটি মুক্তা নেই)। ৪। বেনারসী জোড়। ৫। ভেলভেটের উপর সাচ্চা জরির কাজ করা বিড়ে।

রথ :

আগেই বলেছি রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত রথটি ছিল রুপার। এই রথে সুসজ্জিত ২টি ঘোড়া ছিল। একটি সারথি ও ৪টি পরি ছিল। এগুলিও ছিল রৌপ্য নির্মিত।

মৃত্যু :

মথুরামোহন বিশ্বাস	:	১৮৭১ ১৬ই জুলাই
পদ্মমণি	:	১৮৭৮ ৩০ সেপ্টেম্বর
জগদম্বা	:	১৮৮০ ৩১ ডিসেম্বর

ছবি :

রাণী রাসমণির বাড়ির ছবিগুলি তুলেছেন রাজা ধর।
মন্দির ও তৎসংলগ্ন যাবতীয় ছবি অলোকদের তোলা।

রাণী রাসমণির পিতৃকুল

- জগমোহন দাস (হালিশহর কোনা গ্রামের এক দরিদ্র কৈবর্ত)
  - হরেকৃষ্ণ দাস (একমাত্র পুত্র। শ্রমজীবী। স্ত্রী রামপ্রিয়া।)
    - রামচন্দ্র
    - গোবিন্দ
    - রাসমণি (১২০০ সন)

রাণী রাসমণির শ্বশুরকুল

- কৃষ্ণরাম দাস (মাড়) (মাড় বংশের আদি পুরুষ। হাওড়া খোশালপুরে বাস। কিছুদিন বাঁশের কারবার করেছিলেন ইনিও। মাহিষ্য)
  - প্রীতিরাম (যোগমায়া)
    - হরচন্দ্র (নিঃসন্তান)
    - (রায়) রাজচন্দ্র (রাসমণি)
      - (১২১৩) পদ্মমণি=(রামচন্দ্র দাস আটা)
        - গণেশ
          - গোপালকৃষ্ণ (গিরিবালা)
        - বলরাম
          - শ্যাম
          - শিব
          - যোগা
          - অজিত
        - সীতানাথ
          - অমৃত
      - (১২১৮) কুমারী=(প্যারীমোহন চৌধুরী)
        - যদুনাথ
          - চণ্ডী
          - প্রসন্ন
          - দুলাল
          - কিশোর
          - নন্দ
      - ১২২৬ পুত্র (মৃত)
      - (১২২৩) করুণাময়ী=(মথুর)
        - ভূপাল
          - শশী
          - গিরীন্দ্র
          - মণীন্দ্র
            - গুরুদাস
            - কালিদাস
            - দুর্গাদাস
      - (১২৩৩) জগদম্বা=(মথুরামোহন বিশ্বাস)
        - দ্বারিক
        - ত্রৈলোক্য
          - শ্রীগোপাল
          - ব্রজগোপাল
          - নিত্যগোপাল
          - মোহনগোপাল
        - ঠাকুরদাস
          - শ্যামাচরণ
  - রামতনু
  - কালীপ্রসাদ

নির্দেশিকা ●

গ্রন্থসূত্র

করুণাময়ী রাসমণি : নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ॥
জানবাজারের রাণীমা : অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ ॥
লোকমাতা রাণী রাসমণি : বঙ্কিমচন্দ্র সেন ॥
রাণী রাসমণি : প্রবোধচন্দ্র সাঁতরা ॥
রাণী রাসমণি : অন্নপূর্ণা দেবী ॥
রাণী রাসমণির জীবনী : গোপালচন্দ্র রায় ॥
ভক্তিযোগ : স্বামী বিবেকানন্দ
শ্রীগুরু গীতা :
শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা : জগদীশচন্দ্র ঘোষ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ : নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : শ্রী ম ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী : স্বামী তেজসানন্দ ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা : স্বামী গম্ভীরানন্দ ॥
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ : স্বামী সারদানন্দ ॥
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সংস্পর্শে : নির্মলকুমার রায় ॥
সাধিকামালা : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ॥
দক্ষিণেশ্বর মন্দির ॥ (শতবার্ষিকী সংখ্যা) ॥
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ॥
শ্রী দক্ষিণেশ্বর ॥
কলকাতা কালচার : কালপেঁচা ॥
কলিকাতা দর্পণ : রাধারমণ মিত্র ॥
বরণীয় যাঁরা আদালতে : চিত্রগুপ্ত ॥
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী ॥
রামমোহন সময় ও জীবন সাধনা : মদনমোহন গরাই ॥
হুতোম পাঁচার নকশা : কালীপ্রসন্ন সিংহ ॥
পরিবর্তন পত্রিকা ॥ (শারদ সংখ্যা) ॥
মাহিষ্যসমাজ ॥ মুখপত্র ॥
সাময়িক পত্রসমূহ ॥ সৌজন্যে : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ॥
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র : বিনয় ঘোষ ॥
সংবাদ প্রভাকর o সমাচার চন্দ্রিকা o সোমপ্রকাশ ॥
সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান :
Marshes to Metropolis Calcutta : Dr. Biren Roy.